ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

দেশবিভাগ

পশ্চাৎ ও নেপথ্য কাহিনী

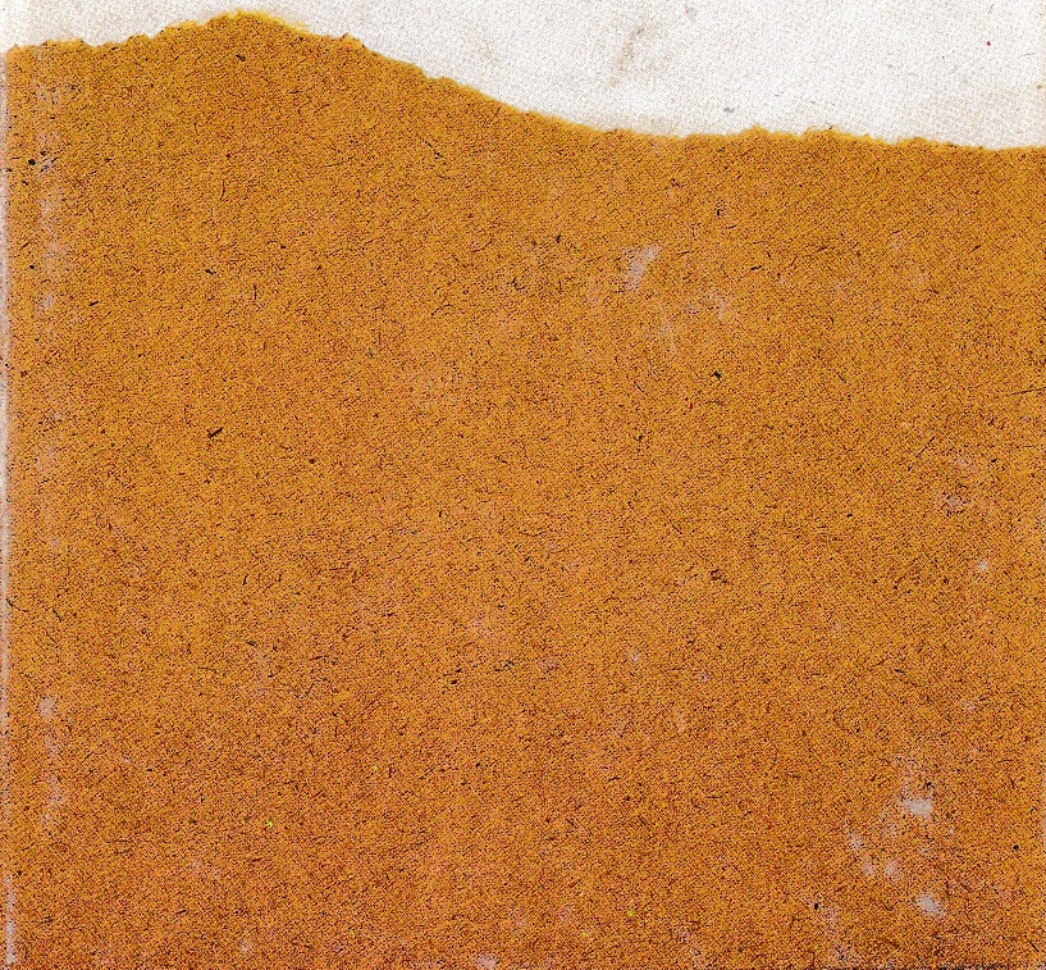

ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পিছনে যেমন শত শহীদের আত্মোৎসর্গের গৌরবকাহিনী, তেমনই রয়েছে রক্ত-কলুষিত দেশবিভাগের করুণ ঘটনা। বস্তুত স্বাধীনতা দেশবিভাগের মূল্যেই অর্জিত। তবু যাঁরা দেশবিভাগ চেয়েছিলেন তাঁদের উল্লাস—দাবি সনদের পূর্ণ প্রাপ্তির অভাবে—হয়েছে কণ্টকিত, আর, যাঁরা তা চাননি তাঁদের মন স্বপ্নভঙ্গের বেদনায় ভারাক্রান্ত।

কিন্তু দেশবিভাগ কি একান্তই আকস্মিক কোনও ঘটনা? মোটেই তা নয়। কিছু লোকের অকারণ জিদ, কিছু মানুষের ভুল বোঝাবুঝি অথবা কোনও-কোনও লোকের অহেতুক ক্ষমতাপ্রিয়তার পরিণাম মাত্র নয় যেমন দেশবিভাগ, তেমনই হয়তো দেশবিভাগের দাবিকেও সম্পূর্ণ অযৌক্তিক বলা যাবে না। বস্তুত, দেশবিভাগের সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনা না থাকলেও এর জন্য প্রস্তুতি চলেছিল দীর্ঘ দিন ধরে। সাম্রাজ্যবাদী শক্তি ধীরে ধীরে এর জন্য প্রস্তুতিপর্ব চালিয়ে গিয়েছিল। তাদের বিষের বাঁশির সুরের তালে তালে প্রলয়নাচন নেচেছে ভারতবর্ষের মানুষ। যদি দেশবিভাগকে কোনওভাবে আটকান যেত, তবে তার জন্য কী মূল্য দিতে হোত সেকথাও ভেবে দেখার মতো জরুরি এক বিষয়।

উনিশ শো সাতচল্লিশ সালের চোদ্দই ও পনেরই আগস্টের আগে বহু-বহু বছর ধরে নাটকের যে-মহড়া চলছিল নেপথ্যে, তৈরি হচ্ছিলেন কুশীলবেরা, শাণিত করছিলেন তাঁদের অস্ত্র, সেই ঐতিহাসিক কাহিনীই বিবৃত হয়েছে এই বইটিতে। ক্রোধ এবং বেদনা উদ্রেককারী দেশবিভাগের ঘটনাবলীর যে বিশ্লেষণ এতে করা হয়েছে তা নতুন করে মানুষকে চিন্তা করার অবকাশ এনে দেবে।

ISBN 81-7215-162-4

জন্ম ১৯২৭ সাল। আদি বাড়ি হুগলী জেলায়, তবে জন্ম-কর্ম কলকাতাতেই।

ছাত্রাবস্থায় 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের দ্বারা উদ্বুদ্ধ হন এবং গঠনকর্মে আত্মনিয়োগ করেন। কিছু কাল সক্রিয় রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত থাকলেও স্বাধীনতার অব্যবহিত পরেই দলীয় রাজনীতির সংশ্রব ত্যাগ করেন। ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের পাঠ শেষ করে প্রথমে একটি বিদেশী সংস্থায় যুক্ত হন। কিন্তু স্বদেশী কাজে সুযোগ পাওয়ার অসুবিধা বোধ করে সে-কাজ ছেড়ে দিয়ে কলকাতা কর্পোরেশনের কাজে যুক্ত হন।

ছাত্রজীবনে যেমন, কর্মজীবনেও তেমন গান্ধী-ভাবনার গঠনকর্মে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত থেকেছেন।

বর্তমানে বহু স্বেচ্ছাসেবী প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত এবং কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের পরিচালক। এই কাজে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলে ব্যাপক পরিভ্রমণ করেছেন।

গান্ধীদর্শনের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যাতা ও সুলেখক বলে সমধিক পরিচিত।

দেড় শতাধিক প্রবন্ধের লেখক এবং পঁচিশটি পুস্তক-পুস্তিকার রচয়িতা।

প্রচ্ছদ □ প্রবীর সেন

দেশবিভাগ

পশ্চাৎ ও নেপথ্য কাহিনী

ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

প্রথম সংস্করণ জানুয়ারি ১৯৯৩
পঞ্চম মুদ্রণ জুন ২০১৩

© ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

সর্বস্বত্ব সংরক্ষিত

প্রকাশক এবং স্বত্বাধিকারীর লিখিত অনুমতি ছাড়া এই বইয়ের কোনও অংশেরই কোনওরূপ পুনরুৎপাদন বা প্রতিলিপি করা যাবে না, কোনও যান্ত্রিক উপায়ের (গ্রাফিক, ইলেকট্রনিক বা অন্য কোনও মাধ্যম, যেমন ফোটোকপি, টেপ বা পুনরুদ্ধারের সুযোগ সংবলিত তথ্য-সঞ্চয় করে রাখার কোনও পদ্ধতি) মাধ্যমে প্রতিলিপি করা যাবে না বা কোনও ডিস্ক, টেপ, পারফোরেটেড মিডিয়া বা কোনও তথ্য সংরক্ষণের যান্ত্রিক পদ্ধতিতে পুনরুৎপাদন করা যাবে না। এই শর্ত লঙ্ঘিত হলে উপযুক্ত আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করা যাবে।

ISBN 81-7215-162-4

আনন্দ পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেডের পক্ষে ৪৫ বেনিয়াটোলা লেন
কলকাতা ৭০০ ০০৯ থেকে সুবীরকুমার মিত্র কর্তৃক প্রকাশিত এবং
বসু মুদ্রণ ১৯এ, সিকদার বাগান স্ট্রিট কলকাতা ৭০০ ০০৪
থেকে মুদ্রিত।

DESH BIBHAG: PASCHAT O NEPATHYO KAHINI
[Modern History]
by
Bhabani Prasad Chattopadhyay
Published by Ananda Publishers Private Limited
45, Beniatola Lane, Calcutta-700009

১৫০.০০

শিপ্রাকে

মুখবন্ধ

যতদূর মনে পড়ে ষাট দশকের কোন এক সময়। কলকাতার হেদুয়ার কাছে বিখ্যাত মল্লবীর যতীন্দ্রনাথ গুহের (গোবরবাবু) সঙ্গে দেখা করে ফিরছিলাম। পথে প্রয়াত অধ্যাপক আমার বিশেষ শ্রদ্ধাভাজন নির্মলকুমার বসুর সঙ্গে দেখা। তিনি যাচ্ছিলেন গান্ধীজীর এক বিদেশী জীবনীকারের সঙ্গে দেখা করতে। অনেকটা পথ তাঁর সঙ্গে ট্রামে ও পায়ে হেঁটে গিয়েছিলাম। কথা বলেছিলাম দেশবিভাগ নিয়ে। আমার মনে কিছু প্রশ্ন ছিল। প্রশ্ন ছিল তাঁর মনেও। তিনি তার উত্তর খুঁজে পেয়েছিলেন। সেকথা আমাকে বলেছিলেন। তাঁর কথা আমার মনকে নাড়া দিয়েছিল। ভাবিত করেছিল তার চেয়েও বেশি।

আমার সংশয় এবং তাঁর সমাধান আমাকে তাড়িত করেছে দীর্ঘ দিন। দেশবিভাগ একটি ঘটনা। কিন্তু আকস্মিক ঘটনা কি ? এ কি কেবল কয়েকটি লোকের অকারণ জিদ, ভুল বোঝাবুঝি, ভীতি-দুর্বলতার করুণ কাহিনী ? অথবা এর পিছনে ছিল একটি সুনির্দিষ্ট কার্যকারণ, পরিকল্পিত প্রচেষ্টা ? আর এ যদি নিতান্ত নিয়তিই হয় তাহলে সেই নিয়তির বাঁশির সুরের তালে তালে প্রলয় নাচন নেচেছিলেন কারা এবং কেন ? সেই সঙ্গে একথাও মনে এসেছে যে দেশবিভাগ চাওয়াটা কি প্রকৃতই অসঙ্গত ছিল ?

এ নিয়ে আমি পড়েছি যত, ভেবেছি তার চেয়েও বেশি। অনেক দিন লেগেছে আমার নিজেরই মন বুঝতে, ঘটনাগুলি পরস্পর সাজিয়ে নিয়ে একটি সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে। বার বার আমি নিজেকে প্রশ্ন করেছি, আমার কথা কোন পক্ষপাতদুষ্ট নয় তো ? বস্তুত নতুন কিছু তথ্য আবিষ্কার করার দাবি আমি করি না। যেসব ঘটনার উল্লেখ আছে ছিটিয়ে ছড়িয়ে অনেক গ্রন্থে আমি সেগুলিকে যথাযথ স্থানে এবং প্রকৃত প্রেক্ষিতে উপস্থাপিত করেছি এই বইটিতে। সন তারিখের ধারা অনুসরণ করে ইতিহাস রচনার প্রয়াস আমার নয়। আমি ইতিহাসের কাহিনী তুলে ধরতে চেষ্টা করেছি। সন তারিখ তাতে আছে, তার ধারাবাহিকতাকেও সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করা হয়নি। কিন্তু যেহেতু দেশবিভাগের পশ্চাৎ ও নেপথ্য কাহিনী প্রকাশ করাই আমার উদ্দেশ্য সেইহেতু সন তারিখের চেয়ে ঘটনার পারম্পর্যকেই আমি অগ্রাধিকার দিয়েছি। তার ফলে কোন কোন ঘটনার কথা ভিন্ন প্রাসঙ্গিকে একাধিকবার উল্লেখিত হয়েছে। আশা করি গুণীজন এটির অনিবার্যতা উপলব্ধি করে ক্ষমার চোখেই দেখবেন।

আর একটি কথা। গত প্রায় চল্লিশ বছর ধরে বহু জনের কাছ থেকে এই প্রশ্ন আমি শুনেছি যে এই দেশবিভাগ কি এড়ান যেত না ! এই প্রশ্নের অভিঘাত আমার মনকে

শঙ্কাকুল করেছে যে যদি দেশবিভাগ আটকান হোত তবে তার জন্য কী মূল্য দিতে হোত আমাদের সকলকে ? বস্তুত স্বাধীনতা পেতেই দেশবিভাগকে মেনে নিতে হয়েছিল এবং তার জন্যও কম মূল্য দিতে হয়নি। বিনা মূল্যে আমরা স্বাধীনতা পাইনি। দেশবিভাগ এবং তাকে ঘিরে আগে-পরের ঘটনা তো স্বাধীনতারই মূল্য। কিন্তু দুর্ভাগ্য দুটি রাষ্ট্রের কোটি কোটি মানুষের যে সেই মূল্যের দায় আজও মেটেনি। বিভেদ এবং বিভ্রান্তি, বিচ্ছেদ এবং বিদ্বেষ আজও জনজীবনকে ক্লিষ্ট করে দিচ্ছে। দেশবিভাগের পশ্চাৎ ও নেপথ্য কাহিনী মানুষকে আগামী দিনের বিপদ সম্পর্কে সচেতন করে দেবে এই আশা নিয়েই আমি এই ইতিবৃত্ত রচনায় প্রয়াসী হয়েছি।

যেসব বই থেকে আমি তথ্য সংগ্রহ করেছি সেগুলির লেখক এবং প্রকাশকদের কাছে আমি ঋণী। ব্যারাকপুর গান্ধী সংগ্রহালয়ের সম্পাদক বন্ধুবর শ্রীসুপ্রিয় মুন্সী তাঁদের গ্রন্থাগার ব্যবহার করার সুযোগ আমাকে দিয়েছিলেন। কলকাতার জাতীয় গ্রন্থাগার থেকেও আমি সাহায্য পেয়েছি। এঁদের সকলকে আমার ধন্যবাদ। ধন্যবাদ আর একজনকেও। সংসারের নিত্যকর্মের দায়মুক্ত করে যিনি আমাকে আমার সধর্ম পালনে উদ্‌বোধিত করেছেন। বইটি তাঁকেই উৎসর্গ করেছি।

১লা ডিসেম্বর ১৯৯২ — ভবানীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়

ফ্ল্যাট নং ৮/৭
৩৬সি বালিগঞ্জ সার্কুলার রোড, কলিকাতা ৭০০০১৯

সূচি

পূর্বাভাস ১১

শেষের শুরু—১১, ভেদাভেদের রাজনীতি—১৩, দেশবিভাগের সূচনা—১৬, পৃথক নির্বাচনের পর্ব—২০, পরিকল্পিত সাম্প্রদায়িকতা—২২, বিচ্ছেদের বিষবৃক্ষ—২৮

পরিকল্পনা ৩৫

দেশবিভাগ : ভাঙনের জয়গান গাও—৩৫, যুদ্ধাবসান : বন্দরের কাল হল শেষ—৪৭, ক্রিপস প্রস্তাব : আশার ছলনা—৫১

প্রস্তুতি ৫৯

আত্মনিয়ন্ত্রণ : স্বশাসনের নির্মোক—৫৯, ওয়াভেল পরিকল্পনা : মায়া মরীচিকা—৬৪

প্রয়োগ ৭৩

মন্ত্রীমিশন : গুটিয়ে নেওয়া এবং গুছিয়ে নেওয়া—৭৩, প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দ্বি-জাতি তত্ত্বের বিভীষিকা—৮৫, অন্তর্বর্তী সরকার : ঘৃতাহুতি—৮৮

পরিণতি-ক ৯৭

আজাদ-নেহরু-প্যাটেল : স্বপ্নভঙ্গ—৯৭, স্বায়ত্তশাসনের অধিকার : কংগ্রেসের ধর্মসঙ্কট—১১২, জিন্না : যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই—১২১, গান্ধী : যাহা পাই তাহা চাই না—১৩৫

পরিণতি-খ ১৫৭

মাউন্টবেটেনের ভূমিকা : আলেয়ার আলো—১৫৭, উপসংহার : শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে ?—১৭৯

তথ্যপঞ্জী ১৮৭

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ২০১

গভর্নর জেনারেল এবং ভাইসরয় ২০২

গ্রন্থসূচি ২০৪

নির্দেশিকা ২০৫

॥ পূর্বাভাস ॥

শেষের শুরু

অবশেষে ভারতবর্ষ বিভক্ত হয়ে গেল। পরাধীন ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাওয়া অংশগুলি নিয়ে গঠিত হল নতুন রাষ্ট্র, পাকিস্তান। সেই সঙ্গে ব্রিটিশ ভারতবর্ষের অবশিষ্ট অংশও স্বাধীন হল। সংবিধানে তার নাম উল্লেখিত হল ইন্ডিয়া, অর্থাৎ ভারত। ব্রিটিশ ভারতবর্ষই দুটি ভাগে বিভাজিত হল, তবে পরাধীন ভারতবর্ষের যে-মানচিত্র অঙ্কিত হত তার মধ্যে থাকত পাঁচ শতাধিক ছোট বড় দেশীয় রাজ্য। ভারত অথবা পাকিস্তান যে কোন একটি রাষ্ট্রের সঙ্গে যুক্ত হবার স্বাধীনতা তাদের দেওয়া হল। ইচ্ছা করলে নিজেদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখার অধিকার থেকেও তারা বঞ্চিত হল না। ব্রিটিশ ভারতবর্ষের মানচিত্র আলাদা হওয়ার এটিই অবশ্য প্রথম ঘটনা নয়। ১৯৩৭ সালের আগে ভারতবর্ষের মানচিত্রে ব্রহ্মদেশ (বর্তমান নাম মায়নামা) অন্তর্ভুক্ত থাকত। ঐ বছর প্রশাসনিক কাজের সুবিধার্থে ব্রহ্মদেশকে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্তর্গত একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের মর্যাদা দেওয়া হয়। আবার অনেকের মনে অখণ্ড ভারতবর্ষের যে চিত্র অঙ্কিত ছিল তাকে দেশীয় রাজ্যগুলির অবস্থান মলিন করে দেয়নি। কিন্তু পাকিস্তানের সৃষ্টিকে দেশবিভাগ বলেই ইতিহাসে বিবৃত হয়েছে। এর কারণে কোন দ্ব্যর্থবোধকতা নেই। এটি জানা কথা যে আসমুদ্র হিমাচল ভারতবর্ষ কোন দিনই একটি রাষ্ট্ররূপে বিরাজ করেনি। এই দেশ বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন সম্রাট অথবা বাদশার শাসনাধীন হয়েছে। তাঁদের রাষ্ট্রের পরিধি সকলের ক্ষেত্রে এক থাকেনি। কখন তা বিস্তৃত হয়েছে, কখন বা সঙ্কুচিত। কিন্তু ইংরেজরাই দিল্লীর বাদশাকে পরাজিত করে ভারতবর্ষকে জয় করে নেয় এবং খণ্ড ছিন্ন বিক্ষিপ্ত ভারতবর্ষকে একটি রাষ্ট্রের বন্ধনে আবদ্ধ করে। দেশীয় রাজ্যগুলি নামেই ছিল স্বাধীন, কার্যত সেগুলি ছিল সাম্রাজ্যবাদী শক্তির আশ্রয়পুষ্ট করদ রাজ্য। সেখানকার জনগণের আগ্রহ ছিল মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে সংযুক্ত হবার। তার জন্য কোথাও কোথাও তাঁরা প্রযত্নশীল ছিলেন। তাঁদের সেই প্রয়াস যত দিন সফল হয়নি তত দিন তাঁরা খণ্ডিত ভারতবর্ষের কোন অংশে বসবাস করছেন এমন ধারণা কেউ পোষণ করতেন না। কিন্তু ব্রিটিশ ভারতবর্ষ থেকে বেরিয়ে যাওয়া কয়েকটি অঞ্চলকে নিয়ে গঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রকে দেশবিভাগের পরিণাম বলেই মেনে নেওয়া হয়েছে। তার কারণ হল, এই দেশবিভাগ প্রশাসনিক কারণে সংঘটিত হয়নি। তা হয়েছে ভারতবর্ষের জনগণের দুর্বলতা, সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের চক্রান্ত এবং পরস্পরের প্রতি অবিশ্বাস ও অসহিষ্ণুতার কারণে। কিছু মানুষের মূঢ় চেতনা এবং দাঙ্গাবাজী মনোবিকার স্বাধীনতার ঊষালগ্নে দেশবিভাগকে বাস্তবিক করে দিয়েছিল। বস্তুত ভারতবর্ষের স্বাধীনতা ভারতবিভাগের মূল্যেই অর্জিত হয়েছে।

এ কথা ঠিক যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যভুক্তির মধ্যেই একটি রাজনৈতিক সত্তারূপে ভারতবর্ষের আত্মপ্রকাশ ঘটেছিল। আর বণিকের মানদণ্ড রাজদণ্ডরূপে দেখা দেবার পরে জনগণের মনে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা ধীরে ধীরে রূপ পরিগ্রহ করতে থাকে। এই আকাঙ্ক্ষা যতই ঘনীভূত ও শক্তিশালী হতে থাকে দেশবিভাগের দাবিও ততই উদগ্র হয়ে ওঠে। যদিও এ কথা ঠিক যে দাবি যেমনভাবে উত্থিত হয়েছিল দেশের বিভাজন তেমনভাবে হয়নি, তবু এ কথাও অনস্বীকার্য যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সঙ্গে ভারতবর্ষের অঙ্গচ্ছেদ সমীকৃত হয়ে গিয়েছিল। উনিশশো সাতচল্লিশ সালের পনেরই আগস্টের আগমন মুহূর্তে জওহরলাল নেহরু গণপরিষদে ঘোষণা করেছিলেন : "মধ্য রাত্রির ঘণ্টা বাজার সময় সমগ্র পৃথিবী যখন নিদ্রাভিভূত তখন ভারতবর্ষ জেগে উঠবে জীবনে এবং স্বাধীনতায়।" এই ঘোষণার কয়েক ঘণ্টা আগেই পাকিস্তানের জন্ম হয়েছিল। স্বাধীনতা এবং দেশবিভাগের মধ্যে যে যোগাযোগ ঘটেছিল তার উল্লেখ করে জওহরলাল পরবর্তী সময়ে বলেছিলেন : "আমরা দেখেছিলাম পাঞ্জাবে আগুন জ্বলছে। প্রত্যেক দিন হত্যার ঘটনাগুলির কথা আমাদের কানে আসছিল। দেশবিভাগ এই অবস্থা থেকে বার হয়ে আসার একটি পথ আমাদের সামনে উপস্থিত করেছিল। আমরা সেটি গ্রহণ করেছিলাম।"[১] তিনি এ কথাও বলেছিলেন যে অদূর ভবিষ্যতে স্বাধীনতা লাভের অন্য কোন পথ তাঁরা দেখতে পাচ্ছিলেন না বলেই দেশকে বিভক্ত করার প্রস্তাবে তাঁরা সম্মত হয়েছিলেন।

স্বাধীনতার সঙ্গে দেশবিভাগের অঙ্গাঙ্গী সম্পর্ক থাকলেও পাকিস্তানের সৃষ্টিকে কোন আকস্মিক ঘটনা বলে মনে করার হেতু নেই। এ এক বহু দিনের সঞ্চিত আকাঙ্ক্ষা এবং দীর্ঘ প্রয়াসের পরিণতি। অনুরূপভাবে পাকিস্তানের জন্ম কেবল দেশবিভাগের একটি ঘটনামাত্র নয়, তা হল ভারতবর্ষের চিরন্তন সাধনার ওপর প্রচণ্ড আঘাত। যারা একত্র হয়েছে তাদের এক করতে হবে এইটিই হল ভারতবর্ষের চিরকালের গুরুতর সমস্যা। এ কথা রবীন্দ্রনাথ বলেছেন। এই দেশে আর্যরা এসেছে বহিরাগত হয়ে। তাদের সঙ্গে সংঘাত হয়েছে অনার্যদের। তারপর উভয়ে মিলেমিশে রচনা করেছে জনজীবনের মূল স্রোত। 'শক হুনদল পাঠান মোগল' তারাও বাইরে থেকে এ দেশে এসেছে বারে বারে এবং এখানে তারা 'এক দেহে লীন' হয়ে গিয়েছে। কিন্তু ব্যতিক্রম ঘটেছে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের ক্ষেত্রে। ভারতবর্ষ কেবল হিন্দুর দেশ নয়, ভারতবর্ষের কোন অংশ কেবল মুসলমানদের দেশ হতে পারে না ; সমগ্র ভারতবর্ষ হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে ভারতবর্ষে বসবাসকারী সকল মানুষের দেশ এই সত্যকে যুক্তি ও আবেগনিষ্ঠভাবে জনসমাজের মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করা যায়নি। সেই কাজ করার জন্য যে কোন প্রয়াস হয়নি তা নয়। তার জন্য অনেকেই অত্যন্ত আন্তরিকতার সঙ্গে চেষ্টা করেছেন। কিন্তু সেই বন্ধন সম্পূর্ণ হবার আগেই ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের উপনিবেশে পরিণত হয়ে যায়। যে ফাটলটি ছিল তা শাসকদের উস্কানিতে বিস্তৃত হয়, যে প্রীতির সম্পর্ক ধীরে ধীরে গড়ে উঠছিল শাসকদের পরস্বাপহরণের লোলুপতা তার সামনে অবিশ্বাসের প্রাচীর গড়ে তোলে। আর এই অসহিষ্ণুতা এবং অবিশ্বাসের ভিত্তিতেই শেষ পর্যন্ত দেশ দ্বিখণ্ডিত হয়। সে জন্য দেশবিভাগের ঘটনাটি একটি ভূখণ্ডকে খণ্ডিত করার অপেক্ষা জনমানসে বিচ্ছেদ সৃষ্টির করুণতর কাহিনী।

চতুর্দশ শতাব্দীতে বিখ্যাত বিদেশী পর্যটক ইবন বতুতা ভারতবর্ষ পরিভ্রমণ করেছিলেন। তাঁর ভ্রমণকাহিনী থেকে জানা যায় যে তদানীন্তন ভারতবর্ষে হিন্দু ও মুসলমানের সাধারণ সম্পর্ক বিশেষ প্রীতিপূর্ণ ছিল না। হিন্দুরা মুসলমানদের অস্পৃশ্য মনে

করত আর মুসলমানরা হিন্দুদের বিজিত ও বিধর্মী বলে তাচ্ছিল্য করত। মুসলমানদের রাজত্বকালে হিন্দুদের সুবিচার পাবার পথ সম্পূর্ণ বন্ধ না হয়ে গেলেও কেবল হিন্দু বলেই তাদের নানাবিধ অত্যাচার সহ্য করতে হত। বস্তুত এই ভেদভাব ছিল বলেই মধ্যযুগে দাদু, কবীর, রজ্জবের মতো সাধকরা হিন্দু-মুসলমানের মিলনের কথা শুনিয়েছিলেন। পরবর্তীকালেও অনেক আউল বাউল দরবেশরা মনের ক্ষুদ্রতা দূর করতে জনসাধারণকে আহ্বান করেছিলেন। তারই পাশাপাশি ইংরেজ শাসকরা এই সঙ্কীর্ণতাবোধ ও বিভেদকে অবলম্বন করেই তাদের শাসনকে দৃঢ় করতে চেয়েছিল। এই অঘোষিত প্রতিযোগিতায় তারাই জয়ী হয়। তাদের শাসন শিথিল হলেও তাদের ভেদ-নীতি সফল হয়েছিল। দেশবিভাগ তারই ফসল।

ভেদাভেদের রাজনীতি

ইংরেজ শাসকরা ভারত-শাসনে বিভেদ নীতি অনুসরণের কথা অনেক আগে থেকেই ভাবতে শুরু করেছিলেন। তাঁদের সেই মায়াজালে ভারতবর্ষের উভয় সম্প্রদায়ের বেশ কিছু মানুষ প্রলুব্ধ হয়েছিলেন। তাঁরা যে সকলেই খলনায়ক ছিলেন তা নয়। কিন্তু আপাত কিছু কল্যাণের মোহে অথবা কোথাও ক্ষুদ্র স্বার্থসিদ্ধির আশায় তাঁরাও শাসকদের বিভেদ-নীতি সমর্থন করছিলেন। খুব সম্ভবত এর পরিণাম সম্পর্কে তাঁরা সজাগ এবং সতর্ক ছিলেন না। এই বিভেদনীতিই এক দিন বিস্তৃত হয়ে দেশবিভাগকে বাস্তব করে তুলবে এই বোধও তাঁদের ছিল না।

১৮২১ সালে ভারতবর্ষ যখন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির কর্তৃত্বাধীন অর্থাৎ ভারতবর্ষে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের শাসন প্রতিষ্ঠিত হয়নি সেই সময় এক ইংরেজ অফিসার লিখেছিলেন যে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক, অসামরিক এবং সামরিক প্রশাসনের ক্ষেত্রে 'বিভেদ সৃষ্টি কর এবং শাসন কর' (Devide et empera)—এই নীতিকে অনুসরণ করা উচিত। এর প্রায় চল্লিশ বছর পরে বোম্বাইয়ের গভর্নর এলফিনস্টোনের কণ্ঠে এই কথাই প্রতিধ্বনিত হয়। তিনি রাজকর্মচারীদের পরামর্শ দিয়েছিলেন যে রোমানদের মতো ইংরেজ শাসকদেরও ভারতবর্ষে ভেদনীতি অনুসরণ করে রাজ্য শাসন করা দরকার।[২] এলফিনস্টোন যখন এই কথা বলেছিলেন তার আগেই সিপাহী বিদ্রোহ ঘটে গিয়েছিল। সিপাহী বিদ্রোহকে অনেকে ভারতবর্ষের প্রথম স্বাধীনতা সংগ্রাম বলে অভিহিত করেছেন। এই সংগ্রাম সফল হয়নি। তার ফলে মুসলমান সমাজের গরিষ্ঠ অংশে একটি হতাশার ছায়া নেমে আসে। মুসলমানরা অভিমানবশত ইংরেজদের নিয়ে আসা আধুনিকতা থেকে মুখ ফিরিয়ে রাখেন। অবশ্য এই অভিমান যে সমগ্র মুসলমান সমাজকে এক পিছিয়ে পড়া জনসম্প্রদায়ে পরিণত করে দেবে সে কথা তাঁদের কোন কোন নেতা কিছু দিন পর থেকেই বুঝতে আরম্ভ করেন। এই রকম নেতাদের মধ্যে স্যার সৈয়দ আহমেদ ছিলেন অগ্রগণ্য। তিনি ইসলামের মূল নীতির কোন রকম পরিবর্তন না ঘটিয়েও মুসলমান সমাজের মানসিক জড়তাকে দূর করতে সচেষ্ট হন। বিজ্ঞান ও আধুনিকতাকে তিনি স্বাগত জানান। তবে তিনি ছিলেন ব্রিটিশ শাসনের অনুরক্ত। সিপাহী বিদ্রোহের সময় তিনি ইংরেজদের সহযোগিতা করেছিলেন এবং পরবর্তী সময়ে তিনি যখন মুসলমানদের মধ্যে আধুনিক শিক্ষা বিস্তারের উদ্দেশ্যে আলিগড়ে অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ প্রতিষ্ঠা করেন তখন ঘোষণা করেছিলেন যে সেই কলেজের লক্ষ্য হবে মুসলমানদের ব্রিটিশ রাজত্বের উপযুক্ত

ও প্রয়োজনীয় প্রজারূপে গড়ে তোলা। ১৮৮৫ সালে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠা হয়। অনেক দিন ধরে কংগ্রেসের কার্যকলাপ আবেদন-নিবেদন করার মধ্যেই সীমিত ছিল। তা সত্ত্বেও সৈয়দ আহমেদ মুসলমান সমাজকে কংগ্রেস থেকে দূরে থাকতে বলেছিলেন। কংগ্রেস একটি হিন্দু প্রতিষ্ঠান এই রকম ধারণা নিয়ে তিনি মুসলমানদের কংগ্রেস থেকে দূরে থাকতে বলেননি। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে কংগ্রেস একটি আক্রমণাত্মক সংগঠন।[৩] তাই যাঁদের তিনি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অনুগত প্রজারূপে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন তাঁরা সাম্রাজ্যের বিরোধী কোন রকম কাজে লিপ্ত হন তা তিনি চাননি। বস্তুত মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগদান থেকে নিবৃত্ত করার এইটিই ছিল তাঁর কারণ।[৪]

সৈয়দ আহমেদ একজন অসাম্প্রদায়িক এবং উদার মনোভাবাপন্ন লোক বলেই সমধিক পরিচিত ছিলেন। ১৮৮৪ সালে একটি বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন : "আমি আন্তরিকভাবে আমার দেশ এবং জাতির সেবা করতে চাই। জাতি কথাটি দিয়ে আমি হিন্দু এবং মুসলমান উভয়কেই বোঝাতে চাইছি। কেননা আমার জাতি কথাটির এইটিই একমাত্র অর্থ।"[৫] অন্য একটি বক্তৃতায় তিনি এমন কথা বলেছিলেন বলে শোনা যায় যে হিন্দু এবং মুসলমান একটি সুন্দরী রমণীর দুটি চোখের মতো। কোন আঘাতে তার একটি চোখ নষ্ট হয়ে গেলে অপরটিও নষ্ট হয়ে যাবে। তাঁর এই কথার যাথার্থ্য পরবর্তী কালে উপলব্ধি করা গিয়েছে। দেশবিভাগের প্রাক্কালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে যেসব দাঙ্গা হয়েছিল তাতে চরিত্রভ্রষ্টের দায় থেকে হিন্দু-মুসলমান কেউই মুক্ত ছিল না। সে অবশ্য পরের কথা। কিন্তু যে অভিঘাত এই দুটি সম্প্রদায়ের অনেক মানুষের চরিত্রভ্রষ্ট করে দিয়েছিল তার বীজ বপনের দায় থেকে সৈয়দ আহমেদকেও হয়তো সম্পূর্ণরূপে মুক্ত করা যাবে না। মনে হয় যে তিনি ইংরেজদের গুণাবলীর প্রতি আকৃষ্ট হওয়ার ফলে তাদের বিভেদ সৃষ্টির নীতির শিকার হয়ে পড়েছিলেন। জাতিসত্ত্বার সংজ্ঞা নিয়ে হয়তো তাঁর মনেও দ্বন্দ্ব ছিল। তাই এমনকি কংগ্রেসের জন্ম হবার আগেই ১৮৮২ সালে মুসলমান ছাত্রদের সম্বোধন করে তিনি বলেছিলেন : "প্রিয় সন্তানরা, কেউ যদি স্বর্গের তারা হয়ে যায় কিন্তু সে মুসলমান না হয় তা হলে সে আমাদের কাছে কীভাবে গ্রহণযোগ্য হবে ? সে তা হলে আমাদের জাতির কেউ নয়। কেননা ইসলামকে তুলে ধরে প্রগতি করার অর্থ হল জাতীয় উন্নতি।"

এ কথা অবশ্যই মনে করা যেতে পারে যে সৈয়দ আহমেদ এই কথাগুলির মধ্য দিয়ে মুসলিম তরুণদের আপন ধর্মে নিবিষ্ট থেকেও শিক্ষায় এবং আচরণে প্রগতিশীল হতে আহ্বান করেছিলেন। কিন্তু সেই সঙ্গে তিনি যে ধর্ম এবং জাতিকে একসঙ্গে জুড়ে দিয়েছিলেন সেকথাও অস্বীকার করা যাবে না। বোধহয় তিনিই ভারতীয়দের মধ্যে সর্বপ্রথম মুসলমানদের একটি জাতি বলে উল্লেখ করেছিলেন। হিন্দু জাতি, মুসলমান জাতি, এমনকি ব্রাহ্মণ, কায়স্থ প্রভৃতিকে জাতি বলে উল্লেখ অনেক আগে থেকেই লোকমুখে প্রচারিত ছিল। তবে ভারতবর্ষের সামগ্রিকতার পটভূমিতে মুসলমানদের স্বতন্ত্র জাতি বলে উল্লেখ এমন জোরদারভাবে বোধহয় এর আগে কেউ করেননি। বস্তুত সৈয়দ আহমেদ ইংরেজ শাসনের প্রতি এত অনুগত এবং কংগ্রেসের দাবির প্রতি এত বিরূপ ছিলেন যে মুসলমানদের ভারতবর্ষের সামগ্রিক সত্তা থেকে বিচ্ছিন্ন বলে মনে করতেও তিনি কুণ্ঠিত হননি। ১৮৮৭ সালে তিনি বলেছিলেন : "যখন আমাদের হিন্দু ভাইরা

অথবা বাঙালী বন্ধুরা* এমন কিছু করতে চান যাতে আমাদের ক্ষতি হবে এবং আমাদের জাতির অপমান হবে তখন আমরা তাঁদের প্রতি বন্ধুভাবাপন্ন থাকতে পারি না এবং তখন আমাদের অবশ্যই কর্তব্য হবে হিন্দু এবং বাঙালীদের আক্রমণ থেকে আমাদের জাতিকে রক্ষা করা—এই আক্রমণ যে আমাদের জাতির ক্ষতি করবে সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত।" দু বছর পরে তিনি আবার বলেছিলেন : "কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলি যে দেশে দুটি স্বতন্ত্র জাতি বাস করে সেই দেশের পক্ষে নিতান্তই অযৌক্তিক। ধরে নেওয়া গেল সব ইংরেজ ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে গেল।...তখন কারা ভারতবর্ষ শাসন করবে ? এটি কি সম্ভব যে এই রকম অবস্থায় হিন্দু এবং মুসলমান দুটি জাতি একই সিংহাসনে অধিরূঢ় হবে এবং ক্ষমতার ক্ষেত্রে উভয়েই হবে সমান ? তা কখনই হতে পারে না। যা হবে তা হল একটি অপরকে পরাভূত করবে এবং নিপীড়িত করবে। দুটিতে সমান হয়ে থাকবে এমন আশা করা হল অসম্ভব এবং অভাবনীয়কে প্রত্যাশা করা।"[৬]

যে সৈয়দ আহমেদ এক সময় বলেছিলেন যে 'জাতি বলতে আমি মনে করি হিন্দু এবং মুসলমানকে' এবং 'আমার মতে কার কী ধর্ম তা ধর্তব্যের বিষয় নয়' সেই ব্যক্তিটির এমনভাবে বিশ্বাসের পরিবর্তন ভবিষ্যতের জন্য যে এক অশুভ ইঙ্গিত বহন করে এনেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। আর সেই পরিবর্তন যে ইংরেজদের বিভেদ-নীতির জয় সূচিত করে—যার অন্তিম পরিণাম দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশবিভাগ—তাতেও কোন সন্দেহ নেই।

হিন্দু নেতাদের মধ্যেও কেউ কেউ বিভেদ-রাজনীতির শিকার হয়েছিলেন। পরবর্তী সময়ে হলেও তাঁদের মুখ থেকে হিন্দু জাতীয়তার কথা শোনা যাচ্ছিল। ১৯২৫ সালে লালা লাজপত রায় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন যে মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা শ্রেষ্ঠ এবং সর্বোত্তম দেশপ্রেমিক তাঁদের মুসলিম ইতিহাস, মুসলিম আইন এবং ধর্মীয় অনুশাসনের প্রতি আনুগত্য হিন্দু-মুসলমান ঐক্যকে এক অবাস্তব পরিকল্পনা করে দিয়েছে।[৭] হিন্দু মহাসভার সভাপতিরূপে বীর সভারকর স্পষ্টতই বলেছিলেন যে হিন্দুরা হল একটি জাতি, হিন্দুস্থান হল হিন্দুদের অবস্থান, মুসলমানরা এখানে আঞ্চলিক নাগরিক।[৮] সভারকর আরও বলেছিলেন : "হিন্দু মহাসভা একটি হিন্দু মিশন নয়।...এটি কোন হিন্দু ধর্মমহাসভাও নয়। এটি হল হিন্দু জাতীয় মহাসভা।...সম্পূর্ণ অর্থে হিন্দুত্বের জাতীয় জীবনের সঙ্গে হিন্দু মহাসভা নিজেকে চিহ্নিত করেছে এবং হিন্দু জাতির সর্বাঙ্গীণ স্বাধীনতা, শক্তি এবং গৌরব রক্ষা করতে এ প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।"[৯]

শাসকদের বিভেদ সৃষ্টির প্রয়াস হিন্দু সমাজের দুর্বলতাকেও পুঁজি করতে চেয়েছিল। বহু দিন ধরে হিন্দু সমাজের তথাকথিত উচ্চবর্ণের মানুষরা সমধর্মাবলম্বী মানুষদের একটি বড় অংশের উপর অন্যায় অবিচার করে এসেছে। স্বাভাবিক কারণেই আম্বেদকরের মনে এর বিরুদ্ধে বিদ্রোহের মানসিকতা গড়ে উঠেছিল। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর অনুগতদের নিয়ে হিন্দুধর্ম ত্যাগ করে বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করেছিলেন। ইংরেজ শাসকরা আম্বেদকরের বিদ্রোহী মানসিকতাকে লক্ষ্য করে তাঁর প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন।[১০] আর আম্বেদকরও প্রচণ্ড অভিমান নিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রাম থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে রেখেছিলেন। তিনি তথাকথিত নিম্নবর্ণের হিন্দুদের সামাজিক ও রাজনৈতিক অধিকার প্রতিষ্ঠার কাজে আত্মনিয়োগ করেছিলেন। হিন্দুদের অন্তর্বিরোধকে রাজনৈতিক বিভেদে

---

* হিন্দু এবং বাঙালী বলে তিনি এখানে সন্ত্রাসবাদীদের কার্যকলাপের উল্লেখ করেছিলেন, এমন কথা মনে করা যায়।

পরিণত করার জন্য ইংরেজ সরকার হিন্দুদের মধ্যেও পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করতে চেয়েছিল। আম্বেদকরের এতে সমর্থন ছিল। গান্ধীজী এর বিরোধিতা করে আমরণ অনশন করেন। অনেক আলাপ আলোচনার পর আম্বেদকর গান্ধীজীর দাবি মেনে নেন। তাঁর সহযোগিতার ফলে গান্ধীজী অনশন ভঙ্গ করেন। হিন্দুদের মধ্যে পৃথক নির্বাচনের প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু মুসলমানদের স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্বের ব্যবস্থার প্রচলনে ইংরেজ শাসক সফল হয়েছিল। বস্তুত মুসলমানদের জন্য এই জাতীয় স্বাতন্ত্র্যের দাবি সর্বপ্রথম কোন মুসলিম প্রতিষ্ঠানের কাছ থেকে আসেনি। ১৮৮৮ সালে ভাইসরয় লর্ড ডাফরিনই সর্বপ্রথম এইরকম একটি প্রস্তাব করেন। এর অনেক পরে ১৯০৯ সালে ভাইসরয় লর্ড মিন্টোর কাছে মুসলমানদের পক্ষ থেকে এই দাবি তোলা হয়।[১১] আরও পরে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা কার্যান্বিত হয়। তত দিনে বিভেদনীতির বিষক্রিয়ায় ভারতীয় সমাজের পচন শুরু হয়ে গিয়েছিল।

দেশবিভাগের সূচনা

১৯০৩ সাল। কংগ্রেস তখনও একটি সংগ্রামী প্রতিষ্ঠানে পরিণত হয়নি। তবে স্বশাসনের মৃদু দাবি কোথাও কোথাও শোনা যাচ্ছিল। স্বাধীনতা ছিনিয়ে আনার জন্য কয়েকটি স্থানে গুপ্ত সমিতিও গঠিত হয়েছিল। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থানে যে উত্তেজনা লক্ষিত হচ্ছিল তাতে বাংলার বড় ভূমিকা ছিল। সেজন্য সরকার মনে করেছিল যে কোনভাবে বাংলাকে যদি দুর্বল করে দেওয়া যায় তা হলে আন্দোলনের তীব্রতা স্তিমিত হয়ে যাবে। বিভেদকে বাস্তবায়িত করেই এই কাজ করা যেতে পারে। এই উদ্দেশ্য নিয়েই বঙ্গভঙ্গ প্রস্তাব উত্থাপিত হয়। কার্জন লিখেছিলেন : "আমার বিশ্বাস কংগ্রেস টলমল করে পড়ে যাচ্ছে, ভারতবর্ষে থাকাকালীন আমার সবচেয়ে বড় স্বপ্ন তার শান্তিপূর্ণ বিলুপ্তির কাজে হাত লাগানো।"[১২] তা সত্ত্বেও অনেকের ধারণা যে কংগ্রেসকে ধ্বংস করার উদ্দেশ্যে এই প্রস্তাব রচিত হয়নি, তা হয়েছিল প্রশাসনিক কাজের সুবিধার কথা ভেবে। তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে চরমপন্থী বাঙালিদের মেরুদণ্ড ভেঙে ফেলার উদ্দেশ্যে এই প্রস্তাব রচিত হয় এবং কার্জন বিভেদ সৃষ্টির মাধ্যমে সেই উদ্দেশ্য সিদ্ধ করতে বঙ্গভঙ্গের কথা ঘোষণা করেছিলেন। কিন্তু কার্জনের উদ্দেশ্য সফল হয়নি। কংগ্রেস এই প্রস্তাবের প্রতিবাদ করে। সরকার সাময়িকভাবে রণে ভঙ্গ দেয়। কিন্তু দু বছর পরেই সরকার হঠাৎ ঘোষণা করে যে বঙ্গভঙ্গ বিল আইনে পরিণত হয়েছে। কেন বাংলাকে ভাগ করা হচ্ছে এবং বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাবের পিছনে ইংরেজ শাসকদের কী মানসিকতা কাজ করছিল তা বোঝা যায় লর্ড কার্জনের একটি উক্তি থেকে। অবশ্য তখনকার বাংলাকে ভাগ করবার পরিকল্পনা প্রথম কার্জনের মাথায় আসেনি। কিন্তু বঙ্গভঙ্গের তিনিই ছিলেন মূল স্থপতি। এটিকে কার্যকর করার কয়েক দিন আগে ঢাকার নবাবের বাড়িতে মুসলমান নেতাদের তিনি বলেছিলেন : "আমি আপনাদের একটি মুসলিম প্রদেশ দিচ্ছি।"[১৩] বলা বাহুল্য কার্জনের এই কথা ধর্মভিত্তিক দেশবিভাগের দিকে ইঙ্গিত করেছিল। অবশ্য শেষ পর্যন্ত বঙ্গভঙ্গকে সেবারও কার্যান্বিত করা যায়নি। তীব্র আন্দোলনের চাপে ইংরেজ সরকার পিছু হঠতে বাধ্য হয়েছিল। কয়েক বছর পরে বাংলাকে ভাগ করবার প্রস্তাব তুলে নেওয়া হয়। এইভাবে প্রদেশ বিভাগ বাতিল হয়ে যাওয়ায় বেশ কিছু মুসলমান নেতা ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। বঙ্গভঙ্গ রদ হওয়ার ঘটনা তাঁদের মনে প্রচণ্ড আঘাত করে।[১৪] তাঁদের

অসন্তোষকে অবলম্বন করে সরকার রণকৌশল পরিবর্তন করে নেয়। সরকার লক্ষ্য করেছিল যে সৈয়দ আহমেদের প্রভাব উচ্চবিত্ত এবং প্রতিষ্ঠিত মুসলমানদের মধ্যেই সীমিত। তরুণদের মধ্যেও প্রগতির আলোক বিচ্ছুরিত হয়েছে তাঁর শিক্ষা বিস্তার করার প্রয়াসের ফলে। কিন্তু মুসলমান সমাজের সাধারণ মানুষরা রাজনীতি-সচেতন হয়ে ওঠেনি। তা ছাড়া মুসলিম নেতারাও সংঘবদ্ধ নন। সরকার অনুভব করে যে এইসব নেতাদের সংগঠিত করা দরকার। এবং সেই সঙ্গে সাধারণ মানুষদের মনকেও বিচ্ছেদ ও বিভেদের ভাবনায় বিষিয়ে তুলতে হবে। তার জন্য এলোমেলোভাবে কোন কাজ করলে হবে না। সংগঠিত প্রয়াসের দ্বারাই এই কাজ করা যেতে পারে।

সংঘবদ্ধ প্রয়াসের জন্য চাই সর্বপ্রথম একটি সংগঠন। সরকার এইবার সেই কাজে অগ্রসর হয়। ১৯০৬ সালে ইংরেজদেরই সক্রিয় পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম লীগের জন্ম হয়। আগা খাঁর নেতৃত্বে এক প্রতিনিধি দল ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তাঁরা মুসলমান সমাজের জন্য পৃথক নির্বাচনের দাবি করেছিলেন। ভাইসরয় সেই দাবি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচনা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন।[১৫] ঐ বছরই ৯ই অক্টোবর নবাব সালিমুল্লা একটি বিবৃতি প্রকাশ করে অল ইন্ডিয়া মুসলিম কনফারেন্স নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলার কথা বলেন। এর কিছু দিন পরে ডিসেম্বর মাসে ঢাকা শহরে মুসলিম শিক্ষা সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানেই অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের জন্ম হয়। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন নবাব উলমুলুক।[১৬] অন্য দিকে মুসলিম নেতাদের মধ্যে সকলেই যে বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করেছিলেন তা নয়। আগা খাঁ বঙ্গভঙ্গ বাতিল হবার সিদ্ধান্তকে সমর্থন করেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল যে এর পরিণাম মুসলমান সমাজের পক্ষে ভাল। অবশ্য যাঁরা কট্টরপন্থী তাঁরা আগা খাঁর এই মতকে সমর্থন করেননি। লক্ষ্ণৌ থেকে প্রকাশিত 'মুসলিম গেজেটে' এর জন্য আগা খাঁ সমালোচিত হন। ফলে তিনি মুসলিম লীগের সভাপতির পদ ত্যাগ করেন।[১৭] এটি অবশ্য অনেক পরে ১৯১২ সালের ঘটনা। এবং এর দ্বারা এ কথাও প্রমাণিত হয় না যে আগা খাঁ সাম্প্রদায়িক রাজনীতি ত্যাগ করেছিলেন। প্রকৃতপক্ষে দেশবিভাগের ক্ষেত্রে তাঁরও উল্লেখযোগ্য অবদান আছে। সেকথা পরে।

আগা খাঁর নেতৃত্বে গঠিত মুসলিম লীগের উদ্দেশ্য ছিল শাসন পরিচালনার কাজে মুসলমানদের যোগদান যাতে সহজ হয় তা দেখা। ইংরেজ সরকারও আপন স্বার্থ সিদ্ধির উদ্দেশ্যে মুসলিম লীগকে কাজে লাগাতে চেষ্টা করে। অবশ্য মুসলমান নেতাদের মধ্যেও এমন মানুষের অভাব ছিল না যাঁরা হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের কথা বলতেন এবং দেশের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে নিজেদের যুক্ত করেছিলেন। আবার হিন্দু সমাজের মধ্যেও এমন অনেক মানুষ ছিলেন এবং তাঁদের আচার-আচরণও এমন ছিল যে তার ফলে সংখ্যালঘিষ্ঠ হিসেবে মুসলমান সমাজের অনেক মানুষই ভয়ভীত হতেন। প্রকৃতপক্ষে পারস্পরিক বিশ্বাস-অবিশ্বাসের অভিঘাত এবং আদর্শের সংঘাতের মধ্য দিয়েই স্বাধীনতার আন্দোলন এগিয়ে চলেছিল। আর আন্দোলনের তীব্রতা যত বাড়ছিল ততই সেই শক্তিকে দুর্বল করবার জন্য সাম্প্রদায়িকতার মানসিকতাকে প্রসারিত করার সযত্ন প্রয়াসও করা হচ্ছিল।

হিন্দু মহাসভা গঠিত হয় ১৯০৬ সালে। এই সংগঠন স্বাধীনতা আন্দোলনে কখন কোন সক্রিয় ভূমিকা গ্রহণ করেনি। শ্যামাপ্রসাদ ভারতব্যাপী আন্দোলন শুরু করার পক্ষে ছিলেন। কিন্তু সভারকর তাতে রাজি হননি।[১৮] বিয়াল্লিশের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের

প্রসঙ্গে শ্যামাপ্রসাদ লিনলিথগোকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন (১২-৮-৪২) : "যে-দাবি কংগ্রেসের বিগত প্রস্তাবে উত্থিত হয়েছে তা কার্যত সমগ্র ভারতবর্ষের জাতীয় দাবি। ...এই সঙ্কটের সময় দমন কোন প্রতিকার হতে পারে না। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের পক্ষে সবচেয়ে দুর্ভাগ্যজনক সিদ্ধান্ত হল মহাত্মা গান্ধীর সঙ্গে যোগাযোগ না করা, বিশেষ করে তিনি যখন পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে সম্মানজনক মীমাংসার সব রকম চেষ্টা করার আগে তিনি আন্দোলন শুরু করবেন না।"[১৯] শ্যামাপ্রসাদের এই চিঠির ভাষা এ কথা প্রমাণ করে না যে তিনি অথবা হিন্দু মহাসভা কংগ্রেসের অহিংস নীতির প্রতি শ্রদ্ধাশীল ছিলেন। তা নয়, প্রকৃতপক্ষে হিন্দু মহাসভা হিংসার নীতিতেই বিশ্বাস করত। কিন্তু স্বাধীনতা আন্দোলনের কোন কর্মসূচিতে তার বিন্দুমাত্র যোগ ছিল না। ডঃ বি এস মুঞ্জে এক সংবাদদাতাকে প্রসঙ্গত জানিয়েছিলেন : হিন্দু মহাসভার নীতি হল নিম্নরূপ : "আমরা কংগ্রেসের অহিংসা এবং অসহযোগের নীতি বিশ্বাস করি না ; আমরা তার বিরোধী। আমরা সমবেদনাপূর্ণ সহযোগিতায় (responsive cooperation) বিশ্বাসী। প্রকৃতপক্ষে এটি হল প্রতিপক্ষের সঙ্গে যুগপৎ চুক্তি এবং সংগ্রাম। অনুরূপভাবে আমরা আধুনিক ইউরোপিয়ান পদ্ধতি দ্বারা বিজ্ঞানসম্মতভাবে সংগঠিত হিংসায় বিশ্বাস করি। আমরা বিশ্বাস করি যে যথাসময়ে সহিংস সংগ্রাম ছাড়া স্বরাজ অর্জিত হতে পারে না। ...মুসলমানদের সঙ্গে আমরা যেভাবে সহযোগিতা করে থাকি তার প্রকৃতি কংগ্রেস তাদের সঙ্গে যেভাবে সহযোগিতা করে থাকে তা থেকে ভিন্ন। কংগ্রেস মনে করে যে মুসলমানদের সহযোগিতা ছাড়া স্বরাজ লাভ করা যাবে না। আমরা বিশ্বাস করি যে সময় যখন আসবে তখন মুসলমানদের বিরোধিতা সত্ত্বেও আমরা স্বরাজ অর্জন করব।"[২০]

হিন্দু মহাসভার কাছে সেই সময় কখন আসেনি, স্বাধীনতার জন্য সহিংস-অহিংস কোন সংগ্রামই তারা করেনি। বরং মুসলমানদের একাংশের বিরোধিতার ফলে তাদের অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন ব্যর্থ হয়ে যায়। কংগ্রেস মুসলমানদের সহযোগিতা লাভের প্রয়াস করেছিল। গান্ধীজী তাঁর কর্মসূচিতে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের উপর জোর দিয়েছিলেন। তিনি যে খিলাফত আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করেছিলেন তার কারণও ছিল হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সহযোগিতার ভাব গড়ে তোলা। তিনি ভারতীয় জনমানসের দুর্বলতার দিকটি লক্ষ্য করেছিলেন—বিদেশীরা তো সেই দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করেই দেশকে পদানত রেখেছে। সেইজন্য হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠা করা, তাদের পরস্পরের মধ্যে বিশ্বাস স্থাপনা করা তাঁর কর্মসূচির অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। গান্ধীজী মনে করেছিলেন যে খিলাফত আন্দোলনের সঙ্গে নিজেকে যুক্ত করে সেই কাজ তিনি করতে পারবেন। খিলাফত আন্দোলন মুসলমানদের এক শ্রেণীর মধ্যে ধর্মান্ধতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে এবং সেই ধর্মান্ধতাই ভবিষ্যতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলনের পথের কাঁটা হয়ে উঠতে পারে এমন সংশয় গান্ধীজীর মনে দেখা দেয়নি। খিলাফত সমস্যার ঘটনাটি ছিল এই রকম। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সময় ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষের মুসলমানদের কথা দিয়েছিল যে তাঁরা যদি তুরস্ককে যুদ্ধে ইংলন্ডের সঙ্গে যোগ দিতে প্ররোচিত করেন তবে তারা যুদ্ধের অবসান হলে তুরস্কের পবিত্রভূমির এবং সেই সুবাদে খলিফার মর্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবে। ভারতবর্ষের মুসলমানরা সেই কাজ করেছিলেন, নিজেরাও যুদ্ধে সাহায্য করেছিলেন। কিন্তু ইংরেজ সরকার তাদের কথা রাখেনি।[২১] তারা যুদ্ধের শেষে খলিফাকে পদচ্যুত করেছিল। এই বিশ্বাসঘাতকতায় ভারতবর্ষের মুসলমানরা আহত এবং অপমানিত বোধ করেছিলেন। তাঁরা প্রতিবাদের পন্থা খুঁজছিলেন। গান্ধীজী তাঁদের পাশে

গিয়ে দাঁড়ান, আন্দোলনের পথ দেখান। হিন্দুদেরও তিনি এই আন্দোলনে যুক্ত হয়ে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য প্রতিষ্ঠায় সক্রিয় হতে বলেছিলেন। কিন্তু গান্ধীজীর আশা সফল হয়নি। তুরস্ক নিজেই খলিফাকে তাঁর সম্মানের আসন থেকে সরিয়ে দেয়। তার ফলে ভারতবর্ষে খিলাফত আন্দোলন ভাল করে দানা বাঁধবার আগেই বন্ধ হয়ে যায়। অবশ্য খিলাফত আন্দোলনে ভারতবর্ষের সব মুসলমানের যে সমর্থন ছিল তা নয়। সরকারকে সন্তুষ্ট করতে কোন কোন মুসলিম নেতা তার বিরোধিতা করেছিলেন। এঁদের মধ্যে যিনি সর্বপ্রথম সোচ্চার হয়েছিলেন তিনি হলেন হায়দ্রাবাদের নিজাম, ১৯২০ সালে।[২২] যাই হোক, স্বাধীনতার দাবি নিয়ে কংগ্রেস এগোতে থাকে। ১৯২১ সালে গান্ধীজী অসহযোগের ডাক দেন। কিন্তু মুসলমান সমাজের বড় অংশ তাতে যোগ দেননি। ১৯২৯ সালে কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপন করে। এর ফলে খিলাফত আন্দোলনে গান্ধীজীর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ মৌলানা মহম্মদ আলি গান্ধীজীকে ত্যাগ করে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির দিকে ঝুঁকে পড়েন।[২৩] ইংরেজ সরকার তো এই সুযোগই খুঁজছিল। এইবার তারা মুসলমান সমাজকে নিজেদের দিকে নিয়ে আসবার জন্য আরও বেশি তৎপর হয়। ভাইসরয় লর্ড রিডিং এই কাজে অগ্রণীর ভূমিকা নিয়েছিলেন। সরকার মুসলমানদের এই কথা বোঝাতে চেষ্টা করে যে গান্ধীজী নন, ব্রিটিশ গভর্নমেন্টই হল তাঁদের প্রকৃত বন্ধু।[২৪] বস্তুত লর্ড রিডিং ২১-৯-২২ তারিখে ভারত সচিবকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন : "আমি এখনই আপনাকে একটি টেলিগ্রাম পাঠিয়েছি। তাতে আপনি দেখতে পাবেন যে হিন্দু ও মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির কাজকে আমরা প্রায় সম্পূর্ণ করতে পেরেছি।"[২৫]

বিভেদের যে দড়ি দিয়ে ব্রিটিশ সরকার ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনকে বেঁধে ফেলছিল তার দুটি মুখ ধরে রেখেছিলেন মুসলিম লীগ ও হিন্দু মহাসভার নেতারা। ১৯৩৭ সালে হিন্দু মহাসভার সম্মেলনে সভারকর বলেছিলেন : "ভারতবর্ষের অধিবাসীরা আজ একটি একক ও সমপ্রকৃতির জাতিরূপে পরিগণিত হতে পারে না। পক্ষান্তরে ভারতবর্ষে আজ দুটি প্রধান জাতি রয়েছে। তারা হল হিন্দু এবং মুসলমান। ভারতবর্ষে এই দুটি বিবদমান জাতি বাস করছে।"[২৬] দু বছর পরে হিন্দু মহাসভার কলকাতা অধিবেশনে সভারকর এই কথাই আবার বলেছিলেন : "ভারতবর্ষে বসবাসকারী আমরা একটি জাতিরূপে চিহ্নিত। আমাদের যে কেবল একটিই সাধারণ মাতৃভূমি এবং আঞ্চলিক একতা আছে তা নয়। পৃথিবীর অন্যত্র যা নেই সেই একটি পবিত্র ভূমি আমাদের রয়েছে। এটি আমাদের মাতৃভূমির মধ্যে মিশে গিয়েছে। হিন্দুরা কোন সন্ধিসূত্রে বাঁধা জাতি (treaty nation) নয়—তারা একটি সুসম্বদ্ধ জাতির মানুষ (Organic national being)।... আমাদের সাহসের সঙ্গে এই অপ্রীতিকর ঘটনা মেনে নিতে হবে যে ভারতবর্ষে দুটি জাতি আছে—হিন্দু এবং মুসলমান।"[২৭] মুসলিম লীগও দ্বি-জাতি তত্ত্বে বিশ্বাস করত। এই তত্ত্বের ভিত্তিতেই তারা দেশবিভাগের দাবি উত্থাপন করেছিল। ভারত সরকার মুসলিম লীগকে কী দৃষ্টিতে দেখত তা জানা যায় আমেরিকে লেখা লিনলিথগোর একটি চিঠি থেকে। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলাকালীন (২৩-৩-৪২) এই চিঠিটিতে ভাইসরয় ভারত সচিবকে জানিয়েছিলেন : "শত্রু শিবিরের মুসলমানদের আমরা সহ্য করতে পারি না। লীগের বাইরে যেসব মুসলমান আছেন তাঁরা শত্রু শিবিরে অবস্থিত, তাঁরা দেশদ্রোহী।"[২৮] মুসলিম লীগ তার জন্ম থেকেই গভর্নমেন্টের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করে এসেছে। তা সত্ত্বেও উপযুক্ত কর্মসূচি এবং যোগ্য নেতৃত্বের অভাবে সংগঠন কিছু দিন পরেই দুর্বল হয়ে

পড়েছিল। কিন্তু ১৯২৩ সালে হিন্দু মহাসভা যখন পুনরুজ্জীবিত হয় তখন মুসলিম লীগ কাজ নতুন করে শুরু করার সুযোগ পেয়ে যায়।[২৯] পৃথক নির্বাচনের দাবি এবং দেশে সাধারণ নির্বাচন মুসলিম লীগের কাছে একটি বড় কর্মসূচি উপস্থিত করে। সেই দাবির আকার, প্রকৃতি এবং উত্তাপ ক্রমশ বর্ধিত হয়ে শেষ পর্যন্ত দেশবিভাগের দাবিতে পরিণত হয়েছিল। সেই দাবির পিছনে ছিল মুসলমান সমাজের একাংশের জঙ্গি মনোভাব এবং হিন্দু সমাজের কতিপয় মানুষের অসহায়জনিত অনুমোদন। বোম্বাইয়ের গভর্নর লিনসলে লিনলিথগোকে একটি বার্তায় জানিয়েছিলেন: "মুন্সী খুবই মজার মানুষ। ...রাজাগোপালচারী যতদূর গিয়েছেন তিনি নিজে ততদূর যাননি বটে তবে তিনি বুঝতে পেরেছেন যে দ্বি-জাতি তত্ত্ব মুসলমানদের মনে গভীরভাবে প্রবিষ্ট হয়েছে এবং সেই দাবিকে অস্বীকার করা যাবে না। মুসলমানদের সন্তুষ্ট করতে না পারলে ভবিষ্যতে মীমাংসার কোন আশা নেই। অখণ্ড হিন্দুস্তানের প্রবক্তা মুন্সীর পক্ষে এটি একটি বড় স্বীকৃতি।"[৩০]

পৃথক নির্বাচনের পর্ব

ইংলন্ডের হাউস অফ কমনস-এ বিখ্যাত বাগ্মী জন ব্রাইট ১৮৫৮ সালের ৪ঠা জুন একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন: "ইংলন্ড ভারতবর্ষকে কত দিন শাসন করবে বলে মনে করে? এই প্রশ্নের উত্তর কেউ দিতে পারে না। তা পঞ্চাশ বছর, একশ বছর অথবা পাঁচশ বছর যাই হোক না কেন, সামান্যতম সাধারণ জ্ঞান যাঁর আছে এমন কোন লোক কি ভাবতে পারেন যে এত বড় একটি দেশ যেখানে কুড়িটি পৃথক জাতি এবং কুড়িটি ভিন্ন ভিন্ন ভাষা আছে সেই দেশ একটি মাত্র দৃঢ় ও স্থায়ী সাম্রাজ্যের মধ্যে ঐক্যবদ্ধ ও সুসংগঠিত হতে পারবে? আমার মনে হয় এ জিনিস একেবারেই অসম্ভব।"[৩১]

জন ব্রাইটের এই মতকে কে কতটা সমর্থন করেছিলেন অথবা তার জন্য প্রকাশ্যে বা গোপনে গভর্নমেন্ট কী কর্মসূচি নিয়েছিল সে প্রসঙ্গে না গিয়েও এ কথা বলা যায় যে প্রায় একই সময়ে এলফিনস্টোন প্রশাসনে বিভেদনীতিকে অনুসরণ করার পরামর্শ দিয়েছিলেন। পৃথক নির্বাচন পদ্ধতি প্রচলন করার প্রয়াস ছিল সেই বিভেদনীতি অনুসরণ করার কার্যকর পন্থা। বস্তুত লর্ড ডাফরিন যে পৃথক প্রতিনিধিত্বের পরামর্শ দিয়েছিলেন তা কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের প্রতি প্রীতিবশত করা হয়নি। তার উদ্দেশ্য ছিল একান্তই হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে অনৈক্যকে বাড়িয়ে তোলা। ১৯০৫ সালে লর্ড কার্জনের বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব, ১৯০৬ সালে লর্ড মিন্টোর মুসলমানদের কাছে দেওয়া পৃথক প্রতিনিধিত্ব ও তাঁদের প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দেবার প্রতিশ্রুতি এবং ১৯১৯ সালে তাকে কার্যান্বিত করতে শাসন সংস্কারের প্রস্তাব সবই একই উদ্দেশ্যে লক্ষিত। এই অনুমান যে সঠিক তার প্রমাণ পাওয়া যায় ভারত সচিব ওলিভারের দুটি উক্তি থেকে। ওলিভার বলেছিলেন: "প্রভুত্বকারী ইংরেজরা যাঁরা ভারতবর্ষে কাজ করেছেন তাঁরা মুসলমান সমাজের অধিকতর গুণগ্রাহী এবং তাঁদের শাসন কাজে মুসলমানদের হিন্দুদের চেয়ে, বিশেষ করে বাঙালিদের চেয়ে যোগ্যতর বলে মনে করা ভুল।" সেই সঙ্গে 'টাইমস' পত্রিকায় তিনি এ কথাও লিখেছিলেন: "ভারতবর্ষের ঘটনাবলীর সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যাঁরা পরিচিত তাঁদের কেউই এ কথা অস্বীকার করতে পারবে না যে ভারতবর্ষের ব্রিটিশ অফিসাররা মুসলমান সমাজের প্রতি বেশি পক্ষপাতিত্ব দেখিয়ে থাকেন।"[৩২]

বস্তুত এই পক্ষপাতিত্ব আছে জেনেই ১৯০৯ সালে মুসলমান সমাজের কিছু নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি লর্ড মিন্টোর কাছে মুসলমানদের জন্য পৃথক প্রতিনিধিত্বের দাবি উত্থাপন করেছিলেন। মিন্টো তা সমর্থন করেন। কোন কোন ঐতিহাসিকের মতে মিন্টো এর দ্বারা দেশবিভাগের বীজটি বপন করেছিলেন। অবশ্য সাম্প্রদায়িক নির্বাচনের ঔচিত্য নিয়ে শাসকদের মধ্যেও মতদ্বন্দ্ব ছিল। ভারতবর্ষের শাসনকার্যে ভারতীয় প্রতিনিধিদের গ্রহণ করা যাবে কি না তা নিয়ে আলোচনার সময় এই প্রশ্নটি উত্থিত হয়েছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামের অঙ্গরূপে স্বায়ত্ত শাসনের দাবি ক্রমশ জোরদার হয়ে উঠছিল। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট বুঝতে পারে যে আর চুপ করে থাকা যাবে না। একটা কিছু করতেই হবে। তাই একটি কমিশন গঠনের প্রস্তাব করা হয়। প্রশ্ন ওঠে, কারা কমিশনের সদস্য হবেন ? সদস্যরা সকলেই কি ইংরেজ হবেন, নাকি তাতে ভারতীয়দেরও নেওয়া হবে ? ভারতীয়দের যদি একেবারেই বাদ দেওয়া হয় তা হলে ভারতবর্ষের মানুষদের কাছে তা হয়তো গ্রহণযোগ্য হবে না। কংগ্রেস হয়তো তা মেনে নেবে না। আরউইন কমিশনে ভারতীয় সদস্য নেওয়ার বিরোধী ছিলেন। তিনি ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে এই বলে আশ্বস্ত করেন যে মুসলমানদের, উদারপন্থীদের এবং দেশীয় নৃপতিদের সাহায্যে তিনি 'হিন্দু কংগ্রেসের বয়কটের মোকাবিলা করতে পারবেন'। আরউইনের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং ১৯২৭ সালে শাসন সংস্কারের পরামর্শ দেবার জন্য সাইমন কমিশন গঠিত হয়। পৃথক নির্বাচনের বিষয়টি এই প্রসঙ্গে খুবই আলোচিত হচ্ছিল। মন্টেগু চেমসফোর্ড সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে পৃথক নির্বাচনের বিপদ সম্পর্কে কমিশনকে সাবধান করে দিয়েছিলেন। তাঁরা বলেছিলেন : "ধর্ম এবং শ্রেণী বিভেদের অর্থ হল পরস্পর বিরোধী রাজনৈতিক ক্যাম্প সৃষ্টি করা। এই বিভেদ মানুষকে নিজেদের নাগরিকরূপে ভাবতে শেখায় না, শেখায় সে কোন দলে আছে তা ভাবতে।" ওলিভার বলেছিলেন : "সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের পদ্ধতি হল উদ্দেশ্যসাধনের এক বিপজ্জনক পদ্ধতি (disastrous expedient)। এই পদ্ধতি যে-সংবিধান রচনার কথা ভাবে তা কখনই সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বের দ্বারা সফল হতে পারে না।" কমিশন এঁদের কথায় সহমত হয়েও শেষ পর্যন্ত যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন তা তাঁদের কথায় : "আমরা একমত যে একটি প্রদেশে মুসলমানদের জন্য সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্ব অবশ্যই বজায় থাকবে এবং মুসলমান ভোটারদের বিশেষ সংরক্ষণ থেকে বঞ্চিত করা যাবে না।"[৩৩] বস্তুত মর্লে, মন্টেগু, সাইমন এবং এমনকি এটলিও সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে নির্বাচনের নিন্দা করেছিলেন। কিন্তু তা সত্ত্বেও ১৯০৯, ১৯১৯ এবং ১৯৩৫-এর শাসন সংস্কারে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে নির্বাচন ব্যবস্থা স্বীকৃত হয়েছিল।

১৯৩২ সালে হিন্দু-মুসলমানের মতানৈক্য দূর করতে ইলাহাবাদে একটি ঐক্য সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে অনেক বিষয়ে ঐকমত্য হলেও দুটি বিষয়ে জটিলতার সৃষ্টি হয়েছিল। তার একটি হল, সিন্ধুপ্রদেশকে বোম্বাই প্রেসিডেন্সি থেকে আলাদা করে একটি মুসলমানপ্রধান প্রদেশ রূপে গঠন করা এবং দ্বিতীয় হল, পৃথক নির্বাচনের পরিবর্তে যৌথ নির্বাচন প্রথা চালু করা। সম্মেলনে উপস্থিত মুসলিম নেতৃবৃন্দ সিন্ধুপ্রদেশের বিনিময়ে যৌথ নির্বাচনে রাজি হয়ে যান। কিন্তু ভারত সচিব স্যামুয়েল হোরের হস্তক্ষেপের ফলে সেই প্রস্তাব শেষ পর্যন্ত বাতিল হয় এবং সম্মেলনও ব্যর্থ হয়।[৩৪] অবশ্য পরে সিন্ধুপ্রদেশ গঠিত হয়েছিল। এইসব ঘটনা ঘটার আগে ১৯১৫ সালে মুসলিম লীগের বার্ষিক সভায় জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা যখন পৃথক নির্বাচনের বিপক্ষে আলোচনা করছিলেন তখন

সরকারী অফিসারদের উৎসাহে এবং শেঠ সোলেমান কামাম-এর নেতৃত্বে গুণ্ডারা সভায় গোলমাল সৃষ্টি করেছিল।[৩৫]

ঐ বছরই পৃথক নির্বাচন নিয়ে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে একটি সন্ধি হয়েছিল। বাংলায় এবং পাঞ্জাবে মুসলমান প্রতিনিধিদের সংখ্যা যথাক্রমে শতকরা ১৩ এবং ৫ ভাগ কমিয়ে দেওয়া হয়। অন্য প্রদেশগুলিতে যেখানে মুসলমানদের সংখ্যা আনুপাতিকভাবে কম সেখানে তাঁদের প্রতিনিধিদের সংখ্যা বাড়িয়ে দেওয়া হয়।[৩৬] দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকে মুসলমান নেতৃবৃন্দ পৃথক নির্বাচনের দাবি উত্থাপন করেছিলেন। শিখ এবং অনুন্নত সম্প্রদায়ের নেতাদেরও অনুরূপ দাবি ছিল। সংখ্যালঘু সম্প্রদায়ের নেতাদের কথা শোনার পর গান্ধীজী পৃথক নির্বাচন সমর্থন এই শর্তে করেছিলেন যে মুসলমানরা স্বরাজের দাবি সমর্থন করবেন এবং যৌথ নির্বাচনের প্রশ্নটিকে নতুন সংবিধান কার্যকর করার পর গণভোটের মাধ্যমে চূড়ান্ত করার জন্য ছেড়ে দেবেন।[৩৭] মুসলিম লীগের নেতারা কিন্তু কোনরকম শর্ত মানতে রাজি ছিলেন না। শাসকরা চাননি যে হিন্দু-মুসলমান একতাবদ্ধ হোক। তাঁরা তো চাইছিলেন হিন্দু-মুসলমানদের মধ্যে ভাঙন ধরাতে। পৃথক নির্বাচনের প্রশ্নে তাঁরা আম্বেদকরকে সঙ্গে পেয়েছিলেন। মুসলিম লীগ এবং দেশীয় নৃপতিদের অতিরিক্ত আম্বেদকরকে নিজেদের দিকে পেয়ে ভাইসরয় ১৮-১২-৩২ তারিখে লিখেছিলেন : "গোলটেবিল বৈঠকে আম্বেদকরের আচরণ বেশ ভাল ছিল। আমিও সম্ভাব্য সবরকম ভাবে তাঁর হাত শক্ত করতে উৎসুক।"[৩৮] পরবর্তী সময়ে আম্বেদকরের ভূমিকা কেমন ছিল সে সম্পর্কে জানাতে গিয়ে তদানীন্তন ভাইসরয় ১৯-১১-৪০ তারিখের একটি চিঠিতে লিখেছিলেন : "তিনি (আম্বেদকর) বলেন যে তিনি বর্তমান অবস্থায় সম্পূর্ণ সন্তুষ্ট এবং তিনি পাকিস্তান ধারণার পক্ষে। কেননা তার অর্থ হল ব্রিটিশদের আর ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যেতে হবে না।"[৩৯]

পৃথক নির্বাচনের প্রস্তাব ও প্রয়োগের অনেক দিন পরে ভাইসরয় এই কথাগুলি লিখেছিলেন। তবে আম্বেদকরের মনোভাবের কথা বলতে গিয়ে তিনি যে কথাগুলি বলেছিলেন তা থেকে ইংরেজ শাসকদেরই মনোভাব কেমন ছিল তা অনুমান করা যায়। বস্তুত পৃথক নির্বাচনের প্রস্তাব ইংরেজ শাসকদের দূরপ্রসারী পরিকল্পনা। পাকিস্তানের উদ্ভব তা থেকেই। পাকিস্তানকে কেবল কিছু মানুষের আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবির সাকার রূপ বলে মনে করলে ভুল হবে। পাকিস্তানের সৃষ্টি হল সাম্প্রদায়িকতার বিস্ফোট—মুসলমান এবং হিন্দু উভয়ের ক্ষেত্রেই।

পরিকল্পিত সাম্প্রদায়িকতা

কাসমি রাজভি ছিলেন হায়দ্রাবাদের এক জঙ্গি মুসলমান নেতা। তিনি ছিলেন হায়দ্রাবাদের ভারতভুক্তির ঘোরতর বিরোধী। সেই উদ্দেশ্য সাধনে তিনি নিজামের রাজ্যে সাম্প্রদায়িকতার আগুন জ্বেলেছিলেন। ১৯৪৮ সালে একটি ভাষণে সাম্প্রদায়িকতার জঘন্য জিগির তুলে তিনি বলেছিলেন : "হিন্দু হল কাফের। তারা পাথর এবং হনুমানকে পূজা করে। ধর্মের নামে তারা গোমূত্র এবং গোময় খায়। সম্পূর্ণ অর্থে তারা বর্বর। আর তারাই চায় আমাদের শাসন করতে। এ এক অদ্ভুত উচ্চাশা এবং দিবাস্বপ্ন।...সেই দিন বেশি দূরে নয় যখন বঙ্গোপসাগরের জল আমাদের সার্বভৌম রাষ্ট্রের পদধৌত করে দেবে।"[৪০]

মুসলমানদের সম্পর্কেও কোন কোন হিন্দু নেতা বিরূপ মনোভাব পোষণ করতেন। এমনকি 'বন্দেমাতরম' মন্ত্রের ঋষি বঙ্কিমচন্দ্রও 'আনন্দমঠ' গ্রন্থে মুসলমানদের সম্পর্কে অকরুণ শব্দ ব্যবহার করেছিলেন। এই সবই ছিল ব্যক্তিগত অভিমতের ব্যাপার। রাজভির উদ্ধত উক্তির সঙ্গে বঙ্কিমচন্দ্রের তুলনা করা যায় না। বাঙালির চেতনায় স্বাদেশিকতার মানসিকতা জাগ্রত করার ক্ষেত্রে বঙ্কিমচন্দ্র অনন্য ভূমিকা পালন করেছেন। মুসলমানদের সম্পর্কে তাঁর যত্নহীন মন্তব্যে (casual remark) সাম্প্রদায়িকতাবোধ জাগিয়ে তোলার চেষ্টা হয়নি।[৪১] অন্য দিকে রাজভির উদ্দেশ্য ছিল মুসলমানদের মনে হীন সাম্প্রদায়িক মানসিকতাকে বিষিয়ে দেওয়া। তবে একে এক বিচ্ছিন্ন ঘটনা বলেও মনে করা যায়। সেই সঙ্গে এ কথাও মনে রাখা দরকার যে এইসব ক্ষুদ্রতা ও অবিশ্বাসের বিরুদ্ধে শুভ চেতনা সৃষ্টির প্রয়াসও কিছু কম হয়নি। সেই চেষ্টা কম বেশি উভয় সম্প্রদায় থেকেই হয়েছে। সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প যখন রাজনৈতিক পটভূমিকে গ্রাস করে ফেলছিল তখন রাজনৈতিকভাবেও তার মোকাবিলা করতে অনেক হিন্দু ও মুসলমান নেতা এগিয়ে এসেছিলেন। জিন্না তাঁর প্রথম জীবনে এই দলেরই একজন নেতা ছিলেন। ১৯২৪ সালে তাঁর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশনে যে-প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল তাতে বলা হয়েছিল : (১) ভারতবর্ষের বর্তমান প্রদেশগুলি একটি রাষ্ট্রে ফেডারেল নীতি অনুসারে সংঘবদ্ধ হবে, এবং (২) আইনসভাগুলিতে এবং অন্যান্য নির্বাচিত সংস্থাগুলিতে প্রতিনিধিত্বের ভিত্তি হবে জনসংখ্যা।[৪২]* কিন্তু ১৯২৭ সালে জিন্না একটি শান্তি সম্মেলনে বলেছিলেন যে মুসলমান জনসাধারণ যৌথ নির্বাচনের বিরোধী।[৪৪] সাম্প্রদায়িকতার পটভূমিতে জিন্নার এই পরিবর্তন পরিকল্পিতভাবে সাম্প্রদায়িকতার প্রসারের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়। এর দু বছর পরে জিন্না কেন্দ্রীয় আইনসভায় সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা (communal award) গ্রহণের সুপারিশ করেন। তিনি তখন বলেছিলেন যে যত দিন না সংশ্লিষ্ট সম্প্রদায়গুলি একটি বিকল্প ব্যবস্থা সর্বসম্মতভাবে স্থির করতে পারে তত দিন সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব চালু থাকুক। জিন্নার এই প্রস্তাব কেন্দ্রীয় আইনসভায় সরকারের অনুগত ব্লকের সমর্থনে গৃহীত হয়।[৪৫] জিন্না যখন এই প্রস্তাব উত্থাপন করেন তার আগে থেকেই ভারতবর্ষে স্বশাসনের প্রকৃতি এবং নির্বাচন ব্যবস্থা কেমন হবে তার জন্য একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্ত গ্রহণের প্রয়াস শুরু হয়েছিল। সেই উদ্দেশ্যে মতিলাল নেহরুর সভাপতিত্বে বিভিন্ন মতাবলম্বী মানুষদের নিয়ে একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। জিন্নাও সেই কমিটির সদস্য ছিলেন। কমিটি সুপারিশ করেছিল যে কেন্দ্রীয় আইনসভায় মোট সদস্যের শতকরা বাইশ ভাগ মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। জিন্না অবশ্য এক তৃতীয়াংশ চেয়েছিলেন। সেই সঙ্গে তিনি এও চেয়েছিলেন যে বাংলায় এবং পাঞ্জাবে জনসংখ্যার ভিত্তিতে আসন সংরক্ষিত হোক।[৪৬] অর্থাৎ জিন্না বাংলা এবং পাঞ্জাবে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ বলে সেখানে জনসংখ্যাকে ভিত্তি করতে চেয়েছিলেন আর সমগ্র ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে মুসলমানদের আসন সংখ্যা বাড়াবার জন্য

---

* জনসংখ্যার ভিত্তিতে প্রতিনিধিত্ব নির্ধারণের বিষয়টি চিত্তরঞ্জনের নেতৃত্বে বাংলার স্বরাজ্য দল সমর্থন করেছিল। ১৯২৩ সালে মুসলমান নেতাদের সঙ্গে তিনি একটি চুক্তি করেছিলেন। 'বাংলা চুক্তি' নামে এটি খ্যাত হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল যে বাংলার আইনসভায় আসনগুলি ৬০ : ৪০ অনুপাতে সংরক্ষিত হবে।[৪৩] চিত্তরঞ্জনের লক্ষ্য ছিল মুসলমানদের কিছু বেশি আসন দিয়ে তাঁদের সহযোগিতা আদায় করা। কলকাতা কর্পোরেশনে নতুন নিয়োগের ক্ষেত্রে শতকরা ৮০ ভাগ এবং সরকারী চাকরিতে শতকরা ৬০ ভাগ মুসলমানদের জন্য সংরক্ষণের প্রস্তাব তিনি করেছিলেন। জনসংখ্যার বিচারে এই অনুপাত বেশি ছিল।

জনসংখ্যার অনুপাতকে মানতে রাজি হননি। জিন্নার এই মনোভাবকে অসাম্প্রদায়িক আখ্যা দেওয়া যায় না। অবশ্য এই সময় জিন্নাকে কট্টর সাম্প্রদায়িকতাবাদী এবং বিভেদপন্থী বলেও চিহ্নিত করা যায় না। কিন্তু জাতীয়তাবাদী জিন্নার পরিবর্তন যে তখনই শুরু হয়ে গিয়েছিল তা তাঁর আসন সংরক্ষণের অযৌক্তিক দাবির বহর থেকে বোঝা যায়। বাংলা ও পাঞ্জাবের নীতি অনুসরণ করলে কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলমান আসন সংখ্যা কমাতে হবে এই যুক্তি জিন্না মানতে চাননি। মৌলানা মহম্মদ আলিও সেই যুক্তি মানেননি। তিনি তো রীতিমতো রেগে গিয়েছিলেন। কংগ্রেসের উত্থাপিত স্বাধীনতার দাবির সঙ্গে একমত হতে না পেরে তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক আগেই ছিন্ন করেছিলেন। জিন্নাও যখন দেখেছিলেন যে কংগ্রেস অসহযোগ আন্দোলনের মাধ্যমে একটি গণসংগঠনে পরিণত হচ্ছে, তখন তিনিও কংগ্রেস থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন।[৪৭] এবার তাঁর রাজনীতি সাম্প্রদায়িকতার পরিধির মধ্যে আবর্তিত হতে থাকে।

কয়েকজন হিন্দু নেতাও নেহরু কমিটির কয়েকটি সুপারিশে আপত্তি তুলেছিলেন। এই কমিটি স্বতন্ত্র সিন্ধুপ্রদেশ গঠনের পরামর্শ দিয়েছিল। মুসলমান নেতারা এই দাবি করেছিলেন। কংগ্রেসের সংগঠনেও সিন্ধুপ্রদেশের স্বতন্ত্র অস্তিত্ব মেনে নেওয়া হয়েছিল। কিন্তু বি এস মুঞ্জের নেতৃত্বে হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা নেহরু কমিটির এই সুপারিশের বিরোধিতা করেন। বস্তুত কয়েকজন হিন্দু এবং শিখ নেতা সংরক্ষিত আসনসহ যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থারও বিরোধী ছিলেন। তাঁদের অনমনীয় মনোভাব অসাম্প্রদায়িক মুসলমানদের মনকেও আঘাত করেছিল। এর ফলে ১৯২৮ সালে অনুষ্ঠিত সর্বদলীয় বৈঠক ব্যর্থ হয়ে যায়। নেহরু কমিটির সুপারিশ অনুযায়ী কাজ করতে অনেকেই এগিয়ে আসেননি। এই জাড্য অবস্থার সুযোগ গ্রহণ করে মুসলমান সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা। মৌলানা মহম্মদ আলি নেহরু কমিটির সুপারিশ এবং তা নিয়ে উত্থিত বিতর্ক সম্পর্কে বলতে গিয়ে হিন্দুদের উদ্দেশ করে বলেন : "মিথ্যা তত্ত্ব, অনৈতিক বিশ্বাস এবং ভুল ধারণার বশবর্তী হয়ে আপনারা প্রতি মুহূর্তে আপনাদের সংবিধানের সঙ্গে আপস করছেন। কিন্তু আপনারা আমাদের মধ্যে যাঁরা সাম্প্রদায়িকতাবাদী নন তাঁদের সঙ্গে পৃথক নির্বাচন ও সংরক্ষণ নিয়ে কোন আপস করছেন না। জনসংখ্যার শতকরা পঁচিশ ভাগ হল আমাদের অনুপাত। তবু আইনসভায় আপনারা আমাদের ত্রিশ ভাগ আসন দেবেন না। আপনারা সব ইহুদী*, আপনারা বেনিয়া।"[৪৮]

নেহরু কমিটির সুপারিশের জবাবে জিন্নাও ১৯২৯ সালের মার্চ মাসে একটি চোদ্দ দফা প্রস্তাব উপস্থাপিত করেছিলেন। এই প্রস্তাবে জিন্না স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলমানদের যোগদানের শর্তরূপে যে বিষয়গুলি পেশ করেছিলেন তার মধ্যে ছিল মুসলমানদের হিন্দুদের উপর প্রভুত্বকামী-সুবিধাভোগী জাতিরূপে (master race privileges qua the Hindus) স্বীকৃতি দেওয়া। তা ছাড়া ছিল হিন্দু ও মুসলমানপ্রধান দেশগুলিকে নিয়ে একটি ফেডারেশন গঠন করা, পৃথক নির্বাচন, কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক মন্ত্রী পরিষদে এবং কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলমানদের এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষিত রাখা।[৪৯]

নেহরু কমিটির একজন সদস্য হয়েও পরে তার সুপারিশের বিরোধিতা করা এবং পৃথক নির্বাচন দাবি করা যে জিন্নার মেরু পরিবর্তন তাতে কোন দ্বিমত নেই। কেননা জিন্না

---

* শেকসপিয়রের 'মার্চেন্ট অফ ভেনিস' নাটকে সাইলক নামে একজন ইহুদীকে নির্দয় সুদখোর মানুষরূপে চিত্রিত করা হয়েছে। মহম্মদ আলি ইহুদী বলে সেই চরিত্র উল্লেখ করেছেন।

নিজেই এর আগে পৃথক নির্বাচনের দাবিকে সঙ্কীর্ণতা বলে গণ্য করেছিলেন। ১৯১০ সালে পৃথক নির্বাচনের বিরোধিতা করে তিনি একটি প্রস্তাবও উত্থাপন করেছিলেন।[৫০] কিন্তু কারণ যাই থাক, পরবর্তী সময়ে জিন্না পৃথক নির্বাচন সমর্থন করে সাম্প্রদায়িকতার বোধকে প্রশাসনের মধ্যে যুক্ত করতে সাহায্য করেন। এর ফলে স্বাধীনতার দাবি দুর্বল হয়ে পড়ে এবং সরকারের হাত শক্ত হয়। গভর্নমেন্ট অবশ্য বুঝতে পেরেছিল যে ভারতবর্ষের শাসনকার্যে ভারতবাসীকে যুক্ত করা বেশি দিন ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। সেজন্য মাঝে মাঝেই তারা শাসন সংস্কারের ব্যবস্থা করছিল। এই রকম প্রথম প্রস্তাব উত্থাপিত হয় ১৮৯২ সালে। এর নাম ছিল 'ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট, ১৮৯২'। এই প্রস্তাব তদানীন্তন ভারতীয় নেতাদের খুশি করতে পারেনি। ১৯০৯ সালে মন্টেগু-চেমসফোর্ড যে সংস্কারের পরিকল্পনা উপস্থিত করেছিলেন তাতে কার্জনের নীতি অনুসরণ করে ভারতবাসীদের মধ্যে অনৈক্য সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়েছিল। কেননা তাতে পৃথক নির্বাচনের কথা ছিল। সেই সময় জিন্না পৃথক নির্বাচনের সমালোচক ছিলেন। তা সত্ত্বেও তিনি সংস্কারের এই প্রস্তাবকে সমর্থন করেছিলেন। কারণ তাঁর ক্ষীণ আশা ছিল যে এর ফলে তিনি মুসলমানদের জাতীয় আন্দোলনের মূল স্রোতে টেনে আনতে সক্ষম হবেন।[৫১] জিন্নার সেই আশা পূর্ণ হয়নি। বরং শেষ পর্যন্ত তিনি নিজেই পরিকল্পিত সাম্প্রদায়িকতার জালে জড়িয়ে পড়েন। এই সময়েই ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাক্ট প্রবর্তিত হয়। তাতে পৃথক নির্বাচনের কথা তো ছিলই, তা ছাড়া মুসলমানদের কিছু বাড়তি সুযোগ সুবিধা দেবার কথাও এতে বলা হয়েছিল। বলা বাহুল্য, এই আইন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের অনৈক্যকে বাড়াতে সাহায্য করে। অন্য দিকে ঐক্য যাতে ফিরে আসে সেজন্য কংগ্রেস এবং লীগের নেতারা আবার সচেষ্ট হন। তার ফলে ১৯১৬ সালে 'লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট' স্বীকৃত হয়। এই চুক্তিতে আইনসভার সদস্যসংখ্যা বৃদ্ধি এবং মোট সদস্যের চার-পঞ্চমাংশ নির্বাচিত হবেন এই কথা মেনে নিলেও মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচনের কথা ছিল। কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের যৌথ উদ্যোগে স্বীকৃত লক্ষ্ণৌ চুক্তির সার কথা হল—(১) প্রশাসনিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে প্রদেশগুলি যতদূর সম্ভব কেন্দ্রের নিয়ন্ত্রণ থেকে মুক্ত থাকবে, (২) কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক আইনসভাগুলির চার-পঞ্চমাংশ সদস্য হবেন নির্বাচিত প্রতিনিধি, (৩) কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারগুলির অন্তত অর্ধেক সদস্য সংশ্লিষ্ট আইনসভার সদস্যদের দ্বারা নির্বাচিত হবেন, (৪) কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারগুলি আইনসভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য থাকবে, তবে গভর্নর জেনারেল এবং প্রাদেশিক গভর্নরদের তা বাতিল করবার অধিকারও থাকবে। কিন্তু আইনসভাগুলিতে যদি অন্তত এক বছর পরে বাতিল করা প্রস্তাবগুলি আবার গৃহীত হয় তা হলে সেগুলিকে কার্যান্বিত করতে হবে, (৫) বৈদেশিক এবং দেশরক্ষার বিষয়গুলি কেন্দ্রীয় সরকারের নিয়ন্ত্রণাধীন থাকবে, তাতে আইনসভাগুলির কোন রকম হস্তক্ষেপ থাকবে না, এবং (৬) ভারতবর্ষ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে ডোমিনিয়ন স্টেটাসের মর্যাদা লাভ করবে।[৫২]

এই চুক্তির মধ্যে পূর্ণ স্বাধীনতার কথা না থাকায় তিলক ক্ষুণ্ণ হয়েছিলেন। তবে এতে হিন্দু-মুসলমানের ঐকমত্য দেখে তিনি চুক্তিটিকে সমর্থন করেছিলেন। লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসে তিনি বলেছিলেন : "এই কথা বলা হয়েছে যে আমরা অর্থাৎ হিন্দুরা আমাদের মুসলমান ভাইদের অনেক দাবি মেনে নিয়েছি। আমি এ বিষয়ে নিশ্চিত যে যখন আমি বলি যে আমরা খুব বেশি কিছু দিতে পারি না তখন আমি হিন্দু সমাজের মনের কথারই প্রতিনিধিত্ব করি। যদি কেবল মুসলমান সম্প্রদায়কে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া হয় তাতেও

আমার আপত্তির কারণ নেই। কেননা তা হলে আর এখনকার মতো ত্রিমুখী সংগ্রাম হবে না।" একই সময়ে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে জিন্না বলেছিলেন : "যে-মূল নীতিগুলির ভিত্তিতে মুসলমানদের সর্বপ্রধান রাজনৈতিক সংগঠনটি দাঁড়িয়ে আছে তা হল ভারতবর্ষের রাজনৈতিক বিবর্তনের জন্য উদ্দীষ্ট যে কোন সাংবিধানিক পুনর্বিন্যাসে মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক স্বাতন্ত্র্যকে দৃঢ় এবং অক্ষুণ্ণ রাখা। এই সম্প্রদায়ের রাজনৈতিক জীবন ও চিন্তা বিকাশের সঙ্গে সঙ্গে তার নীতিও গঠিত এবং বিস্তৃত হয়েছে। সাধারণ দৃষ্টিভঙ্গী এবং নীতির ক্ষেত্রে অখিল ভারত মুসলিম লীগ ভবিষ্যতে ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের পাশাপাশি থাকবে এবং সমগ্র দেশের অগ্রগতির জন্য স্বদেশহিতৈষী কাজে অংশগ্রহণ করবে।"[৫৩]

তিলক এবং জিন্না যে কথাগুলি বলেছিলেন তার মধ্যে একটি দর কষাকষির মনোভাব ফুটে উঠেছিল। স্বাধীনতা সংগ্রামে যুক্ত হবার বিনিময়ে তিলক মুসলমানদের বাড়তি সুযোগ দিতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। এমনকি তার জন্য তাঁদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকেও তিনি মেনে নিতে রাজি ছিলেন। অন্য দিকে তখনকার অসাম্প্রদায়িক জিন্না মুসলমানদের স্বতন্ত্র সাম্প্রদায়িক অস্তিত্বের স্বীকৃতির বিনিময়েই কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করতে সম্মত হয়েছিলেন। এই দরাদরির মধ্যে কোন পলায়নী মনোবৃত্তি কাজ করছিল কিনা তা বলা যায় না। কিন্তু অনেক দিন পরে সত্যই যখন স্বাধীনতা আসন্ন হয়েছিল তখন দেশবিভাগকে মেনে নেওয়া হয়েছিল অনুরূপ দরাদরি আর পলায়নী মনোবৃত্তির তাড়নায়। সেকথা যথাসময়ে আলোচনা করা হবে। কিন্তু এ কথা মেনে নিতে হবে যে হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের নামে সেদিন যে-চুক্তি হয়েছিল তার মধ্যে পরিকল্পিতভাবে সৃষ্ট সাম্প্রদায়িকতাকে বাধা দেওয়া হয়নি। ইংরেজ সরকার ভারতবর্ষকে স্বাধিকার দেয়নি। বরং ১৯১৮ সালে মন্টেগু-চেমসফোর্ডের নামে তারা আর একটি শাসন সংস্কারের প্রস্তাব করেছিল। সেই প্রস্তাবে না ছিল প্রকৃত স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতি, না ছিল তাতে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে প্রকৃত ঐক্য প্রতিষ্ঠার প্রয়াস। এর মধ্যে জনপ্রতিনিধিত্বকে আরও একটু বিস্তৃত করার প্রস্তাব ছিল। গান্ধীজী একে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু পৃথক নির্বাচনের অভিশাপ থেকে দেশকে মুক্ত করা যায়নি। শাসন সংস্কারের পরবর্তী প্রস্তাব আসে ১৯৩৫ সালে। এই প্রস্তাবে ভারতবর্ষে একটি ফেডারেল রাষ্ট্র গঠন করার প্রস্তাব করা হয় এবং তার সঙ্গে দেশীয় রাজ্যগুলিকেও সন্নিবিষ্ট করার কথা বলা হয়। বস্তুত এটিও ছিল ইংরেজ সরকারের বিভেদনীতির আর একটি বড় পদক্ষেপ। কংগ্রেস ফেডারেশনের প্রস্তাবিত নীতিটি মানতে রাজি হয়নি। কেননা দেশীয় রাজ্যগুলিকে মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে যুক্ত করে ইংরেজ সরকার নিজেদের প্রাধান্য বজায় রাখতে চেয়েছিল। দু বছর পরে এই বিধি অনুসারে ভারতবর্ষে যখন সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় তখন কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ পরস্পরের প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে রণাঙ্গনে অবতীর্ণ হয়েছিল।

পৃথক নির্বাচন এবং সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার মধ্যে ভবিষ্যতের জন্য বিপদ নিহিত রয়েছে এ কথা যে কেউ বুঝতে পারেননি তা নয়। লাজপত রায় বলেছিলেন : "এটি (সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা—ভ. প্র. চ.) কেবলই সাময়িক এবং মুসলমানরা নিজেরাই এক দিন এটিকে বাতিল করতে চাইবেন এই রকম একটি আপাত মিষ্ট কথন (enphemism) কাউকেই প্রতারণা করতে পারবে না। পৃথক নির্বাচনের ভিত্তিতে সাম্প্রদায়িক প্রতিনিধিত্বকে যদি একবার আপনারা স্বীকার করে নেন তবে গৃহযুদ্ধ ছাড়া তাকে কখনই আপনারা বাতিল করতে পারবেন না।"[৫৪] আবার অন্য দিকে অসাম্প্রদায়িক মুসলমান

নেতা ডঃ আনসারি দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠকের সময় ভিয়েনা থেকে গান্ধীজীকে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা মেনে নিতে অনুরোধ করেছিলেন। বস্তুত অনেক জাতীয়তাবাদী মুসলমান নেতা মনে করেছিলেন যে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা মেনে নিয়ে সাম্প্রদায়িক মুসলমানদের যদি আলাদা করে দেওয়া না যায় তবে তাঁরা অর্থাৎ জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা কংগ্রেসে তেমনভাবে আদৃত হবেন না।[৫৫] ঘটনাটি যেমনই হোক এবং সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা গ্রহণ বা বর্জনের মধ্যে যাঁর যে মানসিকতাই কাজ করুক না কেন এর দ্বারা ইংরেজ শাসকদের বিভেদনীতি যে দৃঢ়তর হয়েছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই। বাংলার মুসলমানরা সাধারণভাবে শিক্ষার ক্ষেত্রে কিছুটা অনগ্রসর ছিলেন বলে চিত্তরঞ্জন তাঁদের বাড়তি সুযোগ দিতে চেয়েছিলেন। এ কথা উপরে উল্লেখ করা হয়েছে। কিন্তু চিত্তরঞ্জনের সকল অনুগামীর কাছে তাঁর প্রস্তাব মনঃপূত হয়নি। তার ফলে তাঁর মৃত্যুর পর প্রস্তাবটিকে কার্যকর করা হয়নি। মৌলানা আজাদের মনে হয়েছিল যে এর ফলে মুসলমানরা কংগ্রেস থেকে বেরিয়ে যান এবং এইভাবে 'দেশবিভাগের প্রথম বীজ' রোপিত হয়।[৫৬] তা ছাড়া বাংলার বিধানসভায় কংগ্রেস সংখ্যাগরিষ্ঠ হতে পারবে না জেনেও কংগ্রেসীরা ফজলুল হক বা মুসলিম লীগের সদস্য নন এমন কোন মুসলমান নেতাকে সমর্থন না করায় তাঁদের বিরক্তির কারণ ঘটিয়েছিলেন। বাংলার বিধানসভায় মনোনীত ইংরেজ প্রতিনিধিদের একটি শক্তিশালী গোষ্ঠী ছিল। মন্ত্রী পরিষদ গঠন এবং তার অস্তিত্ব রক্ষায় এই গোষ্ঠীর একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। কংগ্রেস ফজলুল হকের কৃষক পার্টির সঙ্গে আঁতাত না করায় ফজলুল হককে মন্ত্রীসভা গঠনে ইংরেজ প্রতিনিধিদের উপর নির্ভর করতে হয়[৫৭] এবং তা শাসকগোষ্ঠীর কাছে সাম্প্রদায়িকতার মানসিকতাকে নতুন মোড়কে উপস্থিত করার সুযোগ করে দেয়।

শাসন সংস্কারের মধ্য দিয়ে যেমন সাম্প্রদায়িকতাকে সংগঠিত রূপ দেওয়া হচ্ছিল তেমনি কারণে-অকারণে হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গার উস্কানি দিয়ে তাকে সাকার করার চেষ্টাও করা হচ্ছিল। ১৯১৬ সালে হিন্দু-মুসলমান চুক্তি হবার পর সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার সংখ্যা বৃদ্ধি হতে থাকে। এই চুক্তি হয়ে যাবার পর দেড় বছরের মধ্যে বিভিন্ন স্থানে মোট পঁচিশটি দাঙ্গার খবর পাওয়া গিয়েছিল। খালিকুজ্জমান অভিযোগ করেছেন যে লক্ষ্ণৌ শহরে শান্তিস্থাপনার সামান্য প্রয়াস ছাড়া ইংরেজরা বিস্তৃত অঞ্চলে প্রসারিত দাঙ্গা দমনে কোন ব্যবস্থাই নেয়নি। তিনি এই অভিযোগও করেছেন যে দাঙ্গার সংখ্যা বৃদ্ধির একমাত্র কারণ স্বামী শ্রদ্ধানন্দের 'শুদ্ধি আন্দোলন'। মোপলা রায়টের পর ভাইসরয় তাঁকে এই কাজে উৎসাহিত করেছিলেন।[৫৮]

মোপলা রায়ট ঘটেছিল ১৯২১ সালের আগস্ট মাসে। কয়েক মাস ধরে এখানে বিদ্রোহ ধূমায়িত হয় এবং তা শেষ পর্যন্ত দাঙ্গার রূপ নেয়। তুরস্কে খিলাফতকে পুনর্প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য মোপলা নামে পরিচিত মুসলমান কৃষক ও মৎস্যজীবীরা ধর্মযুদ্ধ শুরু করে দেয়। তারা কয়েকজন ইউরোপীয়নকে এবং বহু হিন্দু জমিদার ও মহাজনকে হত্যা করে। বেশ কিছু হিন্দুকে তারা জোর করে ধর্মান্তরিত করে এবং কয়েকটি মন্দিরকে ভেঙে দেয়।[৫৯] সেপ্টেম্বর মাসে গান্ধীজী এবং মহম্মদ আলি দাঙ্গা প্রশমিত করতে মালাবারের উদ্দেশ্যে যাত্রা করেন। কিন্তু মাঝপথে সরকার মহম্মদ আলিকে অন্য এক অজুহাতে গ্রেপ্তার করে। সরকারের এই কাজ এ কথাই প্রমাণ করে যে তারা চায়নি যে মহম্মদ আলি দাঙ্গা দমনে স্ব-সম্প্রদায়ের লোকেদের উপর তাঁর প্রভাব বিস্তার করুন। ১৯২৪ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কোহাটে সাংঘাতিক দাঙ্গা হয়। এবারের দাঙ্গার কারণ

ছিল একজন হিন্দুর লেখা 'রঙ্গীলা রসূল' নামে পয়গম্বরের জীবনী। এটি লেখার 'অপরাধে' লেখককে হত্যা করা হয়। তার ফলে অল্প সময়ের মধ্যেই দাঙ্গা বিভিন্ন অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ে। আমেথি, সন্তান এবং গুলবার্গের মুসলিম জনতা অনেকগুলি হিন্দু মন্দির ধ্বংস করে। এখানে হতাহতের সংখ্যা ছিল দুশর মতো। নয় লক্ষ টাকার সম্পত্তির ক্ষতি হয়। কোহাট ছেড়ে হিন্দুরা অন্যত্র পালিয়ে যায়।[৬০] ১৯২৬ সালে পঁয়ত্রিশটি হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা হয়। এই বছরের নভেম্বর মাসে দেশে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। নির্বাচনে ভোট আদায় করবার জন্য সাম্প্রদায়িকতাকে বাড়িয়ে দেওয়া হয়। লালা লাজপত রায়, পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য হিন্দু ভোটারদের নিজেদের দিকে আনতে সক্রিয় ভূমিকা নিয়েছিলেন। মতিলাল নেহরুর নেতৃত্বে জাতীয়তাবাদী স্বরাজীরা নির্বাচনে সাফল্য লাভ করতে পারেননি। নির্বাচনের পরে একদিকে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে মন্ত্রী মনোনয়ন এবং অন্য দিকে মুসলমান মন্ত্রীরা তাঁদের মনোনীত গোষ্ঠী এবং সরকারের সহযোগে সংস্কারের যে চেষ্টা করেছিলেন তাতে পাঞ্জাব, বাংলা এবং বোম্বাই-এর হিন্দুরা শঙ্কিত হন। তাঁরা শুদ্ধি আন্দোলনকে কোথাও কোথাও জোরদার করেন। নিজেদের সংগঠনগুলিকেও শক্তপোক্ত করতে চান। তাতে মুসলমানরা উত্তেজিত হন। এইভাবে পারস্পরিক অবিশ্বাস ও ভীতির কারণে দাঙ্গা বিস্তৃত হয়।[৬১] কয়েক বছর পর ১৯২৯ সালে বোম্বাইতে ভয়াবহ দাঙ্গা হয়। এখানে কয়েকশ মানুষ হতাহত হয়েছিলেন।[৬২] লাজপত রায় ভেবেছিলেন যে একমাত্র গৃহযুদ্ধের দ্বারাই কোন দিন পৃথক নির্বাচন প্রথাকে বাতিল করা সম্ভব হতে পারে। তা হয়নি। হয়েছিল তার বিপরীত। পৃথক নির্বাচন সাম্প্রদায়িকতাকে সংগঠিত করতে সফল হয়েছিল এবং ধীরে ধীরে তা দেশকে গৃহযুদ্ধের দিকে ঠেলে দিচ্ছিল। এই রকম এক অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যেই ভারতবর্ষে নতুন শাসন সংস্কার চালু হয়ে যায়।

বিচ্ছেদের বিষবৃক্ষ

স্বাধীনতা আন্দোলন তীব্রতর হওয়ায় এবং কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে কোন শাসন সংস্কারকে কার্যান্বিত করা সম্ভবপর নয়—প্রথম গোলটেবিল বৈঠকের ব্যর্থতা থেকে এই অভিজ্ঞতা লাভ করার পর ইংরেজ সরকার কিছুটা নমনীয় হতে বাধ্য হয়। আরউইন গান্ধীজীর সঙ্গে চুক্তি করেন। সেই চুক্তির শর্ত অনুসারে গান্ধীজী আন্দোলন প্রত্যাহার করে নেন এবং ইংরেজ সরকারের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য কংগ্রেসের একমাত্র প্রতিনিধিরূপে ইংলন্ডে যাত্রা করেন। এটি ছিল দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক। ১৯৩২ সালে অনুষ্ঠিত এই বৈঠকে ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী ম্যাকডোনাল্ড সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। এই প্রস্তাবে প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে প্রতিনিধি নির্বাচনের উদ্দেশ্যে মুসলমান, ইউরোপীয়ান, শিখ, ভারতীয় খ্রিস্টান এবং অ্যাংলো-ইন্ডিয়ানদের জন্য পৃথক নির্বাচন প্রচলন করার কথা বলা হয়েছিল। প্রকৃতপক্ষে মুসলমানদের ক্ষেত্রে পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা আগে থেকেই চালু ছিল আর তার ফলে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে বিভেদ ক্রমশই বেড়ে চলেছিল। এ কথা আগে আলোচিত হয়েছে। কংগ্রেস এক সময় ঘোষণা করেছিল যে সংখ্যাগরিষ্ঠদের সঙ্গে কোন ধর্মীয় সংখ্যালঘুর যদি মতানৈক্য ঘটে তবে অথবা বিশেষ সুবিধাভোগে সংখ্যালঘুদের যদি কোন অসুবিধা হয় তবে তার মীমাংসার ভার সংখ্যাগরিষ্ঠদের উপর ছেড়ে না দিয়ে একটি নিরপেক্ষ বিচারকমণ্ডলীর কাছে, এমনকি

একটি আন্তর্জাতিক ট্রাইবুনালের কাছে দেওয়া যেতে পারে।[৬৩] কিন্তু এইরকম কোন প্রস্তাবই সাম্প্রদায়িক অনৈক্যের সেতুবন্ধনের জন্য বিবেচিত হয়নি। আসল কথা ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট চায়নি যে ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হোক। বরং ভারতবর্ষের জনগণের মধ্যে অনৈক্যকে বিস্তৃত করতে তারা আরও নানাভাবে সচেষ্ট হয়। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন তারই এক প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। এই আইনে প্রশাসনের কাজে দেশের মানুষকে যুক্ত করার কথা যেমন ছিল তেমনি দেশীয় রাজ্যগুলিকে যুক্ত করে একটি ফেডারেল রাষ্ট্র গঠনের কথাও বলা হয়েছিল। অধিকন্তু এ কথাও বলা হয়েছিল যে যেহেতু ভারতবর্ষে ইউনিটারী গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠিত না করে ফেডারেল গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠা করা হবে সেইহেতু করদ রাজ্য হিসাবে প্রদেশগুলিতে অধিকতর স্বাধীনতা থাকবে। আপাত দৃষ্টিতে দেখলে এতে কোন দোষ নেই, বরং বলা যায় যে ফেডারেল রাষ্ট্রের চরিত্রই এমন হওয়া উচিত। কিন্তু ভারতবর্ষের তদানীন্তন পরিস্থিতি বিবেচনা করলে এ কথা মনে হওয়া স্বাভাবিক যে এই আইন বলবৎ করে দেশের মধ্যে অনৈক্যকে প্রবল করার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছিল।[৬৪] জওহরলাল ১৯৩৫ সালের আইনটিকে এইভাবে বর্ণনা করেছিলেন : "এটিতে এক ধরনের প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন এবং ফেডারেল কাঠামোর কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু এর মধ্যে এত বেশি বাধা ও সংরক্ষণ ছিল যে রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষমতা আগের মতোই ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের হাতে কেন্দ্রীভূত হয়ে থাকত। প্রকৃতপক্ষে এটি সম্পূর্ণরূপে গভর্নমেন্টের কাছে দায়বদ্ধ একটি নির্বাহিকবর্গের ক্ষমতাকে বিচ্ছিন্নভাবে সুদৃঢ় ও বিস্তৃত করে দিয়েছিল। ফেডারেল কাঠামোকে এমনভাবে বিবেচনা করা হয়েছিল যে তার ফলে প্রকৃত অগ্রগতি অসম্ভব হয়ে যাবে। ব্রিটিশ নিয়ন্ত্রিত প্রশাসনে ভারতীয় প্রতিনিধিরা যাতে কোন রকম হস্তক্ষেপ করতে না পারে তার জন্য কোন ফাঁক এতে রাখা হয়নি। এর কোন পরিবর্তন বা শিথিলতা কেবল ব্রিটিশ পার্লামেন্টের মাধ্যমেই করা যেত। এইভাবে এটি ছিল প্রতিক্রিয়াশীল। এর মধ্যে স্ব-উন্নয়নের বীজটুকুও ছিল না, বৈপ্লবিক কর্মসূচি তো দূরের কথা। এই আইন ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে নৃপতিদের, জমিদারদের এবং অন্যান্য প্রতিক্রিয়াশীল উপাদানগুলির মৈত্রীকে শক্তিশালী করেছিল ; পৃথক নির্বাচনকে শক্তি জুগিয়ে এই আইন বিচ্ছিন্নতার ঝোঁককেও বাড়িয়ে দিয়েছিল।"[৬৫]

প্রকৃতপক্ষে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে কংগ্রেসের দাবি পূর্ণ স্বাধীনতার কথা তো ছিলই না, এমনকি ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন স্টেটাসের মর্যাদা দেবার কথাও তাতে উল্লেখিত হয়নি। বলা যেতে পারে যে ১৯১৯ সালের আইনে ভারতবর্ষের জনগণের অন্তর্ভুক্ত বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যে রাজনৈতিক বিভেদকে জাগিয়ে তোলার যে সযত্ন প্রয়াস করা হয়েছিল নতুন আইনে তাকেই আরও তাতিয়ে দেবার চেষ্টা করা হয়। আইনটি এমনভাবে পরিকল্পিত হয়েছিল যে তার দ্বারা যেন দেশের প্রগতিশীল মানুষরা ক্ষমতা অর্জন করতে না পারেন এবং প্রচলিত ব্যবস্থার সংশোধন করতে না পারেন। এতে এ কথাও বলা হয়েছিল যে ফেডারেল রাষ্ট্রের আইনসভা দুটি ব্যবস্থাপক সভার দ্বারা সমন্বিত হবে। এর উচ্চ কক্ষের মোট সদস্য হবেন ২৬০ জন। তার মধ্যে দুই-পঞ্চমাংশ (১০৪ জন)-কে দেশীয় নৃপতিরা নির্বাচন করবেন এবং অবশিষ্ট ১৫৬ জনের মধ্যে ১৪০টি আসন প্রদেশগুলির মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হবে। এই ১৪০টি আসনে সাধারণ নির্বাচন কেন্দ্র থেকে আসবেন ৭৫ জন, তফশিলী জাতি থেকে ৬ জন, শিখ ৪ জন, ৪৯ জন মুসলমান এবং ৬ জন মহিলা। বাকি ১০ জনের মধ্যে ৬ জন হবেন ভাইসরয়ের মনোনীত ব্যক্তি, ১ জন অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান, ১ জন ইউরোপীয়ান এবং দেশীয় খ্রিস্টান ২ জন। সংখ্যার এই

বিন্যাস বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে ২৬০ জন সদস্যবিশিষ্ট আইনসভায় সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা (তফশিলী জাতিসহ) শতকরা মাত্র ৩১ জন সদস্যকে নির্বাচন করতে পারতেন আর সংখ্যালঘুরা নির্বাচন করতেন শতকরা ২৪ জন। বাকি ৪৫ শতাংশের মধ্যে শতকরা ৪০টি আসন দেশীয় রাজ্যগুলি এবং শতকরা ৫টি আসন মহিলা ও মনোনীত সদস্যদের জন্য নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। নিম্ন কক্ষের ৩৭৫ জন সদস্যের মধ্যে ১২৫টি আসন দেওয়া হয়েছিল দেশীয় রাজ্যগুলিকে। এর অর্থ হল দেশীয় রাজ্যগুলির জনসংখ্যা যেখানে ছিল মোট জনসংখ্যার শতকরা ২৪ সেখানে তাদের আসন সংখ্যা ছিল শতকরা ৩৩ ভাগ। অবশিষ্ট ২৫০টি আসনের মধ্যে তফশিলী জাতিসহ হিন্দুদের দেওয়া হয়েছিল শতকরা ৪২, মুসলমানদের শতকরা ৩৩ (জনসংখ্যার অনুপাত ছিল শতকরা ২৪) এবং অন্যান্য সংখ্যালঘুদের শতকরা ১০। বাকিগুলি জমিদার, শিল্পপতি, শ্রমিক এবং মহিলাদের জন্য সংরক্ষিত ছিল।[৬৬] ফেডারেল আইনসভার সদস্যসংখ্যার এই বিন্যাস থেকে এ কথা স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল যে ব্রিটিশ সরকারের উদ্দেশ্য ছিল দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যে ঠাণ্ডা লড়াইয়ের পথ প্রশস্ত করে দেওয়া।

আইনটি কেন্দ্রীয় আইনসভায় গৃহীত হবার প্রশ্ন ছিল। সেই সময় কেন্দ্রীয় আইনসভায় দলগত সদস্য সংখ্যা ছিল নিম্নরূপ : কংগ্রেস-৪৪, কংগ্রেস ন্যাশানালিস্ট পার্টি-১১, ইন্ডিপেনডেন্ট পার্টি-২২, ইউরোপীয়ান-১১, প্রশাসনিক কাজে যুক্ত ব্যক্তিদের মধ্য থেকে ২৬ জন এবং বেসরকারী ব্যক্তিদের মধ্য থেকে ১৩ জন। জিন্না ছিলেন ইন্ডিপেনডেন্ট পার্টির নেতা। কোন প্রস্তাব গ্রহণ বা বর্জনের ক্ষেত্রে তাঁর দলের একটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। কংগ্রেস কেন্দ্রীয় আইনসভায় ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনকে সরাসরি বাতিল করার প্রস্তাব উত্থাপন করে। জিন্না সেই প্রস্তাবে সায় দেননি। তার ফলে কংগ্রেসের প্রস্তাব ৭২ : ৬১ ভোটে পরাজিত হয়। তবে জিন্না নিজে তিনটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন এবং সেগুলিতে কংগ্রেসের সমর্থন আদায় করে নিয়েছিলেন। সেই প্রস্তাবগুলি হল : যত দিন না সম্প্রদায়গুলি নিজেরাই একটি বিকল্প ব্যবস্থা উপস্থিত করছে তত দিন সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতি বিনা আপত্তিতে সম্মতি প্রদান, আইনটির সরাসরি নিন্দা না করে প্রাদেশিক অংশটির সমালোচনা, যেহেতু আইনটির ফেডারেল অংশ মূলত খারাপ এবং মোটেই গ্রহণযোগ্য নয় সেইহেতু সেটিকে অস্বীকার করা এবং ব্রিটিশ ইন্ডিয়া ফেডারেলের (Federated British India) মধ্যে তাড়াতাড়ি একটি দায়িত্বশীল সরকার গঠনের দাবি তোলা।[৬৭] প্রকৃত কথা হল ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনকে কংগ্রেস, ইন্ডিপেনডেন্ট পার্টি এবং মুসলিম লীগ কেউই গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেনি। কিন্তু তার কারণ সকলের কাছে একরকম ছিল না। কংগ্রেস এই আইনের মধ্যে স্বায়ত্ত শাসনের কোন প্রকাশ দেখতে পায়নি। হিন্দু মহাসভার একে অস্বীকার করার কারণ ছিল এই যে এটি প্রতিক্রিয়াশীল এবং এটি জাতীয়তা ও গণতন্ত্র বিকাশের প্রতিবন্ধক। মুসলিম লীগ মনে করেছিল যে এতে হিন্দুদের প্রভুত্ব করার সুযোগ রয়েছে, কেননা দেশীয় রাজ্যগুলির জনসংখ্যার অধিকাংশই হিন্দু। এর জন্য তারা কেন্দ্রের ক্ষমতা কমিয়ে দেবার জন্য তিনটি প্রস্তাব দিয়েছিল—(১) কেন্দ্রীয় ফেডারেল গভর্নমেন্টের ক্ষমতা সংক্ষিপ্ত করা, (২) প্রাদেশিক সরকারগুলিকে অধিকতর ক্ষমতা দেওয়া, যার মধ্যে সেনাবাহিনীর উপর কর্তৃত্ব করার অধিকার থাকবে, এবং (৩) অবশিষ্ট (residuary) ক্ষমতা প্রদেশগুলিকে অর্পণ করা। দেখা যাচ্ছে যে মুসলিম লীগ এই সংশোধনী প্রস্তাবের মধ্য দিয়ে নাম না করেও ফেডারেল রাষ্ট্রের মধ্যেই স্বশাসিত মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের ইঙ্গিত দিয়েছিল।

মুসলিম লীগের তো সৃষ্টি হয়েছিল ইংরেজদের পৃষ্ঠপোষকতায়। এবং কংগ্রেসের বিরোধী একটি শক্তি সৃষ্টির প্রয়োজন অনুভূত হওয়ায়। তবে মুসলিম লীগের মধ্যেও কখন কখন এমন মানুষ যুক্ত হয়েছিলেন যাঁদের মনে স্বশাসনের ইচ্ছা প্রবল ছিল। তাঁদের আগ্রহে মুসলিম লীগ স্বাধীনতা আন্দোলনকে কখন কখন সমর্থন করেছিল। ১৯১৩ সালে এই রকম ঘটনা ঘটেছিল। তখন তারা সরকারকে সমর্থন করার মানসিকতা বর্জন করে কংগ্রেসের কাছে এসেছিল। মুসলিম লীগের এই পরিবর্তনে মৌলানা আবুল কালাম আজাদের একটি বড় ভূমিকা ছিল।[৮৮] কিন্তু এ ছিল নিতান্তই সাময়িক। মুসলমান সমাজের জন্য বিশেষ সুবিধা আদায়ের দাবি থেকে লীগ কখনই সরে আসেনি, সেই দাবির যৌক্তিকতা সকলের কাছে সব সময় গ্রহণযোগ্য মনে না হলেও। আম্বেদকরের মতে কংগ্রেসের প্রতি মুসলিম লীগের বিরক্ত হবার দুটি কারণ ছিল। একটি হল, কংগ্রেস কখনই মুসলিম লীগকে মুসলমানদের একমাত্র প্রাতিনিধিক প্রতিষ্ঠানের স্বীকৃতি দেয়নি। দ্বিতীয় কারণ হল, ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন প্রবর্তনের পর কংগ্রেস যেসব প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করেছিল সেইসব প্রদেশে মুসলিম লীগকে নিয়ে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন করেনি।[৮৯] আম্বেদকর যাই মনে করে থাকুন না কেন কংগ্রেসের পক্ষে মুসলিম লীগকে মুসলমানদের একমাত্র সংগঠন বলে মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। কেননা কংগ্রেস যদি এইভাবে মুসলিম লীগকে মেনে নিত তা হলে তা হত রাজেন্দ্রপ্রসাদের ভাষায় অতীতকে অস্বীকার করা, ইতিহাসকে মিথ্যা করে দেওয়া এবং ভবিষ্যতের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করা।[৯০] অন্য দিকে জওহরলাল মনে করেছিলেন যে মুসলিম লীগের সদস্যদের নিয়ে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হলে নানা রকম সমস্যার উদ্ভব হবে। আইনসভার অ-কংগ্রেসী সদস্যরা অনেকেই ছিলেন সংরক্ষণপন্থী এবং সুযোগসন্ধানী। তাঁরা কংগ্রেসের প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গীকে কিছুতেই সমর্থন করতে পারতেন না।[৯১] এই প্রসঙ্গে আরও আলোচনা করার আগে ১৯৩৫ সালের শাসন সংস্কার আইন অনুসরণ করে যে নির্বাচন হয়েছিল তার চিত্রটি অনুধাবন করা যেতে পারে।

আইনটি কার্যকর হয় ১৯৩৭ সালে। কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ নির্বাচনে অংশগ্রহণে প্রস্তুত হয়ে যায়। লীগ তার নির্বাচনী ইস্তাহারে যে কাজের কথা উল্লেখ করেছিল তার সঙ্গে কংগ্রেসের নীতির যথেষ্ট মিল ছিল। তা ছাড়া নির্বাচনের প্রাক্কালে জিন্না যেসব ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে পৃথক নির্বাচন এবং সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাকে তিনি যে আদর্শ বলে মনে করতেন না সেকথাও উল্লেখ করেছিলেন। কখন কখন ভুল করলেও তিনি আদতে কংগ্রেসে যোগদান করবার সময় যে মানুষটি ছিলেন সেই মানুষই আছেন সেই কথাও জিন্না এই সময় উল্লেখ করেছিলেন। সর্বোপরি তাঁর কথার মধ্যে ধ্বনিত হয়েছিল সমগ্র মুসলমান সমাজকে একই পতাকার তলায় নিয়ে আসবার আহ্বান।[৯২] লীগের নেতৃত্বের প্রতিও তিনি সন্তুষ্ট ছিলেন না। বস্তুত জিন্নার কথা থেকে সেদিন এইটিই মনে হয়েছিল যে তিনি চাইছিলেন মুসলমান সমাজের অবিসংবাদী নেতা হতে। তার কারণ অবশ্য ছিল। কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত মুসলমানরা ছাড়াও—এঁদের তো জিন্না বিশ্বাসঘাতক বলেই মনে করতেন—আরও অনেক মুসলমান নেতা তখন ছিলেন, যাঁরা জিন্নার নেতৃত্ব মেনে নেননি। এঁদের মধ্যে ছিলেন বাংলায় কৃষক প্রজা পার্টির ফজলুল হক, পাঞ্জাবে ইউনিয়নিস্ট পার্টির সিকান্দর হায়াত খাঁ, সিন্ধুপ্রদেশে আল্লা বক্স এবং উত্তরপ্রদেশে চৌধুরী খালিকুজ্জমান। এটি জিন্নার কাছে খুবই বিরক্তির কারণ ছিল। অবশ্য সাঁইত্রিশ সালের নির্বাচনে খালিকুজ্জমান জিন্নার শিবিরে যোগ দিয়েছিলেন। ফজলুল হকও পরবর্তীকালে

জিন্নার হাত শক্ত করেছিলেন। আরও পরে তিনি আবার মুসলিম লীগ থেকে সরে গিয়েছিলেন।

যাই হোক, নির্বাচনের ফলাফল থেকে যে চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তা হল কংগ্রেস অধিকাংশ প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করলেও মুসলমান ভোটারদের কাছ থেকে ব্যাপকভাবে সমর্থন অর্জন করতে পারেনি। কংগ্রেস মোট ৮৩৬টি অমুসলমান আসনের মধ্যে ৭১৫টিতে জয়লাভ করে। আর ৪৮৫টি মুসলিম আসনের মধ্যে ৮৫টিতে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে জয়লাভ করে মাত্র ২৬টিতে। অর্থাৎ মোট মুসলিম আসনের শতকরা ৫·৪টি আসন কংগ্রেসের হাতে আসে। অন্যদিকে পাঞ্জাবে মুসলিম লীগ মোট ৮৬টি মুসলিম আসনের মধ্যে মাত্র ২টিতে জয়লাভ করতে সমর্থ হয়েছিল। বাংলায় তারা ১১৯টির মধ্যে পেয়েছিল ৪০টি আসন। সিন্ধুপ্রদেশ এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে তারা একটি আসনেও জিততে পারেনি। কিন্তু উত্তরপ্রদেশে ৬৪টির মধ্যে ২৭টিতে, বিহারে ২৯টির মধ্যে ২০টিতে এবং মাদ্রাজে ২৮টির মধ্যে ১১টিতে মুসলিম লীগ জয়লাভ করেছিল।[৭৩] প্রকৃতপক্ষে সাঁইত্রিশ সালের নির্বাচনে এই জিনিসটি পরিষ্কার হয়ে গিয়েছিল যে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলিতে মুসলিম লীগ প্রাধান্য বিস্তার করতে পারেনি। হিন্দুপ্রধান প্রদেশগুলিতেই তারা শিকড় গাড়তে সক্ষম হয়েছিল। তার মধ্যে উত্তরপ্রদেশের রাজনীতি ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ নির্ণয়ে একটি বড় ভূমিকা গ্রহণ করেছিল।

নির্বাচন দ্বন্দ্বে অবতীর্ণ হয়ে জিন্না যেসব বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার মধ্যে অনেক জায়গাতেই তিনি জাতীয়তাবাদী মনোভাব প্রকাশ করেছিলেন। একটি বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন যে মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেসের মধ্যে আদর্শগত কোন পার্থক্য নেই। সেই আদর্শ হল ভারতবর্ষের পূর্ণ স্বাধীনতা। এমন কোন আত্মসম্মানসম্পন্ন ভারতীয় থাকতে পারেন না যিনি বিদেশী শাসন পছন্দ করেন অথবা নিজের দেশের জন্য পূর্ণ স্বাধীনতা এবং স্বশাসন চান না।

এই পরিবেশ এবং নির্বাচনের এই রকম ফলাফল জানার পর অনেকেই আশা করেছিলেন যে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে সহযোগিতার মনোভাব গড়ে উঠবে। সেই উদ্দেশ্যে খালিকুজ্জমান ১৯৩৭ সালের মে মাসে জওহরলালের সঙ্গে দেখা করেন। কিন্তু তাঁদের আলোচনা ফলপ্রসূ হয়নি। কেননা জওহরলালের মনে হয়েছিল যে আইনসভার ভিতরে একটি স্বতন্ত্র মুসলিম সংগঠনের অবস্থান অবাঞ্ছিত। কয়েক দিন পরে গোবিন্দবল্লভ পন্থ খালিকুজ্জমানের সঙ্গে কথা বলেন। পন্থ উত্তরপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী নির্বাচিত হয়েছিলেন। তাঁরা কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠন নিয়ে কথা বলেছিলেন। কিন্তু এই আলোচনা থেকেও তাঁরা কোন সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারেননি। এর কয়েকদিন পরে মৌলানা আজাদ এবং খালিকুজ্জমান পরস্পর মিলিত হন। আজাদ কংগ্রেসের পক্ষে কয়েকটি শর্ত দিয়েছিলেন। তার মধ্যে একটি ছিল, উত্তরপ্রদেশের আইনসভায় মুসলিম লীগের প্রতিনিধিরা স্বতন্ত্র গোষ্ঠীর অস্তিত্ব বজায় রাখবেন না। আর একটি শর্ত ছিল, উত্তরপ্রদেশে মুসলিম লীগ তাদের পার্লামেন্টারী বোর্ড ভেঙে ফেলবে এবং ভবিষ্যতে কোন উপ-নির্বাচনে এই বোর্ড প্রার্থী মনোনয়ন করবে না। মুসলিম লীগের পক্ষে এই শর্তটি সরাসরি মেনে নেওয়া সম্ভব ছিল না। তাই খালিকুজ্জমান এবং ইসমাইল খাঁ জানান যে তাঁরা এতে রাজি হতে পারেন যদি সাম্প্রদায়িক বিষয়ে আলোচনার সময় আইনসভায় মুসলিম লীগের সদস্যদের বিবেক ভোটের অধিকার দেওয়া হয়। আবার এই কথাও বলা হয়েছিল যে কংগ্রেস যদি কোন অবস্থায় মন্ত্রীসভা থেকে অথবা এমনকি

আইনসভা থেকেও পদত্যাগ করা মনস্থ করে তা হলে মুসলিম গোষ্ঠীর সদস্যরাও সেই সিদ্ধান্ত মানতে বাধ্য থাকবেন।[৭৪] এইসব শর্ত কোন পক্ষই মানতে পারেননি। অতএব আলোচনা ব্যর্থ হয়।

মৌলানা আজাদ আলোচনা ভেঙে যাওয়ার জন্য নেহরুকে দায়ী করেছেন। তিনি লিখেছেন যে উত্তরপ্রদেশের মুসলিম লীগের দুজন নেতা চৌধুরী খালিকুজ্জমান এবং নবাব ইসমাইল খাঁ তাঁকে কথা দিয়েছিলেন যে তাঁরা মন্ত্রীসভায় যোগদান করে কেবল কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করেই তাঁদের কর্তব্য শেষ করবেন না, উপরন্তু কংগ্রেসের কর্মসূচি রূপায়ণেও তাঁরা সর্বতোভাবে সহায়তা করবেন। বস্তুত আজাদের কথা থেকে জানা যায় যে এই দুই মুসলিম লীগ নেতা মন্ত্রীসভায় যোগদান করতে বিশেষ আগ্রহী ছিলেন। তাঁরা জানতেন যে মুখ্যমন্ত্রীর মনোনীত হয়ে মন্ত্রীসভায় স্থান না পেলে তাঁদের পক্ষে মন্ত্রী হওয়া যাবে না। আজাদ তাঁদের এই দুর্বলতা অনুভব করেই তাঁদের দুজনকে মন্ত্রীসভায় নিতে বলেছিলেন। কিন্তু জওহরলাল আজাদের সঙ্গে পরামর্শ না করেই এই প্রস্তাব বাতিল করে দিয়েছিলেন। তিনি লীগ নেতাদের জানিয়ে দিয়েছিলেন যে তাঁদের মধ্য থেকে একজনকেই মন্ত্রীসভায় নেওয়া যেতে পারে। লীগ নেতারা তাতে রাজি হননি। ফলে উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস ও লীগের কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়নি। এই ব্যর্থ প্রয়াসের ভূমিতে দাঁড়িয়ে মুসলিম লীগ তার মাটি শক্ত করে নিয়েছিল।[৭৫]

আজাদ আরও লিখেছেন যে তিনি এই বিষয় নিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে কথা বলেছিলেন। গান্ধীজী জওহরলালকে আজাদের প্রস্তাব মেনে নেবার জন্য পরামর্শ দিতে রাজি হয়েছিলেন। কিন্তু জওহরলাল যখন গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করেন তখন তিনি গান্ধীজীকে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী বোঝাতে সক্ষম হন। আজাদ মনে করেছেন যে কংগ্রেস নেতা পুরুষোত্তম দাস ট্যাণ্ডনের কথায় প্রভাবিত হয়ে নেহরু তাঁর সিদ্ধান্ত স্থির করেছিলেন।

আজাদের এই অভিযোগ অনেকেই মানতে চাননি। জওহরলাল বলেছেন যে কংগ্রেসের প্রগতিশীল কর্মপন্থাগুলি রূপায়ণে এইসব পুরাতনপন্থী নেতারা বাধা সৃষ্টি করতেন এই ভয় তাঁর ছিল বলেই তিনি মুসলিম লীগের দুজনকে মন্ত্রীসভায় নিতে রাজি হননি। কী হত আর কী হত না সময়ের দূর প্রান্তে বসে আজ নিশ্চয় করে কিছুই বলা যায় না। কিন্তু এ কথা ঠিক যে পরিস্থিতির বিশ্লেষণে কংগ্রেসের দুই প্রথম সারির নেতার মধ্যে সেদিন ঐকমত্য ছিল না। ভবিষ্যতে কেন্দ্রে অন্তর্বর্তীকালীন সরকার চালাবার সময় মুসলিম লীগের প্রতিনিধিকে অর্থ মন্ত্রকের ভার দিয়ে কংগ্রেস নিজের বিপদ ডেকে এনেছিল। তাতে দেশবিভাগের পথ প্রশস্ত হয়ে যায়। ট্যাণ্ডনের ভূমিকার কথা জওহরলালের সমালোচক রামমনোহর লোহিয়াও সমর্থন করেননি। তিনি বলেছেন যে উত্তরপ্রদেশের আইনসভায় কংগ্রেসের নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা থাকায় জওহরলাল তাঁর সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন।[৭৬] মুসলিম লীগের দাবি মেনে না নেবার আরও কারণ ছিল। তাঁরা দাবি করেছিলেন যে মন্ত্রীসভার সদস্যদের এক তৃতীয়াংশ তাঁদের দেওয়া হোক। কংগ্রেসকে অবশ্যই কয়েকজন জাতীয়তাবাদী মুসলমানকে মন্ত্রীসভায় স্থান দিতে হত। সেই অবস্থায় মন্ত্রীসভার মোট সদস্য সংখ্যার অর্ধেক হতেন মুসলমান। অথচ সমগ্র লোকসংখ্যার দৃষ্টিতে সেই সময় উত্তরপ্রদেশে মুসলমানরা ছিলেন মাত্র চোদ্দ ভাগ। তাই এই রকম অসম অনুপাত মেনে নেওয়া কংগ্রেসের পক্ষে সম্ভবপর ছিল না।[৭৭] আবার নবাব ইসমাইল খাঁর ছেলে একটি প্রবন্ধে জানিয়েছেন যে নবাবের নিজেরই মন্ত্রীসভায় যেতে আপত্তি ছিল।[৭৮] আজাদ উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস ও লীগের আলোচনা ভেঙে

যাওয়ার কারণ হিসেবে যে যুক্তি উত্থাপন করেছেন খালিকুজ্জমানও তার সঙ্গে একমত হননি। তিনি স্পষ্টতই বলেছেন যে মুসলিম লীগকে মুসলমানদের একমাত্র সংগঠন বলে মেনে নিতে কংগ্রেসের আপত্তিই হল তাঁদের আলোচনা ভেঙে যাওয়ার প্রধান কারণ। একটি চিঠিতে তিনি নেহরুকে লিখেছিলেন (১৪-৪-৩৮) : "যে-সাম্প্রদায়িকতা ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদের কাছে সুরক্ষা (protection) অন্বেষণ করে আমি সেই সাম্প্রদায়িকতাকে অসম্মানজনক বলে মনে করি।"[৭৯] মুসলিম লীগ মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে তাদের ধর্মীয় দাবি বলে মনে করত। সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের প্রভুত্ব থেকে মুসলমানদের রক্ষা করাকে তাঁরা তাঁদের কর্তব্য বলে ধরে নিয়েছিলেন এবং ভারতবর্ষে মুসলমানদের প্রতিনিধিরূপে মুসলিম লীগকে কংগ্রেস স্বীকৃতি দিক এই বিষয়ে তাঁরা কোন আপস করতেও রাজি ছিলেন না। অন্য দিকে কংগ্রেস মুসলমানদের কিছু বিশেষ সুবিধাদানে সম্মত হলেও দেশের মূল স্রোত থেকে তাঁদের সরে যাবার দাবিকে যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেনি। আর মুসলিম লীগই যে মুসলমানদের হয়ে কথা বলার একমাত্র অধিকারী এ কথাও কংগ্রেস মানতে চায়নি। ১৯৩৮ সালে কংগ্রেস সভাপতি সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে জিন্নার আলোচনা হয়। সেই আলোচনাও ব্যর্থ হয়েছিল এই কারণে যে সুভাষচন্দ্র চেয়েছিলেন যে অন্যান্য মুসলিম সংগঠন যারা কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করে থাকে তাদের সঙ্গেও আলোচনা করতে। জিন্না তাতে সম্মত হননি।[৮০] খালিকুজ্জমান এই কারণজনিত ব্যর্থতাগুলিকেই বিচ্ছেদের রাজপথ বলে বর্ণনা করেছেন : "লীগ যখন তার দাবি উত্থাপন করেছিল সেই সময় কংগ্রেস যদি সেই দাবি মেনে নিত তা হলে আর কী কার্যকরী দাবি আমরা তুলতে পারতাম তা আমি জানি না। কংগ্রেসের এই রকম অবিজ্ঞ দীর্ঘসূত্রতা (impolitic tardiness) পাকিস্তানের পথ প্রশস্ত করে দিচ্ছিল। এই কাজে (মিলনের কাজে—ভ. এ. চ.) হিন্দু মহাসভা তো একটি মীমাংসায় আসার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধকের কাজ করছিলই, তা ছাড়াও কংগ্রেসী মুসলমানরা আমাদের ধন্যবাদের পাত্র।"[৮১]

॥ পরিকল্পনা ॥

দেশবিভাগ : ভাঙনের জয় গান গাও

উত্তরপ্রদেশে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট গঠিত হয়নি। মুসলিম লীগ মুসলমানদের একমাত্র প্রাতিনিধিক প্রতিষ্ঠান এ কথা মেনে নিতেও কংগ্রেস রাজি ছিল না। এর ফলে জিন্নার ক্ষোভ যথেষ্ট বেড়ে গিয়েছিল। বিভেদ থেকে বিচ্ছেদের মানসিকতা ইতিমধ্যেই সৃষ্টি হয়ে গিয়েছিল। এবার তা বিদ্বেষের স্তরে পৌঁছে যায়। জিন্নার মধ্যে যে জাতীয়তাবাদীর চরিত্র সজাগ ছিল তা সম্পূর্ণরূপে বিলুপ্ত হয়ে যায়। বস্তুত নির্বাচনের ময়দানে নেমে জিন্না আল্লা এবং কোরানের নাম নিয়ে যেভাবে বক্তৃতা দিচ্ছিলেন[১]—তারই মধ্যে কখন কখন নিজেকে সেই আগের মানুষই আছেন বলে যতই ঘোষণা করে থাকুন না কেন তা সত্ত্বেও ঐ বক্তৃতা থেকেই বোঝা যাচ্ছিল যে তিনি তাঁর আগের ভূমি থেকে সরে এসে আপন প্রতিষ্ঠার জন্য সাম্প্রদায়িকতাকেই আশ্রয় করে নিয়েছেন। তিনি বুঝতে পেরেছিলেন যে গান্ধীজী তাঁর ব্যক্তিত্ব এবং কর্মসূচির মাধ্যমে জনগণচিত্তে যে আসন লাভ করেছেন সেখান থেকে তাঁকে সরান যাবে না। আর তিনি থাকতে জিন্নার জাতীয়তাবাদী নেতারূপে প্রথম স্থান অধিকার করা অসম্ভব। তিনি কেবল মুসলমানদের অবিসংবাদী নেতারূপেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। জিন্না সেই চেষ্টাই করেছিলেন। কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদ পাকা হয়ে গিয়েছিল। জিন্নার এই পরিবর্তনে ইকবালের প্রভাব কাজ করেছিল। বস্তুত ইকবালের কথাতেই জিন্না তাঁর জাতীয়তাবাদী মানসিকতা ত্যাগ করে সাম্প্রদায়িকতার পরিধির মধ্যে নিজেকে বেঁধে ফেলেন।[২] এর জন্য কংগ্রেস কতটা দায়ী তা নিয়ে প্রশ্ন উঠতে পারে। কিন্তু সেই সঙ্গে এ কথাও মনে রাখতে হবে যে মুসলিম লীগের দাবি মেনে নিয়ে কংগ্রেস যদি উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রীসভায় লীগের সদস্যদের জায়গা ছেড়ে দিত তা হলে স্বভাবতই হিন্দুদের পক্ষ থেকে কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মুসলিম লীগকে তোষণ করার অভিযোগ তোলা হত। কংগ্রেসের পক্ষে এটি ছিল উভয় সঙ্কট। তার পক্ষে এই অভিঘাত সহ্য করা সম্ভব ছিল না।

এটি অবশ্যই জানা কথা যে নির্বাচন সব সময়েই বিভেদ এবং বিদ্বেষকে প্রশ্রয় দিয়ে থাকে। সাঁইত্রিশ সালের নির্বাচনে জিন্না জেনেশুনেই তার আশ্রয় নিয়েছিলেন। নির্বাচন শেষ হয়েছিল। মন্ত্রীসভাও গঠিত হয়েছিল। জিন্না কিন্তু বিদ্বেষের প্রবাহকে স্তিমিত করেননি। বিদ্বেষের ভূমিতে দাঁড়িয়ে তিনি এবার অভিযোগ তুলেছিলেন যে যেসব প্রদেশে কংগ্রেসের মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছে সেইসব প্রদেশে মুসলমানরা অত্যাচারিত হচ্ছেন। জিন্না ব্যক্তিগতভাবে এই অভিযোগ করেননি। অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছিল

মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে। কিন্তু তাঁদের অভিযোগ ছিল সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। তখনকার ব্রিটিশ রাজকর্মচারীরাও এই অভিযোগের সত্যতা অস্বীকার করেছিলেন। পক্ষান্তরে তাঁরা কংগ্রেসের এই অভিযোগই মেনে নিয়েছিলেন যে সেই সময় বিভিন্ন স্থানে যে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গাগুলি হয়েছিল তার জন্য দায়ী ছিল মুসলিম লীগ।[৩] জওহরলাল লিখেছেন যে কংগ্রেসের মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করার পর কংগ্রেস সভাপতি রাজেন্দ্রপ্রসাদ জিন্নাকে একটি চিঠিতে অভিযোগগুলি অনুসন্ধান করে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে বলেছিলেন। কেবল চিঠিতে নয়, রাজেন্দ্রপ্রসাদ একটি বিবৃতি প্রকাশ করে মুসলিম লীগকেও একই অনুরোধ করেছিলেন। জিন্না রাজি হননি। তিনি চেয়েছিলেন যে একটি 'রয়াল কমিশন' গঠন করা হোক। কিন্তু 'রয়াল কমিশন' গঠনের কোন সম্ভাবনা ছিল না। কেননা সেই কমিশন একমাত্র ব্রিটিশ গভর্নমেন্টই গঠন করতে পারত। তারা তা করেনি। করার প্রয়োজনও বোধ করেনি। কংগ্রেস যখন মন্ত্রীসভায় ছিল তখন যাঁরা গভর্নর ছিলেন তাঁদের কয়েকজন প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন যে সেই সময় সংখ্যালঘুদের প্রতি ব্যবহারে তাঁরা কোন রকম আপত্তিকর কিছু দেখতে পাননি। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে সংখ্যালঘুদের স্বার্থরক্ষার জন্য গভর্নরদের বিশেষ ক্ষমতা দেওয়া হয়েছিল। সুতরাং সংখ্যালঘুরা অত্যাচারিত হচ্ছেন তা দেখলে গভর্নররা অবশ্যই তাঁদের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করতেন। তা তাঁরা করেননি। বরং সেই সময় একজন কংগ্রেসী মুসলমান মন্ত্রীকে ছুরি মারা হয়। মুসলিম লীগের কোন নেতা এই কাজের নিন্দা করেননি। আততায়ীকে তাঁরা ক্ষমা করেছিলেন।[৪]

জিন্নার অভিযোগ যে কতদূর মিথ্যা ছিল তার উল্লেখ করেছেন ওয়ালি খাঁ। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ডাঃ খান সাহেবের নেতৃত্বে কংগ্রেসের মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছিল। জিন্না অভিযোগ করেছিলেন যে সেখানে হিন্দী ভাষা শিক্ষাকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছে। কথাটি সত্য নয়। সেখানে যেটিকে বাধ্যতামূলক করা হয়েছিল তা হল সেখানকার অধিবাসীদের মাতৃভাষা পুস্তু।[৫]

এই রকম অবিশ্বাসজনিত পরিস্থিতির মধ্যে ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কংগ্রেস একটি প্রস্তাবে নির্দেশ করে যে মুসলিম লীগ এবং হিন্দু মহাসভা দুটিই সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান এবং কোন কংগ্রেসী এই দুটি প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে যুক্ত হতে পারবেন না।[৬] এযাবৎ অনেক নেতাই কংগ্রেসের সঙ্গে যুক্ত থেকেও মুসলিম লীগ অথবা হিন্দু মহাসভার সঙ্গে যোগাযোগ রক্ষা করে চলতেন। অথবা ঐ দুটি প্রতিষ্ঠানের কোন একটিতে যুক্ত থেকেও কংগ্রেসের সভা-সমিতিতে অংশগ্রহণ করতেন। কংগ্রেসের এই প্রস্তাবের নির্দেশে দু নৌকোয় পা দিয়ে চলা বন্ধ হয়ে যায়। কংগ্রেসের সঙ্গে হিন্দু মহাসভা এবং মুসলিম লীগের বিচ্ছেদ সম্পূর্ণ হয়ে যায়।

এই বিচ্ছেদ কেবল প্রতিষ্ঠানের মধ্যেই সীমিত থাকেনি। তা হিন্দু-মুসলমান দুটি সম্প্রদায়ের মধ্যেও সম্প্রসারিত হয়ে যায়। এই কাজে মুসলিম লীগ এবং হিন্দু মহাসভার পাদপীঠ একই ছিল, যদিও কার্যকর ভূমিকার ক্ষেত্রে দুটির মধ্যে তারতম্য ছিল অনেক বেশি। হিন্দুদের একটি বড় অংশ হিন্দু মহাসভাকে উপেক্ষা করে কংগ্রেসের স্বাধীনতা আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিল। কিন্তু মুসলিম লীগ কংগ্রেসের অসাম্প্রদায়িক চরিত্রের প্রতি অবিশ্বাস সৃষ্টি করে দিয়ে মুসলমান সমাজের বড় অংশকে কংগ্রেস থেকে দূরে রাখতে সক্ষম হয়েছিল। শুধু তাই নয়। হিন্দু মহাসভা যা পারেনি মুসলিম লীগ তাই পেরেছিল। সে তার অনুগামীদের মনে কংগ্রেসের প্রতি একটি জিঘাংসার মনোভাব সৃষ্টি

করে দিয়েছিল। সেই মানসিকতারই শেষ পরিণতি দেশবিভাগ। তবে এ কথা ঠিক যে মুসলিম লীগ দেশবিভাগ সম্পর্কে সরকারীভাবে প্রস্তাব গ্রহণের অনেক আগে থেকেই মুসলমানদের জন্য একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের প্রয়োজনীয়তা ও দাবির কথা বিভিন্ন সময়ে ভিন্ন ভিন্ন কণ্ঠে নানাভাবে উচ্চারিত হচ্ছিল। ১৯২৪ সালে লাজপত রায় পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ, সিন্ধুপ্রদেশ এবং বাংলাকে নিয়ে একাধিক মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করেছিলেন। এই রাষ্ট্রগুলি মূল ভারতবর্ষ থেকে সম্পূর্ণভাবে স্বতন্ত্র থাকবে কিনা সে সম্পর্কে কোন সঠিক নির্দেশ এর মধ্যে ছিল না। ১৯৩১ সালের শেষের দিক থেকে ১৯৩৪ সালের অক্টোবর মাস পর্যন্ত জিন্না ইংলন্ডে ছিলেন। এই সময়েই দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। আগা খাঁ তখন বিচ্ছিন্নতাবাদী মুসলমানদের নেতা। তিনি নেহরু পরিকল্পনায় যে ইউনিটারী গভর্নমেন্টের কথা বলা হয়েছিল তার তীব্র নিন্দা করেছিলেন এবং জাতি, সংস্কৃতি ও ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগুলির সীমা পুনর্বিন্যাস করে অনেকগুলি রাষ্ট্র নিয়ে একটি ফেডারেল রাষ্ট্র গঠনের বিষয়টি সমর্থন করেছিলেন।[৭] জিন্না অবশ্য প্রথম দিকে ফেডারেল রাষ্ট্র গঠনের পক্ষপাতী ছিলেন না। তিনি হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের বিষয়টি নিয়ে কংগ্রেস সভাপতির সঙ্গে আলোচনাও করেছিলেন। সেই আলোচনা ব্যর্থ হয়েছিল। এর অনেক পরে খালিকুজ্জমান জিন্নার সঙ্গে এই নিয়ে কথা বলেছিলেন। জিন্না তখন তাঁকে জানিয়েছিলেন যে এই প্রস্তাবের তিনি বিরোধী নন এবং বিষয়টি তিনি গভীরভাবে ভেবে দেখবেন।

খালিকুজ্জমান জিন্নার সঙ্গে যে প্রস্তাব নিয়ে কথা বলেছিলেন তাতে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের পরোক্ষ সমর্থন ছিল। ১৯৩৯ সালের ২০শে মার্চ তারিখে খালিকুজ্জমান ভারত সচিব জেটল্যান্ডের সঙ্গেও কথা বলেছিলেন। জেটল্যান্ড জিজ্ঞেস করেছিলেন যে ১৯৩৫ সালের আইন এবং ফেডারেল ইউনিয়নের বিকল্প কী হতে পারে? খালিকুজ্জমান তখন তাঁকে বলেছিলেন যে গভর্নমেন্ট ভারতবর্ষের মুসলিম অধ্যুষিত অঞ্চলগুলিকে আলাদা করে দিয়ে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করে দিতে পারেন। অবশিষ্ট অঞ্চলগুলিকে নিয়ে একটি ফেডারেল রাষ্ট্র গঠনও করা যেতে পারে। এই ফেডারেল ইউনিয়নে দেশীয় রাজ্যগুলির অন্তর্ভুক্তির কথা ভাবা হয়েছিল। কিন্তু দেশীয় রাজ্যগুলির যেগুলিতে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ তাদের অবস্থান কোথায় এবং কেমন হবে সেকথা এই প্রস্তাবে উল্লেখিত হয়নি। আসলে খালিকুজ্জমান জেটল্যান্ডের সঙ্গে যা নিয়ে কথা বলেছিলেন তার ভিত্তি ছিল রহমৎ আলির একটি প্রস্তাব।

বস্তুত বিভিন্ন দিক থেকে যে চাপ আসছিল তার কাছে নতি স্বীকার করে ব্রিটিশ সরকার একটি মীমাংসার সূত্র খুঁজে বার করতে গোলটেবিল বৈঠকের ব্যবস্থা করেছিল। চার্চিল, লয়েড জর্জ প্রমুখ সংরক্ষণপন্থীরা এবং ভারতবর্ষের রাজকর্মচারীরা এই বৈঠকগুলিকে বানচাল করতে তৎপর হয়েছিলেন। প্লাউডান নামে উত্তরপ্রদেশের একজন বিচারপতি সংরক্ষণপন্থী নেতাদের কাছে একটি স্মারকলিপি পাঠিয়েছিলেন। এটি ছিল গোপনীয়। তাতে তিনি লিখেছিলেন যে ভারতবর্ষে যে অবস্থা চলেছে তার সমাধান করতে ভারতবর্ষকে হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য দুটি ভাগে ভাগ করা উচিত। আর কংগ্রেসের বয়কটের ভীতির মোকাবিলা করতে ব্রিটিশ বাণিজ্যকে বোম্বাই থেকে সরিয়ে করাচিতে নিয়ে যাওয়া প্রয়োজন। 'বোম্বে ক্রনিকেলের' লন্ডনস্থ সংবাদদাতা জানিয়েছিলেন যে হিন্দু ও মুসলমানদের জন্য ভারতবর্ষকে বিভক্ত করার কাজ পূর্ণোদ্যমে চলেছে।[৮]

কেমব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র চৌধুরী রহমৎ আলি ১৯৩০ সালের গোলটেবিল বৈঠক

চলার সময় হিন্দু ভারতবর্ষ থেকে পৃথক করে ভারতবর্ষের মধ্যেই একটি জাতীয় মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের আন্দোলন শুরু করেছিলেন। তিনিই সর্বপ্রথম পাকিস্তান শব্দটি ব্যবহার করেন। পাকিস্তান শব্দটি উর্দু। এর শাব্দিক অর্থ পবিত্র ভূমি। রহমৎ আলি অবশ্য ঠিক এই অর্থে শব্দটি ব্যবহার করেননি। তিনি পাঞ্জাব, আফগানিস্তান, কাশ্মীর, সিন্ধুপ্রদেশ এবং বেলুচিস্তানকে নিয়ে পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাব করেছিলেন। বেলুচিস্তান-এর স্তান এবং অন্য প্রদেশগুলির নামের ইংরেজি শব্দের আদ্যাক্ষরগুলির মাঝে ইংরেজি 'ই' অক্ষরটি বসিয়ে পাকিস্তান শব্দটি সৃষ্টি করা হয়েছিল। ১৯৩৩ সালে রহমৎ আলি আরও দুজনের সঙ্গে একযোগে Now or Never নামে একটি প্রচারপত্র প্রকাশ করেছিলেন। তাতে তাঁরা নিজেদের পাকিস্তানে বসবাসকারী তিন কোটি মুসলমানদের পক্ষে ফেডারেশনের বিরোধিতা করেছিলেন এবং মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র জাতীয় মর্যাদার স্বীকৃতি দাবি করেছিলেন। পাকিস্তান বলতে তখন তাঁরা পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ, সিন্ধুপ্রদেশ এবং বেলুচিস্তানের কথা বোঝাতে চেয়েছিলেন।[৯] উল্লেখ করা যেতে পারে যে রহমৎ আলি তাঁর মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাবে কখনই বাংলার নাম উল্লেখ করেননি।

১৯৩৮ সালে তিনি খালিকুজ্জমানকে এই বিষয়ে একটি চিঠি লিখেছিলেন। তাতেও তিনি লার নাম উল্লেখ করেননি। আর পরবর্তী সময়ে পাকিস্তান সৃষ্টি করতে গিয়ে যখন াব এবং বাংলাকে ভাগ করা হয় তখন তিনি খুবই ক্রুদ্ধ হয়েছিলেন। অন্যদিকে মুসলিম রাষ্ট্র গঠিত হয়ে যাবার পর পাকিস্তান তাঁকে কোন রকম সম্মান দেখায়নি।[১০] দেশবিভাগ হয়ে যাবার পর পাকিস্তানের এই পথিকৃৎ এবং সেই সঙ্গে পাকিস্তানেই অবাঞ্ছিত মানুষটি ভারতবর্ষে যেসব মুসলমান থেকে যাবেন তাঁদের এই বলে আশ্বাস দিয়েছিলেন যে ভারতবর্ষে তাঁদের বিশেষ সুবিধাভোগের গ্যারান্টি হবে পারস্পরিক আদান-প্রদান। আর তাই পাকিস্তানের সকল অমুসলমান সংখ্যালঘুকে তিনি এই বলে অভয় দিতে চেয়েছিলেন যে 'হিন্দুস্তানের সংখ্যালঘু মুসলমানরা' সেখানে যেমন ব্যবহার পাবেন তাঁদের প্রতিও পাকিস্তানে অনুরূপ আচরণ করা হবে।[১১]

১৯৩৩ সালে ইংলন্ডে যেসব মুসলমান নেতা Joint Parliamentary Party-তে (জয়েন্ট পার্লামেন্টারী পার্টি) যোগ দিতে এসেছিলেন তাঁরা রহমৎ আলির প্রস্তাবকে বালখিল্য অলীক কল্পনা বলে উড়িয়ে দিয়েছিলেন। বস্তুত পরবর্তী সময়েও অনেক মুসলমান মনে করেছিলেন যে পাকিস্তানের দাবি হল একটি দরাদরি করার বিষয়। তাঁরা কেন্দ্রীয় আইনসভায় শতকরা পঞ্চাশ ভাগ প্রতিনিধিত্বের অধিকার পেলেই খুশি হবেন এমন ধারণা দেশে সৃষ্টি করা হয়েছিল।[১২]

রহমৎ আলি যখন মুসলমান অধ্যুষিত প্রদেশগুলি নিয়ে স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের পরামর্শ দিচ্ছিলেন প্রায় সেই সময়েই মুসলিম লীগের মঞ্চ থেকে কবি ইকবালও অনুরূপ প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। ভারতের অন্যতম স্বদেশী সঙ্গীত 'সারে জহাঁসে অচ্ছা হিন্দুস্তাঁ হমারা'-র রচয়িতারূপে ইকবাল সমধিক পরিচিত। উর্দু কবিতার প্রকাশিত ধারা ভঙ্গ করে অর্থাৎ প্রেমিকার কাছে প্রেমিকের আত্মনিবেদনের ধারা অতিক্রম করে ইকবাল আত্মগরিমার কবিতা লিখে অনেকের কাছে আদরণীয় ছিলেন। কোরানের নির্দেশের নতুন ব্যাখ্যা করে লেখা তাঁর 'শিকওয়া', 'শমা ঔর শায়র', 'সিসিলি', 'ফতিমা' প্রভৃতি কবিতাগুলি মুসলিম যুবমানসকে উদ্দীপ্ত করেছিল।[১৩] ইকবালের মধ্যে অসাম্প্রদায়িক চিন্তার পাশাপাশি বিশ্বজনীন ঐস্লামিক জাত্যাভিমানের মানসিকতাও তাঁর কবিতাগুলিতে প্রবল ছিল। তাই 'হিন্দী হৈঁ হম, হিন্দুস্তাঁ হৈ হমারা' (আমরা হিন্দুস্তানী, হিন্দুস্তান আমাদের) এই

কথা বলার সঙ্গে সঙ্গে তিনি 'মুসলিম হৈঁ হম, ওয়তন হৈ সারা জহাঁ হমারা' অর্থাৎ আমরা মুসলমান, সারা পৃথিবী হল আমাদের দেশ এই গানও তিনি রচনা করেছিলেন। সমগ্র বিশ্বকে নিজের দেশ মনে করার মধ্যে কোন দোষ নেই। বরং তার মধ্যে উদারতার সুর ঝঙ্কৃত হতে পারে। কিন্তু ধর্মভিত্তিক জাতির অস্তিত্ব স্বীকার করে বিশ্বের কোন খণ্ডকে সেই জাতির স্বতন্ত্র দেশরূপে চিহ্নিত করার প্রয়াস অবশ্যই সঙ্কীর্ণতাকে আহ্বান করে। ইকবাল মুসলিম লীগের সভাপতিরূপে সেই অনুদার মনোভাবই ব্যক্ত করেছিলেন।

১৯৩০ সালে ইকবাল যে প্রস্তাব করেছিলেন তাতে পাঞ্জাব, সীমান্তপ্রদেশ, বেলুচিস্তান, সিন্ধুপ্রদেশ এবং কাশ্মীরকে সম্মিলিত করে 'ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে অথবা বাইরে' একটি রাষ্ট্র গঠনের কথা ছিল।[১৪] অবশ্য মুসলিম রাষ্ট্রটিকে কম বিস্তৃত এবং জনসংখ্যার দিক থেকে বেশি মুসলমানপ্রধান করার জন্য তিনি পাঞ্জাবের আম্বালা এবং অন্যান্য যেসব জেলায় মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ নয় সেগুলিকে প্রস্তাবিত মুসলিম রাষ্ট্র থেকে বাদ দিতে সম্মত ছিলেন।[১৫] অর্থাৎ প্রদেশ ভাগের একটি ইঙ্গিতও ইকবালের দিক থেকেই প্রথম করা হয়েছিল। ইলাহাবাদে অনুষ্ঠিত মুসলিম লীগের বার্ষিক অধিবেশনে ইকবাল সভাপতিত্ব করছিলেন। সেই অধিবেশনেই তিনি তাঁর ভাষণে বলেছিলেন : "আমি দেখতে চাই পাঞ্জাব, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ এবং বালুচিস্তান একটি রাষ্ট্রে সংযুক্ত হবে। এটি ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে অথবা বাইরে স্ব-শাসিত রাষ্ট্র হবে। সংযুক্তি সাধনের মাধ্যমে গঠিত উত্তর ভারতের মুসলিম রাষ্ট্রই হল সকল মুসলমানের, অন্তত উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষের মুসলমানদের চরম ভাগ্য (final destiny)"।[১৬]

এই বক্তৃতাতেই ইকবাল বলেছিলেন : "আমরা হলাম সাত কোটি মানুষ। ভারতবর্ষের অন্য সমস্ত মানুষদের চেয়ে আমরা বেশি সমগোত্রীয় (homogenous)। বস্তুত ভারতবর্ষের মুসলমানরাই একমাত্র জনগোষ্ঠী যাদের সম্পর্কে আধুনিক অর্থে 'জাতি' শব্দটি প্রয়োগ করা যায়। হিন্দুরা যদিও প্রায় সব বিষয়েই আমাদের থেকে এগিয়ে আছে তবু একটি জাতির পক্ষে প্রয়োজনীয় সমগোত্রীয়তা (homogenicety) তারা অর্জন করতে পারেনি। ইসলামের দান হিসেবে তা আমরা পেয়েছি। সুতরাং ভারতবর্ষের মধ্যেই মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের জন্য মুসলমানদের দাবি সম্পূর্ণ ন্যায়সঙ্গত।"[১৭] তিনি আরও বলেছিলেন : "একটি ভারতীয় জাতির ঐক্য বাস্তব অবস্থার বৈপরীত্যের মধ্যে খুঁজলে পাওয়া যাবে না। তা পাওয়া যাবে পারস্পরিক ঐক্য এবং বহুজনের সহযোগিতার মধ্যে। নিজভূমিগুলিতে (homelands) তাঁদের নিজস্ব সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য অনুসারে পরিপূর্ণরূপে বিকশিত হবার অধিকার ভারতীয় মুসলমানদের আছে—এই নীতিকে যদি সাম্প্রদায়িক সমস্যার স্থায়ী মীমাংসার ভিত্তি বলে গণ্য করা হয় তবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য তাদের সব কিছু বাজি ধরতে হবে।...অন্য সম্প্রদায়গুলির রীতিনীতি, বিধি-বিধান, ধর্মীয় এবং সামাজিক সংগঠনগুলির প্রতি আমি গভীর শ্রদ্ধা পোষণ করি।...সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীগুলির অস্তিত্ব অস্বীকার করে পাশ্চাত্যের গণতন্ত্রকে ভারতবর্ষে প্রয়োগ করা যায় না। সুতরাং ভারতবর্ষের মধ্যেই মুসলিম ভারতবর্ষের জন্য 'মুসলমানদের যে দাবি তা সম্পূর্ণ ন্যায্য।"[১৮]

ইকবালের ভাষণ থেকে তাঁর অস্বচ্ছ দৃষ্টিভঙ্গীর প্রকাশ লক্ষ্য করা যায়। তিনি কখন মুসলমানদের একটি পৃথক জাতি বলে উল্লেখ করেছিলেন আবার কখন তাঁদের একটি সম্প্রদায় বলে চিহ্নিত করেছিলেন। বিশেষত অন্য ধর্মাবলম্বী মানুষরা যে ধর্মগোষ্ঠী, জাতি নয় এ কথাই তিনি মনে করেছিলেন। দ্বিতীয়ত, তিনি মুসলমানদের জন্য একাধিক

নিজভূমির কথা বলেছিলেন, যদিও তাঁর ইচ্ছা ছিল একটি মুসলিম ভারতবর্ষীয় রাষ্ট্র গঠন করার, যেটি থাকবে মূল ভারতবর্ষের অঙ্গীভূত হয়ে। তা ছাড়া পাশ্চাত্যের গণতান্ত্রিক প্রথানুসারে সংখ্যাধিক্যের শাসনকে তিনি ভারতবর্ষের পটভূমিতেই এই জন্য গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেননি যে তা হলে সংখ্যালঘু মুসলমানরা চিরকাল সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের শাসনাধীন থাকবে। বস্তুত বিভিন্ন গোষ্ঠীর অস্তিত্ব যদি গণতন্ত্রকে গ্রহণ করার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে যায় তা হলে মুসলিম ভারতবর্ষের অন্তর্গত অন্যান্য ধর্মগোষ্ঠীর অবস্থানও তো সেখানে গণতন্ত্রের পক্ষে বাধা হয়ে পড়ে। এ ক্ষেত্রে প্রস্তাবিত মুসলিম ভারতবর্ষের নীতি কী হবে, সেখানে গণতান্ত্রিক নীতি কীভাবে অনুসৃত হবে সে সম্পর্কে ইকবালের কোন স্পষ্ট প্রস্তাব ছিল না।

তবে ইকবালের এই বক্তৃতায় পরমতের প্রতি তাঁর শ্রদ্ধার বিষয়টি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তাঁর প্রধান লক্ষ্যই ছিল হিন্দু প্রাধান্য থেকে মুসলমানদের মুক্ত রাখা। এই মনোভাব নিয়েই তিনি জিন্নাকে উৎসাহিত হবার জন্য পরামর্শ দিতে গিয়ে বলেছিলেন : "ব্যক্তিগতভাবে আমি বিশ্বাস করি যে কোন রাজনৈতিক সংগঠন যদি সাধারণ মুসলমানদের ভাগ্য পরিবর্তনের প্রতিশ্রুতি না দেয় তা হলে সেই সংগঠন মুসলিম জনগণকে আকৃষ্ট করতে পারবে না। মুসলিম ভারতবর্ষের পক্ষে তার সমস্যাগুলির সমাধান করতে হলে যা প্রয়োজন তা হল দেশের পুনর্বিন্যাস করা এবং নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে এক অথবা একাধিক মুসলিম রাষ্ট্র গঠন করা।"[১৯]

ইকবালের প্রস্তাব এবং কথা থেকে বোঝা যায় যে ইসলাম ধর্মাবলম্বীদের প্রতি তাঁর খুবই ভালবাসা ছিল। কিন্তু তাঁর প্রীতি যে সকল মুসলমানের প্রতি সমানভাবে বর্ষিত হয়েছিল তা মনে হয় না। তিনি শুধু চেয়েছিলেন যেখানে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে তাঁদের শাসন প্রতিষ্ঠিত হোক। এই দৃষ্টি থেকেই তিনি ১৯৩৭ সালে জিন্নাকে লিখেছিলেন : "উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষের এবং বাংলার মুসলমানদের ভারতবর্ষের অন্যান্য জাতির মতোই কেন আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারসম্পন্ন একটি জাতি বলে গণ্য করা হবে না? ব্যক্তিগতভাবে আমি মনে করি যে উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষের এবং বাংলার মুসলমানদের উচিত এখন মুসলিম সংখ্যালঘিষ্ঠ প্রদেশগুলিকে অগ্রাহ্য করা।"[২০] এই কথার অর্থ হল যে হিন্দুরা যেসব প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানকার মুসলমানদের সম্পর্কে তাঁর কোন আকাঙ্ক্ষা বা দাবি ছিল না। তবে এ কথা ঠিক যে ইকবাল প্রকৃত অর্থে দেশবিভাগ চাননি। তিনি চেয়েছিলেন একটি স্বাধীন ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষের মধ্যেই মুসলমানদের জন্য একটি পৃথক রাষ্ট্র। সাম্প্রদায়িকতাবাদী মুসলমানরা তাঁর নামকে দেশবিভাগের কাজে ব্যবহার করেছেন।

মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের কথা রহমত আলি, আগা খাঁ এবং ইকবাল ছাড়া আরও কেউ কেউ বলেছিলেন। ১৯১৭ সালে স্টকহলমে আবদুল জব্বর এবং আবদুল সত্তার নামে দুজন ব্যক্তি একটি ভারতীয় ফেডারেশন গঠনের কথা বলেছিলেন। তার মধ্যে থাকবে একাধিক সার্বভৌম মুসলিম রাষ্ট্র।[২১] ১৯৩৯ সালে সিকন্দর হায়াত খাঁ একটি পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেছিলেন। তাতে শিথিলতম ফেডারেশনের কথা ছিল। ১৯৪০ সালে হায়দ্রাবাদে ডঃ আবদুল লতিফ সমজাতীয় সাংস্কৃতিক অঞ্চলগুলিকে (homogenous cultural zones) নিয়ে ন্যূনতম ফেডারেশন (minimal federation) গঠনের কথা বলেছিলেন। তা ছাড়া 'জনৈক পাঞ্জাবী' নামের আড়ালে এক অজ্ঞাতনামা ব্যক্তিও একটি কনফেডারেশনের কথা বলেছিলেন। তিনি সিন্ধু অববাহিকার আঞ্চলিক

ফেডারেশন, হিন্দু-ভারতবর্ষ ফেডারেশন, রাজস্থান ফেডারেশন, দাক্ষিণাত্যের রাষ্ট্রগুলির ফেডারেশন এবং বাংলা ফেডারেশনের নামে পাঁচটি ফেডারেশন নিয়ে একটি কনফেডারেশন গঠনের প্রস্তাব করেছিলেন।[২২] এইভাবে দেশকে বিভক্ত করার কথা আরও অনেকে বিভিন্নভাবে বলেছিলেন। সেগুলির কয়েকটির উল্লেখ এখানে করা হল :

(১) জন ব্রাইট নামে একজন ইংরেজ উনবিংশ শতাব্দীতে সর্বপ্রথম দেশবিভাগের কথা বলেছিলেন। তাঁর প্রস্তাব ছিল আগরা, বোম্বাই, কলকাতা, লাহোর এবং মাদ্রাজকে রাজধানী করে পাঁচটি প্রায়-স্বাধীন প্রেসিডেন্সি গঠন করা। সেগুলি মোটামুটিভাবে স্বাধীন থাকবে, কারও সঙ্গে কারও যোগ থাকবে না এবং ব্রিটেনের দ্বারা নিয়ন্ত্রিত হবে।

(২) প্যান ইসলামী সৈয়দ আফগানী চেয়েছিলেন উত্তর-পশ্চিম ভারতবর্ষের মুসলমানপ্রধান অঞ্চল এবং তুর্কিস্থানের রাজ্যগুলিকে নিয়ে একটি সম্মিলিত রাষ্ট্র গঠন করা হোক।

(৩) উইফ্রেড সুইন ব্লান্ট বলেছিলেন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিতরে উত্তর ভারত মুসলিম রাষ্ট্র এবং দক্ষিণ ভারত মুসলিম রাষ্ট্র নামে দুটি স্বশাসিত রাষ্ট্র গঠন করতে।

(৪) আবদুল হালিম শারার ১৮৯০ সালে বলেছিলেন যে হিন্দু এবং মুসলমানরা যদি শান্তিতে এবং পরস্পরের প্রতি শ্রদ্ধা নিয়ে বাস করতে না পারে তবে উচিত কাজ হবে ভারতবর্ষকে হিন্দু ও মুসলমান প্রদেশে বিভক্ত করা এবং লোক বিনিময় করে নেওয়া।

(৫) স্তালিনও ১৯৩২ সালে ভারতবর্ষের বিভিন্ন জাতিগুলির ভিত্তিতে ভৌগোলিক সীমার পরিবর্তনের কথা বলেছিলেন। *

(৬) ১৯১৩ সালে মৌলানা মহম্মদ আলি উত্তর ভারতকে মুসলমানদের এবং ভারতবর্ষের অবশিষ্ট অংশকে হিন্দুদের দিয়ে দিতে বলেছিলেন।

(৭) মহম্মদ গুল খান নামে জনৈক পাঠান আগরা পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলে মুসলমানদের জন্য একটি স্বতন্ত্র মাতৃভূমি গঠনের কথা বলেছিলেন।

(৮) ১৯২৪ সালে লালা লাজপত রায় পাঞ্জাবকে বিভক্ত করে হিন্দু ও মুসলমানপ্রধান দুটি প্রদেশ গঠনের পরামর্শ দিয়েছিলেন।[২৫]

এই সমস্ত পরামর্শ এবং প্রস্তাবকে অতিক্রম করে ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ ভাগ্য নির্ণয়ে যে প্রস্তাবটি কার্যকর ভূমিকা নিয়েছিল সেটি হল মুসলিম লীগের দেশবিভাগের প্রস্তাব। ১৯৪০ সালের মার্চ মাসে লাহোর অধিবেশনে মুসলিম লীগ এই প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছিল। এই প্রস্তাবই 'পাকিস্তান প্রস্তাব' নামে পরিচিত। খালিকুজ্জমান মন্তব্য করেছেন যে এই প্রস্তাবটিতে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের কথা থাকলেও তাতে পাকিস্তান শব্দটি কোথাও ব্যবহার করা হয়নি। হিন্দু প্রেসগুলি একে পাকিস্তান প্রস্তাব বলে উল্লেখ করেছিল।[২৬] কথাটি অসঙ্গত নয়। তবে মুসলিম লীগ যে একটি অনুকূল অবস্থার সুযোগ নিয়ে এই প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছিল তাতে কোন সন্দেহ নেই।

---

* ভারতবর্ষের কমিউনিস্টরা জিন্নার পাকিস্তানের দাবি সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু ক্ষমতা যখন সত্যই হস্তান্তরিত হচ্ছিল তখন তাঁরা বলতে শুরু করেছিলেন যে দেশবিভাগ এবং ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস ব্রিটেনকে ভারতবর্ষের উপর তাদের নিয়ন্ত্রণ বজায় রাখতে সাহায্য করবে।[২৩] বস্তুত দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কংগ্রেসের বিরোধিতা করবার জন্য ইংরেজ সরকার কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নেয় এবং কমিউনিস্টদের নানাভাবে উৎসাহিত করে। ৭-৭-৪২ তারিখে আমেরি লিখেছিলেন : "আমার বিশ্বাস রায়কে (এম. এন. রায়) এবং কমিউনিস্ট ছাত্র, কৃষক অথবা শ্রমিক সংগঠনগুলিকে আরও বেশি উৎসাহ দেবার জন্য অনেক কিছু করা যেতে পারে। হতে পারে যে আজ যাঁদের আমরা উৎসাহ দিচ্ছি ভবিষ্যতে তাঁরা বিশ্বাসযোগ্য হবেন না। কিন্তু সরকারী (official) আচরণের সূর্যকিরণে তাঁদের ভাল দিকে পরিচালিত করা যায়।"[২৪]

দেশের স্বাধীনতার দাবির কাছে কিছুটা নতি স্বীকার করেই ব্রিটিশ সরকার ১৯৩৫-এর ভারত শাসন আইন প্রবর্তন করেছিল। সাধারণ নির্বাচনের পর ১৯৩৭ সালে বিভিন্ন প্রদেশে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের দ্বারা মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছিল। মাত্র দু বছর পরেই বিশ্বযুদ্ধ শুরু হয়ে যায়। সরকার ঘোষণা করে যে ফেডারেশন গঠনের প্রস্তাব আপাতত মুলতুবি থাকবে। সরকার মন্ত্রীসভাগুলির সঙ্গে পরামর্শ না করেই ভারতবর্ষকে যুদ্ধে অংশীদার করে নেয়। এর প্রতিবাদে দেশের অধিকাংশ প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত কংগ্রেসী মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করে। সেই সুযোগ গ্রহণ করে মুসলিম লীগ। জিন্না ২২-৩-৩৯ তারিখটিকে 'মুক্তি দিবস' বলে ঘোষণা করেন। এই দিনটি প্রতিপালনের মধ্য দিয়ে মুসলমানদের জন্য একটি আলাদা রাষ্ট্র গঠনের উদ্দেশ্যে মুসলিম সংহতি গড়ার চেষ্টা করা হয়। জিন্না লিনলিথগোকে জানান যে ভারতবর্ষের দুটি বৃহৎ সম্প্রদায়, হিন্দু এবং মুসলমান, তাদের সম্মতি ছাড়া সরকার যেন সংবিধান পরিবর্তনের কোন ঘোষণা না করেন। লিনলিথগো জিন্নার কথা মেনে নিয়ে তাঁকে জানিয়েছিলেন : "ভারতবর্ষের স্থায়িত্ব এবং সফলতার ক্ষেত্রে মুসলমানদের সন্তোষ বিধান সম্পর্কে হিন্দ ম্যাজিস্টিস গভর্নমেন্টের কোন রকম ভুল ধারণা নেই। সুতরাং আপনি ভয় পাবেন না।"[২৭] সরকারের এই মনোভাব সম্পর্কে খালিকুজ্জমান আরও স্পষ্ট কথা জানিয়েছেন : "দলিলপত্র থেকে এখন এটি স্পষ্ট হয়ে গিয়েছে যে পাকিস্তান প্রস্তাব গৃহীত হবার আগে মুসলিম লীগের পরবর্তী পদক্ষেপ কী হবে তা লিনলিথগো জানতেন। দুজন ব্রিটিশ কর্মচারীর সঙ্গে কথা বলার পর আমার ধারণা হয়েছিল যে তাঁরা ঐ ধরনের দাবির কোন রকম বিরোধিতা করবেন না। কেননা দাবিটি ছিল যে যারা ফেডারেশনের বিপক্ষে তাদের দিক থেকে কয়েকটি বিশেষ অঞ্চলকে ফেডারেশনের বাইরে রাখার দাবি হল গণতান্ত্রিক দাবি।"[২৮] বস্তুত এই অনুকূল পরিস্থিতির মধ্যেই মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের প্রস্তাব গৃহীত হয়েছিল।

প্রস্তাবটি উত্থাপন করেছিলেন ফজলুল হক। তত দিনে তিনি নিজের দল ভেঙে দিয়ে মুসলিম লীগে যোগদান করেছিলেন। বলা বাহুল্য তিনি তখন জিন্নার বিশ্বাসভাজনও হয়ে গিয়েছিলেন। পরে আবার তাঁদের সম্পর্ক ভেঙে যায়। যাই হোক, ফজলুল হকের উত্থাপিত প্রস্তাবে বলা হয়েছিল : "অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগ জোরের সঙ্গে এই কথা পুনরায় ঘোষণা করছে যে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে সন্নিবিষ্ট ফেডারেশন পরিকল্পনা দেশের বিশেষ অবস্থায় সম্পূর্ণরূপে অনুপযুক্ত এবং অযোগ্য। আর তাই মুসলিম ভারতের পক্ষে তা একেবারে গ্রহণযোগ্য নয়।" প্রস্তাবে এ কথাও বলা হয়েছিল : "নিম্নলিখিত মৌল ভিত্তির উপর রচিত না হলে কোন সাংবিধানিক পরিকল্পনাই মুসলমানদের কাছে গ্রহণযোগ্য হবে না—মুসলমানরা যেখানে সংখ্যাধিক্য এবং ভৌগোলিক দিক থেকে লাগোয়া যেসব জায়গায় তারা বসবাস করে সেই সব জায়গাকে কয়েকটি অঞ্চলে নির্দিষ্ট করতে হবে। এই ধরনের অঞ্চলগুলি হল ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম এবং পূর্বাঞ্চলের এলাকা। এই এলাকাগুলিকে নিয়ে কয়েকটি 'স্বাধীন রাষ্ট্র' (Independent States) গঠিত হবে এবং তাদের অন্তর্ভুক্ত সাংবিধানিক ইউনিটগুলি (constituent Units) স্বয়ংপূর্ণ ও সার্বভৌম হবে।...ভারতবর্ষের আর যেসব অংশে মুসলমানরা সংখ্যালঘু সেখানে তাঁদের পর্যাপ্ত, প্রকৃত এবং অবশ্য পালনীয় রক্ষণ-ব্যবস্থা সংবিধানে কার্যকরভাবে রাখতে হবে।"[২৯]

এখানে যেটি লক্ষ্য করার বিষয় তা হল এই যে মুসলিম লীগের দেশবিভাগের প্রস্তাবে

মুসলমানদের জন্য একাধিক স্বাধীন রাষ্ট্র (States) গঠনের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে দেশবিভাগ যখন প্রায় সুনিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল তখন লীগের দিল্লী অধিবেশনে মুসলমানদের জন্য একটিমাত্র রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়। সেজন্য বাংলার মুসলিম লীগের পক্ষ থেকে জিন্নাকে এই পরিবর্তনের কারণ জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল। জিন্না বলেছিলেন যে লাহোর প্রস্তাবে 'States' (একাধিক রাষ্ট্র) কথাটি ছাপার ভুল।[৩০] বাংলার লীগ সম্পাদক জিন্নার এই সাফাইতে সন্তুষ্ট হতে পারেননি। অনেকের মনেই তখন সন্দেহ জেগেছিল যে জিন্না চাতুরী করে 'স্টেটস' কথাটি লিখে পূর্বাঞ্চলের মুসলমানদের সমর্থন আদায় করেছিলেন এবং সময় বুঝে তা থেকে পিছিয়ে আসেন। তাঁদের মতে এটি কোন ভুল নয়, এটি হল শঠতা।

আন্বেদকর লাহোর প্রস্তাবটির মধ্যে কিছু দ্ব্যর্থবোধকতা লক্ষ্য করেছিলেন। তিনি প্রশ্ন তুলেছিলেন : (১) মুসলিম প্রদেশগুলি কি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র হবে, নাকি সেগুলি ফেডারেল অথবা এককেন্দ্রিক (federal or unitary) রাষ্ট্রে একটি সংবিধানের দ্বারা পরস্পর সম্বদ্ধিত থাকবে ? (২) 'কনসটিটিউয়েন্ট ইউনিট' (Constituent Unit) কথাটির মানে এই হয় যে তাতে ফেডারেশনের চিত্রটি ভাবা হয়েছে। তা যদি হয় তবে ইউনিটগুলি সম্পর্কে 'সার্বভৌম' কথাটি অর্থহীন হয়ে যায়।

বস্তুত লাহোর প্রস্তাব যখন উত্থাপন করা হয়েছিল তখন জিন্নার কাছেও পাকিস্তানের বা দেশবিভাগের কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। মাদ্রাজের রাজ্যপালের সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে জিন্না বলেছিলেন : "ভারতবর্ষকে চারটি অঞ্চলে ভাগ করা উচিত। সেই ভাগগুলি হল (ক) দ্রাবিড় স্থান, (খ) হিন্দুস্থান (বোম্বাই* এবং মধ্যপ্রদেশ), (গ) বেঙ্গলিস্থান (বাংলা ও অসম) এবং (ঘ) পাঞ্জাব, সিন্ধুপ্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ।"[৩১] পাকিস্তানের সজ্ঞার্থ নিয়ে জিন্না এবং নিজামুদ্দিন (নাজিমুদ্দিন)-এর মধ্যেও মতপার্থক্য ছিল। জিন্না বলেছিলেন : "পাকিস্তানের মর্যাদা (Status) হবে উপমহাদেশের ভিতর একটি স্বাধীন জাতি এবং একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। পক্ষান্তরে দেশবিভাগের প্রস্তাবটি গৃহীত হবার বেশ কিছু দিন পরেও নিজামুদ্দিন বলেছিলেন—এটি হবে সমান শর্তে ভারতীয় ফেডারেশনের অঙ্গ।"[৩২]

মুসলিম লীগের দেশবিভাগ প্রস্তাবের অস্পষ্টতা এবং তা নিয়ে প্রস্তাবটির প্রবক্তাদের মধ্যে এই জাতীয় বিভ্রান্তির একটি কারণ অনুমান করা যায়। মুসলিম লীগ চাইছিল সমগ্র ভারতবর্ষে মুসলমান সমাজের একমাত্র প্রাতিনিধিক সংস্থারূপে সর্বজনস্বীকৃত হতে। হিন্দু প্রাধান্য থেকে মুক্ত হবার দাবিই যে সাধারণ মুসলমানদের কাছে মুসলিম লীগকে গ্রহণীয় করে দিতে পারে সেকথা লীগের নেতারা বুঝতেন। সেই স্বীকৃতি বহুলাংশে অর্জন করতে তাঁরা সক্ষমও হয়েছিলেন। অন্য দিকে কংগ্রেসের ক্রমবর্ধমান শক্তিতে ইংরেজ সরকার ভয় পাচ্ছিল। সরকার বুঝতে পেরেছিল যে কংগ্রেসের শক্তিকে দুর্বল করতে এবং তাঁর অগ্রগতিকে বাধা দিতে হলে মুসলিম লীগকে এবং তার উত্থাপিত সাম্প্রদায়িক দাবিগুলিকে প্রশ্রয় দিতে হবে। আর চরম আঘাত হানতে হলে দেশবিভাগের কথাই লীগকে দিয়ে বলাতে হবে। খালিকুজ্জমানের কথা থেকে তো জানা গিয়েছে যে দেশবিভাগের প্রস্তাব উত্থাপিত হবার আগেই লিনলিথগো জানতেন যে কী হতে চলেছে। বাদশা খাঁর ছেলে ওয়ালি খাঁ জানিয়েছেন যে লাহোরে উত্থাপিত দেশবিভাগের দাবি তোলার প্রস্তাবটি

---

* বোম্বাই বলতে তখন মহারাষ্ট্র এবং গুজরাটকে বোঝাত।

লিনলিথগোর নির্দেশেই রচিত হয়েছিল। লাহোরে প্রস্তাবটি উত্থাপনের তারিখ ছিল ২৬শে মার্চ ১৯৪০। এর চোদ্দ দিন আগে অর্থাৎ ১২ই মার্চ লিনলিথগো ভারত সচিবকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন : "আমার নির্দেশে জাফুরুল্লা দুটি ডোমিনিয়ন রাষ্ট্র-এর বিষয় নিয়ে একটি স্মারকলিপি তৈরি করেছেন।...তিনিই যে এটি লিখেছেন তা যাতে কেউ জানতে না পারে সেজন্য তিনি বিশেষ আগ্রহী।...যদিও জাফুরুল্লা স্বীকার করবেন না যে তিনিই এটির রচয়িতা তা হলেও তাঁর দলিলটি মুসলিম লীগের দ্বারা গৃহীত হবার জন্যই রচিত হয়েছিল।" জাফরুল্লা খাঁ যে জন্য সতর্কতা অবলম্বন করতে চেয়েছিলেন তা হল এই যে তিনি ছিলেন কোয়াদিনী সম্প্রদায়ের লোক। মুসলমানরা যদি জানতে পারতেন যে পরিকল্পনাটি একজন কোয়াদিনী প্রস্তুত করেছেন তা হলে তাঁরা বিরক্ত হতেন।[৩৩]

জিন্নার মনের দ্বিধা-সংশয়ের পরিচয় অন্য সূত্র থেকেও দেখতে পাওয়া যায়। দেশবিভাগের প্রস্তাব গৃহীত হবার কয়েক বছর পরে ১৯৪৪ সালে গান্ধীজী যখন জিন্নার সঙ্গে এই বিষয়ে কথা বলেছিলেন তখন মুসলিম লীগের প্রস্তাবটি মেনে নিতে তাঁর অক্ষমতা জানিয়ে তিনি জিন্নাকে জিজ্ঞেস করেছিলেন যে প্রস্তাবটিতে পাকিস্তান শব্দটি ব্যবহার করা হয়নি। তা হলে কি পাঞ্জাব, আফগানিস্তান, কাশ্মীর, সিন্ধু এবং বেলুচিস্তান—এই জায়গাগুলির আদ্যাক্ষর নিয়ে পাকিস্তান শব্দটি স্মৃতিসহায়করূপে সৃষ্টি করা হয়েছে? উত্তরে জিন্না জানিয়েছিলেন : "হ্যাঁ, প্রস্তাবে পাকিস্তান কথাটির উল্লেখ করা হয়নি এবং এটি কোন মৌলিক (original) অর্থ বহন করছে না। শব্দটি লাহোর প্রস্তাবের সমার্থবোধক হয়ে গিয়েছে।"[৩৪] গান্ধীজীর প্রশ্নের উত্তরে জিন্না এ কথাও স্পষ্ট করে দিয়েছিলেন যে দুটি অঞ্চলের উপাদানগুলি (constituents) পাকিস্তানের ইউনিট রূপে গঠিত হবে। পাকিস্তানের লক্ষ্য প্যান-ইসলাম কি না গান্ধীজীর এই প্রশ্নের উত্তর জিন্না দেননি। প্রস্তাবে উল্লেখিত 'মুসলিম' শব্দটির অন্তর্নিহিত অর্থ কী, তার দ্বারা ভূগোলে অবস্থিত ভারতবর্ষের মুসলমানদের বোঝাচ্ছেন, নাকি ভবিষ্যতের পাকিস্তানের মুসলমানদের বোঝাচ্ছেন, এই প্রশ্নের উত্তরও জিন্না দেননি।

সে কথা থাক। দেশবিভাগের প্রস্তাব উত্থাপন করে ফজলুল হক যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তাতে পাঞ্জাব এবং বাংলায় সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা নিরাপদ নন এ কথা যেমন তিনি বলেছিলেন তেমনি যে প্রদেশগুলি মুসলিম রাষ্ট্রের অন্তর্ভুক্ত হবে না. সেখানকার মুসলমানদের কথা বলতেও তিনি ভোলেননি। তিনি বলেছিলেন : "কোন সংবিধান যদি তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হয় তবে তারা সেটিকে সম্পূর্ণরূপে অকেজো করে দেবে।...মুসলিম জনসাধারণের এই অসম বণ্টনের কোন সন্তোষজনক মীমাংসা যতক্ষণ না হচ্ছে ততক্ষণ পর্যন্ত সাংবিধানিক অগ্রগতি অথবা অভয়পত্রের (safeguard) কথা বলা অর্থহীন। কেন না এগুলি সবই হল মরীচিকা।" প্রস্তাবটি সমর্থন করতে গিয়ে খালিকুজ্জমান বলেছিলেন : "ভারতীয়দের শোষণ করবার জন্য (ইংরেজরা) ভারতবাসীদের একটি জাতি বলে বর্ণনা করেছিল এবং সংখ্যাগুরু-সংখ্যালঘুর প্রশ্ন তুলেছিল।...বিচ্ছেদের দাবি হল সেইসব মুসলমানদের কাজের পরিণতি যাঁরা বিরোধী সংগঠন খাড়া করে অথবা কংগ্রেসে কিংবা অন্য অ-মুসলমান রাজনৈতিক দলে যোগদান করে সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করতে চেয়েছেন।"[৩৫]

ফজলুল হক এবং খালিকুজ্জমানের বক্তৃতাদুটি বিশ্লেষণ করলে যে সত্য উপলব্ধ হয় তা হল এই যে তাঁরা যে ভাঙনের জয়গান গেয়েছিলেন তাতে যুক্তির চেয়ে ক্ষোভের প্রাধান্য ছিল। ফজলুল হক লোক বিনিময়ের কথা স্পষ্ট করে বলেননি। কিন্তু বিভক্ত ভারতবর্ষে

সংখ্যালঘু মুসলমানদের অভয়পত্র যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের উপরেই নির্ভরশীল থাকে তবে সেই নির্ভরতা অবিভক্ত ভারতবর্ষের মুসলমানদের ক্ষেত্রে কেন প্রযোজ্য হতে পারে না তার কোন যুক্তিগ্রাহ্য ব্যাখ্যা ফজলুল হক উপস্থিত করেননি। আর বিচ্ছেদের দাবির যৌক্তিকতা যদি খালিকুজ্জমানের কথামতো সব মুসলমানের মুসলিম লীগে যোগদান না করা হয়ে থাকে তবে এত দিন ধরে যে হিন্দু শাসনের ভয় দেখান হচ্ছিল তার যৌক্তিকতা হারিয়ে যায়। বস্তুত দেশবিভাগের মধ্যে ধর্মের জিগির যতই তোলা হোক না কেন এ আসলে ছিল নেতৃত্বের সংঘাতকে ইংরেজের স্বার্থসিদ্ধির হাতিয়ারে পরিণত করার প্রয়াস। প্রকৃত ধর্মের সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক ছিল না। তাই মৌলানা আজাদ কেবল রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দিক থেকেই এর বিরোধিতা করেননি, উপরন্তু ধর্মের নীতিগত কারণেও তিনি এর বিরোধিতা করেছিলেন। যেহেতু দেশবিভাগের প্রস্তাব ঐক্য এবং সংহতির পরিবর্তে বিভাজনের উপরেই গুরুত্ব দিয়েছিল সেইহেতু এটিকে তাঁর ইসলামের মূল নীতির পরিপন্থী বলে মনে হয়েছিল।[৩৬]

অনেকে অনেকভাবেই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করেছিলেন। এক পত্রলেখকের প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী লিখেছিলেন: "জাতির প্রতিটি উপাংশ যদি নিজেদের জন্য আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দাবি করতে থাকে তা হলে স্বাধীনতা থাকবে না। আমি বলেছি যে পাকিস্তান অসত্য এবং তা টিকবে না। এর প্রণেতারা যখন এটিকে কার্যান্বিত করতে যাবেন তখন দেখবেন যে এটি বাস্তবসম্মত নয়।"[৩৭] জমায়েত-উল-উলেমা এবং আজাদ মুসলিম বোর্ড-এর মতো কয়েকটি মুসলিম সংগঠন আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মেনে নিয়েও দেশবিভাগের বিরোধিতা করেছিল।[৩৮] হিন্দু মহাসভা ১০-৫-৪২ তারিখে পাকিস্তান বিরোধী এবং সারা ভারত স্বাধীনতা দিবস উদযাপন করে। সেদিন তারা যে-প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল তাতে বলা হয়েছিল: "আমরা অর্থাৎ হিন্দুরা আজ এই পবিত্র শপথ গ্রহণ করছি যে একটি সংহত জাতি ও কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্ররূপে হিন্দুস্থানের ঐক্য ভেঙে দিয়ে একটি স্বতন্ত্র পাকিস্তান ফেডারেশন গঠনের জন্য মুসলমানদের যে কোন প্রচেষ্টাকে আমরা বাধা দেব।"[৩৯] পক্ষান্তরে, পাকিস্তানের দাবির জোরদার সমর্থন করেও ভারতবর্ষের প্রতি ভালবাসার কথা বলেছিলেন মুসলিম লীগ নেতা আবদুর রহমান সিদ্দিকি। তিনি বলেছিলেন যে একজন হিন্দু মারা গেলে তার দেহ পোড়ান হয় এবং ভস্ম নদীতে নিক্ষেপ করা হয়। ঈশ্বরই জানেন যে জলে প্রবাহিত হয়ে তা কোথায় যায়। কিন্তু একজন মুসলমান মারা গেলে তার দেহের জন্য ছ ফুট গুণীতক তিন ফুট সুন্দর ভারতবর্ষের মাটির প্রয়োজন হয়—জনমে এবং মরণে সে এই দেশেই বিরাজ করে।"[৪০]

মুসলিম লীগের অধিবেশনে দেশবিভাগের প্রস্তাব গৃহীত হবার কয়েক দিন পরেই (এপ্রিল ১৯৪০) দিল্লীতে মুসলিম সংস্থাগুলির প্রতিনিধিদের একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। তাতে আহরার, জমায়েত-উল-উলেমা-ই-হিন্দ, শিয়া রাজনৈতিক সম্মেলনের নেতারা যোগদান করেছিলেন। কংগ্রেসের কয়েকজন মুসলমান নেতাও তাতে যোগ দিয়েছিলেন। সম্মেলনের নাম দেওয়া হয়েছিল আজাদ মুসলিম সম্মেলন। মুসলিম লীগের এবং খাকসারদের কোন প্রতিনিধি এই সম্মেলনে যোগ দেননি। সম্মেলনে সভাপতিত্ব করেছিলেন সিন্ধুপ্রদেশের মুখ্যমন্ত্রী আল্লা বক্স। সম্মেলনে উপস্থিত প্রতিনিধিরা পাকিস্তানের ধারণার প্রতিবাদ করেন। এবং দেশে কোন রকম রাজনৈতিক তৎপরতা না করার অজুহাতরূপে মুসলমানদের ব্যবহার করার যে প্রচেষ্টা চলছিল তার প্রতিবাদ করেন।

মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবি যে কংগ্রেসের ভুল নীতি অনুসরণের পরিণাম এমন কথা বলেছিলেন চিমনলাল শীতলদের মতো আইনজীবী। তিনি বলেছিলেন: "পাকিস্তান আন্দোলনের প্রকৃত জনক পাওয়া যাবে কংগ্রেসের মধ্যে। সাম্প্রদায়িকতার প্রশ্নটিকে কংগ্রেস যে ভুল নীতির দ্বারা চালিত করেছে এবং তারা যখন ক্ষমতায় ছিল তখন তাদের আচরণ যেমন ছিল তারই ফলে মুসলমান সম্প্রদায়ের মধ্যে প্রচণ্ড অবিশ্বাস জাগ্রত হয়েছে। এই অবিশ্বাসই তাদের পাকিস্তানের দাবির দিকে টেনে নিয়ে গিয়েছে।"[৪১] কংগ্রেস ভুল করেছে এই মন্তব্য চিমনলাল করেছিলেন। জিন্নাও সেকথা বলতেন। কিন্তু সঠিক পন্থা কী তার কোন নির্দেশ চিমনলাল দেননি। মনে করা যেতে পারে যে তিনি হয়তো জিন্নার সুরে সুর মিলিয়ে মুসলিম লীগকেই মুসলমানদের একমাত্র প্রাতিনিধিক সংগঠন রূপে মেনে নেবার ঔচিত্য স্বীকার করতেন। কংগ্রেস যদি এটা মেনেও নিত তা হলেও কি মুসলিম লীগের সাম্প্রদায়িক চরিত্রের কোন রকম পরিবর্তন হত? হয়তো তাতে মুসলিম লীগের আক্রমণাত্মক মনোভাব স্তিমিত হত। অথবা এ কথাও ভাবা যায় যে চিমনলাল কংগ্রেসের মন্ত্রীসভা ভেঙে দেবার বিষয়টিই উল্লেখ করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু মুসলিম লীগ নিজেকে গুছিয়ে নেবার সুযোগ পাবে এই ভয়ে কংগ্রেস যদি তার সংগ্রামী সত্তাকে জলাঞ্জলি দিত তা হলে কি স্বাধীনতার পথ থেকে কংগ্রেস দেশকে দূরে সরিয়ে ত না? বস্তুত এই দুটি বিষয়ে কংগ্রেসের বক্তব্য স্পষ্ট ছিল। ১৯৪৭ সালে কংগ্রেস যেভাবে চরিত্রভ্রষ্ট হয়েছিল ১৯৪০-৪২ সালে তা তার পক্ষে সম্ভব ছিল না।

প্রকৃতপক্ষে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা, আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের যে প্রস্তাব এবং পরিকল্পনা বিভিন্ন মানুষের কাছ থেকে উত্থাপিত হয়ে আসছিল তার পিছনে এই বিশ্বাস ছিল যে এইসব কিছুই হবে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের মধ্যে অবস্থান করে। পূর্ণ স্বাধীনতার সঙ্গে এইসব প্রস্তাবের কোন সম্পর্ক ছিল না। মুসলিম লীগ তার জন্য কোন সক্রিয় কর্মসূচি অনুসরণ করেনি। শীতলবাদের মতো উদারপন্থী ও বুদ্ধিজীবীরাও কোনভাবে নিজেদের স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত করেননি। একমাত্র কংগ্রেসই এই কাজে সক্রিয় ছিল। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলার সময় গান্ধীজী 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন শুরু করেছিলেন। প্রাদেশিক মন্ত্রীসভাগুলি থেকে কংগ্রেস পদত্যাগ করায় সরকার কিছুটা বিব্রত হয়েছিল। তার ফলে দেশে একটি শূন্যতাও সৃষ্টি হয়েছিল। মুসলিম লীগ এই সুযোগটির সদ্ব্যবহার করে। তারা সরকারের কাছে হাত বাড়িয়ে দেয়। সরকার তা সাগ্রহে গ্রহণ করে। লীগকে তারা কংগ্রেসের প্রতিষেধকরূপে ব্যবহার করতে এগিয়ে আসে। বস্তুত কংগ্রেসের অধিবেশনে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হবার আগেই, গান্ধীজী যখন এককভাবে এই দাবি তুলছিলেন সেই সময় মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের গভর্নর স্যার এইচ টোয়ামেন লিনলিথগোকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন (২-৬-৪২): "নাজিমুদ্দিন আমাকে জিজ্ঞেস করছিলেন যে কংগ্রেস যদি গণ আন্দোলন শুরু করে দেয় তা হলে হিন্দুদের দমিত করবার জন্য মুসলমানদের ব্যবহার করা যাবে কি না। আমি তাঁর এই কথায় হেসেছিলাম এবং বলেছিলাম যে তা সম্ভব নয়।* এর পরে তিনি আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করেছিলেন। তিনি ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন যে ঐ কথাটি আমি আপনাকে জানাই। বিষয়টি কিছু গুরুত্বপূর্ণ। তিনি বলেছিলেন যে যেহেতু

---

* 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের সময় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হয়নি এবং সাধারণভাবে মুসলমানরা কংগ্রেসের সক্রিয় বিরোধিতা করেননি।[৪২]

আমেরিকায় আমাদের প্রতিনিধিরা সবাই হিন্দু সেইহেতু সেখানে মুসলমানদের দাবি অবহেলার মধ্য দিয়ে বিবেচিত হয়ে থাকে।"[৪৩] কিন্তু এই পরিস্থিতিরও পরিবর্তন হয়ে যায়। বিয়াল্লিশের আন্দোলনের তীব্রতা জিন্নার মনেও আলোড়ন সৃষ্টি করেছিল। যুদ্ধে ব্রিটিশের সঙ্গীণ অবস্থাও জিন্নাকে নতুন ভাবনায় ভাবিত করেছিল। সাম্প্রদায়িকতার শিখরে আরোহণ করে ১৯৪৩ সালে মুসলিম লীগের করাচি অধিবেশনে জিন্না তাঁর দাবির মাত্রায় স্বাধীনতাকে যুক্ত করে দেন। তিনি নতুন জিগির তোলেন—'ভাগ করো এবং ভাগো' (Devide and Quit)।[৪৪]

যুদ্ধাবসান : বন্দরের কাল হল শেষ

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ ইংরেজ সাম্রাজ্যের কাছে এক ভয়াবহ অভিশাপরূপে উপস্থিত হয়েছিল। যুদ্ধে প্রাণহানি এবং অন্য ক্ষয়ক্ষতি তো হবেই। যুদ্ধে জড়িয়ে পড়া যে কোন দেশের কাছেই তা অনিবার্য। কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজকে আরও কিছু বেশি হারাতে হয়েছিল। সেটি হল তাদের সাম্রাজ্য বজায় রাখার শক্তি। ইংরেজ শাসকগোষ্ঠীর মন থেকে সাম্রাজ্যবাদীর মানসিকতা দূর হয়নি ঠিকই, কিন্তু যুদ্ধে জিতেও তাদের যে-পরিমাণ শক্তি হ্রাস হয়েছিল এবং ভারতবর্ষে স্বাধীনতার দাবি যেভাবে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল তাতে তারা বুঝতে পেরেছিল যে সাম্রাজ্যের অধিকার নিয়ে তারা আর ভারতবর্ষকে দাবিয়ে রাখতে পারবে না। ভাগ করো আর শাসন করোর নীতি অনুসরণ করে তারা ঠিকই লাভবান হয়েছিল। যে সুফল তারা লাভ করেছিল এবার তাকেই আহরণ করার সময় সমাগত। চলে তো যেতেই হবে ; প্রশ্ন ছিল তাদের কাছে কী দিয়ে যাব আর কী নিয়ে যাব। গান্ধীজী ইংরেজকে ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যেতে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন, ভারতবর্ষকে ঈশ্বরের হাতে ছেড়ে দিয়ে তোমরা বিদায় হও, যদি একে বেশি বলে মনে হয় তা হলে ভারতবর্ষকে অন্তত অরাজকতার মধ্যেই রেখে, দোহাই তোমাদের এ দেশ ছেড়ে চলে যাও। গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন যে ইংরেজরা চলে গেলে ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান নিজেরাই তাদের সমস্যার সমাধান করে নেবে। এই ভয় ভারতসচিব আমেরির মনেও ছিল। তিনি ৮-২-৪৩ তারিখে লিখেছিলেন : "আমরা যদি তাদের পথ থেকে সরে আসি তবে ভারতবাসীরা ঐকমত্যে আসতে পারবে গান্ধীজীর এই যুক্তির মধ্যে কিছু সত্য আছে।"[৪৫] জিন্নাও মনে মনে এই কথা জানতেন। তাই ইংরেজদের চলে যাওয়া যখন আসন্ন হয়ে উঠেছিল তখন তিনি নতুন ধ্বনি দিয়েছিলেন দেশটাকে ভাগ করে দিয়ে তবে তোমরা যাও। এতকাল ইংরেজদের চলে যাবার কথা জিন্না কখনই বলেননি। এবার যে দাবি তিনি তোলেন তা সাম্রাজ্যবাদীকে হুঁসিয়ারী দেওয়া নয়, তা ছিল তাদের কাছে তাঁর কাতর আবেদন। হতে পারে যে জিন্নার মনে এই ভয় হয়েছিল যে ইংরেজরা যদি দেশকে ভাগ না করেই চলে যায় তা হলে হিন্দুরা সমগ্র ভারতবর্ষে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে মুসলমানদের উপর প্রভুত্ব করে যাবে। তাই যাবার আগে তাদের অনুগত মুসলমানদের হয়ে তিনি ইংরেজদের কাছে দেশভাগের আবেদন করেছিলেন। কারণ যাই হোক এটি স্পষ্ট যে সেদিন আন্দোলন নয় আবেদনই ছিল জিন্নার একমাত্র অস্ত্র। জিন্নার এই কাতরতার কথা উল্লেখ করেছেন বেভারিল নিকলস তাঁর কুখ্যাত 'ভারডিকট অফ ইন্ডিয়া' বইটিতে। বইটিতে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের কুরুচিপূর্ণ সমালোচনা করা হয়েছে। তাতে তিনি লিখেছেন : "পাকিস্তানের সমস্যা নিয়ে আমাদের মধ্যে আলোচনা শুরু করার

আগে জিন্না (জিন্নাকে তিনি এশিয়ার সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি বলে মনে করেছিলেন—ভ. প্র. চ.) আমাকে বলেছিলেন 'ব্রিটিশদের এটি বুঝে নেওয়া উচিত যে এ দেশে তাদের একটিও বন্ধু নেই। একজনও নেই।' একজন হিন্দু রাজনীতিক এই কথাগুলি বলতেন চিৎকার করে এবং বেশ আনন্দের সঙ্গে। জিন্না কথাগুলি বলেছিলেন শান্তভাবে এবং বেদনার সঙ্গে।"[৪৬]

বন্ধুহীন ভারতবর্ষে আর বেশি দিন রাজত্ব করা যাবে না এ কথা ইংরেজরা যুদ্ধের মধ্যেই বুঝতে শুরু করেছিলেন। যুদ্ধ শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তা আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। ১৯৪৭ সালের ৩রা মার্চ স্যার স্ট্যাফোর্ড ক্রিপস ব্রিটিশ পার্লামেন্টকে জানান যে তাঁদের সামনে দুটি বিকল্প আছে। একটি হল যথেষ্ট সংখ্যক সৈন্য পাঠিয়ে ভারতবর্ষের উপর সরাসরি কর্তৃত্ব করা এবং অপরটি হল যতটা সম্ভব ভাল শর্তে রাজনৈতিক ক্ষমতার হস্তান্তর করা। প্রথম বিকল্পটি হল অসম্ভব। কেন না ক্রিপসের ভাষায় 'এইভাবে কার্যকর করার ক্ষমতা আমাদের নেই'। ঐ বছরেই 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডেন' সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখেছিল : "ব্রিটিশদের কাজকর্ম উচ্চ নীতিভিত্তিক ছিল, নাকি ঝড় ওঠবার আগেই প্রত্যাবর্তনের মহান ইচ্ছা কার্যকর হয়েছিল তা প্রমাণ করা শক্ত।" লন্ডনের 'ডেলি মেল' লিখেছিল যে ভারতবর্ষকে দমিয়ে রাখতে পাঁচ লক্ষ সৈন্য প্রয়োজন, কিন্তু দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের পর সেই অবস্থা ছিল না।[৪৭]

বস্তুত ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়টি যতই অনিবার্য হয়ে উঠছিল শাসকদের মানসিকতা ততই আপন স্বার্থসিদ্ধির পথ অনুসন্ধানে ব্যাগ্র হয়ে উঠছিল। ক্রিপসের কথা 'ভাল শর্তে ক্ষমতা হস্তান্তর' এই মনোভাবের পরিচায়ক। পাকিস্তান গঠনের মাধ্যমে ভারতবর্ষের 'জাতিগত' সমস্যার সমাধান হবে কি না তা নিয়ে ইংরেজদের মাথা ব্যথা ছিল না। তাঁরা বুঝতে পেরেছিলেন যে ভারতবর্ষকে মুক্ত করবার শ্রেষ্ঠ শর্ত হল দেশকে ভাগ করা। ব্রিটিশ রাজ্যের অবসান হোক এ জিনিস উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ অফিসাররা চাননি। তাই মন-ভোলানো কিছু দিয়ে ব্রিটিশ প্রভুত্ব বজায় রাখার সম্ভাব্য সব রকম কলা-কৌশলই তাঁরা উপস্থিত করছিলেন। ব্রিটিশ সিভিল সার্ভেন্টের অধিকাংশই যে মুসলমানদের প্রতি সদয় ছিলেন তাতেও কোন সংশয় ছিল না।[৪৮]

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় হল এই যে স্বাধীনতার কথাবার্তা এবং তার শর্তরূপে পাকিস্তান গঠনের প্রস্তাব বারে বারে আলোচিত হতে থাকলেও তার জন্য কোন রকম পূর্ব প্রস্তুতি করা হয়নি। ১৯৪৬ সালে স্যার ফ্রান্সিস টকার ভারতবর্ষে ব্রিটিশ সেনাবাহিনীর একজন উচ্চপদস্থ অফিসার ছিলেন। তিনি কর্তৃপক্ষকে জানিয়েছিলেন যে ভারতবর্ষকে যদি স্বাধীনতা তাড়াতাড়ি দিতেই হয় তবে দেশবিভাগ অনিবার্য। আর তাই এই অবশ্যম্ভাবী ঘটনার জন্য আগে থেকে কিছু প্রস্তুতি নেওয়া দরকার। দিল্লীস্থ যুদ্ধ বিভাগের সচিব আমব্রস ডাড্ডাস ৯-৪-৪৬ তারিখে তাঁকে জানিয়েছিলেন : "দেশরক্ষা—হিন্দুস্থান ও পাকিস্তান সম্পর্কে আপনার লেখা খুবই আকর্ষক। এটি খুবই বাস্তবসম্মত। কিন্তু অনুভূতি অথবা আত্মপ্রকাশের স্বার্থে বাস্তব অবস্থার উপর কতটা গুরুত্ব দেওয়া হবে এবং কতটা অবহেলা করা হবে তা আপনার এবং আমার হাতের বাইরে।"[৪৯] বস্তুত রাজনৈতিক লাভ-ক্ষতিই যেখানে প্রধান বিবেচ্য বিষয় সেখানে বাস্তব অবস্থা অথবা রক্তক্ষয় কোনটিই সেদিন ইংরেজ শাসকদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হয়ে ওঠেনি।

সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন মুসলমানদের তুষ্ট করার প্রয়াসের পিছনে সরকারের অবশ্যই একটি যুক্তি ছিল। ভাইসরয় মনে করেছিলেন যে শাসন চালাবার জন্য মুসলমানদের

সমর্থন আদায় করা একান্ত আবশ্যক। কেন না সেনাবাহিনীর শতকরা ষাট ভাগ লোক মুসলমান সমাজ থেকেই আসত।[৫০] এই দৃষ্টিভঙ্গী থেকেই চার্চিল মাউন্টবেটেনকে বলেছিলেন : "আমি তোমাকে একটি কথা বলে দিতে চাই।...যে কোন ব্যবস্থাই তুমি করো না কেন তুমি অবশ্যই দেখো যেন কোন মুসলমানের একটি চুলেরও ক্ষতি না হয়।"[৫১] চার্চিল মাউন্টবেটেনকে এই কথা তখনই বলেছিলেন যখন ক্ষমতা হস্তান্তরের সিদ্ধান্ত পাকা হয়ে গিয়েছিল, কেবল সমস্যা ছিল কীভাবে তা করা যাবে। পাকিস্তান যে গঠিত হতে যাচ্ছে এই সিদ্ধান্তও তখন নিয়ে নেওয়া হয়েছিল। কংগ্রেস শাসিত স্বাধীন ভারতকে চার্চিলের মতো ইংরেজরা বিশ্বাস করতে পারেনি। পাকিস্তানের প্রতিবেশী রাশিয়াও ছিল ইংলন্ডের শত্রু দেশ। তাই স্বাধীন পাকিস্তান যাতে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে থাকে এই আগ্রহ ইংরেজদের মনে ছিল। ২০-১০-৪৮ তারিখে পাঞ্জাবের গভর্নর খালিকুজ্জমানকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন যে রাশিয়া এবং ভারতের আক্রমণ থেকে বাঁচার জন্য পাকিস্তানের কমনওয়েলথে থেকে যাওয়া উচিত। ভারত দুর্বল দেশ। তাই রাশিয়া এখন সেখানে শক্তি কেন্দ্রীভূত করছে।[৫২] এটি অবশ্য অনেক পরের কথা। কিন্তু জিন্নাকে এবং মুসলিম লীগকে কাছে টানার প্রয়াস সরকার অনেক দিন আগে থেকেই করে আসছিল। যুদ্ধাবসানে তা আরও তীব্র হয়ে ওঠে। লিনলিথগো শাসন সংস্কারের বিষয় নিয়ে গান্ধীজীকে যেমন ডেকেছিলেন তেমনি জিন্নাকেও তিনি আহ্বান করেছিলেন। এর ফলে মুসলমান সমাজের কাছে জিন্নার মর্যাদা অনেক বেড়ে গিয়েছিল। জিন্না নিজেই এ সম্পর্কে বলেছেন : "যুদ্ধের পর...(ইংরেজদের) আমার প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীর হঠাৎ পরিবর্তন হয়ে যায়। মিঃ গান্ধীর সঙ্গে একই ভূমিকায় আমার প্রতি আচরণ করা হয়। আমার কেন উত্তরণ হল এবং মিঃ গান্ধীর পাশাপাশি কেন আমাকে স্থান দেওয়া হল তা ভেবে আমি বিস্ময়াভিভূত হই।"[৫৩]

১৯৪০ সালে কংগ্রেস গান্ধীজীর পরামর্শ অগ্রাহ্য করে কয়েকটি শর্তে যুদ্ধে সাহায্য করার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল। এর পরেই ঐ বছর আগস্ট মাসে লিনলিথগো ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের পক্ষে একটি ঘোষণা করেন। এই ঘোষণা 'আগস্ট দান' (August offer) নামে পরিচিত। আমেরি এটির খসড়া তৈরি করেছিলেন। লিনলিথগো এটির সংশোধন করেছিলেন। এতে বলা হয়েছিল : "যে কোন পরিবর্তনে সংখ্যালঘুদের মতামতের উপর যথেষ্ট গুরুত্ব দেওয়া হিজ ম্যাজেস্টিস গভর্নমেন্টের লক্ষ্য।...এ কথা বলার অবকাশ রাখে না যে গভর্নমেন্ট ভারতবর্ষের শান্তি এবং সমৃদ্ধির কথা বিবেচনা করে এমন একটি ব্যবস্থার কাছে তাদের বর্তমান দায়িত্ব হস্তান্তর করতে পারে না যে ব্যবস্থাটিকে ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের একটি বড় এবং শক্তিশালী অংশ অস্বীকার করে।"[৫৪] এটি যে পক্ষান্তরে জিন্নাকেই 'ভেটো' দেওয়া তা সহজেই বুঝতে পারা যায়।

বস্তুত যুদ্ধ বাধার পর লিনলিথগো যখন দেখেন যে কংগ্রেসকে বাগে আনা যাচ্ছে না তখন তিনি মুসলিম লীগের দিকে হাত বাড়িয়ে দেন। রামগড় কংগ্রেসে আইন অমান্য করার কথা আলোচিত হয়েছিল। তাতেই সরকার মুসলিম লীগকে কাছে টেনে আনে। ৯-৪-৪০ তারিখে জিন্নাকে এই আশ্বাস দেওয়া হয় যে মুসলমানদের বিনা সম্মতিতে কোন সংবিধান ভারতবর্ষের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে না।[৫৫]

এমন কথা কেন তাঁরা বলেছিলেন তা বোঝা যায়। জিন্নার প্রতি ইংরেজদের প্রথমাবধি ভরসা ছিল। চার্চিল প্রমুখ রক্ষণশীল দলের নেতারা তো মনে করতেন যে মুসলমানদের জন্য যদি একটি নতুন রাষ্ট্র গঠন করে দেওয়া যায় তা হলে ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে এলেও

একটি পদবিক্ষেপের স্থান তাঁদের থাকে। এই আলোচনা উপরে করা হয়েছে। ওয়াভেল যখন সিমলা কনফারেন্সে তাঁর পরিকল্পনা উপস্থিত করেন তখন অন্য বিষয় ছাড়াও ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের সদস্য কারা হবেন তা নিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে মুসলিম লীগের মতপার্থক্য দেখা দিয়েছিল। জিন্না তখন ভাইসরয়কে বলেছিলেন : "আমি আমার শেষ সীমায় পৌঁছিয়ে গিয়েছি। আমার অনুরোধ আপনি লীগকে ধ্বংস করে দেবেন না।" আবার উভয় পক্ষের সম্মতি আদায় করতে না পেরে ওয়াভেল যখন নিজেই নামের তালিকা প্রস্তুত করছিলেন তখন অনেক ব্রিটিশ অফিসার ওয়াভেলকে মুসলিম লীগের মতো বন্ধুকে হারাতে বারণ করেছিলেন।[৫৬] গভর্নর ক্লাউ স্বীকার করেছিলেন যে পাকিস্তানের ধারণাটি পুষ্ট করতে তাঁরা সাহায্য করেছেন। কেননা পাকিস্তান বলতে জিন্না কী বোঝেন সেকথা তাঁকে জিজ্ঞাসা না করেই তাঁরা এটিকে ১৯৪২-এর সাংবিধানিক পরিকল্পনায় স্বীকার করে নিয়েছিলেন।[৫৭] আর কেবল রক্ষণশীল দলের লোকেরাই নন এমনকি শ্রমিক দলের নেতা এটলিও জানতে চেয়েছিলেন যে ভারতবর্ষ ডোমিনিয়ন স্টেটাস লাভ করলে সেখানে ব্রিটিশ সৈনিকরা কীভাবে অবস্থান করবে? এই প্রশ্ন তিনি ১৯৪৫ সালে করেছিলেন। পরে অবশ্যই তাঁর মতির পরিবর্তন হয়েছিল। কিন্তু যুদ্ধের অব্যবহিত পরেও তাঁর মনে হয়েছিল যে পূর্ণ স্বাধীনতা নয়, কিছু সুযোগ-সুবিধা দিয়ে আর সংস্কার সাধন করে ভারতবর্ষকে সন্তুষ্ট করা যাবে। তাই ভারতবর্ষে অবস্থিত ব্রিটিশ সৈনিকদের সম্পর্কে তাঁর মনে প্রশ্ন উত্থিত হয়েছিল। আমেরি তো বলেছিলেন যে ব্রিটিশ সৈনিকরা স্থানীয় মেয়েদের সঙ্গে পরিণয়সূত্রে আবদ্ধ হোক।[৫৮] তার ফলে ইংরেজদের ভারতবর্ষে বসবাস করবার একটি কারণ খুঁজে পাওয়া যাবে এবং ইংরেজদের প্রতি ভারতবাসীদের সাধারণভাবে মনোভাবেরও পরিবর্তন হবে।

জিন্নার উপর শাসকগোষ্ঠীরা যে ভরসা করতেন তার প্রমাণ পাওয়া যায় মধ্যপ্রদেশ ও বেরারের গভর্নর স্যার এইচ টোয়ামেন (Twyman)-এর ওয়াভেলকে লেখা একটি চিঠি থেকে। চিঠিটি তারিখবিহীন। তবে অনুমান করা যায় যে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ হবার পর ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যখন ভারতবর্ষের স্বাধীনতা নিয়ে নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করতে যাচ্ছিলেন সেই সময় লেখা। তিনি লিখেছিলেন : "যদিও দেখা যায় যে পাকিস্তানের দাবি আগের চেয়ে বেশি পরিষ্কার ও সুনির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছে তা হলেও আমার মনে হয় যে জিন্না তাঁর বক্তব্য সম্পর্কে অকপট এবং কংগ্রেস যদি তার গোঁ ত্যাগ করে তবে তিনি মীমাংসায় আসতে প্রস্তুত। আমার তো মনে হয় না যে যখন উভয় পক্ষই 'জটিলতা থেকে মুক্ত' হবার জন্য অগ্রসর হবে তখন জিন্নার পরিবর্তে গান্ধীর সঙ্গে আলোচনা করলে ভাল ফল পাওয়া যাবে। এইভাবে চেষ্টা করলে কংগ্রেসের শুভবুদ্ধি তাড়াতাড়ি ফিরে আসবে, যা অন্য কোনভাবে আসবে না। কংগ্রেসের রেকর্ড খারাপ। অন্য দিকে লীগের রেকর্ড বেশ ভালই। এ থেকে আমার কথার যাথার্থ্য বোঝা যাবে।"[৫৯]

এই গভর্নরই ১৯৪৪ সালে আর একটি চিঠিতে ওয়াভেলকে গান্ধীজী এবং কংগ্রেস সম্পর্কে সতর্ক করে দিয়েছিলেন : "আমি মনে করি যে কংগ্রেসের নেতৃত্ব করার মতো যথেষ্ট শক্তি (গান্ধীজীর শারীরিক অবস্থাকে লক্ষ্য করে বলা হয়েছিল—ভ. প্র. চ.) অর্জন করে নিতে পারবেন না। গান্ধী যদি মরে যান তা হলে আমার মনে হয় যে সম্পূর্ণ এক নতুন পরিস্থিতির সম্মুখীন আমাদের হতে হবে।"[৬০]

বস্তুত ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট মনে মনে গান্ধীহীন এক ভারতবর্ষের আশা পোষণ করতেন। ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রস্তাব গৃহীত হবার পর গান্ধীজী যখন জেলে বন্দী এবং

জেলের মধ্যে আন্দোলনে সংঘটিত হিংসার জন্য দায়ী করার প্রতিবাদে একুশ দিনের অনশনের ফলে যখন তাঁর দ্রুত স্বাস্থ্যহানি ঘটছিল তখন গভর্নমেন্ট তাঁর মৃত্যু অবধারিত বলে ধরে নিয়েছিল। কিন্তু গান্ধীজী যখন সেই বিপদ কাটিয়ে উঠলেন, তাঁর মৃত্যু হল না তখন চার্চিল বিস্মিত হয়েছিলেন। গান্ধীজীকে গোপনে গ্লুকোজ ইনজেকশন দেওয়া হয়েছে এমন সন্দেহ তাঁর মনে দেখা দিয়েছিল। আর স্বাস্থ্যের কারণে গান্ধীজীকে মুক্তি দিলে তিনি যখন আবার সক্রিয় রাজনীতিতে নেমে পড়েন তখন চার্চিল ওয়াভেলকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন (৫-৭-৪৪) : "মিঃ গান্ধী যখন আবার সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণে সক্ষম হয়ে উঠেছেন তখন বোঝা যাচ্ছে যে তিনি বেশ ভালভাবেই সেরে উঠেছেন। তাঁর ভগ্ন স্বাস্থ্যের কথা ভেবে তাঁকে যে আমরা মুক্তি দিতে সম্মত হয়েছিলাম তার সঙ্গে কী করে এর মিল ঘটতে পারে ? একটি রিপোর্টে তো জানান হয়েছিল যে তিনি আর রাজনীতি করতেই পারবেন না।"[৬১]

এই চিঠির প্রায় দু মাস আগে (১১-৫-৪৪) আমেরি ওয়াভেলকে লিখেছিলেন যে ভারতবর্ষকে কিছু একটা দিতেই হবে। এটি এখন অবশ্যম্ভাবী হয়ে উঠেছে। স্টাফোর্ড ক্রিপস ভারতবর্ষে এসে ফিরে গিয়েছেন। তাঁর দৌত্য ব্যর্থ হয়েছিল। আমেরি ওয়াভেলকে এই পরিস্থিতির দিকে তাকিয়ে লিখেছিলেন : "কোন রকম দুর্বলতা নিয়ে নয়, বরং দৃঢ়তার সঙ্গে আমাদের কাজ করে যেতে হবে। বুয়র যুদ্ধের পর আমরা সেইভাবে কাজ করেছিলাম এবং তাতে আমরা সাফল্যলাভ করেছিলাম। ক্রিপসের ক্ষেত্রে আমরা যে ভুলটি করেছিলাম তা বোধহয় এই যে পূর্ব প্রান্তে আমাদের দুর্দৈবের ঠিক পরেই ক্রিপস তাঁর প্রস্তাব নিয়ে গিয়েছিলেন।"[৬২] আমেরি যে-দৃঢ়তার সঙ্গে কাজ করার কথা বলেছিলেন সেটি কী ? সৈন্যবল বা অস্ত্রবল যে দৃঢ়তা এনে দেয় তা নিশ্চয় নয়। তা হলে অনুমান করা যেতে পারে যে আমেরি কূটকৌশলের জোরের কথাই বলতে চেয়েছিলেন। বলা বাহুল্য যে ভারতবর্ষে ইংরেজ সরকারের কূটকৌশল ছিল হিন্দু-মুসলমানকে কোনভাবে ঐকমত্যে আসতে না দেওয়া।

ক্রিপস প্রস্তাব : আশার ছলনা

যুদ্ধ তখনও শেষ হয়নি। পূর্ব রণাঙ্গণে জাপানী অগ্রসর অব্যাহত। ব্রিটিশ সরকার যুদ্ধের অন্তিম পরিণতি কী হবে তা নিয়ে উদ্বিগ্ন। জাপান পার্ল হারবার আক্রমণ করেছিল ১৯৪১ সালের ৭ই ডিসেম্বর। এই আক্রমণের ফলে মিত্রশক্তি যথেষ্ট বিব্রত এবং ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল। আমেরিকার প্রেসিডেন্ট রুজভেল্ট মনে করেছিলেন যে যুদ্ধের এইরকম সঙ্গীন অবস্থায় ইংরেজদের উচিত ভারতবর্ষের সঙ্গে বিরোধ মিটিয়ে ফেলা। স্বাধীনতা না হোক অন্তত স্বশাসনের অধিকার ভারতবাসীদের দেওয়া হোক এই রকম একটি চাপ রুজভেল্টের দিক থেকে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের উপর আসছিল। চাপ আসছিল চীনের রাষ্ট্রপ্রধান চিয়াং কাইশেকের দিক থেকেও। ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী চার্চিল এইসব চাপের কাছে নতি স্বীকার করতে রাজি ছিলেন না। পার্ল হারবার আক্রান্ত হবার এক মাস পরে (৭-১-৪২) তিনি ইংলন্ডের শ্রমিক দলের নেতা এটলিকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন : "এই সময় কংগ্রেসকে দায়িত্বে অধিষ্ঠিত করে ভারতবর্ষ থেকে 'আরও বেশি আদায় করতে পারব'—এমন ধারণা সৃষ্টি করা অসমীচিন (illfounded)। ...ভারতীয় সৈনিকরা গৌরবের সঙ্গে যুদ্ধ করছে। কিন্তু এ কথা মনে রাখতে হবে যে তাদের আনুগত্য হল সম্রাটের

প্রতি। কোন সংগ্রামী জাতি কখনই কংগ্রেসের শাসন এবং যাজক সম্প্রদায়ের কারিগরী (priesthood machine) সহ্য করবে না।"[৬৩]

কংগ্রেসের মধ্যেও কেউ কেউ এই সময় সরকারের সঙ্গে একটি মীমাংসায় আসতে আগ্রহী হয়ে উঠেছিলেন। রাজাগোপালাচারী ছিলেন এই রকম এক নেতা। তিনি মনে করেছিলেন যে জাপান ভারতবর্ষ আক্রমণ করবে এবং ভারতবর্ষের উচিত সেই আক্রমণ প্রতিহত করা। আর সে জন্য উচিত মুসলিম লীগের দাবি মেনে নেওয়া। এই মর্মে তিনি মাদ্রাজ এসেমব্লিতে একটি প্রস্তাবও এনেছিলেন। কিন্তু এই প্রস্তাব বিধানসভায় উত্থাপন করার আগেই তিনি লিনলিথগোর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। লিনলিথগো রাজী হননি। তিনি আমেরিকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন (৩১-১-৪২) : "আমি নিশ্চিত যে রাজাগোপালাচারীর দ্বারা ভাল কিছু হবে না এবং গান্ধীর ওয়ার্কিং কমিটিতে তাঁর (গান্ধীজীর) গোষ্ঠীর সঙ্গে সম্পর্ক ছিন্ন করার ইচ্ছাও তাঁর (রাজাজীর) নেই। তিনি ভাইসরয়ের সঙ্গে দেখা করে নিজের মর্যাদা বাড়াতে চান। বর্তমানে তাঁর সঙ্গে দেখা করার ইচ্ছা আমার নেই।"[৬৪]

বস্তুত সরকার তখন গান্ধীজীকেই তাঁদের প্রধান শত্রু বলে মনে করতেন। গান্ধীজীর সম্পর্কে তাঁদের মনোভাব কেমন ছিল তা লিনলিথগোর নিম্নলিখিত মন্তব্য (মে ১৯৪১) থেকে বোঝা যায় : "আমি প্রায়ই বুঝে উঠতে পারি না যে মহাত্মার মনে কী আছে! অবশ্য যুদ্ধ শুরু হওয়া থেকেই তিনি এক অসহনীয় আপদ হয়ে উঠেছেন। আবার অন্য দিকে আমাদের শত্রুরা জয়লাভ করুক এ জিনিসও তিনি চান বলে আমি বিশ্বাস করি না। যা তিনি চান তা হল এই যে তাঁর আপদ-বালাই চরিত্রটাকে বজায় রাখা এবং যুদ্ধের শেষে আলোচনার জন্য এখন দর কষাকষির মাত্রাকে যতটা সম্ভব উঁচুতে তুলে রাখা।"[৬৫] চিয়াং কাইশেক এই সময় ভারতবর্ষে এসেছিলেন। চীন দেশের প্রথা হল কেউ বিদেশে গেলে সেখানকার বিশিষ্ট ব্যক্তিদের কাছে গিয়ে দেখা করা। এই প্রথানুযায়ী চিয়াং কাইশেক গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে চেয়েছিলেন। কিন্তু সরকারের ইচ্ছা ছিল না যে চিয়াং কাইশেক গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করেন। সেজন্য সরকার তাঁকে বহুভাবে নিরস্ত করতে চেষ্টা করেছিলেন। শেষ পর্যন্ত অন্য কোনভাবে আটকাতে না পেরে সরকারের পক্ষ থেকে একটি চিঠিতে (১২-২-৪২) চিয়াংকে ওয়ার্ধায় গিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে বারণ করা হয়।[৬৬] অবশ্য শান্তিনিকেতনে যেতে দিতে সরকারের বাধা ছিল না। সরকার বোধহয় ভেবেছিল যে তা করলে বড়ই দৃষ্টিকটু দেখাবে এবং সরকারের বিশ্বাসযোগ্যতা যেটুকু বজায় আছে তাও নষ্ট হয়ে যাবে। আমেরি তাই চার্চিলকে লিখেছিলেন : "শান্তিনিকেতন হল রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের আধ্যাত্মিক ধ্যানের ক্ষেত্র। কর্তৃপক্ষ এটিকে সব সময় ভাল চোখেই দেখে এসেছে।"[৬৭]

কিছু দিন পরেই সিঙ্গাপুরের পতন হয়। ব্রিটিশ রাজনীতি নড়েচড়ে ওঠে। ইংলন্ডে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। শ্রমিক দলের নেতা এটলি হন উপ-প্রধান মন্ত্রী এবং ডোমিনিয়ন বিভাগের সচিব। শ্রমিক দলের আর একজন নেতা স্টাফোর্ড ক্রিপস হন হাউস অফ কমনসের প্রধান। ইংলন্ডের শ্রমিক দল ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবির প্রতি সহানুভূতিশীল ছিল, রক্ষণশীল দলের নেতাদের মতো তাঁরা ভারতবর্ষকে সম্পূর্ণরূপে বঞ্চিত রাখার পক্ষপাতী ছিলেন না। হিন্দু এবং মুসলমানদের প্রতি দৃষ্টিভঙ্গীতেও দুটি দলের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য ছিল। রক্ষণশীল দল এবং ইংলন্ডের প্রধান শাসকগোষ্ঠী উদ্বায়ী হিন্দু বুদ্ধিজীবীদের (volatile intellectual Hindus) প্রতি আস্থাবান ছিলেন না।

তাঁরা মুসলমানদের জীবনধারা ও দৃষ্টিভঙ্গী ভাল করে বুঝতেন এবং মনে করতেন যে মুসলমানরা হলেন ভারতবর্ষের সংগ্রামী জাতি। লর্ড ক্রানব্রান (Lord Cranbrne)-এর ভাষায় মুসলমানরা হলেন ভারতবর্ষে ইংরেজদের শ্রেষ্ঠ বন্ধু। আর শ্রমিক দলের নেতাদের মধ্যে কংগ্রেসের প্রগতিশীল এবং বুদ্ধিজীবী মানুষদের আকর্ষণ ছিল বেশি।[৬৮]

যুদ্ধ পরিস্থিতি ইংলন্ডকে ভারতবর্ষের সঙ্গে একটি চুক্তি করার জন্য চাপ সৃষ্টি করছিল। আর আমেরিকা এবং চীনের দিক থেকে চাপ তো ছিলই। এবার শ্রমিক দলের নেতারাও ক্ষমতার সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন। এই অবস্থায় আমেরি ভারতবর্ষের শাসন সংস্কারের একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেন। এই প্রস্তাবের মধ্যে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যেটি ছিল তা হল কয়েকটি প্রদেশের কেন্দ্রীয় সরকার থেকে বাইরে চলে যাবার অধিকার। আমেরির ভাষায় সেটি হল—যদি যথেষ্ট সংখ্যক প্রদেশ নিজেরা এক হতে চায় এবং একটি ডোমিনিয়ন গঠন করে তা হলে ভিন্ন মতপোষণকারী প্রদেশগুলি ইচ্ছা করলে আলাদা থাকতে পারবে এবং স্বেচ্ছামতো থাকার সময় উত্তীর্ণ হলে হয় মূল অংশে ফিরে আসবে আর নয়তো নিজেদের জন্য একটি পৃথক ডোমিনিয়ন গঠন করবে। বস্তুত আমেরি এটিকে পাকিস্তানের দিকে ঝোঁক (Pakistan option) বলে বর্ণনা করেছিলেন এবং মুসলমানপ্রধান প্রদেশগুলির জন্য একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের আভাস দিয়েছিলেন।[৬৯]

লিনলিথগো এই সংস্কার প্রস্তাবে সম্মত হননি। তিনি কংগ্রেসের সঙ্গে কোন রকম মীমাংসায় আসারই বিরোধী ছিলেন। কিন্তু ইংলন্ডের মন্ত্রীসভা নানান কারণে, অন্তত লোক দেখানর জন্যও একটা কিছু করতে চাইছিল। তাই ভারতবর্ষের বিভিন্ন দলের সঙ্গে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে মন্ত্রীপরিষদ স্টাফোর্ড ক্রিপসকে ভারতবর্ষে পাঠাতে মনস্থ করেছিল। ক্রিপস ছিলেন জওহরলালের বন্ধু। ভারতবর্ষের দাবির প্রতি তাঁর সহানুভূতি ছিল। সেজন্য অনেকেই মনে করেছিলেন যে ক্রিপসের দৌত্য সফল হবে, সম্মানীয় শর্তে উভয় পক্ষের গ্রহণযোগ্য মীমাংসার একটি সূত্র পাওয়া যাবে। ক্রিপস সেই চেষ্টা করেছিলেন। তবে তাঁর সেই চেষ্টার মধ্যে সাম্রাজ্যবাদীর মানসিকতা প্রবল ছিল। ফলে ক্রিপসের দৌত্য সফল হয়নি। সে আলোচনা পরে করা হবে।

১৯৪২ সালের ২৩শে মার্চ মন্ত্রীপরিষদের সনদ নিয়ে ক্রিপস ভারতবর্ষে এসে পৌঁছান। তার কয়েক দিন আগে (২৪-২-৪২) চুং কিং থেকে লেখা স্যার এইচ সেনর-এর একটি চিঠি ক্রিপস পেয়েছিলেন। সেনর তাতে লিখেছিলেন : "মাদাম চিয়াং কাইশেক আমাকে গোপনে জানিয়েছেন যে তিনি জানেন যে এখনই যদি স্বাধীনতা দেওয়া হয় তা হলে কংগ্রেস গান্ধীকে এবং তাঁর নিষ্ক্রিয় প্রতিরোধের নীতিকে পরিত্যাগ করতে প্রস্তুত আছে।"[৭০] কথাটি মিথ্যা নয়। স্বাধীনতার বিনিময়ে কংগ্রেস গান্ধীজীর পরামর্শ অগ্রাহ্য করে যুদ্ধে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত হয়েছিল। কংগ্রেসের অধিবেশনে সেই মর্মে প্রস্তাবও গ্রহণ করা হয়েছিল। এই প্রসঙ্গে কংগ্রেসের ভূমিকা কী ছিল মৌলানা আজাদ তা বর্ণনা করেছেন। আজাদ জানিয়েছেন : "আলোচনার সময় ক্রিপস একাধিকবার গান্ধীজীর সম্পর্কে মন্তব্য করেন। গান্ধীজীর যুদ্ধবিরোধী মনোভাবের কথা উল্লেখ করে তিনি বলেন, যুদ্ধের বিরুদ্ধে গান্ধীজী যেরকম দৃঢ় মনোভাব পোষণ করছেন তাতে ভারতবর্ষের সঙ্গে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কোন রকম আপস সম্ভব নয়। তবে ঐ ব্যাপারে আমি যে অভিমত ব্যক্ত করেছিলাম তাতে পরবর্তী আলোচনার দ্বার রুদ্ধ হয়নি। স্যার ক্রিপস তখন আমাকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যদি ভারতবাসীর স্বাধীনতার দাবি মেনে নেয় তা হলে ভারতবর্ষের জনসাধারণ আমার কথা মেনে নেবে কিনা। এর উত্তরে আমি বলি,

গান্ধীজীকে আমরা যথেষ্ট শ্রদ্ধা করি এবং তাঁর মতামতকে আমরা বিশেষভাবে গুরুত্ব দিই। তবে এই বিশেষ ব্যাপারটিতে কংগ্রেসের বেশির ভাগ লোক তথা সারা দেশই আমার পিছনে দাঁড়াবে।...স্টাফোর্ড ক্রিপস আরও একটি প্রশ্ন করেন। প্রশ্নটি ছিল, ভারতবর্ষ থেকে বাধ্যতামূলকভাবে সৈন্য সংগ্রহ করা যাবে কিনা ! এই প্রশ্নের উত্তরে আমি বলি, যুদ্ধের ব্যাপারে আমরা সর্বতোভাবেই সহায়তা করব এবং ভারতবর্ষের সহযোগিতা যাতে সর্বাত্মক হয় তা আমরা দেখব।"[৭১] আজাদ পরবর্তী সময়ে ওয়াভেল-পরিকল্পনার সময়েও বাধ্যতামূলক সেনাবাহিনীতে ভারতবাসীর যোগদানের (conscription) বিষয়টিকে স্বাধীনতার প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেছিলেন। আজাদ এই কথাও লিখেছেন যে গান্ধীজী যুদ্ধের বিরোধী হলেও কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সঙ্গে তাঁর মতবিরোধ হয়নি অথবা ওয়ার্কিং কমিটিকে তিনি কোনভাবে প্রভাবিত করতে চাননি। গান্ধীজী ওয়ার্কিং কমিটিকে বলেছিলেন যে তাঁরা যেন স্বাধীনভাবে তাঁদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেন। নিজেকে তিনি দূরে সরিয়ে নিয়ে গিয়েছিলেন।[৭২] যাই হোক কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে ক্রিপসের আলোচনা ফলপ্রসূ হয়নি। আশাভঙ্গ হওয়ায় কংগ্রেস গান্ধীজীকে আবার নেতৃত্ব দেওয়ার জন্য আহ্বান করে। গান্ধীজী আন্দোলনের জন্য প্রস্তুত হন। কংগ্রেসও গান্ধীজীর ডাকে সাড়া দেয়। অবশ্য এটি কয়েক মাস পরের ঘটনা। কিন্তু এই ঘটনা যে ইঙ্গিত বহন করে তা হল এই যে কংগ্রেস কেবল স্বাধীনতা সংগ্রামের ক্ষেত্রেই গান্ধীজীর নেতৃত্ব মেনে নিয়েছিল। স্বাধীনতার বিনিময়ে, এমন কি তার প্রতিশ্রুতিতেও গান্ধীপথ পরিত্যাগ করতে কংগ্রেসের কিছুমাত্র আপত্তি ছিল না। দেশবিভাগের সময়েও এই জিনিসেরই পুনরাবৃত্তি হয়েছিল। যথাস্থানে সে বিষয়ে আলোচনা করা হবে।

ওয়ার ক্যাবিনেট কী উদ্দেশ্যে ক্রিপসকে ভারতবর্ষে পাঠাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল তার কারণ বর্ণনা করতে গিয়ে এটলি বলেছিলেন : "তিনি হিজ ম্যাজিস্টিস গভর্নমেন্টের নামে প্রয়োজনীয় সম্মতি আদায় করতে চেষ্টা করবেন—কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের কাছ থেকেই নয় বড় বড় সংখ্যালঘুদের কাছ থেকেও, যার মধ্যে সবচেয়ে বেশি গুরুত্বপূর্ণ হল মুসলমানরা।"[৭৩] অর্থাৎ গভর্নমেন্ট ভারতবর্ষের শাসন সংস্কারের বিষয়টিকে এবারও মুসলমানদের প্রতিনিধিরূপে মুসলিম লীগের ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর ছেড়ে দিয়েছিলেন। সেটি সম্পূর্ণ অনুচিত কাজ হয়েছিল, কি হয়নি তা নিয়ে বিতর্ক হতে পারে। কিন্তু ঘটনা হল ক্রিপস দৌত্যের পিছনেও মুসলিম লীগের সম্মতি অর্জন করার বিষয়টি শর্তরূপে উপস্থিত ছিল। কংগ্রেসের দাবি ছিল স্পষ্ট। মুসলিম লীগও পাকিস্তানের দাবিতে অটল ছিল। ক্রিপসকে বলা হয়েছিল এই দুই মেরুর মধ্যে মীমাংসার সূত্র খুঁজে বার করতে। যে ঘোষণাটি তিনি সঙ্গে করে এনেছিলেন তাতে বলা হয়েছিল যে ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন স্টেটাস দেওয়া হবে। এবং যুদ্ধ শেষ হলে সংবিধান রচনার জন্য ভারতবর্ষে একটি গণ পরিষদ গঠিত হবে। এর সদস্যরা প্রাদেশিক বিধানসভার দ্বারা নির্বাচিত হবেন এবং দেশীয় রাজ্যগুলির রাজন্যবর্গের দ্বারা মনোনীত হবেন। যেসব প্রদেশ নতুন সংবিধান সমর্থন করবে না তাদের অধিকার থাকবে ব্রিটেনের সঙ্গে আলাদা চুক্তি করে নিজেদের 'স্ট্যাটাস' (অবস্থান) ঠিক করে নেবার।

ক্রিপসের এই খসড়া ঘোষণার মধ্যেই যে পাকিস্তানের দাবির প্রতি একটি সূক্ষ্ম সমর্থন ছিল তা সহজেই লক্ষ্য করা যায়। তা ছাড়া ঘোষণাটির মধ্যে ভাইসরয়কেও 'ভেটো পাওয়ার' (বাতিল করে দেবার ক্ষমতা) দেওয়া হয়েছিল এবং বলা হয়েছিল যে যুদ্ধের

শেষে যখন স্বাধীনতার দাবি গুরুত্ব সহকারে বিবেচিত হবে তখন সাম্প্রদায়িক সমস্যা মিটিয়ে নেওয়ার জন্য কংগ্রেস এবং লীগকে একটি সুযোগ দেওয়া হবে। এই দুটি দল যদি মীমাংসায় উপস্থিত হতে না পারে তা হলে কী হবে সে বিষয়ে কোন কথা ঘোষণাটিতে উল্লেখ করা হয়নি। অর্থাৎ সব কিছুকেই জিন্নার ইচ্ছা-অনিচ্ছার উপর ছেড়ে দেওয়া হয়েছিল। বস্তুত জিন্নার বিরক্তির উদ্রেক হতে পারে এই ভয়ে ক্রিপস সিন্ধু প্রদেশের জাতীয়তাবাদী নেতা আল্লা বক্সকে আমন্ত্রণ জানিয়েও তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চাননি। পরে অবশ্য মৌলানা আজাদের চেষ্টায় তাঁদের মধ্যে সাক্ষাৎকার হয়েছিল। কিন্তু আজাদের নিজেরই মনে হয়েছিল যে সেই সাক্ষাৎকার ছিল নেহাতই প্রহসন।[৭৪]

তবে এ কথা ঠিক যে ক্রিপস গান্ধীজীর সঙ্গে কংগ্রেসের নীতিগত সম্পর্ক ছিন্ন করাতে সক্ষম হয়েছিলেন। বলা যায় এদিক থেকে তিনি ছিলেন মাউন্টবেটেনের পূর্বসূরী। ক্রিপস প্রস্তাবের মধ্যে আরও একটি বিষয় ছিল যা কংগ্রেসের পক্ষে গ্রহণ করা সম্ভব ছিল না। তিনি চেয়েছিলেন যে যুদ্ধোত্তর পর্বে স্বাধীনতার রূপরেখা যেমনই হোক না কেন মধ্যবর্তী সময়ে বিশ্বযুদ্ধের পরিপ্রেক্ষিতে দেশরক্ষার বিষয়টি সরাসরি ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের নিয়ন্ত্রণে থাকবে, তাতে ভারতীয়দের কোন হাত থাকবে না। মুসলিম লীগও এই শর্তটি মেনে নিতে পারেনি। উপরন্তু তারা সরাসরি পাকিস্তান গঠনের ঘোষণা দাবি করেছিল। তারা এ কথাও বলেছিল যে যৌথ নির্বাচন এবং সংখ্যাধিক্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত গ্রহণের বিষয়টি তারা গ্রহণ করবে না। অন্য দিকে হিন্দু মহাসভা ক্রিপস প্রস্তাবের কোন কোন অংশের জন্য সন্তোষ প্রকাশ করেও তার মধ্যে প্রদেশগুলিকে আলাদা হয়ে থাকার অধিকার দেওয়ায় সেটিকে বাতিল করে দিয়েছিল। আবার তেজবাহাদুর সপ্রু এবং জয়াকরের মতো উদারপন্থী নেতারা বলেছিলেন যে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের দৃষ্টিতে নীতিগতভাবে একাধিক ইউনিয়ন গঠন যুক্তিযুক্ত হলেও দেশের দীর্ঘমেয়াদী স্বার্থ, সংহতি এবং নিরাপত্তার ক্ষেত্রে তা খুবই বিপজ্জনক। শিখরাও প্রস্তাবটির তীব্র বিরোধিতা করেছিলেন। তাঁরা জানিয়ে দিয়েছিলেন যে সর্বভারতীয় ইউনিয়ন থেকে পাঞ্জাবকে বাইরে রাখার সকল প্রচেষ্টাকে তাঁরা সর্বরকমে বাধা দেবেন। অনুন্নত সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিরা প্রস্তাবে তাঁদের জন্য কোন রকম সংরক্ষণের (Safeguard) ব্যবস্থা না থাকায় সেটিকে বাতিল করে দিয়েছিলেন।

প্রকৃতপক্ষে ক্রিপস ভারতবর্ষকে দেবার মতো কোন কিছুই সঙ্গে আনেননি। বরং বিবদমান পক্ষগুলিকে তিনি আরও যুযুমান করে দিয়েছিলেন। এই জন্যই গান্ধীজী এটিকে দুর্ভাগ্যজনক প্রস্তাব (ill-fated proposal) আখ্যা দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন : "(ক্রিপস) জানতেন যে তাঁর প্রস্তাব ভারতবর্ষকে তিনটি ভাগে ভাগ করতে চায়। এর প্রত্যেকটি ভাগই দেশশাসন সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করে। এটিতে পাকিস্তানও ছিল। তবে তাঁর প্রস্তাবিত পাকিস্তান মুসলিম লীগের ধারণানুসারী নয়। সর্বোপরি এটি দায়িত্বশীল মন্ত্রীদের হাতে দেশরক্ষার নিয়ন্ত্রণ দিতে চায় না।...যদি মুসলমানদের বিপুল সংখ্যক মানুষ নিজেদের হিন্দুদের থেকে সম্পূর্ণ আলাদা বলে মনে করেন, যেখানে কোন মিলই নেই তা হলে পৃথিবীর কোন শক্তিই তাঁদের অন্য রকম ভাবতে বাধ্য করতে পারে না। আর তাঁরা যদি ভারতবর্ষকে সেই ভিত্তিতে বিভক্ত করতে চান তা হলেও তাঁরা তা করতে পারবেন—যদি না হিন্দুরা এই রকম বিভাগকে লড়াই করে আটকাতে চান। আমি যতদূর দেখতে পাচ্ছি উভয়ে তার জন্য ধীরে ধীরে প্রস্তুত হচ্ছেন। এই পথ হল আত্মহত্যার পথ। মনে হয় প্রত্যেকেই ব্রিটিশদের অথবা

বিদেশীদের সাহায্য চায়। আর সেই অবস্থা হল স্বাধীনতাকে জলাঞ্জলি দেওয়া।"[৭৫]

গান্ধীজীর এই কথাগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে তাঁর মন সেদিন কোন খাতে প্রবাহিত হচ্ছিল। রাজাজীর ফরমুলা নিয়ে তিনি কেন পরবর্তী সময়ে জিন্নার সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলেন এবং কেনই বা দেশবিভাগকে আটকাতে অনশন করেননি তারও খানিকটা আভাস এই কথাগুলি থেকে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যাই হোক, ক্রিপসের ঘোষণা থেকে এ কথা বোঝা গিয়েছিল যে তাঁকে ভারতবর্ষে পাঠানর পিছনে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের এক অভিভাবকত্বের মানসিকতা কাজ করেছিল। সাম্রাজ্যবাদী মনোভাব থেকে তাঁরা মুক্ত ছিলেন না। তাঁরা চেয়েছিলেন ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে সুদূর পরাহত করতে এবং সেই সঙ্গে স্বাধীনতার দাবিকেও দুর্বল করে দিতে। তাই জিন্নাকে সন্তুষ্ট করতে ক্রিপস পাকিস্তানের দাবির প্রতি জনসমর্থন আছে কি না তা যাচাই করতে গণভোটের কথাও বলেছিলেন।[৭৬] ক্রিপসকে কেন যে ভারতবর্ষে পাঠান হচ্ছে সেকথা জানিয়ে আমেরি লিনলিথগোকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। তাতে ক্রিপস-প্রস্তাবের ফলাফল কী হবে সেকথাও আমেরি জানিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন : (১) ভাইসরয় কেবল একজন সাংবিধানিক গভর্নর জেনারেল হিসেবেই থাকবেন না, তিনি ভবিষ্যতে দীর্ঘ দিন সাম্রাজ্যের বিষয়গুলি তদারকি করার প্রতিনিধিরূপেও থাকবেন। (২) পাকিস্তান যদি গঠিত হয় তা হলে সম্ভবত দুটি মুসলিম অঞ্চল থাকবে। থাকবে সমগ্র দেশ যেটি হবে হিন্দু ব্রিটিশ ভারত (অবশ্য এটিও যদি খণ্ডিত না হয়)। এবং শেষ পর্যন্ত আদিম অধিবাসীদের নিয়ে গঠিত অন্তত একটি পার্বত্য অঞ্চল। আমেরি লিখেছিলেন যে এর অর্থ হল একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার থাকবে। কেননা স্থল-সেনা, নৌবাহিনী এবং বিমানবাহিনীর রক্ষণাবেক্ষণ করা প্রত্যেকটি ইউনিটের পক্ষে সম্ভবপর হবে না। অতএব কেন্দ্রীয়-স্বশাসিত ফেডারেলের কোন পরিকল্পনা না থাকায় এইসব দেখাশোনার জন্য কাউকে থাকতেই হবে।[৭৭] এই তদারকি করার জন্য মাথার উপর ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট থাকবে আমেরি ইঙ্গিতে সেকথাই বোঝাতে চেয়েছিলেন। চার্চিল তো প্রথমাবধি ভারতবর্ষের সঙ্গে কোন রকম আলোচনা করারই বিরোধী ছিলেন। লিনলিথগো-ও অনুরূপ মত পোষণ করতেন। ক্রিপসকে ভারতবর্ষে পাঠান হচ্ছে এই মর্মে চার্চিলের ঘোষণা শুনে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক নেতাদের কী রকম প্রতিক্রিয়া হয়েছিল সেকথা জানিয়ে লিনলিথগো আমেরিকে ১২-৩-৪২ তারিখে একটি চিঠি পাঠিয়েছিলেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন "(১) নেহরু কোন রকম মন্তব্য করতে রাজি নন। (২) আজাদ ক্রিপসকে বন্ধু বলে স্বাগত করেছেন। (৩) রাজাগোপালাচারী গভর্নমেন্ট যে অবস্থা অনুধাবন করতে পেরেছেন সেজন্য সন্তোষ প্রকাশ করেছেন। (৪) জিন্না মুসলিম লীগের ওয়ার্কিং কমিটির সিদ্ধান্তের আগে কোন রকম মতামত প্রকাশ করতে রাজি নন। (৫) সভারকর একে স্বাগত জানিয়েছেন, তবে তাঁর মনে হয়েছে যে কুসুমে কীট (cat in the bag) রয়েছে।"[৭৮]

লিনলিথগোর কথা থেকে কয়েকটি বিষয় স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। নেহরু যখন কোন মন্তব্য করতে নারাজ তখন জিন্না লীগের সিদ্ধান্তের জন্য অপেক্ষা করতে চান। জিন্নার এই অভিপ্রায় গণতন্ত্রসম্মত হলেও এটি যে তাঁর সময় নেবার অছিলা এবং অন্যের প্রতিক্রিয়া আগেভাগে জেনে নেবার জন্য অপেক্ষা করা সেকথাও মনে করা যেতে পারে। পরবর্তী সময়েও তিনি এইভাবে কালক্ষেপ করেছেন। আজাদ ছিলেন আশাবাদী। সভারকর আশা-নিরাশায় দুলছিলেন। আর রাজাগোপালচারী মনে

করেছিলেন এটি বাস্তবসম্মত।

ক্রিপস ভারতবর্ষের বিভিন্ন মতাবলম্বী নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করার জন্য ভারতবর্ষে এসেছিলেন। কিন্তু আলোচনা করবার পর যে ঘোষণাটি তিনি করবেন বলে সঙ্গে এনেছিলেন তার কোন পরিবর্তন করার অধিকার তাঁর ছিল না। তাঁকে বলে দেওয়া হয়েছিল যে যে-প্রস্তাবটি তিনি সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন তার বাইরে একটি পদক্ষেপও যেন তিনি না করেন। শ্রমিক দলের নেতা ক্রিপস যাতে ভারতবর্ষের নেতাদের উত্থাপিত স্বাধীনতার দাবির প্রতি সমর্থন দিয়ে না বসেন সেজন্য চার্চিল, আমেরি, লিনলিথগো এবং কমান্ডার-ইন-চিফ ওয়াভেল সযত্ন প্রয়াস চালিয়েছিলেন। ফলে ক্রিপস ব্যর্থ হন। তিনি ভারতবাসীকে কিছু দিতে পারেননি এবং ভারতবাসীর কাছ থেকে যুদ্ধে সহযোগিতার প্রতিশ্রুতিও নিয়ে যেতে পারেননি।

ক্রিপস-প্রস্তাব সমর্থন করার পক্ষে শ্রীঅরবিন্দ মত দিয়েছিলেন এমন কথা বলা হয়ে থাকে। শ্রীঅরবিন্দ এক মহান ধ্যানযোগী। তিনি তাঁর দূরদৃষ্টিতে হয়তো এর মধ্যে কল্যাণকর কিছু দেখতে পেয়েছিলেন। অথবা ভবিষ্যতে আরও খারাপ কিছু হবে এমন সম্ভাবনা তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। কিন্তু প্রত্যক্ষ রাজনীতি থেকে তিনি তখন অনেক দূরে সরে গিয়েছিলেন। তাই যাঁরা প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে তখন যুক্ত ছিলেন, যাঁরা স্বাধীনতার জন্য সংগ্রাম করছিলেন এবং যাঁরা তাঁদের দাবি আদায়ের উদ্দেশ্যে লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন তাঁরা কেউই ক্রিপস-প্রস্তাবের উপলব্ধ-মূল্য (face value) বিচার করে তাকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেননি। সুতরাং ক্রিপসকে বিফল হয়েই দেশে ফিরে যেতে হয়েছিল।

ক্রিপস একটি কাজ করে গিয়েছিলেন। তাঁর ব্যর্থতা দেশবিভাগের প্রশ্নটিকে নতুন আঙ্গিকে ভাববার পরিবেশ সৃষ্টি করে দিয়েছিল। জিন্না এবং মুসলিম লীগ এর জন্য সোচ্চার ছিলেন। এইবার সেই দাবি নিয়ে এগিয়ে এলেন রাজাগোপালচারী। ১৯৪২ সালের ২৩শে এপ্রিল তাঁর নেতৃত্বে মাদ্রাজ বিধানসভার কংগ্রেসী সদস্যরা একটি প্রস্তাবে অল ইন্ডিয়া কংগ্রেস কমিটিকে মুসলিম লীগের প্রস্তাব মেনে নিতে অনুরোধ করে।* এটি ছিল এক অপ্রত্যাশিত দাবি। প্রস্তাবটি জানতে পেরে কংগ্রেসীরা চমকিত হন। কংগ্রেস সভাপতির সঙ্গে পরামর্শ না করে এই রকম প্রস্তাব গ্রহণ করার জন্য রাজাজী দুঃখপ্রকাশ করেন এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যপদ ত্যাগ করেন। কিন্তু আপন চিন্তা সকলের কাছে উপস্থিত করার 'কর্তব্যবোধে' কংগ্রেসের সভায় প্রস্তাবটি উত্থাপন করেন এবং তা বিপুল ভোটের ব্যবধানে বাতিল হয়ে যায়। গান্ধীজী সকলকে ধৈর্য সহকারে রাজাজীর কথা শোনার জন্য অনুরোধ করেন। তিনি রাজাজীকে জিজ্ঞাসা করেন যে তিনি কি পাকিস্তানের সীমানা কেমন হবে, কেমন করে তার পক্ষে-বিপক্ষে লোকেদের মতামত যাচাই করা যাবে সেকথা ভেবেছেন? গান্ধীজী বলেছিলেন: "যদিও রাজাজী তাঁর

---

* এর কয়েক দিন পরে (২৭-৪-৪২) লিনলিথগো মাদ্রাজের গভর্নর স্যার এ হোপকে লেখা একটি চিঠিতে রাজাজী মুসলিম লীগের সঙ্গে মীমাংসায় আসার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করে যে সাহস দেখিয়েছিলেন তার জন্য প্রশংসা করেন।[৭৯] রাজাজীর এটিই প্রথম প্রয়াস ছিল না। প্রায় দু বছর আগে (১৬-৯-৪০) অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির অধিবেশনের পর রাজাজী মুসলিম লীগের সঙ্গে আপোস করার উদ্দেশ্যে বলেছিলেন যে গভর্নমেন্ট যদি এখনই একটি সাময়িক জাতীয় সরকার গঠনের কথা ঘোষণা করেন তাহলে তিনি তাঁর সহকর্মীদের রাজি করাবেন যাতে মুসলিম লীগকে প্রধান মন্ত্রী মনোনয়ন করতে আহ্বান করা হয় এবং প্রধান মন্ত্রী তাঁর মনোমত মন্ত্রীসভা গঠন করেন।[৮০] একই সঙ্গে রাজাজী অবশ্য একথাও বলেছিলেন যে দ্বি-জাতি তত্ত্ব একটি ক্ষতিকারক (mischevious) ধারণা এবং তা ভারতবর্ষকে ধ্বংসের দিকে নিয়ে যাবে।[৮১]

সমর্থনে আমার নাম উল্লেখ করেছেন কিন্তু আমি দেখছি যে মাটি এবং রুটির (chalk and cheese) মধ্যে যেমন প্রভেদ বিদ্যমান তাঁর সঙ্গে আমার সেই রকম প্রভেদ রয়েছে। তিনি জাপানীদের দূরে সরিয়ে রাখবার আশায় ঐক্যের বিনিময়ে আলাদা হয়ে যাবার অধিকার মেনে নিতে চান। আমি মনে করি যে ভারতবর্ষকে ভাগ করা পাপ।"[৮২]

ডঃ তারাচাঁদ রাজাজীর দৃষ্টিভঙ্গীর অন্য একটি ব্যাখ্যা দিয়েছেন। তিনি বলেছেন : "মাদ্রাজের নেতার কাছে যুক্তি ছিল। কিন্তু ভারতবর্ষকে বিভক্ত করার বিরুদ্ধে মানসিকতা এত প্রবল ছিল যে কংগ্রেসীরা দেওয়ালের লিখন পড়তে পারেননি।"[৮৩] বস্তুত কংগ্রেস আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অনেক আগেই মেনে নিয়েছিল। সেই অধিকার অনুকূল পরিবেশে কোথায় মাথা চাড়া দিয়ে উঠবে কংগ্রেস আগে থেকে তার কোন ধারণা করতে পারেনি। ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কার্যত মুসলিম লীগের দাবিকে মেনে নিয়ে তার উদ্গমকে অবাধ করে দিয়েছিল। ক্রিপস আশা জাগাতে চেয়েছিলেন। তিনি তা পারেননি। তাঁর আশাকে প্রায় সব পক্ষই মিথ্যা ছলনা বলে মনে করেছিলেন। এই অস্থির অবস্থাকে সামনে রেখে রাজাজী তাঁর প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। তিনি যুক্তিতে সাড়া জাগাতে চেয়েছিলেন। হয়তো কিছুটা সফল হয়েছিলেন। কিন্তু তিনি হৃদয়কে নাড়া দিতে পারেননি। তার ফলে ক্রিপস প্রস্তাবের মতো তাঁর প্রস্তাবও বাতিল হয়ে গিয়েছিল।

॥ প্রস্তুতি ॥

আত্মনিয়ন্ত্রণ : স্বশাসনের নির্মোক

রাজাগোপালাচারী আত্মনিয়ন্ত্রণের স্বীকৃত অধিকারের যুক্তিতে মুসলিম লীগের পাকিস্তান দাবি মেনে নেবার কথা বলেছিলেন। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ছিল কংগ্রেসের গৃহীত সিদ্ধান্ত। সেই দৃষ্টিতে রাজাজীর প্রস্তাবকে একেবারেই অমূলক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। কিন্তু যে-প্রশ্ন গান্ধীজী রাজাগোপালাচারীকে করেছিলেন অর্থাৎ আত্মনিয়ন্ত্রণের ভৌগোলিক সীমানা কোথায় এবং সেই সীমানা নির্ধারণ করা হবে কী করে তার কোন সুনির্দিষ্ট উত্তর রাজাজী সেদিন দিতে পারেননি। সেদিন তিনি ইচ্ছাই প্রকাশ করেছিলেন, কোন পরিকল্পনা উপস্থিত করেননি। সেটি করেছিলেন আরও কিছু দিন পরে।

আত্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত প্রস্তাব কংগ্রেস সর্বপ্রথম ১৯১৮ সালে গ্রহণ করেছিল। প্রথম বিশ্বযুদ্ধ তখন সবে শেষ হয়েছে। আমেরিকা এবং ব্রিটেনের রাষ্ট্রপ্রধানরা 'স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধে' জয়লাভ করে বিশ্বে 'শান্তি' স্থাপনে উদ্যোগী হয়েছিলেন। তাঁরা স্বীকার করেছিলেন যে প্রত্যেক প্রগতিশীল জাতির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার আছে। কংগ্রেস তখনও পূর্ণ স্বাধীনতা বা এমনকি ডোমিনিয়ন স্টেটাসের দাবিও উত্থাপন করেনি। এই অবস্থার পটভূমিতে কংগ্রেসের একটি প্রস্তাবে নিতান্ত আবেদনের সুরে বলা হয় যে ব্রিটিশ পার্লামেন্ট এবং শান্তি সম্মেলন ভারতবর্ষকে একটি প্রগতিশীল দেশ বলে গণ্য করুক এবং তাকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিক। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের অর্থ দেশের আভ্যন্তরীণ বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণের এবং যে কোন আন্তর্জাতিক সম্মেলনে ভারতবর্ষের নির্বাচিত প্রতিনিধির অংশগ্রহণের অধিকার। এর একুশ বছর পরে, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ তখন সবে শুরু হয়েছে সেই সময় (১৪-৯-৩৯) কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার অর্থে আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি উত্থাপন করে। যে-প্রস্তাবে এই দাবি উত্থাপিত হয়েছিল তাতে বলা হয়েছিল যে গ্রেট ব্রিটেন যখন গণতন্ত্রকে রক্ষা করার এবং বিস্তৃত করার উদ্দেশ্যে যুদ্ধ করছে বলে ঘোষণা করেছে তখন তার উচিত তার দখলীকৃত সাম্রাজ্যের অবসান ঘটান এবং ভারতবর্ষে পূর্ণ গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করা—কারণ ভারতবর্ষের জনগণের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার রয়েছে।

বলা বাহুল্য ব্রিটেন কংগ্রেসের এই দাবির প্রতি মোটেই কর্ণপাত করেনি। তার ফলে সুভাষচন্দ্রের নেতৃত্বে কংগ্রেসের অনেক সদস্য তখনই আন্দোলন শুরু করার জন্য অন্য নেতাদের উপর, বিশেষ করে গান্ধীজীর উপর চাপ দিচ্ছিলেন। গান্ধীজী তাতে রাজি হননি। তিনি বলছিলেন যে দেশ তখন আন্দোলন করার জন্য প্রস্তুত নয়। আন্দোলন শুরু না করার জন্য তাঁর আপত্তির আর একটি বড় কারণ ছিল কংগ্রেসের আভ্যন্তরীণ

সাংগঠনিক দুর্বলতা। তবে তিনি এ কথাও বলেছিলেন যে সাম্রাজ্যবাদের চরিত্রের সঙ্গে কংগ্রেসের যথেষ্ট পরিচয় হয়ে গিয়েছে এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের পূর্ণ অধিকার ছাড়া কংগ্রেস আর কিছুতেই সন্তুষ্ট হতে পারে না।[১]

এ কথা ঠিক যে কংগ্রেস এবং গান্ধীজী আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার সঙ্গে সমীকৃত করেছিলেন। সেই সঙ্গে এই কথাও সত্য যে কংগ্রেস নানা ভাষা, নানা মত, নানা পরিধানে বৈচিত্র্যময় ভারতবর্ষে একটি 'ইউনিটারী' গভর্নমেন্ট (রাষ্ট্র) গঠন করতে চায়নি। কংগ্রেসের লক্ষ্য ছিল ভারতবর্ষে একটি 'ফেডারেল' রাষ্ট্র গঠন করা। এর অন্তর্ভুক্ত রাজ্যগুলি কয়েকটি মৌলিক এবং সামগ্রিক বিষয় ছাড়া বাকি সব বিষয়ে স্বাধীন থাকবে। রাজ্যগুলি গঠিত হবে ভাষাকে ভিত্তি করে। গান্ধীজী ১৯২৪ সালে অনুষ্ঠিত কংগ্রেসের অধিবেশনে সভাপতির অভিভাষণে এই পরামর্শই দিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন : "প্রদেশগুলি ভাষার ভিত্তিতে পুনর্গঠিত হবে এবং আভ্যন্তরীণ শাসন ও উন্নয়নের ক্ষেত্রে প্রদেশগুলি সম্পূর্ণরূপে স্বায়ত্তশাসিত হবে।"[২] মুসলিম লীগের দেশবিভাগ সম্পর্কিত প্রস্তাব গ্রহণের আগে যাঁরা স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্রের কথা বলতেন তাঁদের কারও কারও মনে এই রকম ধারণা ছিল যে ব্রিটিশ শাসিত ফেডারেল ভারত রাষ্ট্রে মুসলমানদের নিয়ে স্ব শাসিত অঞ্চল গঠিত হবে। অর্থাৎ তাঁরা ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশ গঠনের পরিবর্তে ধর্মের ভিত্তিতে রাজ্য গঠনের দাবি তুলেছিলেন। পরে ব্রিটিশ শাসন থেকে মুক্ত হয়ে স্বাধীনতা লাভের দাবি যখন সোচ্চার হতে থাকে এবং ধীরে ধীরে তার অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হতে থাকে তখন মুসলমানদের জন্য স্ব-শাসনের দাবিদারদের মন থেকে সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য একটি ফেডারেল রাষ্ট্রের চিত্রটি মুছে যায়। তার পরিবর্তে তাঁরা স্বাধীন মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের দাবি তোলেন। রাজাজী যে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মেনে নিতে বলেছিলেন তা ছিল মূল ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন মুসলমানদের একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করা। এই প্রসঙ্গে যে প্রশ্নটি তোলা যেতে পারে তা হল, মুসলমানদের গরিষ্ঠসংখ্যক মানুষ যদি এই দাবি সমর্থন করেন তবে যিনি কোন না কোনভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে স্বীকার করেন তিনি কোন্ যুক্তিতে মুসলমানদের এই দাবিকে অস্বীকার করবেন ? হয়তো গান্ধীজীর মনেও এই প্রশ্ন ছিল। তিনি কেবল এই বিষয়েই নিশ্চিত হতে চাইছিলেন যে দাবিটির পিছনে সত্যই অধিকাংশ মুসলমানের সমর্থন আছে, না নেই। ইংরেজরা যে ব্যূহ রচনা করেছিল তার প্রভাব কতটা ? এক প্রশ্নের উত্তরে তিনি লিখেছিলেন : "আমি যে গণপরিষদের কথা বলি তাতে এই আশাই ব্যক্ত হয়েছে যে মুসলিম লীগের মানসিকতা সমগ্র মুসলমান সমাজের ইচ্ছাকে প্রতিনিধিত্ব করছে কি না তা জানা। প্রতিনিধিরা যখন বাস্তবের সম্মুখীন হবেন তখন তাঁরা ধর্মের ভিত্তিতে দেশকে ভাগ করতে চাইবেন না। বরং তাঁরা ভারতবর্ষকে একটি অবিভাজ্য দেশ বলে মনে করবেন এবং এক জাতীয়তা অর্থাৎ ভারতীয়ত্বকে তাঁরা আবিষ্কার করবেন। মুসলমানদের সমস্যারও সেখানেই সমাধান হবে। কিন্তু এই আশা যদি ব্যর্থ হয় তা হলে কংগ্রেস মুসলমানদের ইচ্ছাকে জোর করে দাবিয়ে রাখতে পারে না।"[৩] এই লেখাটি প্রকাশিত হবার পনের দিন পরে গান্ধীজী আর একটি প্রবন্ধে লিখেছিলেন : "মুসলমানদের নিজেদের শর্ত (অসহযোগ আন্দোলনের ক্ষেত্রে—ভ. প্র. চ.) উত্থাপন করার অধিকার আছে। অবশিষ্ট ভারতবর্ষ যদি আভ্যন্তরীণ ভ্রাতৃঘাতী সংঘাতে নিযুক্ত হতে না চায় তবে মুসলমানরা তা শুরু করলে তাদের আদেশের কাছে অন্যদের নতি স্বীকার করতে হবে। অবশিষ্ট ভারতবর্ষ যতই শক্তিশালী হোক না কেন আট কোটি মুসলমানদের অনুগত হতে

বাধ্য করার কোন অহিংস পদ্ধতি আমার জানা নেই। অবশিষ্ট ভারতবর্ষের মতো মুসলমানদেরও আত্মনিয়ন্ত্রণের সমান অধিকার থাকা উচিত। আমরা এখন যৌথ পরিবারে বাস করছি। এর যে কোন সদস্যই আলাদা হয়ে যাবার দাবি তুলতে পারে।"[৪]

সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের ইচ্ছানুসারে যদি স্বতন্ত্র মুসলিম রাষ্ট্র গঠিত হয় তা হলে তার মধ্যে বসবাসকারী হিন্দু এবং শিখদের অবস্থা কেমন হবে, এইরকম এক প্রশ্নও গান্ধীজীকে করা হয়েছিল। উত্তরে গান্ধীজী বলেছিলেন: "হিন্দু এবং শিখদের সমান দাবি থাকবে।...যদি জাতির প্রত্যেকটি অঙ্গীভূত অংশ (component part) এইভাবে আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি তুলতে থাকে তবে জাতি বলে কোন কিছু থাকবে না। স্বাধীনতা বলেও আর কিছু থাকবে না। আমি বলেছি যে পাকিস্তান এমনই এক অসত্য যে তা বাস্তব হবে না। এর রচয়িতারা যখন একে রূপ দিতে যাবেন তখন তাঁরা দেখবেন যে এটি বাস্তবসম্মত নয়।"[৫] গান্ধীজীর এই মত মুসলিম লীগের নেতারা সমর্থন করতে পারেননি। তাঁরা পাকিস্তানের দাবি থেকে সরে আসেননি। পাকিস্তানের রূপরেখা কেমন হবে গান্ধীজীর এই প্রশ্নের সদুত্তর দিতে না পারলেও রাজাজী তাঁর প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নেননি। বরং এবার তিনি তাঁর প্রস্তাবকে একটি ছকে বাঁধতে প্রস্তুত হচ্ছিলেন। বিয়াল্লিশের আন্দোলনে যেসব হিংসাত্মক ঘটনা ঘটেছিল ইংরেজ সরকার তার দায় গান্ধীজীর উপর দিচ্ছিল। গান্ধীজী তখন জেলে বন্দী। তিনি সরকারের অভিযোগের উত্তরে জানান যে যা কিছু ঘটেছে তা হল সরকারের অবিমৃশ্যকারিতার ফল। কেননা আন্দোলনের ডাক দেবার আগেই সরকার নেতাদের কারারুদ্ধ করে জনগণকে উত্তেজিত করেছিল। গান্ধীজী তাঁর বিরুদ্ধে আরোপিত অভিযোগের প্রতিবাদে জেলের মধ্যে অনশন করেন। এই সময়ে রাজাজী তাঁর নতুন প্রস্তাবের প্রতি গান্ধীজীর সমর্থন আদায় করে নিয়েছিলেন। রাজাজী স্পষ্টতই বলেছিলেন যে তিনি পাকিস্তানের পক্ষে। কেননা এমন রাষ্ট্র তিনি চান না যেখানে হিন্দু-মুসলমান কেউই সম্মানীয় নাগরিকরূপে বসবাস করবে না। তাঁর অভিমত ছিল যে পাঞ্জাব এবং বাংলা তো প্রকৃতপক্ষে পাকিস্তান। তা হলে আর দেশবিভাগে আপত্তি কেন?[৬]

রাজাজীর প্রস্তাবের মূল কথা ছিল—(১) মুসলিম লীগ ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবি অনুমোদন করবে এবং মধ্যবর্তী সময়ে একটি অস্থায়ী অন্তর্বর্তী সরকার গঠনে কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করবে; (২) যুদ্ধের অবসান হলে উত্তর-পশ্চিম ও উত্তর-পূর্ব ভারতবর্ষের মুসলমান প্রধান অঞ্চলগুলি নির্দিষ্ট করার জন্য একটি কমিশন গঠিত হবে; (৩) এই অঞ্চলে বসবাসকারী সকল মানুষ গণভোটের মাধ্যমে জানাবে যে তারা হিন্দুস্থান থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় কিনা। যদি অধিকাংশ মানুষ তা চায় তা হলে সেই অঞ্চলগুলিকে নিয়ে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠিত হবে; (৪) যদি বিচ্ছিন্ন হয় তা হলে দেশরক্ষা, বাণিজ্য, যোগাযোগ এবং অন্যান্য অত্যাবশ্যকীয় বিষয়ে একটি চুক্তি সম্পাদিত হবে; এবং (৫) এইসব কাজগুলি ব্রিটেন কর্তৃক ভারতবর্ষের সম্পূর্ণ শাসনভার হস্তান্তর করার পরই প্রযুক্ত হবে। রাজাজীর প্রস্তাবে এই কথাও বলা হয়েছিল যে গণভোটের আগে নিজের মতামত প্রচার করার স্বাধীনতা সকলের থাকবে। আর লোকবিনিময় যদি হয় তবে তা হবে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাপ্রণোদিতভাবে।[৭]

রাজাজীর প্রস্তাব বিশ্লেষণ করলে চারটি কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এক, নীতিগতভাবে কিছু মানুষের মূল ভূখণ্ড থেকে বিচ্ছিন্ন হবার জন্য দাবি করার অধিকার আছে। এ কথা প্রস্তাবে মেনে নেওয়া হয়েছে। দুই, দুটি রাষ্ট্র গঠিত হলেও কতকগুলি মৌলিক বিষয়ে

চুক্তিবদ্ধ হবার শর্ত বাধ্যতামূলক থাকছে। তিন, বিচ্ছিন্ন হবার বিষয়টি কার্যান্বিত হবে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবার পরে। এবং চার, সকল ধর্মাবলম্বী মানুষের ভোটেই বিচ্ছিন্ন হবার বিষয়টি বিবেচিত হবে। তা ছাড়াও মুসলিম লীগকে স্বাধীনতার সংগ্রামে যুক্ত করার কথা এই প্রস্তাবে বলা হয়েছিল।

জিন্না প্রস্তাবটিকে ভাল চোখে দেখেননি। তিনি মুসলিম লীগের সভায় বলেছিলেন (৩০-৭-৪৪) : "মিঃ গান্ধী একটি ছায়া এবং খোসা, একটি বিকলাঙ্গ, অঙ্গহীন, কীটদষ্ট পাকিস্তান দিচ্ছেন।"[৮] রাজাজীর প্রস্তাব সম্পর্কে এই মন্তব্য করেও জিন্না প্রস্তাবটি নিয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনা করতে এগিয়ে এসেছিলেন। তার কারণ অবশ্য ছিল। একটি মীমাংসায় উপনীত হতে তখন জিন্নার উপর বিভিন্ন দিক থেকে চাপ আসছিল। খাকসার আন্দোলনের প্রতিষ্ঠাতা মৌলানা এনায়াত উল্লা খাঁ মশরিকি একটি চিঠিতে জিন্নাকে লিখেছিলেন : "আমার স্থির বিশ্বাস যে পাকিস্তান অর্জন করার জন্য এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য এই সঙ্কটময় মুহূর্তে হিন্দু-মুসলমানের একটি বোঝাপড়ায় আসা উচিত। কিন্তু আপনি আপনার উন্মাদনাবশত (fury) এই মূল্যবান সময়টি হতাশা এবং অকর্মণ্যতার মধ্যে নষ্ট করে দিচ্ছেন।"[৯] এই রকম অভিযোগের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জিন্নার পক্ষে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা না করে উপায় ছিল না। আর গান্ধীজীর দিক থেকে আগ্রহ তো ছিলই। তাঁর নিজের কাছে পাকিস্তানের কাঠামোটি খুব স্পষ্ট ছিল না। দেশবিভাগ আদৌ হবে কিনা, হলেও কেমন হবে তার রূপ—এই প্রশ্নগুলি ছাপিয়েও তাঁর মন বিশ্লেষভাবে সশঙ্কিত ছিল হিন্দু-মুসলমানের পারস্পরিক সম্পর্ককে কেন্দ্র করে এবং হিন্দু-মুসলমানের অনৈক্যের মাঝখানে দাঁড়িয়ে থাকা ইংরেজ সরকারের অস্তিত্বকে নিয়ে। রাজাজী গান্ধীজীকে বলেছিলেন জিন্না প্রকৃতপক্ষে কী চান তা জেনে নিতে। গান্ধীজী এর উত্তরে বলেছিলেন : "আমি সেই চেষ্টাই করছি। তাঁর কথা থেকেই আমি প্রমাণ করাব যে পাকিস্তান অবাস্তব। আমার মনে হয় তিনি (আলোচনা) ভেঙে দিতে চান না। আমার দিক থেকেও কোন তাড়া নেই। কিন্তু তিনি কখনই আমার কাছ থেকে অবর্ণিত (undefined) পাকিস্তানের সমর্থন আদায় করতে পারবেন না।"[১০]

অন্য দিকে জিন্না 'কীটদষ্ট পাকিস্তান' নিতে রাজি ছিলেন না। তা ছাড়া দেশ পরশাসনমুক্ত হবার পর সকল মানুষের ভোট পাকিস্তানের অনুকূলে যাবে কিনা তা নিয়েও তাঁর মনে সংশয় ছিল। আবার গান্ধীজী আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার, বিচ্ছিন্ন হবার জন্য দাবি করার অধিকার মেনে নিয়েও জিন্নার পাকিস্তানের দাবি মেনে নিতে পারেননি। অতএব শেষ পর্যন্ত তাঁদের আলোচনা ব্যর্থ হয়। গান্ধী-জিন্না আলোচনা যেমন দেশে সে সময় মিশ্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করেছিল তেমনি আলোচনা ব্যর্থ কেন হয়েছিল তা নিয়েও বিভিন্ন মত দেখা দিয়েছিল। গান্ধীজীর লক্ষ্য ছিল ব্রিটিশকে বাদ দিয়ে হিন্দু-মুসলমানের অনৈক্য নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে মিটিয়ে ফেলা। তার জন্য যদি পাকিস্তান একান্তই অনিবার্য বিষয় হয়ে ওঠে তবে তা নিয়েও বিবেচনা করা যেতে পারে। গান্ধীজীর এই দৃষ্টিভঙ্গীকে কেউ কেউ মেনে নিতে পারেননি। যেদিন তিনি জিন্নার সঙ্গে দেখা করার উদ্দেশ্যে বোম্বাই রওনা হন সেদিন 'পাকিস্তান-বিরোধী ফ্রন্ট' তাঁর পথে বাধা সৃষ্টি করে। বাধা যাঁরা দিচ্ছিলেন তাঁদের মধ্য থেকে আটজনকে গ্রেপ্তার করা হয়। এঁদের একজনের কাছ থেকে একটি ছোরাও পাওয়া গিয়েছিল। গান্ধীজী এবং জিন্না আঠার দিন ধরে আলোচনা করেছিলেন। পরস্পরের মধ্যে যেখানে অবিশ্বাস সেখানে আলোচনা কতটা ফলপ্রসূ হতে পারে—এই রকম প্রশ্ন গান্ধীজীর নিজের মনেও ছিল। সেকথা তিনি

রাজাগোপালাচারীকে বলেছিলেন। তবু তিনি দেখতে চেয়েছিলেন যে জিন্নার সঙ্গে কোন মীমাংসায় আসা যায় কিনা। গান্ধীজী প্রার্থনা সভায় বলেছিলেন : "আপনারা ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করুন যেন তিনি ভারতবর্ষের স্বার্থে আমরা যাতে একটি বোঝাপড়ায় আসতে পারি তার জন্য কায়েদে আজম (জিন্না) এবং আমাকে আশীর্বাদ করেন।" জিন্নাও লাহোরের একটি সভায় বলেছিলেন : "আমরা যাতে একটি মীমাংসায় পৌঁছতে পারি তার জন্য আপনারা আমাকে এবং মহাত্মা গান্ধীকে আশীর্বাদ করুন। তৃতীয় পক্ষ রয়েছে এবং তাঁরা (বাধা দিতে) চেষ্টা করবে। তা সত্ত্বেও আমরা মীমাংসায় পৌঁছতে পারব। কারণ গান্ধীজী সম্পূর্ণ সৎ (incorruptable) এবং আমার সম্পর্কেও তাঁর ধারণা অনুরূপ।"[১১] কিন্তু এই প্রার্থনা এবং সদিচ্ছা ফলপ্রসূ হয়নি। তৃতীয় পক্ষকেও উপেক্ষা করা যায়নি। জিন্না চেয়েছিলেন স্বাধীনতার আগেই পাকিস্তান গঠিত হোক। তিনি গান্ধীজীকে বলেছিলেন, "চলুন, আমরা একসঙ্গে শাসকদের কাছে যাই। পাকিস্তান এবং হিন্দুস্তানকে স্বাধীনতা দিতে তাদের উপর চাপ দিই।" গান্ধীজী তাতে রাজি হননি। তিনি বলেছিলেন, "শাসকদের কাছে আমরা যাব না। স্বাধীনতা আসুক। তারপর জনগণ যদি সত্যই পাকিস্তান চায় তা হলে তাকে কেউ আটকাতে পারবে না।" গান্ধীজী জিন্নাকে লিখিতভাবে যে প্রশ্নগুলি করেছিলেন (এ সম্পর্কে আগেও কিছু আলোচনা করা হয়েছে) তার মধ্যে ছিল—(১) পাকিস্তানের লক্ষ্য কি 'প্যান ইসলামিক'? (২) ধর্ম ছাড়া হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আর কোথায় প্রভেদ আছে? (৩) পাকিস্তানের প্রস্তাবটি কি কেবল মুসলমানদের উদ্দেশ করেই রচিত হয়েছে, নাকি তা ভারতবর্ষের সকল মানুষের কাছে একটি আবেদন, অথবা তা বিদেশী শাসকদের কাছে চরম পত্র? (৪) এই সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্রগুলি একটি দরিদ্র রাষ্ট্রের সমষ্টি হয়ে নিজেদের কাছে এবং অবশিষ্ট ভারতবর্ষের কাছে এক ভীতির বস্তু হয়ে উঠবে না তো? (৫) পাকিস্তান প্রস্তাব কার্যকর করার দ্বারা সমগ্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং কল্যাণকর্ম কীভাবে সাধিত হবে? এবং, (৬) সংখ্যালঘু কথার অর্থ কী?—এ ছাড়াও গান্ধীজী আরও কয়েকটি প্রশ্ন করেছিলেন।[১২] জিন্না সবগুলি প্রশ্নের উত্তর দেননি। তবে এই প্রশ্নগুলি থেকেই তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গীর মৌলিক পার্থক্যের চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। সুতরাং স্বাভাবিক পরিণতি হিসেবে গান্ধী-জিন্না আলোচনা ব্যর্থ হয়ে গিয়েছিল। এই ব্যর্থতার কারণ অনেকে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে বর্ণনা করেছেন। কেউ বলেছেন যে গান্ধীজী যুদ্ধ শেষ হওয়া পর্যন্ত অপেক্ষা করতে রাজি হননি বলেই আলোচনা ভেঙে গিয়েছিল। ডঃ তারাচাঁদ বলেছেন যে গান্ধীজীর আত্মনিয়ন্ত্রণের এবং বিচ্ছিন্ন হবার অধিকার মেনে নিতে প্রস্তুত না হওয়াই আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার কারণ। মধ্যপ্রদেশের গভর্নর স্যার এইচ টোয়ামেন ১০-৮-৪৪ তারিখে অর্থাৎ গান্ধী-জিন্না আলোচনার এক মাস আগে একটি গোপন চিঠিতে ভাইসরয়কে জানিয়েছিলেন : "গান্ধী শ্যামাপ্রসাদ মুখার্জিকে বলেছেন যে পাকিস্তান পরিকল্পনার প্রতি তাঁর আস্থা নেই এবং তিনি যে রাজাগোপালাচারীর 'ফরমুলা' সমর্থন করেছেন তা হল একটি সুবিধা নেবার ব্যাপার (matter of expediency)। আর একটি রিপোর্ট থেকে জানা যাচ্ছে যে জিন্নার সঙ্গে তাঁর আলোচনা ফলপ্রসূ হবে এমন আশা গান্ধী করেন না। তাঁর উদ্দেশ্য হল পৃথিবীর কাছে গভর্নমেন্টকে এবং জিন্নাকে হেয় করা।...বোম্বাইতে ৯ই আগস্ট উদযাপনে গান্ধীজীর নির্দেশ এই কথাই প্রমাণ করে যে তিনি এখনও নিজেকে আইনের ঊর্ধ্বে বলে মনে করেন।"[১৩]

গভর্নমেন্টের গোপন তথ্য সম্পূর্ণ অমূলক নাও হতে পারে। জিন্নার সঙ্গে দেখা করতে

যাওয়া যে গান্ধীজীর পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গী এবং তাঁদের আলোচনা যে বড় দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে বোঝাপড়ার পথ সুগম করে দিতে পারে এমন ভয় শাসকদের মনে দেখা দিয়ে থাকতে পারে। জিন্নাও বলেছিলেন যে পাকিস্তান কী তা গান্ধীজী বোঝেন না এমন হতেই পারে না, কেননা তিনি নিজেই এ সম্পর্কে 'হরিজন' পত্রিকায় লিখেছেন। আর আলোচনার অবসান হলে এক সাংবাদিকের প্রশ্নের উত্তরে গান্ধীজী বলেছিলেন : "আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে মিঃ জিন্না দ্বার রুদ্ধ করেননি। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবি, যা অনেকদিন আগেই মেনে নেওয়া উচিত ছিল, সে সম্পর্কে একটি মীমাংসায় আমরা উপনীত হই তা ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট চায় না। আর তাই তারা জিন্নাকে ভারতবর্ষের মুক্তি অস্বীকার করার কাজে অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছে।"[১৪]

গান্ধী-জিন্না আলোচনা ব্যর্থ হওয়ার কারণ বর্ণনা করে ওয়াভেল ৩-১০-৪৪ তারিখে আমেরিকে একটি চিঠি লিখেছিলেন। তাতে তিনি জানিয়েছিলেন : "জিন্না দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিতের উপর দাঁড়িয়ে আছেন। এই তত্ত্ব অনুসারে হিন্দু এবং মুসলমান সমগ্র দেশে ছড়িয়ে থাকলেও তারা পরস্পরের কাছে বিদেশী। তিনি গান্ধীজীকে এই তত্ত্ব এবং মুসলিম লীগের ১৯৪০-এর লাহোরে গৃহীত প্রস্তাব মেনে নিতে চাপ দেন। এই অঞ্চলগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের এবং পৃথক সার্বভৌমত্বের অধিকার কেবল মুসলমানরাই প্রয়োগ করবেন। জিন্না অর্থনৈতিক স্থায়িত্ব এবং সংখ্যালঘুদের ভাগ্য সম্পর্কিত অসুবিধাজনক (awkward) প্রশ্নের উত্তর দিতে চাননি। ...গান্ধীজী রাজাজীর প্রস্তাব তুলে ধরেছিলেন বটে কিন্তু তিনি এ কথা পরিষ্কার করে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি রাজাজীর প্রস্তাবের প্রতি আস্থাশীল নন এবং তিনি যা চান তা হল একটি যুক্ত ভারতবর্ষের মধ্যে মুসলমানদের এক ধরনের আত্মনিয়ন্ত্রণ।"[১৫]

ওয়াভেল প্রস্তাব : মায়া মরীচিকা

রাজাজী-প্রস্তাব এবং গান্ধী-জিন্না আলোচনা ব্যর্থ হয়ে যায়। দু পক্ষই নিজেদের সিদ্ধান্তে অটল থাকেন। জিন্না এবং মুসলিম লীগ কংগ্রেসকে জাতীয় প্রতিষ্ঠানরূপে মেনে নিতে সম্মত হননি। পাকিস্তানই যে মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার একমাত্র পন্থা এবং ব্রিটিশ শাসনের আনুকূল্যেই তা পাওয়া যেতে পারে এই বিশ্বাসের প্রতি জিন্নার আস্থা রাজাজীর প্রস্তাব অথবা গান্ধীজীর সঙ্গে আলোচনার ফলে বিন্দুমাত্র শিথিল হয়নি। এই আলোচনা যখন হচ্ছিল তখন কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ জেলে বন্দী ছিলেন। গান্ধীজী মুসলিম লীগকে মুসলমানদের হয়ে কথা বলার একমাত্র দাবিদাররূপে মানতে রাজি ছিলেন না। স্বাধীনতা পরে, দেশবিভাগ আগে—জিন্নার এই জেদকেও তিনি সমর্থন করতে পারেননি। এই মতানৈক্যের ফলে দেশে যে অচলাবস্থার সৃষ্টি হয়েছিল তার অবসান হয়নি। অতএব যুদ্ধে ভারতবর্ষের স্বেচ্ছায় সহযোগিতা করাও সম্ভব হয়নি। এইরকম অস্বস্তিকর অবস্থার পরিবর্তনের জন্য ওয়াভেল উদ্যোগী হন। তিনি কেন্দ্রীয় আইনসভায় কংগ্রেস পরিষদীয় দলের নেতা ভুলাভাই দেশাইকে জানান যে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের পরিষদীয় দলদুটি যদি মিলিতভাবে একটি জাতীয় সরকার গঠন করে তা হলে তিনি তাকে স্বাগত জানাবেন। ভুলাভাই ওয়াভেলের আহ্বানে উদ্বুদ্ধ হন। তাঁর মনে হয় যে এইরকম একটি সরকার যদি গঠন করা যায় তবে তার ফলে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের জেল থেকে মুক্ত করা সম্ভব হবে এবং একটি রাজনৈতিক সমাধানে পৌঁছান যাবে। ভুলাভাই ওয়াভেলের প্রস্তাব

নিয়ে কেন্দ্রীয় আইনসভার মুসলিম লীগের সহকারী নেতা লিয়াকত আলির সঙ্গে কথা বলেন। লিয়াকত সম্মত হন এবং একটি প্রস্তাব পেশ করেন। প্রস্তাবটিতে বলা হয়েছিল যে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ কেন্দ্রে একটি জাতীয় সরকারে যোগদানে সম্মত হয়েছে। এই সরকার নিম্নলিখিত পদ্ধতি অনুসারে গঠিত হবে :

ক) কেন্দ্রীয় পরিষদে কংগ্রেস এবং লীগ সমসংখ্যক সদস্য মনোনয়ন করবে। আইনসভার সদস্য নন এমন ব্যক্তিদেরও কেন্দ্রীয় পরিষদে মনোনয়ন করা যাবে।

খ) কেন্দ্রীয় পরিষদে সংখ্যালঘুদের (বিশেষ করে তফশিলী এবং শিখদের) প্রতিনিধি থাকবে।

গ) সেনাধ্যক্ষ কেন্দ্রীয় পরিষদের সদস্য হবেন।

এই প্রস্তাবটি শেষ পর্যন্ত কার্যান্বিত হয়নি। তার কারণ ছিল জিন্না এবং লিয়াকত আলির অনমনীয়তা। ভাইসরয় ভুলাভাইকে গান্ধীজীর এবং জিন্নার সমর্থন আদায় করতে বলেছিলেন। ভুলাভাই সেই উদ্দেশ্যে ১৯৪৫ সালের জানুয়ারি মাসে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। গান্ধীজী বলেছিলেন যে পরিষদীয় বিষয় ভুলাভাই গান্ধীজীর চেয়ে ভাল বোঝেন। সুতরাং এ বিষয়ে তিনিই সঠিক সিদ্ধান্ত নিতে পারেন। গান্ধীজীর এই কথার মধ্যে যতই যুক্তি থাক এইরকম গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে তাঁর এমন নির্দেশকে সুবিবেচনাপ্রসূত নয় বলে মনে হওয়া স্বাভাবিক। অবশ্য পরে তিনি এই প্রসঙ্গে ভুলাভাইকে লিখেছিলেন : "আমার ধারণা অনুসারে যদি কংগ্রেস এবং লীগের মিলন হয় তবে তাকে আমি স্বাগত জানাব। পরিষদীয় কাজে কংগ্রেস এবং লীগ যদি হাত ধরাধরি করে তবে তা আমি পছন্দ করব। কিন্তু তোমাকে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির কাছ থেকে (এই আলোচনা চালাবার জন্য) অধিকার অর্জন করতে হবে।"

সেই সুযোগ ভুলাভাই পাননি। অথবা তার জন্য তিনি অপেক্ষা করতে প্রস্তুত ছিলেন না। সরকার গঠনের এবং একটি মীমাংসায় পৌঁছবার আগ্রহাতিশয্যে তিনি মাত্রাধিক এগিয়ে গিয়েছিলেন। সেই কাজে লিয়াকত তাঁকে সমর্থন করেছেন এবং জিন্নার অনুমোদনও তিনি আদায় করতে পেরেছেন এমন একটি বিশ্বাস তাঁর হয়েছিল। কিন্তু কথাবার্তা অনেক দূর এগিয়ে যাবার পর জিন্না এবং লিয়াকত তাঁদের সম্মতি দানের কথা অস্বীকার করেন। জেলের মধ্যে এই চুক্তির খবর পড়ে কংগ্রেসের নেতারাও তাঁদের আপত্তির কথা জানিয়ে দেন। দেশাই-লিয়াকত চুক্তির প্রসবের আগেই মৃত্যু হয়। কিন্তু প্রস্তাবিত জাতীয় সরকারে কংগ্রেস এবং লীগের সমসংখ্যক প্রতিনিধি পাঠাবার সিদ্ধান্তে প্রাথমিক স্তরে রাজি হওয়ার সিদ্ধান্ত সাম্প্রদায়িকতার বিষকে প্রবল করেছিল। ওয়াভেল এই পটভূমিতে দাঁড়িয়ে তাঁর পরিকল্পনা উপস্থিত করেছিলেন।[১৬]

সালটি ছিল ১৯৪৪। তখনও বুঝতে পারা যায়নি যে যুদ্ধ শীঘ্রই শেষ হতে চলেছে। সুতরাং যুদ্ধে জয়লাভের জন্য ইংরেজদের তখনও ভারতবর্ষের সহযোগিতা পাওয়া জরুরী হয়ে পড়েছিল। ভারতবর্ষে যদি একটি জাতীয় সরকার গঠন করা যায় তবে তার মাধ্যমে সেই সহযোগিতা পাওয়ার কথা তখনও ভাবা হচ্ছিল। বস্তুত এই ভাবনা থেকেই তখন মিত্রশক্তির অন্তর্ভুক্ত যুদ্ধরত দেশগুলি ভারতবর্ষের শাসনপ্রণালীর মধ্যে কিছু পরিবর্তন

• বোম্বাই-এর গভর্নর স্যার কোলভিল একটি গোপন টেলিগ্রামে আমেরিকে জানিয়েছিলেন যে জিন্না লিয়াকত ভুলাভাইয়ের সঙ্গে আলোচনা করায় খুবই বিরক্ত হয়েছিলেন। আলোচনার অব্যবহিত পরেই তিনি এর সঙ্গে যুক্ত থাকার কথা অস্বীকার করেছিলেন। লিয়াকতও আইনসভায় জানিয়ে দিয়েছিলেন যে তিনি এবং ভুলাভাই যে একটি মীমাংসায় উপনীত হয়েছিলেন তা বাজে কথা। মীমাংসা কেবল কংগ্রেস এবং লীগের মধ্যেই হতে পারে।

আনার প্রয়াসী হয়েছিলেন। দেশাই-লিয়াকত চুক্তি ব্যর্থ হয়ে যাবার পর ওয়াভেল বিভিন্ন দলের নেতাদের সমবেত করে একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চেষ্টা করেন। বলা নিষ্প্রয়োজন যে ওয়াভেল তাঁর এই প্রয়াসের মধ্যেও সাম্রাজ্যবাদীর মানসিকতা থেকে নিজেকে মুক্ত করেননি। জিন্না তাঁকে বেশি বেগ দেবেন না এটি তিনি ধরে নিয়েছিলেন। জিন্নার দিকে তাঁদের সহানুভূতির পাল্লা ভারি ছিল। ওয়াভেল এবং ইংরেজ সরকারের ভয় ছিল গান্ধীজীকে। গান্ধীজী কখন যে কী বলবেন আর করে বসবেন তা নিয়ে তাঁরা শঙ্কিত ছিলেন। তাই ওয়াভেলের প্রয়াস শুরু হবার আগে থেকেই তাঁরা গান্ধীজীর মনের কথা জানতে চেষ্টা করছিলেন। অবশ্য এই চেষ্টা সরকারীভাবে করা হয়নি, হচ্ছিল বেসরকারীভাবে।

একটি মীমাংসায় পৌঁছতে গান্ধীজীও আগ্রহী ছিলেন। জেল থেকে মুক্ত হবার কয়েক দিন পরে তিনি আপস-রফার আগ্রহের কথা জানিয়ে ভাইসরয়কে একটি চিঠি লিখেছিলেন। সেই চিঠিতে তিনি জানিয়েছিলেন যে পরিবর্তিত পরিস্থিতি বিবেচনা করে অবিলম্বে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং জাতীয় সরকার গঠনের শর্তে তিনি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে প্রস্তাবিত (cxvisaged) বিয়াল্লিশের আন্দোলন আহ্বান না করতে এবং যুদ্ধে সহযোগিতা করতে পরামর্শ দেবেন। ওয়াভেল তাতে রাজি হননি। তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন যে যুদ্ধকালীন সময়ে সংবিধানের কোনরকম পরিবর্তন সম্ভব নয়। তিনি সেই সঙ্গে এই কথাও জানিয়েছিলেন যে হিন্দু-মুসলমানের সমস্যাটি প্রকৃত এবং জটিল। সংখ্যালঘুদের প্রতি এবং দেশীয় নৃপতিদের প্রতি গভর্নমেন্টের যে দায়িত্ব রয়েছে তা তাঁরা ছেড়ে দিতে পারেন না। তবে বর্তমান অবস্থা মেনে নিয়ে হিন্দু এবং মুসলমানরা যদি একটি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনে একমত হতে পারেন তা হলে তাতে দেশের প্রগতি সম্ভব।

এইসব চিঠি লেখার মধ্যেই লন্ডনের 'নিউ ক্রনিকাল' পত্রিকার সংবাদদাতা স্টুয়ার্ড গেলডার ১৯৪৪ সালের ৪ঠা জুলাই গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করেন। গান্ধীজী তাঁকে বলেছিলেন যে যুদ্ধ চলার সময়ে ভারতবর্ষের বেসামরিক প্রশাসনের পূর্ণ দায়িত্ব যদি জাতীয় সরকারের হাতে দেওয়া হয় তা হলে তিনি সন্তুষ্ট হবেন। গান্ধীজী মনে করেছিলেন যে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন আহ্বান করার সময় দেশের যা অবস্থা ছিল তার যথেষ্ট পরিবর্তন হয়েছে। সুতরাং এখন একটি জাতীয় সরকার গঠন করা যায়। কেন্দ্রীয় আইনসভার নির্বাচিত সদস্যদের মনোনীত ব্যক্তিদের দ্বারা এই সরকার গঠিত হবে। গান্ধীজী এ কথাও বলেছিলেন যে জাতীয় সরকার সেনাবাহিনীকে সব রকমের সুযোগ দিলেও নিয়ন্ত্রণ নিজের কাছে রাখবে। অর্ডিনান্সের শাসনের স্থলাভিষিক্ত হবে স্বাভাবিক প্রশাসন। ভাইসরয় থাকবেন ইংলন্ডের রাজার মতন। তিনি দায়িত্বশীল মন্ত্রীদের দ্বারা পরিচালিত হবেন। গান্ধীজী বলেছিলেন : "আমরা অনেকেই মনে করি যে ভাইসরয় ব্যক্তিগতভাবে যা কিছু চান না কেন রাজনৈতিক ক্ষেত্রে তাঁর কোন অধিকার নেই। মিঃ চার্চিল কোনরকম মীমাংসা চান না। তিনি আমাকে শেষ করতে চান। তিনি কখনও সেকথা অস্বীকার করেননি। আমার কাছে এটি আনন্দের। তাঁর কাছে এটি বিষাদের (The beauty of it for me, the pity of it for him)। তার কারণ সত্যাগ্রহীকে কেউ বিনাশ করতে পারে না। সত্যাগ্রহী স্বেচ্ছায় দেহকে বলিদানে উৎসর্গ করে আত্মাকে মুক্ত রাখে।"[১৭]

মিঃ গেলডার গান্ধীজীর অনুমতি না নিয়েই তাঁর সাক্ষাৎকারের এক বিবরণ কাগজে

প্রকাশ করে দেন। তার মধ্যে প্রকৃত সত্য ছিল না। সেজন্য গান্ধীজী একটি বিবৃতি দেন। ওয়াভেলকে একটি চিঠি লিখে দেশের জটিল অবস্থার সমাধানে তাঁর দিক থেকে সহযোগিতার আশ্বাসও দেন। এই চিঠির উত্তরে ওয়াভেল জানিয়েছিলেন যে গান্ধীজী যে-প্রস্তাব নিয়ে তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে চান তা গভর্নমেন্টের পক্ষে মেনে নেওয়া সম্ভব নয়। এর পরেই গান্ধীজী রাজাগোপালাচারীর প্রস্তাব নিয়ে জিন্নার সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়েছিলেন। সেই আলোচনা যেমন সফল হয়নি তেমনি ভুলাভাই দেশাইয়ের মাধ্যমে ওয়াভেল যে চেষ্টা চালিয়েছিলেন তাও ব্যর্থ হয়েছিল। বস্তুত বিফলতার এই প্রেক্ষাপটেই ওয়াভেল তাঁর প্রস্তাব নিয়ে সরাসরি এগিয়ে এসেছিলেন। ১৯৪৪ সালের আগস্ট মাসে তিনি গভর্নরদের সম্মেলনে শাসন সংস্কারের একটি প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। সেই প্রস্তাব ইংলন্ডের শাসনকর্তাদের মনঃপূত হয়নি। তা নিয়ে কয়েক দিন টানা-পোড়েন চলে। সেই পর্ব শেষ হলে ওয়াভেলের সঙ্গে ইংলন্ডের কর্তৃপক্ষের একটি বোঝাপড়া হয়। ওয়াভেল ১৪-১-৪৫ তারিখে একটি বেতার ভাষণে ঘোষণা করেন যে তাঁর প্রস্তাব অনুসারে বড়লাট এবং প্রধান সেনাপতি ছাড়া কাউন্সিলের সব সদস্যই ভারতীয় হবেন। পরিষদে বর্ণহিন্দু এবং মুসলমানদের সংখ্যা সমান হবে। গান্ধীজী বর্ণহিন্দু শব্দটিতে আপত্তি করেন। তিনি এ কথাও বলেন যে তিনি সমতা মানতে রাজি আছেন ; তবে তফশিলী এবং মুসলমান সদস্যদের মনোনয়ন করবার অধিকার কংগ্রেসের থাকবে। গান্ধীজীর এই শর্তসাপেক্ষে অনুমোদন থেকে যে কথা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল তা হল এই যে তিনি দেশে সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে একটি সংগঠনের অস্তিত্ব বজায় রাখতে বেশি আগ্রহী ছিলেন এবং তার জন্য জনসংখ্যার ভিত্তিতে হিন্দুদের প্রাপ্য প্রাধান্যকে বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন। জিন্না দেশে কোন অসাম্প্রদায়িক পরিবেশের অস্তিত্বকে স্বীকার করে নিতে রাজি হননি। গোটা দেশ সাম্প্রদায়িকতার মানসিকতায় বিভক্ত এটি প্রমাণ করতে তিনি ব্যস্ত ছিলেন। তাই গান্ধীজীর প্রস্তাবে তিনি সম্মত হতে পারেননি। তিনি তাঁর দাবিতে অনড় ছিলেন। আর সেই দাবি হল মুসলমান সদস্যদের একমাত্র মুসলিম লীগই মনোনয়ন করবে। ওয়াভেল জিন্নাকে এই বলে আশ্বস্ত করেছিলেন যে সংখ্যালঘুরা সব সময় মুসলমানদের বিরুদ্ধে ভোট দেবে তার কোন মানে নেই। তা ছাড়া বড়লাটের তো 'ভেটো' প্রদানের ক্ষমতা থাকছেই।[১৮] জিন্নার সমর্থন আদায় করবার জন্য ওয়াভেলের এই যুক্তি উত্থাপন তাঁর রাজনৈতিক চাতুর্যের পরিচয়। পরবর্তী এক সময়ে গান্ধীজীর কথার মাঝে আটকে পড়ে ওয়াভেল বলেছিলেন যে তিনি একজন সৈনিক, রাজনীতি বা আইন তিনি বেশি বোঝেন না। উত্তরে গান্ধীজী বলেছিলেন যে ভাইসরয়কে আইনজ্ঞ হতেই হবে এমন কোন কথা নেই। কিন্তু তিনি যে পদে রয়েছেন সেই আসন থেকে কথা বলতে হলে তাঁকে নিজের কাছে আইন বিষয়ক পরামর্শদাতা রাখতে হবে এবং তাঁকে তাঁদের মত নিয়েই কথা বলতে হবে। ওয়াভেলের যে এ কথা জানা ছিল না তা মনে করবার কোন হেতু নেই। আসলে আপন কার্যসিদ্ধির জন্য ওয়াভেল তাঁর চাতুর্যের পাশাপাশি নিরপেক্ষতার ভান করতেন। এটি এক ধরনের পলায়নী মনোবৃত্তি। যথাস্থানে এই প্রসঙ্গ আলোচনা করা হবে। যাই হোক, সিমলা সম্মেলনে জিন্না যখন কংগ্রেসের মুসলমান সদস্য মনোনয়ন করার অধিকারের বিরুদ্ধে গোঁ ধরে বসেছিলেন তখন ওয়াভেল সেই জট বেশ সহজেই খুলে দিয়েছিলেন। জিন্না বলেছিলেন যে কংগ্রেস হল হিন্দুদের একটি প্রতিষ্ঠান। মৌলানা আজাদ এই কথা মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। ডাঃ খানসাহেবও জিন্নার এই কথার প্রতিবাদ করেছিলেন।

তখন ওয়াভেল বলেছিলেন যে কংগ্রেস অবশ্যই তার সদস্যদের প্রতিনিধিত্ব করে। জিন্না এই কথার বিরুদ্ধাচরণ করতে না পেরে ওয়াভেলের রায় মেনে নিয়েছিলেন।[১৯] বলা বাহুল্য এইখানে ওয়াভেল রাজনৈতিক বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়েছিলেন।

ঘটনায় ফিরে আসা যাক। ওয়াভেলের আমন্ত্রণে ১৯৪৪ সালের ২৫শে জুন সিমলায় বিভিন্ন দলের নেতৃবৃন্দ একটি সম্মেলনে সমবেত হয়েছিলেন। সেখানে প্রারম্ভিক ভাষণে ওয়াভেল বলেছিলেন : "এখনকার মতো আমার নেতৃত্ব আপনাদের মেনে নিতেই হবে। একটি ভাল গভর্নমেন্ট এবং ভারতবর্ষের কল্যাণের জন্য আমি হিজ ম্যাজিস্টিস গভর্নমেন্টের কাছে দায়বদ্ধ। আমাকে ভারতবর্ষের একজন প্রকৃত বন্ধু বলে মনে করতে আমি আপনাদের অনুরোধ করছি।" ওয়াভেলের এই কথা হয়তো সেদিন অনেকেরই ভাল লেগেছিল। তাঁদের হয়তো মনে হয়েছিল যে আলোচনার সূত্রপাত বেশ আশাব্যঞ্জক। রাজাগোপালাচারী তো বলেই ফেলেছিলেন যে বহু দিন পরে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের পারস্পরিক সদিচ্ছা এবং বিশ্বাস পুনরুজ্জীবিত হয়েছে।

সম্মেলনের দ্বিতীয় দিনে ওয়াভেল সম্মেলনের আলোচ্য সূচি কী হবে তা নিয়ে দুটি প্রশ্ন উত্থাপন করেছিলেন। প্রথম প্রশ্নটি ছিল এইরকম—বেতার ভাষণে তিনি কাউন্সিল গঠনের যে নীতির কথা বলেছিলেন তা কি গ্রহণীয় ? দ্বিতীয় প্রশ্নটি ছিল—নীতিটি যদি গ্রহণীয় হয় তা হলে কাউন্সিল গঠিত হবে কাদের নিয়ে এবং কারা সদস্যদের নাম মনোনয়ন করবেন ? প্রথম প্রশ্নটি অর্থাৎ সমতার বিষয়টি নিয়ে মোটামুটিভাবে সকলে একমত হয়েছিলেন। কিন্তু গোলমাল বাধে দ্বিতীয় প্রশ্নটি নিয়ে। কংগ্রেস এবং ছোটখাট দলগুলি তাদের নামের তালিকা ভাইসরয়কে দিয়েছিল। কংগ্রেস তার নীতি অনুসরণ করে দুজন মুসলমান সদস্যের নাম তাদের তালিকায় অন্তর্ভুক্ত করেছিল। যাঁদের নাম ছিল তাঁরা হলেন মৌলানা আজাদ এবং আসফ আলি। তা ছাড়া জিন্নার বিরোধী পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী এবং ইউনিয়নিস্ট পার্টির নেতা মালিক খিজির হায়েত খাঁ তাঁর প্রদেশ থেকেও একজন মুসলমান প্রতিনিধির নাম পাঠিয়েছিলেন। জিন্না এতে আপত্তি করেন। ব্যক্তিগতভাবে আলোচনার মাধ্যমে জিন্নার সমর্থন আদায় করবার চেষ্টা করা হয়। কিন্তু জিন্না রাজি হননি। তার ফলে ওয়াভেল ১৭ই জুলাই সম্মেলন ব্যর্থ হয়েছে বলে ঘোষণা করেন।

মৌলানা আজাদ ৭-৭-৪৫ তারিখে ওয়াভেলের কাছে প্রস্তাবিত এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের জন্য নামের তালিকা পাঠিয়েছিলেন। তাতে যেমন জিন্না, লিয়াকত আলি, নবাব মহম্মদ এবং উত্তরপ্রদেশের ইসমাইল খাঁর নাম যুক্ত করা হয়েছিল তেমনি শ্যামাপ্রসাদের এবং মাস্টার তারা সিং-এর নামও দেওয়া হয়েছিল। অবশ্য আজাদ এ কথা লিখতেও ভোলেননি যে মুসলিম লীগের সদস্যদের নাম লীগই চূড়ান্ত করবে।[২০] জিন্না কোন নাম পাঠাননি। কেন, তার কারণ বর্ণনা করে তিনি ৭-৭-৪৫ তারিখে ওয়াভেলকে একটি লম্বা চিঠি পাঠিয়েছিলেন। জিন্না লিখেছিলেন : "প্রস্তাবিত এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলের জন্য মুসলিম লীগের পক্ষে নাম পাঠাবার বিষয়ে আপনার পরামর্শ ওয়ার্কিং কমিটি বিবেচনা করেছে। কমিটি জানাতে চায় যে আপনার মহামান্য পূর্বাধিকারী লর্ড লিনলিথগো ১৯৪০ সালের আগস্ট মাসে যখন অনুরূপ প্রস্তাব করেছিলেন তখন ওয়ার্কিং কমিটি তার বিরোধিতা করেছিল। সেই বিরোধিতা লর্ড লিনলিথগোর দৃষ্টিতে আনা হলে তিনি তাঁর প্রস্তাব বাতিল করে অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের সভাপতিকে ২৫-৯-৪০ তারিখে যে চিঠি দিয়েছিলেন তার অংশবিশেষ নিচে উদ্ধৃত করছি। তিনি লিখেছিলেন

'তালিকা প্রণয়নের বিষয়ে আমি আপনাকে আগেই যে পরামর্শ দিয়েছিলাম তা কার্যান্বিত করতে গিয়ে যে অসুবিধার সম্মুখীন আপনাকে হতে হচ্ছে বলে আমাকে জানিয়েছেন তা আমার সঙ্গত মনে হয়েছে। আপনার সঙ্গে আলোচনা করে আমি একমত হয়েছি যে যেহেতু কাউন্সিলে সদস্য তালিকা চূড়ান্ত করা গভর্নর জেনারেলের এক্তিয়ারভুক্ত সেইহেতু মুসলিম লীগের ক্ষেত্রে (এবং আর যেসব দল কাউন্সিলে প্রতিনিধি পাঠাতে চায় তাদের ক্ষেত্রেও) প্রতিনিধির তালিকা বিধিবৎ না পাঠিয়ে দলনেতার আমার সঙ্গে গোপনে আলোচনা করেই ঠিক করা উচিত।' এই বিকল্প মুসলিম লীগ মেনে নিয়েছিল। ওয়ার্কিং কমিটি মনে করে যে যে-নীতি আগে অনুসরণ করা হয়েছে বর্তমানেও অন্তত মুসলিম লীগের ক্ষেত্রে সেই নীতি অনুসরণ করা উচিত।'[২১]

কেন সম্মেলন ব্যর্থ হল তার কারণ ব্যাখ্যা করতে গিয়ে জিন্না বলেছিলেন যে ভাইসরয় মোট পাঁচজন মুসলমান সদস্যের মধ্যে লীগকে মাত্র দুজন সদস্য মনোনয়নের সুযোগ দিয়েছিলেন। ভি. পি. মেননের মতে জিন্নার এই অভিযোগ সত্য নয়। লিয়াকত আলি মেননকে বলেছিলেন যে মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার জন্য ভাইসরয়ের 'ভেটো' প্রদানের ক্ষমতা ছাড়া আর কোন শর্ত না থাকায় তাঁদের পক্ষে কোন মীমাংসা মেনে নেওয়া সম্ভব হয়নি। মেনন লিয়াকতকে বলেছিলেন যে উভয় পক্ষই নিজেরা বসে এই সমস্যা মিটিয়ে নিতে পারেন। লিয়াকত আলি এই বিষয়ে জিন্নার সঙ্গে কথা বলে তাঁকে পরে তাঁদের অভিমত জানাবেন বলেছিলেন। কিন্তু জানাননি।[২২] জিন্না তাঁর স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গীতে এই ব্যর্থতার দায় গান্ধীজী এবং কংগ্রেসের উপর চাপিয়েছিলেন। তিনি এবারও বলেছিলেন যে এঁরা ভারতবর্ষে হিন্দুর রাজত্ব কায়েম করতে চান। আর এঁদের সঙ্গে যুক্ত হয়েছেন খিজির হায়েত খাঁ যিনি মুসলমানদের মধ্যে ফাটল ধরাতে চান। জিন্না লীগের পক্ষ থেকে নামের কোন তালিকা পাঠাতেও অসম্মতি জানান। পক্ষান্তরে, আজাদ মনে করেছিলেন যে ওয়াভেলের উদ্দেশ্য ভাল ছিল। কিন্তু তিনি শক্ত হতে পারেননি এবং দোদুল্যমান ছিলেন। সেইজন্যই আলোচনা ফলপ্রসূ হয়নি।[২৩]

ওয়াভেল যে তাঁর নিজস্ব এক বিশেষ ধারণার দ্বারা তাড়িত হয়ে ভারতবর্ষের শাসন সংস্কারের কাজে অগ্রসর হয়েছিলেন তা তাঁর একটি বক্তৃতা থেকে অনুধাবন করা যায়। কলকাতার বণিকসভায় তিনি বলেছিলেন : "'ভারত ছাড়ো' ধ্বনিটি চিচিং ফাঁকের মতো এমন কোন যাদুমন্ত্র নয় যা আলিবাবার রত্নগুহা খুলে দিতে পারে। মীমাংসা নির্ভর করছে অনেকগুলি পক্ষের উপর। কংগ্রেস আছে, সংখ্যালঘুরা আছেন, মুসলিমরা আছেন, দেশীয় রাজন্যরা আছেন, ব্রিটিশ সরকার আছে। এদের সকলের মধ্যে যেমন করেই হোক অন্তত কিছুটা মতৈক্য হওয়া চাই।"[২৪] ওয়াভেলের এই দৃষ্টিভঙ্গীর সমালোচনা করে এটলি বলেছিলেন যে ভাইসরয় ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য কোন গঠনমূলক পরিকল্পনা প্রস্তুত করেননি।[২৫] বস্তুত ওয়াভেল সমগ্র বিষয়টিকে একজন সাম্রাজ্যবাদীর দৃষ্টিতে দেখেছিলেন এবং সেইভাবেই তাঁদের অনুসৃত নীতির ফলে যে-সমস্যার সৃষ্টি হয়েছিল তার সমাধান করতে চেয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল যে ভারতবর্ষে যদি ক্ষমতা হস্তান্তর করতেই হয় তবে যাঁদের প্রতি জনসমর্থন আছে তাঁদের হাতে ক্ষমতা দিয়ে দেওয়া হোক। নতুবা ভারতবর্ষকে দাবিয়ে রাখার জন্য বিদেশ থেকে যথেষ্ট সংখ্যক সৈন্য নিয়ে আসা হোক।[২৬] মৌলানা আজাদও বলেছেন যে ওয়াভেল মনে করতেন, ভারতবর্ষের হিন্দু এবং মুসলমানরা একটি মীমাংসায় উপনীত না হলে ইংরেজদের ভারতবর্ষ ছেড়ে যাওয়া ঠিক হবে না। তবে এটলি এই মত পোষণ করতেন না।[২৭] মনে হয় দৃষ্টিভঙ্গীর এই পার্থক্যের

জন্যই ওয়াভেলকে শেষ পর্যন্ত ভাইসরয়ের পদ থেকে অপসারিত করা হয়েছিল। অবশ্য এটি আরও অনেক পরের ঘটনা। কিন্তু মৌলানা আজাদ মনে করেছিলেন যে ওয়াভেলের পথই ছিল সঠিক। তিনি বলেছেন : "লর্ড ওয়াভেলের প্রস্তাব যদি মেনে নেওয়া হত এবং ভারতীয় সমস্যার সমাধান যদি এক বছর কি দু বছর পিছিয়ে দেওয়া হতো তা হলে মুসলিম লীগ হয়তো তাদের বিরোধিতার ব্যাপারে হতাশ হয়ে পড়তো। আবার লীগ যদি কোন রকম ইতিবাচক মনোভাব না নিত, তা হলেও ভারতবর্ষের মুসলমান সম্প্রদায় মুসলিম লীগের সেই নেতিবাচক মনোভাবকে হয়তো আর মেনে নিতে চাইতেন না। তা ছাড়া এমনও হতে পারত যে ভারতবিভাগের মতো দুঃখজনক ঘটনাকেও পরিহার করা যেত। এই ব্যাপারে সঠিকভাবে কিছু বলা সম্ভব না হলেও একটি কথা বলা চলে যে, একটি জাতির ইতিহাসে এক বছর কি দু বছর নিতান্তই নগণ্য। ইতিহাস এটি স্বীকার করে নেবে যে লর্ড ওয়াভেলের নীতিকে মেনে নিয়ে তাঁর পরামর্শ মতো চললেই ভাল হতো।"[২৮]*

আজাদ এই কথাগুলি বলেছিলেন ওয়াভেলের পরবর্তী সময়ের আরও কিছু পদক্ষেপ সম্পর্কে আলোচনার প্রসঙ্গে। তা হলেও এ কথা উল্লেখ করা যেতে পারে যে শবিভাগের প্রস্তাব গ্রহণ অথবা বর্জনের প্রশ্নটি যখন এক সঙ্কট সমাধানের পন্থারূপে পস্থিত হয়েছিল তখন আজাদও অনেক নেতার মতোই দু-এক বছর অপেক্ষা করতে ভরসা পাননি। এক অভূতপূর্ব এবং অপ্রত্যাশিত অবস্থার মধ্যে পড়ে সেই প্রস্তাব তাঁকেও মেনে নিতে হয়েছিল।

মূল কথা হল এবং তাকে অস্বীকার করা যাবে না, তা এই যে ১৯৪৪ সালের জুন মাসে ওয়াভেল যে প্রস্তাব এনেছিলেন তা ছিল ইংলন্ডের আসন্ন সাধারণ নির্বাচনের জন্য একটি ভড়ং (stunt)। যুদ্ধ জয় যখন সুনিশ্চিত বলে বোঝা যাচ্ছিল তখন চার্চিল ইংলন্ডে শ্রমিক দলের সঙ্গে মিলিতভাবে গঠিত জাতীয় সরকার ভেঙে দিয়ে নির্বাচনের কথা ঘোষণা করেছিলেন। লিটেনে তখন অনেক লোক ছিলেন যাঁরা ভারতবর্ষের সঙ্গে একটি মিটমাট করে নেবার পক্ষপাতী ছিলেন। ওয়াভেল তাঁদের কথা চিন্তা করেই ভারতবর্ষের শাসন সংস্কারের এই ভড়ংটি করেছিলেন। ইউনাইটেড নেশনস রিলিফ অ্যান্ড রিহাবিলিটেশন অ্যাডমিনিসট্রেশনের ফ্রান্সিস সায়ার (Francys Sayer) একটি সাক্ষাৎকারের সময় গান্ধীজীকে বলেছিলেন : "আপনি তো স্বীকার করবেন যে ওয়াভেল অচলাবস্থা দূর করতে সততার সঙ্গে চেষ্টা করেছিলেন।" উত্তরে গান্ধীজী বলেছিলেন : "সৎ প্রচেষ্টা সততার সঙ্গে শেষ হয়।" এর কয়েক দিন পরেই লন্ডন থেকে এক পত্রলেখক জওহরলালকে জানিয়েছিলেন : "এটি এখন জানা কথা যে ওয়াভেলের প্রস্তাব নির্বাচনের জন্য যা প্রয়োজন ছিল তার অঙ্গীভূত ছিল। তা ছাড়া এখান থেকে নির্দেশ দেওয়া হয়েছিল যে জিন্নাকে বাদ দিয়ে কোন সরকার গঠন করা যেন না হয়। এইটিই ছিল ওয়াভেলের আলোচনা ভেস্তে যাওয়ার আসল কারণ।"[৩০]

ওয়াভেল হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যকে ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা দেবার এবং তার জন্য শাসন সংস্কারের শর্তরূপে প্রয়োগ করতে চেয়েছিলেন। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের নীতিকেই

* ১৯২৩ সালে আজাদ বলেছিলেন : "আমি স্বরাজ ছেড়ে দেবো কিন্তু হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ছাড়ব না। কেননা স্বরাজ যদি দেরি করে আসে তাতে ভারতবর্ষের ক্ষতি হবে। আর ভারতবর্ষের ঐক্য যদি না হয় তবে সমগ্র মানবজাতির ক্ষতি হবে।"[২৯] আজাদের মতো অসাম্প্রদায়িক মানুষের পক্ষে এ কথা বলা স্বাভাবিক। কিন্তু ভাগ্যের এমনই পরিহাস যে শেষ পর্যন্ত অনৈক্যের আগুনের মধ্য দিয়েই ভারতবর্ষের নেতারা স্বাধীনতাকে বরণ করেছিলেন।

তিনি সততার সঙ্গে অনুসরণ করেছিলেন। কেননা হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে রাজনৈতিক ঐক্য প্রতিষ্ঠিত হোক, তারা যৌথভাবে স্বাধীনতার সংগ্রামে অংশগ্রহণ করুক এ জিনিস ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট চাইত না। তাই গভর্নমেন্টকে চিঠি লিখে কোন কাজ না হওয়ায় গান্ধীজী যখন জেল থেকে জিন্নাকে চিঠি লিখেছিলেন তখন সেই চিঠি যাতে জিন্নার কাছে না পৌঁছায় তা দেখতে চার্চিল পরামর্শ দিয়েছিলেন। আর সেই চিঠির সূত্র ধরেই ভাইসরয় জিন্নাকে যে কোন মীমাংসার বাধারূপে উপস্থিত করতে চেয়েছিলেন। বস্তুত জিন্না কেবল যে একজন গঠনমূলক চিন্তার মানুষ ছিলেন না তা নয়, উপরন্তু তাঁকে বিনাশকারী মানুষ রূপেই উপস্থাপিত করা হচ্ছিল।[৩১] জিন্নাকে দিয়ে এমন কাজ করান যাবে এই ভরসা ছিল বলেই ওয়াভেল তাঁর প্রয়াস শুরু করার প্রাথমিক অবস্থাতেই 'কাউন্সিল অফ স্টেট' এবং আইনসভায় একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন (১৭-২-৪৪) : "দেশরক্ষা, বহির্বিশ্বের সঙ্গে সম্পর্ক, আভ্যন্তরীণ তথা বাইরেকার অনেক অর্থনৈতিক সমস্যার দিক থেকেই ভারতবর্ষ একটি স্বাভাবিক ইউনিট। ... সংস্কৃতি এবং ধর্ম ভিন্ন হওয়া সত্ত্বেও দুটি সম্প্রদায়, এমনকি দুটি জাতিও একসঙ্গে বসবাস করার ব্যবস্থা করে নিতে পারে। ইতিহাসে তার অনেক প্রমাণ আছে। ভারতীয়দের জন্য ভারতীয়দের দ্বারা কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট গঠন করা কোন অবাস্তব আদর্শ নয়।"[৩২] মনে হয় মৌলানা আজাদ ওয়াভেলের এই কথাতেই আস্থা জ্ঞাপন করেছিলেন। কিন্তু ওয়াভেল কোয়ালিশন গভর্নমেন্ট গঠন করার আগ্রহ দেখাতে গিয়ে এ কথা সেদিন ভুলে গিয়েছিলেন যে ১৯৩৭ সালে যে নির্বাচন হয়েছিল তাতে ভারতবর্ষের মোট এগারটি প্রদেশের একটিতেও মুসলিম লীগ সরকার গঠন করতে পারেনি। প্রকৃতপক্ষে দীর্ঘ দিন ধরে সাম্রাজ্যবাদী শক্তি অনৈক্যের যে ফ্রাঙ্কেশটাইন তৈরি করেছিল সেটি ওয়াভেলের এবং পরবর্তী সময়ে ক্যাবিনেট মিশনের সব প্রস্তাবকে ব্যর্থ করে দিচ্ছিল। অনৈক্যের চূড়ায় বসে মিলনের ললিতবাণী সেদিন জীবনের ব্যর্থ পরিহাস বলেই মনে হয়েছিল।

মন্ত্রীমিশন : গুটিয়ে নেওয়া এবং গুছিয়ে নেওয়া

উনিশশো পঁয়তাল্লিশ সালের সাতই মে জার্মানী মিত্রপক্ষের কাছে আত্মসমর্পণ করে। তার ফলে পশ্চিম রণাঙ্গণে যুদ্ধের অবসান হয়। পূর্ব রণাঙ্গণেও জাপান তখন বিপর্যস্ত। তবে জাপান আত্মসমর্পণ করেছিল আরও কয়েক মাস পরে। যুদ্ধে মিত্রপক্ষের জয় হয়েছিল। ইংলন্ড মিত্রপক্ষের অঙ্গ ছিল। সুতরাং জয়লাভ ইংলন্ডেরও হয়েছিল। কিন্তু বিজয়লাভ করেও ইংলন্ড বিশ্ব-রাজনীতিতে যুদ্ধপূর্ব অবস্থায় ফিরে যেতে পারেনি। সামরিক শক্তির দৃষ্টিতে তার স্থান তৃতীয় স্থানে নেমে আসে। ইংলন্ডের শাসনকর্তারা উপলব্ধি করেন যে তাঁদের সাম্রাজ্যবাদের ভিত্তি নড়ে গিয়েছে। ভারতবর্ষই ছিল তাঁদের প্রধান খুঁটি। সেই ভারতবর্ষকে আর দাবিয়ে রাখা যাবে না। চলে যাবার ভূমিকায় দাঁড়িয়ে তাঁরা হিসেব করতে শুরু করেছিলেন যে ভারতবর্ষকে কী দিয়ে যাবেন এবং এখান থেকে কী নিয়ে যাবেন ! সওদাগিরি মানসিকতা বজায় রেখেও তাঁদেরই একাংশ বুঝতে পেরেছিলেন যে বলপ্রয়োগের দ্বারা যেমন ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে আটকে রাখা যাবে না তেমনি স্বাধীনতার দাবিকে বানচাল করবার জন্য মুসলিম লীগকেও আর 'ভেটো' প্রয়োগের অধিকার দেওয়া যাবে না। এই দুটি অবস্থা মেনে নিয়ে ক্ষমতার হস্তান্তর কীভাবে এবং কত তাড়াতাড়ি করা যাবে সেইটিই হয়ে ওঠে তাঁদের কাছে বড় সমস্যা।

চার্চিল মনে করেছিলেন যে যুদ্ধজয়ের গৌরবের জের থাকতে থাকতে যদি ব্রিটেনে নির্বাচন সেরে ফেলা যায় তা হলে তাঁর রক্ষণশীল দল আবার ক্ষমতায় বসতে পারে। কিন্তু তাঁর আশা পূর্ণ হয়নি। নির্বাচনে রক্ষণশীল দল পরাজিত হয়। শ্রমিক দল ক্ষমতা লাভ করে। কংগ্রেস শ্রমিক দলের জয়লাভকে স্বাগত জানায়। অন্য দিকে মুসলিম লীগ শ্রমিক দলের সাফল্যকে তাদের স্বার্থের পরিপন্থী বলেই মনে করেছিল। তার কারণ ছিল স্পষ্ট। নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবার আগেই শ্রমিক দলের নেতা বেভিন ঘোষণা করেছিলেন যে তাঁরা যদি ক্ষমতায় আসেন তা হলে ইন্ডিয়া অফিস বন্ধ করে দেবেন এবং এর সমস্ত কাজকর্ম 'ডোমিনিয়নের' কাছে হস্তান্তর করে দেবেন। শ্রমিক দল ক্ষমতা লাভ করার পর যখন ভারতবিদ্বেষী আমেরিকে ভারত সচিবের পদ থেকে সরিয়ে সেখানে পেথিক লরেন্সকে নিযুক্ত করে তখন তার বিরোধিতা করে খালিকুজ্জমান বলেছিলেন যে এ থেকেই বোঝা যায় যে শ্রমিক দল মুসলমানদের গুরুত্ব দিতে চায় না।

যাই হোক, নির্বাচনের আগে রক্ষণশীল দল ওয়াভেলের মাধ্যমে ভারতবর্ষের নেতাদের সঙ্গে মিটমাটের চেষ্টা করেছিল। জার্মানদের আত্মসমর্পণের অব্যবহিত পরেই ওয়াভেল তাঁর বেতার ভাষণে বলেছিলেন যে অনিচ্ছুক ভারতবর্ষে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কোন স্বশাসিত

প্রতিষ্ঠান চাপিয়ে দিতে পারে না। ভারতবাসীদের নতুন সংবিধান তৈরি করতে হবে এবং তার পদ্ধতির প্রতি তাদের ঐকমত্যে পৌঁছতে হবে। যত দিন না তা হয় তত দিনের জন্য তিনি তাঁর এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল পুনর্গঠিত করতে চান। এই কাউন্সিলে গভর্নর জেনারেল এবং সেনাপ্রধান ছাড়া বাকি সকলেই হবেন ভারতীয়। এই প্রসঙ্গ উপরে আলোচিত হয়েছে। ভাইসরয়ের আহুত সম্মেলন কীভাবে ব্যর্থ হয়েছিল সেটিও তত দিনে স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। প্রসঙ্গত এইটুকু উল্লেখ করা যেতে পারে যে ভাইসরয়ের কাউন্সিলে বর্ণহিন্দু এবং মুসলমানদের সমসংখ্যক সদস্য নেবার প্রস্তাবে সম্মেলনে উপস্থিত কোন প্রতিনিধি আপত্তি না তুললেও গান্ধীজী তার বিরোধিতা করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে এই ধরনের বাধ্যতামূলক সমতা (statutory parity) গণতন্ত্রকে পরিহাসে পরিণত করবে। কংগ্রেস তাঁর এই সাবধান বাণীতে কর্ণপাত করেনি।[১] সম্মেলন ব্যর্থ হওয়ায় সেদিন এই সমতাকে কার্যান্বিত করা না গেলেও কংগ্রেসের ভূমিকা ভবিষ্যতের আরও বড় ঘটনার ক্ষেত্রে ইঙ্গিতবহ হয়েছিল।

খালিকুজ্জমানের অভিযোগ সম্পূর্ণ অর্থহীন বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। ব্রিটেনের রক্ষণশীল দল যেভাবে মুসলিম লীগের দাবিকে অগ্রাধিকার দিত শ্রমিক দল তা দিত না। ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবির প্রতি তাদের বরাবরই সহানুভূতি ছিল। এবার ক্ষমতায় বসে সেই দাবিটিকে তারা নতুন দৃষ্টিতে বিচার করতে শুরু করে। ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা ফিরিয়ে দিতে হবে এ বিষয়ে তাদের মনে কোন সংশয় ছিল না। যে প্রশ্নটি তাদের মনে প্রবল হয়ে উঠেছিল তা হল ক্ষমতা হস্তান্তরের পর ভারতবর্ষে ইংলন্ডের প্রভাব কতটা থাকবে এবং কীভাবে সেই প্রতিষ্ঠা বজায় রাখা যাবে। এ কথা মনে করার কারণ আছে। শ্রমিক দলের মন্ত্রীপরিষদের একটি সিদ্ধান্ত থেকে তাদের এই মানসিকতা স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। মন্ত্রীপরিষদ মনে করেছিল যে ক্রিপস প্রস্তাব মোটেই এমন একটি 'চেক' ছিল না যাতে খুশিমতো অঙ্ক বসিয়ে নেওয়া যায়। তাতে যে শর্তগুলি ছিল তার প্রতি সব দলেরই সমর্থন ছিল। সুতরাং যে সমাধানকে তাঁরা যুক্তিযুক্ত মনে করেন তা যদি মেনে নেওয়া হয় অর্থাৎ সেইভাবে যদি সিদ্ধান্তে পৌঁছান না যায় তবে স্বাভাবিকভাবেই তাদের (ইংলন্ডকে) ভারতবর্ষকে শাসন করে যেতে হবে। তাতে যদি ভারতবর্ষে বিদ্রোহ দেখা দেয় তা হলে ব্রিটিশ সেনা দিয়ে তাকে দমিত করতে হবে।[২]

'বিদ্রোহ' কথাটি ব্যবহার করার তাঁদের একটি কারণ ছিল। এই সিদ্ধান্ত যখন তাঁরা গ্রহণ করেছিলেন তখন আজাদ হিন্দ বাহিনীর নেতাদের বিচার নিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষ উত্তাল হয়ে উঠেছিল। সেনাবাহিনীর মধ্যেও বিদ্রোহের আগুন ধূমায়িত হচ্ছিল। বোম্বাইতে নৌ-বিদ্রোহ সংঘটিত হয়। অবশ্য নৌ-বিদ্রোহ ইংরেজ সরকারকে সিদ্ধান্ত গ্রহণে প্রভাবিত করেনি। কেননা এই বিদ্রোহ আরম্ভ হবার আগেই ইংলন্ডের মন্ত্রীপরিষদ ভারতবর্ষে ক্ষমতা হস্তান্তর কীভাবে করা যাবে তার পথ অনুসন্ধানের জন্য ভারতবর্ষে একটি ক্যাবিনেট মিশন পাঠাবার কথা ঘোষণা করেছিলেন।[৩] তারও আগে ভারতবর্ষে সাধারণ নির্বাচনের কথা ঘোষিত হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল যে নির্বাচনোত্তর পর্বে ভাইসরয় জনপ্রতিনিধিদের নিয়ে তাঁর পরিষদ গঠন করবেন। অর্থাৎ ক্ষমতায় এসে শ্রমিক দলও চাইছিলেন যে এমন ব্যবস্থা অবলম্বন করা হোক যাতে সাপও মরবে লাঠিও ভাঙবে না। ক্ষমতা ভারতবাসীদের কাছে এমনভাবে ছড়িয়ে দেওয়া হবে যাতে তারা তার দ্বারা স্বাধীনতার আস্বাদ গ্রহণ করতে পারবে এবং সেইসঙ্গে ইংলন্ডকেও ভারতবর্ষ থেকে সম্পূর্ণভাবে পাততাড়ি গোটাতে হবে না। ইংরেজদের এইরকম ইচ্ছাকে নানা কারণে

প্রশ্রয় দিচ্ছিলেন জিন্না এবং আম্বেদকরের মতো নেতারা। স্বাধীন ভারতবর্ষের পরিকাঠামো রচনার জন্য গণপরিষদ গঠনের যে প্রস্তাব করা হয়েছিল আম্বেদকর তাতে আপত্তি করেছিলেন। তিনি মনে করেছিলেন যে গণপরিষদ গঠিত হলে তাতে বর্ণহিন্দুদের আধিপত্য থাকবে।[৪] জিন্নার সেই পুরনো দাবি—মুসলিম লীগ মুসলমানদের হয়ে কথা বলবার একমাত্র প্রতিষ্ঠান এবং পৃথক রাষ্ট্র ছাড়া মুসলমানরা অন্য কিছুতেই সন্তুষ্ট হবে না।

মুসলমানদের হয়ে কথা বলবার অধিকার সম্পর্কে জিন্নার দাবি সম্পূর্ণ অযৌক্তিক ছিল এমন কথা বলা যায় না। এ কথা ঠিক যে তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বী অনেক মুসলমান নেতা ছিলেন। জিন্নার সঙ্গে তাঁরা একমত ছিলেন না। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশের, সিন্ধুপ্রদেশের এবং এমনকি পাঞ্জাবের বিধানসভায় জিন্নার বিরোধীরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ ছিলেন। কিন্তু ভারতবর্ষের অবশিষ্ট অংশের সাধারণ মুসলমানদের মধ্যে জিন্না এবং মুসলিম লীগ অধিকতর জনপ্রিয় ছিলেন। মন্ত্রীপরিষদের ঘোষণা অনুযায়ী ১৯৪৬ সালের প্রথম দিকে ভারতবর্ষে যে সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে কেন্দ্রীয় আইনসভায় কংগ্রেস অমুসলমান ভোট কেন্দ্রগুলিতে শতকরা ৯১·৩ ভাগ ভোট পেয়েছিল। লীগ মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত ৬০টি আসনের সব কটি জয়লাভ করেছিল। প্রদেশগুলিতেও লীগ শতকরা ৮৬ ভাগ ভোট পেয়েছিল। সেক্ষেত্রে হিন্দু মহাসভা কেন্দ্রীয় আইনসভায় মাত্র দুটি আসন জয়লাভ করতে সক্ষম হয়েছিল। পক্ষান্তরে জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা সমগ্র ভারতবর্ষে মোট ১৬টি আসনে জয়লাভ করতে পেরেছিল। বিভিন্ন প্রদেশে মুসলিম লীগ কতটা প্রভাব বিস্তার করতে পেরেছিল তা নিচের তালিকা থেকে বোঝা যাবে :

১৯৩৭ এবং ১৯৪৬ সালে অনুষ্ঠিত নির্বাচনের ফলাফল

প্রদেশের নাম	মুসলমান সংরক্ষিত আসন	মুসলিম লীগ জয়ী হয়েছিল	
অসম	৩৪	৩১	(১০)
বাংলা	১১৯	১১৩	(৪০)
বিহার	৪০	৩৪	×
বোম্বাই প্রেসিডেন্সি	৩০	৩০	(১৮)
মধ্যপ্রদেশ ও বেরার	১৪	১৩	(৫)
মাদ্রাজ	২৯	২৯	(৯)
উঃ পঃ সীমান্তপ্রদেশ	৩৬	১৭	×
উড়িষ্যা	৪	৪	×
পাঞ্জাব	৮৬	৭৩	(১)
সিন্ধুপ্রদেশ	৩৪	২৭	×
উত্তরপ্রদেশ	৬৬	৫৪	(২৬)

ব্রাকেটের মধ্যে ১৯৩৭ সালের প্রাপ্ত আসন সংখ্যা।

১৯৩৭ সালে যে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তাতে লীগ মাত্র ১০৯টি আসনে জয়লাভ করতে পেরেছিল। নয় বছরের মধ্যে মুসলিম লীগ যে তার প্রভাব কতটা বিস্তার করতে পেরেছিল তা দুটি নির্বাচনে প্রাপ্ত তাদের আসনসংখ্যা থেকে বুঝতে পারা যায়। অন্য

দিকে মুসলমান জনসাধারণের মধ্যে কংগ্রেসের প্রভাব ক্রমশই কমতে থাকে। তবে কংগ্রেসের জনপ্রিয়তা বাড়ছিল অন্য দিকে। কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ ছাড়া অন্য দলগুলি ধীরে ধীরে জনসাধারণের দ্বারা পরিত্যক্ত হয়। তার ফলে ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে মোট ১৫৮৫টি আসনের মধ্যে যেখানে কংগ্রেস ৭১৪টি আসনে জয়লাভ করেছিল সেখানে ১৯৪৬ সালে তারা ৯২৩টি আসন জিতেছিল। মুসলিম লীগের কথা আগেই বলা হয়েছে।

নির্বাচনের এই ফলাফল থেকেই লক্ষ্য করা গিয়েছিল যে ক্ষমতা হস্তান্তরের ক্ষেত্রে জিন্না এবং মুসলিম লীগের ভূমিকা উপেক্ষা করা যাবে না। স্বাধীনতা সংগ্রামে মুসলিম লীগ এবং হিন্দু মহাসভা কেউই যোগদান করেনি। ইংরেজকে ভারতবর্ষ থেকে চলে যেতে বাধ্য করার কাজে ভারতবর্ষের মধ্যে কংগ্রেসের ছিল একক ভূমিকা। বাংলা, পাঞ্জাব, মহারাষ্ট্র প্রভৃতি অঞ্চলে কয়েকটি ছোটখাট দল অবশ্যই সে কাজে অগ্রসর হয়ে এসেছিল। উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে বাদশা খাঁর খুদা-ই-খিদমদগার অবশ্যই একটি উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিল। কিন্তু সমগ্র ভারতবর্ষে গণঅভ্যুত্থানের মধ্য দিয়ে যে-স্বাধীনতা সংগ্রাম পরিচালিত হচ্ছিল তাতে কংগ্রেস ছাড়া আর কোন দল বিশেষ অংশগ্রহণ করেনি। কংগ্রেস অবশ্যই একটি অসাম্প্রদায়িক দল ছিল। কিন্তু সাম্প্রদায়িক স্বার্থরক্ষার উদ্দেশ্যে গঠিত হিন্দু মহাসভা যেখানে হিন্দুদের মধ্যে একটি শক্তিশালী সংগঠনরূপে গড়ে উঠতে পারেনি সেখানে মুসলিম লীগ মুসলমানদের একটি বড় অংশের মধ্যে তার স্থান শক্ত করে নিতে পেরেছিল। বস্তুত এই বাস্তব অবস্থার পরিপ্রেক্ষিতেই ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে মন্ত্রীমিশন ভারতবর্ষে এসেছিলেন।

১৯৪৬ সালের ১৯শে জানুয়ারি ভারত সচিব পেথিক লরেন্স ইংলন্ডের পার্লামেন্টে ঘোষণা করেছিলেন যে ভারতীয় নেতাদের মতামত যাচাই করে ভারতবর্ষে কীভাবে স্বশাসিত গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠা করা যায় সে সম্পর্কে তাঁরা কয়েকটি পন্থা অবলম্বন করতে চান। সেই পন্থাগুলি হল : (১) একটি সংবিধান রচনার পদ্ধতি কী হবে সে সম্পর্কে যাতে সকলে একটি মীমাংসায় আসতে পারেন তার জন্য ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার নির্বাচিত প্রতিনিধি এবং দেশীয় রাজ্যগুলির সঙ্গে প্রাথমিক আলোচনা করা, (২) একটি সংবিধান রচনাকারী পরিষদ গঠন করা, এবং (৩) ভারতবর্ষে একটি পূর্ণ স্বশাসিত গভর্নমেন্ট প্রতিষ্ঠা করা। পেথিক লরেন্স এই কথাও জানিয়েছিলেন যে এই পন্থাগুলি কার্যকর করার জন্য একটি মন্ত্রীমিশন ভারতবর্ষে গিয়ে ভারতীয় নেতাদের সাহায্য করবে। মন্ত্রী মিশনের সদস্য হবেন তিনি নিজে, স্টাফোর্ড ক্রিপস এবং এ. ভি. আলেকজান্ডার।

এর কয়েক দিন পরে কেন্দ্রীয় আইনসভায় ভাইসরয় জানান যে তিনি বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের নিয়ে তাঁর এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল গঠন করতে চান। একটি গণপরিষদ গঠনের কথাও তিনি উল্লেখ করেছিলেন। কংগ্রেস নেতৃবৃন্দ ভাইসরয়ের এই ঘোষণাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। কিন্তু জিন্না জানিয়ে দেন যে যতক্ষণ না নীতিগতভাবে পাকিস্তানের দাবিকে স্বীকৃতি দেওয়া হচ্ছে ততক্ষণ তিনি কোন রকম সহযোগিতা করবেন না।

পার্লামেন্টে উত্থাপিত পেথিক লরেন্সের প্রস্তাবের উপর বিতর্কে যোগদান করে এটলি জানান (১৫-৩-৪৬) যে ভারতবর্ষে যত তাড়াতাড়ি এবং যত বেশি সম্ভব (as speedily and as fully as possible) স্বাধীনতা দেওয়া যায় তার চেষ্টা করতে তাঁর সহকর্মীরা ভারতবর্ষে যাচ্ছেন। তিনি আরও জানান : "সংখ্যালঘুদের দাবি সম্পর্কে আমরা সম্পূর্ণ

সচেতন। সংখ্যালঘুদের ভয়মুক্ত হয়ে বসবাস করা উচিত। কিন্তু তাই বলে আমরা কোন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কে সংখ্যাগুরুর অগ্রগতির বিরুদ্ধে 'ভেটো' দেবার অধিকার দিতে পারি না।"[৬]

এটলি তাঁর বক্তৃতায় পূর্ণ স্বাধীনতার কথা উল্লেখ না করে 'যতদূর সম্ভব স্বাধীনতা' কথা বলেছিলেন। পক্ষান্তরে এতকালের অনুসৃত ব্রিটিশ নীতি থেকে সরে এসে সংখ্যালঘুদের 'ভেটো' দেবার অধিকারকেও বাতিল করে দিয়েছিলেন। এটলির ভাষণকেও গান্ধীজী এবং কংগ্রেসের নেতারা সমর্থ করেছিলেন। স্বভাবতই জিন্না এতে আপত্তি তুলেছিলেন। মুসলিম জাতি না বলে কেন সংখ্যালঘু বলা হল তা নিয়ে তিনি অভিযোগ করেছিলেন এবং দেশবিভাগ ও পাকিস্তান গঠনের প্রতি তাঁর দাবির কথা তিনি মনে করিয়ে দিয়েছিলেন।

এর কয়েক দিন পরেই ২৩শে মার্চ মন্ত্রীমিশন ভারতবর্ষে এসে পৌঁছান। মন্ত্রীমিশনের অন্যতম সদস্য ক্রিপস তো কয়েক বছর আগে ভারতবর্ষে দৌত্য করতে এসেছিলেন। সেবারে তিনি কারও কাছেই গ্রহণীয় হননি। অন্য যেসব প্রচেষ্টা তার পরে হয়েছিল তাও সফল হয়নি। মনে হয় অতীতের এই অভিজ্ঞতার কথা মনে রেখেই ক্রিপস এবার ভারতবর্ষে পৌঁছিয়েই জানিয়ে দিয়েছিলেন যে তাঁরা খোলা মন নিয়ে এসেছেন। কেননা রানী ভিক্টোরিয়ার সময় থেকে অদ্যাবধি যা কিছু বলা হয়েছে যদি সেগুলির ব্যাখ্যা করা শুরু হয় তবে তার ফলে দুঃখজনক পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। পেথিক লরেন্সও বলেছিলেন যে তাঁদের প্রাথমিক লক্ষ্য হল ভারতবর্ষকে পূর্ণ স্বাধীনতার মর্যাদা দেবার জন্য একটি উপায় বার করা এবং দ্বিতীয়ত একটি মধ্যবর্তীকালীন ব্যবস্থা তৈরি করা।

এইসব কথা বলার দু দিন পরেই পেথিক লরেন্স মুসলিম লীগকেও যে তাঁরা অবহেলা করতে চান না সেকথা পরিষ্কার করে বোঝাবার জন্য একটি বিবৃতিতে বলেছিলেন যে কংগ্রেস অধিকসংখ্যক মানুষের প্রতিনিধিত্ব করে বলে মুসলিম লীগকে কেবল একটি সংখ্যালঘু দল বলে বিবেচনা করা উচিত নয়। প্রকৃতপক্ষে মুসলিম লীগ হল 'মহান মুসলমান সম্প্রদায়ের সংখ্যাগুরুদের প্রতিনিধি'।

কথাটি অবশ্যই সত্য ছিল। তবে পেথিক লরেন্স তাঁর বক্তৃতাতেও মুসলমানদের 'জাতি' বলে উল্লেখ না করে সম্প্রদায় বলেই অভিহিত করেছিলেন। তাঁর কথা থেকে এটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল যে মুসলিম লীগের গ্রহণযোগ্য না হলে কংগ্রেসের একক দাবি অনুযায়ী স্বাধীনতা তাঁরা হস্তান্তর করবেন না। কংগ্রেসের নেতারাও বুঝতে পেরেছিলেন যে আলোচনার মাধ্যমে স্বাধীনতা পেতে হলে মুসলিম লীগকে বাদ দিয়ে এগনো যাবে না। এই উপলব্ধির অর্থ হল স্বাধীনতা লাভ করা এবং দেশবিভাগ মেনে নেওয়া—এই দুটি দাবির মধ্যে দরাদরি করা। বস্তুত মন্ত্রীমিশনের কার্যকলাপ দেশকে এই অনিবার্যতার মধ্যেই টেনে নিয়ে যাচ্ছিল। সেজন্য তাঁদের উদ্যোগকে দেশবিভাগের প্রয়োগ পর্ব বলে গণ্য করা যেতে পারে।

এ কথা অবশ্য ঠিক যে দেশবিভাগ করতেই হবে এমন কোন স্থির সিদ্ধান্ত নিয়ে মন্ত্রীমিশন ভারতবর্ষে আসেননি। সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধান তাঁরা এবার চাইছিলেন সম্পূর্ণ তাঁদের নিজেদের স্বার্থে। ভারতবর্ষ ঐক্যবদ্ধ থাকুক অথবা খণ্ডিত হোক—এই প্রশ্নের চেয়েও তাঁদের কাছে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল যে গোটা ভারতবর্ষ যেন তাঁদের শত্রু শিবিরে পরিণত না হয়ে যায়। যুদ্ধ জয় তাঁদের সামরিক শক্তির হ্রাস ঘটিয়েছে। নতুন শত্রু যেমন সৃষ্টি হচ্ছে তেমনি পরাজিত শত্রুরাও ভবিষ্যতে আবার প্রবল হতে পারে। এইসব বিবেচনা করেই মন্ত্রীমিশন ভারতবর্ষের নেতাদের সঙ্গে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়

নিয়ে আলোচনা করতে চাইছিলেন। আর তা শুরু করেছিলেন নেতাদের সঙ্গে ব্যক্তিগত আলোচনার মধ্য দিয়ে।

মন্ত্রীমিশনের আহ্বানে নেতাদের সম্মেলনও অনুষ্ঠিত হয়েছিল। ১৯৪৬ সালের ৯ই মে সিমলায় নেতৃসম্মেলন আহূত হয়। তাতে কংগ্রেসের পক্ষে মৌলানা আজাদ, জওহরলাল নেহরু, বল্লভভাই প্যাটেল এবং আবদুল গফুর খাঁ যোগদান করেছিলেন। মুসলিম লীগের পক্ষে ছিলেন জিন্না, লিয়াকত আলি খাঁ, মহম্মদ ইসমাইল এবং আবদুর বর নিস্তার। প্রয়োজনে পরামর্শ দেবার জন্য গান্ধীজীও সিমলায় উপস্থিত ছিলেন। সাত দিন ধরে আলোচনা হয়। মন্ত্রীমিশন চেয়েছিলেন যে কংগ্রেস এবং লীগের মধ্যে মতৈক্য হোক। এই দিকে লক্ষ্য রেখে তাঁরা মীমাংসার সূত্ররূপে একটি প্রস্তাব পেশ করেছিলেন। সেই প্রস্তাবে বলা হয়েছিল :

(১) একটি সর্বভারতীয় ফেড়ারেল ইউনিয়ন গঠিত হবে। এই ইউনিয়নের কাছে থাকবে—পররাষ্ট্র, প্রতিরক্ষা, যোগাযোগ এবং মৌলিক অধিকার।

(২) অবশিষ্ট সব ক্ষমতা প্রদেশগুলির কাছে থাকবে।

(৩) কয়েকটি প্রদেশ নিয়ে একাধিক 'গ্রুপ' গঠন করা হবে এবং এই গ্রুপগুলি ঠিক করবে যে প্রদেশের এক্তিয়ারভুক্ত কোন্ কোন্ বিষয় সম্মিলিতভাবে তাদের কাছে থাকবে।

(৪) গ্রুপগুলি তাদের নিজস্ব শাসন বিভাগ ও আইনসভা গঠন করতে পারবে।

(৫) মুসলমানরা এবং হিন্দুরা যেসব প্রদেশে সংখ্যাগরিষ্ঠ সেইসব প্রদেশ স্বতন্ত্রভাবে কোন গ্রুপে যোগ দিক বা না দিক সেগুলি থেকে সমান অনুপাতে সদস্যদের নিয়ে এবং দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে কেন্দ্রীয় আইনসভা গঠিত হবে। *

(৬) কেন্দ্রীয় আইনসভা জনপ্রতিনিধিত্বের যে অনুপাতে গঠিত হবে সেই অনুপাতের ভিত্তিতেই ফেডারেল ইউনিয়ন গঠিত হবে।

(৭) ইউনিয়নের এবং যদি গ্রুপ গঠিত হয় তবে সেই গ্রুপগুলির সংবিধানে এই মর্মে একটি ব্যবস্থা থাকবে যে যে-কোন প্রদেশ প্রথম দশ বছর উত্তীর্ণ হওয়ার পর এবং তারপরে প্রতি দশ বছর অন্তর সংবিধানের শর্তগুলির পুনর্বিবেচনা করতে পারবে।

(৮) উল্লেখিত ভিত্তিতে একটি গণপরিষদ গঠন করা হবে।

কীভাবে গণপরিষদ গঠিত হবে সে সম্পর্কেও মন্ত্রীমিশন কতকগুলি সুপারিশ করেছিলেন। অন্যান্য বিষয়ের মধ্যে তাতে এ কথাও বলা হয়েছিল যে গণপরিষদের একটি অংশ হিন্দুপ্রধান অঞ্চলগুলির, আর একটি অংশ মুসলমানপ্রধান অঞ্চলগুলির এবং তৃতীয় একটি অংশ দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিধিত্ব করবে। প্রাথমিক মীমাংসা হয়ে যাবার পর যে কোন প্রদেশ ইচ্ছা করলে একটি গ্রুপ থেকে বেরিয়ে অন্য গ্রুপে যেতে পারবে অথবা আদৌ কোন গ্রুপে না গিয়ে স্বতন্ত্রভাবে থাকতে পারবে।

মন্ত্রীমিশন তাঁদের এই প্রস্তাবটি সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে উত্থাপন করার আগে তার একটি প্রতিলিপি গান্ধীজীর কাছে পাঠিয়েছিলেন। প্রতিলিপিটি পাওয়ামাত্র গান্ধীজী স্টাফোর্ড ক্রিপসকে লিখেছিলেন যে প্রস্তাবটি নিয়ে কংগ্রেসের মধ্যে আলোচনা চলছে। তাঁরা মনে করছেন যে প্রস্তাবটি যদি একবার গ্রহণ করা হয় তবে তার সবকটি শর্ত মানতে

* ১৯৪১ সালের লোকগণনা অনুযায়ী কয়েকটি প্রদেশের মুসলিম জনসংখ্যা নিম্নরূপ ছিল—বাংলা ৫৩·৪%, পাঞ্জাব ৫২·৯%, সিন্ধুপ্রদেশ ৭০·৭%, উঃ পঃ সীমান্তপ্রদেশ ৭৬·৪%, বেলুচিস্তান ৯১·৫% এবং কাশ্মীর ৭৬·৪%। এ থেকে দেখা যায় যে সমগ্র ভারতবর্ষের মুসলমান জনসংখ্যার প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ লোক এই ছটি এলাকায় বাস করতেন।

কংগ্রেস বাধ্য থাকবে। লীগের ক্ষেত্রেও এ কথা প্রযোজ্য। কিন্তু ক্রিপস তো তাঁকে জানিয়েছেন যে প্রস্তাবটি কারও কাছে বাধ্যতামূলক নয়। অতএব গান্ধীজীর পরামর্শ হল ক্রিপস সেই মর্মে একটি বিবৃতি দিন। গান্ধীজী ক্রিপসকে তাঁর চিঠিতে এ কথাও লিখেছিলেন : "ছটি হিন্দুপ্রধান প্রদেশ এবং পাঁচটি মুসলমানপ্রধান প্রদেশের প্যারটি নিয়ে যে অসুবিধা দেখা দিয়েছে তা দুর্লঙ্ঘ্য। মুসলমানপ্রধান প্রদেশগুলির লোকসংখ্যা নয় কোটির বেশি আর সেক্ষেত্রে হিন্দুপ্রধান প্রদেশগুলির লোকসংখ্যা উনিশ কোটিরও বেশি। সেই বিচারে এটি পাকিস্তানের চেয়েও খারাপ।" উত্তরে ক্রিপস লিখেছিলেন : "এটি-যে পাকিস্তানের চেয়েও খারাপ—এমন কথা আমি মেনে নিতে পারি না। যে-অসুবিধা দেখা দিয়েছে লীগের সম্মতিক্রমে কোন আন্তর্জাতিক সালিশীর ব্যবস্থা করে তা যদি উত্তীর্ণ হওয়া সম্ভব হয় তবে তার পথে প্রতিবন্ধকতা তো কিছু নেই।" বস্তুত গান্ধীজী ক্রিপসকে লেখা তাঁর চিঠিতে যেসব ক্ষেত্রে কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মতানৈক্য ছিল তার মীমাংসা করার জন্য একটি নিরপেক্ষ অ-ব্রিটিশ ট্রাইবুনাল (impartial non-British tribunal should award on this as any other matters of difference otherwise incapable of adjustment) গঠনের ইঙ্গিত করেছিলেন। কিন্তু কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ কারুরই সেই প্রস্তাব মনঃপূত হয়নি। ফলে মন্ত্রীমিশনের আহুত সিমলা সম্মেলন ১২ই মে ব্যর্থ হয়েছে বলে ঘোষণা করা হয়।

প্রকৃতপক্ষে সিমলায় সম্মেলন আহ্বান এবং সেখানে প্রস্তাব উত্থাপনের পিছনে মন্ত্রীমিশনের দুটি যুক্তি কাজ করেছিল। তাঁরা মনে করেছিলেন যে পাকিস্তান সৃষ্টি ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক সমস্যা সমাধানের পথ নয় এবং পাকিস্তান যদি গঠিত হয় তা হলে সেই সার্বভৌম রাষ্ট্রের মধ্যে পাঞ্জাব, বাংলা এবং অসমের যেসব জেলায় অমুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেইসব অঞ্চলকে পাকিস্তানের অন্তর্ভুক্ত করা যুক্তিযুক্ত হবে না। সুতরাং মাঝামাঝি কোন একটি জায়গায় মীমাংসায় আসতে হবে। সেজন্য তাঁদের আগ্রহে মধ্যপন্থা আবিষ্কারের জন্য কংগ্রেসের পক্ষে নেহরু এবং মুসলিম লীগের পক্ষে জিন্না আলোচনায় বসেছিলেন। কিন্তু তাঁরা কোন সিদ্ধান্তে পৌঁছতে পারেননি। তার ফলে এই সিমলা সম্মেলনেরও সমাপ্তি ঘোষিত হয়েছিল। তবে এই ঘোষণার চার দিন পরেই অর্থাৎ ১৬ই মে ১৯৪৬ মন্ত্রীমিশন তাঁদের তরফ থেকে আর একটি সুপারিশ পেশ করেছিলেন। সেই সুপারিশে বলা হয়েছিল যে ভারতবাসীরা নিজেরাই ভারতবর্ষের সংবিধান রচনা করবে এবং যত দিন না সেই কাজ শেষ হয় তত দিন প্রশাসনের কাজ চালাবার জন্য একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হবে।

এই সুপারিশের প্রসঙ্গে বলতে গিয়ে পেথিক লরেন্স তাঁর বেতার ভাষণে পাকিস্তান সৃষ্টির নানান অসুবিধার কথা উল্লেখ করে বলেছিলেন : "ব্রিটিশ সরকারকে আমরা এমন পরামর্শ দিতে পারি না যাতে ব্রিটেনের হাতে বর্তমানে যে ক্ষমতা রয়েছে তাকে সম্পূর্ণভাবে পৃথক দুটি সার্বভৌম রাষ্ট্রের হাতে তুলে দিতে হয়।" অতএব তাঁদের সুপারিশ হল :

(১) ভারতীয় ইউনিয়ন ব্রিটিশশাসিত ভারতবর্ষ এবং দেশীয় রাজ্যগুলিকে নিয়ে গঠিত হবে। এই ইউনিয়ন সরকারের হাতে পররাষ্ট্রনীতি, প্রতিরক্ষা এবং যোগাযোগ ব্যবস্থার দায়িত্ব থাকবে। এই দায়িত্ব পালনের জন্য যে-অর্থের প্রয়োজন হবে তা সংগ্রহ করার অধিকারও ইউনিয়ন সরকারের থাকবে।

(২) ইউনিয়নের একটি শাসন পরিষদ এবং একটি আইনসভা থাকবে। ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের এবং দেশীয় রাজ্যগুলির প্রতিনিধিরা এতে থাকবেন। আইনসভায় যদি এমন

কোন বিষয় উত্থাপিত হয় যার সঙ্গে কোন বৃহৎ সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন জড়িত তা হলে উপস্থিত প্রতিনিধিদের ভোটাধিক্যে এবং প্রধান দুই সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিদের পৃথক ভোটাধিক্যে সেই বিষয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হবে। তা ছাড়াও ভোট দেবার সময় মোট সদস্যদের অধিকাংশকে সভায় উপস্থিত থাকতে হবে এবং ভোট দিতে হবে।

(৩) ইউনিয়নের এক্তিয়ারভুক্ত বিষয়গুলি ছাড়া অন্যান্য বিষয়ের দায়িত্বভার এবং তা ছাড়াও অবশিষ্ট যাবতীয় ক্ষমতা প্রদেশগুলির উপর বর্তাবে।

(৪) ইউনিয়নের কাছে যেসব বিষয় ও ক্ষমতা ছেড়ে দেওয়া হবে তা বাদে অন্যান্য বিষয় ও ক্ষমতা দেশীয় রাজ্যগুলির ক্ষেত্রে তাদের কাছেই থাকবে।

(৫) প্রদেশগুলি তাদের শাসন পরিষদ ও আইনসভাসহ যে কোন গ্রুপে যোগদান করতে পারবে এবং প্রত্যেক গ্রুপই ঠিক করে নেবে যে তার অন্তর্ভুক্ত প্রদেশগুলির কোন্ কোন্ দায়িত্ব গোষ্ঠীগতভাবে তাদের পালন করতে হবে।

(৬) ইউনিয়ন এবং বিভিন্ন গ্রুপের শাসনতন্ত্রে প্রতি দশ বছর অন্তর সংবিধানের শর্তগুলির পুনর্বিবেচনা করার অধিকার থাকবে।

এই ঘোষিত শর্তাবলী বিচার করলে দেখা যায় যে মন্ত্রীমিশন সিমলায় যে-প্রস্তাব পেশ করেছিলেন তার সঙ্গে এর প্রচুর মিল রয়েছে। মন্ত্রীমিশনের এই সুপারিশগুলির প্রসঙ্গে গান্ধীজী লিখেছিলেন : "ব্রিটিশ সরকারের পক্ষ থেকে মন্ত্রীমিশন ও ভাইসরয় যে 'স্টেট পেপার' প্রকাশ করেছেন চার দিন ধরে তার পুঙ্খনাপুঙ্খভাবে পরীক্ষা করে আমার এই বিশ্বাস জন্মেছে যে বর্তমান অবস্থায় এর চেয়ে ভাল কোন দলিল ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের পক্ষে প্রস্তুত করা সম্ভব ছিল না। ইচ্ছা করলে আমরা দেখতে পাব যে এর মধ্যে আমাদের দুর্বলতাই প্রতিফলিত হয়েছে। কংগ্রেস ও লীগ এক মত হয়নি। হতে পারেনি। আমরা যদি বোকার মতো নিজেদের বোঝাই যে ব্রিটেনই যাবতীয় বিরোধের স্রষ্টা তা হলে সেটি একটি মারাত্মক ভুল হবে।"[৯]

ইংরেজ সরকারের অভীপ্সার গান্ধীজীকৃত এই মূল্যায়ন তাঁর চিন্তার পরিবর্তন সূচিত করে। গান্ধীজী এবং কংগ্রেসের নেতারা এত কাল বলে আসছিলেন যে ইংরেজদের উপস্থিতি এবং উস্কানির ফলেই রাজনৈতিক ক্ষেত্রে হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে ঐক্য সাধিত হচ্ছে না। গান্ধীজী তো এমন কথাও বলেছিলেন যে ইংরেজ সরকার জিন্নাকে স্বাধীনতার বিরোধিতা করার অস্ত্ররূপে ব্যবহার করছে। মন্ত্রীমিশনের সুপারিশগুলি বিচার করার পর গান্ধীজীর সেই ধারণার পরিবর্তন হয়েছিল। তাঁর মনে হয়েছিল যে পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ইংরেজ সরকার একটি ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষের কাছেই ক্ষমতার হস্তান্তর করতে চেয়েছিল। কিন্তু সেই কাজে বাধা হয়ে উঠেছিল ভারতীয়দের দুর্বলতা—তাদের পারস্পরিক অবিশ্বাস এবং অনৈক্য।

মন্ত্রীমিশনের সুপারিশে যে ত্রুটিগুলি ছিল সেগুলি গান্ধীজীর দৃষ্টি এড়িয়ে যায়নি। উল্লেখিত প্রবন্ধে তার প্রতিও তিনি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। গ্রুপ গঠন করলে এবং তার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেলে প্রদেশগুলিকে স্বাধীন করার যে প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়েছিল তা বানচাল হয়ে যেতে পারে। সেই প্রসঙ্গে তিনি লিখেছিলেন : "ভারতবর্ষে পাঞ্জাবই হল শিখদের একমাত্র নিজভূমি। শিখদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে কি পাঞ্জাবকে সেই অঞ্চলের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা হবে যার মধ্যে বেলুচিস্তান এবং সিন্ধুপ্রদেশ থাকবে ? অথবা ঘোষণায় যাকে 'খ' বলে বর্ণনা করা হয়েছে সেই পাঞ্জাবের সঙ্গেই কি সীমান্তপ্রদেশকে তাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধে অন্তর্ভুক্ত করা হবে ? অথবা অসমকে যুক্ত করা হবে 'গ'-এর সঙ্গে ?"

আসল কথা হল, মন্ত্রীমিশনের সুপারিশে তাঁদের সদিচ্ছা প্রকাশিত হলেও ভারতবর্ষের সাম্প্রদায়িক মতানৈক্যের সমস্যাটিও স্পষ্ট করে তুলে ধরা হয়েছিল। তার ফলে শুভাশুভের দোদুল্যমান অবস্থার মধ্যেই এটিকে গ্রহণ অথবা বর্জনের প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল। কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ উভয়ের কাছে প্রশ্নটি একইভাবে দেখা দিয়েছিল। তবে ক্ষমতা হস্তান্তরিত হবার সম্ভাবনা আছে তা দেখতে পেয়ে কংগ্রেস যেমন মন্ত্রীমিশনের সুপারিশটি মেনে নিতে সম্মত হয়েছিল তেমনি মুসলিম লীগও সুপারিশটি গ্রহণ করলে মুসলমানরা অন্তত কিছুটা স্বাতন্ত্র্য লাভ করতে পারবেন এই ভেবে এটি গ্রহণ করেছিল। কিন্তু গ্রুপে যাওয়ার বাধ্যবাধকতা নিয়ে অসম আপত্তি তোলে। স্বাভাবিক কারণেই তাঁদের ভয় ছিল যে বাংলার সঙ্গে একই গ্রুপের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত হলে সমগ্র অসম মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলের মধ্যে ঢুকে যাবে। তাঁদের এই ভীতির প্রতি গান্ধীজীর সহানুভূতি ছিল। তিনি মনে করেছিলেন যে যে-যুক্তিতে ধর্মের নামে দেশকে ভাগ করার কথা বলা হচ্ছে, সেই যুক্তিতেই মুসলমানপ্রধান বাংলার গ্রুপে অসমের যেতে না চাওয়া স্বাভাবিক। তিনি এ কথাও বলেছিলেন যে অসম যদি কংগ্রেস কমিটির কাছ থেকে স্পষ্ট নির্দেশ না পায় তবে তার উচিত হবে গ্রুপে না যাওয়া। সেই অবস্থায় অসম প্রতিবাদ জানাবে এবং গণপরিষদ থেকে বেরিয়ে আসবে। এটি হবে কংগ্রেসের জন্যই কংগ্রেসের সত্যাগ্রহ। গ্রুপ গঠন নিয়ে এই রকম অনিশ্চয়তার মধ্যে মন্ত্রীমিশনের ১৬ই মের প্রস্তাব বাতিল হয়ে যায়।[১০] অবশ্য তা হয়েছিল আরও জল ঘোলা হবার পর।

মন্ত্রীমিশনের গ্রুপ গঠনের প্রস্তাবকে আজাদ যে-প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন তার প্রতিধ্বনি বলে মনে করা যেতে পারে। আজাদ বুঝেছিলেন যে সমগ্র ভারতবর্ষকে নিয়ে যদি একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র (Unitary Government) গঠন করা হয় তা হলে সংখ্যাধিক্যের জোরে হিন্দুরা সংখ্যালঘু মুসলমানদের উপর চিরকাল আধিপত্য করে যাবে। এইখানেই মুসলমানদের ভয়। সেজন্য আজাদ মন্ত্রীমিশনকে একটি ফেডারেল রাষ্ট্র গঠনের কথা বলেছিলেন। সেখানে মুসলমানপ্রধান প্রদেশগুলিতে মুসলমানরা আভ্যন্তরীণ কাজকর্মে পূর্ণ কর্তৃত্ব ভোগ করবে। পররাষ্ট্র, দেশরক্ষা এবং যোগাযোগের মতো বিষয়গুলির কর্তৃত্ব ফেডারেল রাষ্ট্রের হাতে থাকবে। আজাদ তাঁর এই প্রস্তাব মন্ত্রীমিশনকে জানাবার আগে সহকর্মীদের সঙ্গে আলোচনা করেননি। তবে মন্ত্রীমিশন আজাদের প্রস্তাবে উৎফুল্ল হয়েছিলেন। পরে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় আজাদ যখন তাঁর প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন তখন কোন কোন সদস্য, বিশেষ করে সর্দার প্যাটেল এর সার্থকতা এবং ফেডারেল রাষ্ট্রের সীমানা কী হবে তা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছিলেন। আজাদ পরে জানিয়েছেন যে গান্ধীজী সাম্প্রদায়িক সমস্যার সমাধানে এটিকে একটি গ্রহণযোগ্য পন্থা বলে মনে করেছিলেন।[১১]

এই প্রসঙ্গে আজাদের বক্তব্য হল : "১৬ই মে মন্ত্রীমিশন তাঁদের পরিকল্পনা প্রকাশ করেছিলেন। এই পরিকল্পনাটি মূলত আমার ১৫ই এপ্রিলের প্রস্তাবের অনুরূপ ছিল। মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাবে উল্লিখিত হয় যে কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে বাধ্যতামূলকভাবে মাত্র তিনটি বিষয় থাকবে। এই তিনটি বিষয় হল—প্রতিরক্ষা, পররাষ্ট্র এবং যোগাযোগ বিভাগ। আমার প্রস্তাবে এই কথাই আমি বলেছিলাম। মিশন আর একটি নতুন বিষয় তাঁদের পরিকল্পনায় জুড়ে দেন। সেটি হল সমগ্র দেশকে ক, খ, গ—এই তিনটি এলাকায় বিভক্তকরণ। মিশন মনে করেছিলেন যে এতে সংখ্যালঘুদের মনে আস্থার ভাব ফিরে আসবে। পরিকল্পিত 'খ' এলাকা হিসেবে দেখানো হয়েছিল পাঞ্জাব, সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম

সীমান্তপ্রদেশ এবং ব্রিটিশ বেলুচিস্তান। এটি মুসলমানপ্রধান অঞ্চল। 'গ' এলাকায় দেখানো হয়েছিল বাংলা এবং অসমকে। এই এলাকায় মুসলমানরা সংখ্যায় সামান্য বেশি ছিলেন। মন্ত্রীমিশন মনে করেছিলেন, এই ব্যবস্থায় মুসলিম সংখ্যালঘুদের (সমগ্র ভারতবর্ষের দৃষ্টিতে—ভ. প্র. চ.) পূর্ণ সুযোগ-সুবিধা দেওয়া হবে এবং মুসলিম লীগের আশঙ্কাও বিদূরিত হবে। মিশন আমার আর একটি প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলেন। এটি হল, সরকারের বেশির ভাগ বিষয়ই প্রদেশগুলির কর্তৃত্বাধীন থাকবে। এই হিসেবে মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলি পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনাধিকার লাভ করবে।"[১২]

যাই হোক, পূর্ব কথায় ফিরে যাওয়া যাক। আগেই বলা হয়েছে যে মুসলিম লীগ মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। জিন্না মন্তব্য করেছিলেন যে সংখ্যালঘুদের সমস্যার এর চেয়ে ভাল সমাধান হতে পারে না এবং তিনি নিজেও এর চেয়ে বেশি কিছু করতে পারতেন না। অন্যদিকে কংগ্রেস মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাবিত ভবিষ্যৎ ভারতবর্ষের পরিকল্পনা গ্রহণ করলেও অন্তবর্তীকালীন সরকার গঠনের প্রস্তাব সমর্থন করেনি।[১৩]

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি প্রস্তাবটি গ্রহণ করেছিল ২৬শে জুন ১৯৪৬। তার কয়েক দিন পরে, ১০ই জুলাই ১৯৮৬ নেহরু একটি সাংবাদিক সম্মেলন আহ্বান করেন। তিনি তখন কংগ্রেসের সভাপতি। এই সম্মেলনে একজন সাংবাদিক নেহরুকে প্রশ্ন করেছিলেন যে কংগ্রেস কি মন্ত্রীমিশনের পরিকল্পনা সামগ্রিকভাবে মেনে নিয়েছে? উত্তরে নেহরু বলেছিলেন যে চুক্তিগুলির দ্বারা কংগ্রেস কোনভাবেই দায়বদ্ধ নয় এবং পরিস্থিতি যেভাবে দেখা দেবে তার মোকাবিলার ক্ষেত্রে সে স্বাধীন। তিনি এ কথাও বলেছিলেন যে সংখ্যালঘু সমস্যার সমাধানে কংগ্রেস আগ্রহী। কিন্তু তাতে ইংরেজদের অথবা আর কারও হস্তক্ষেপ মেনে নিতে কংগ্রেস রাজি নয়।

ভারতবর্ষকে তিনটি গ্রুপে ভাগ করবার যে-প্রস্তাব মন্ত্রীমিশন করেছিলেন সেই প্রসঙ্গে নেহরু বলেছিলেন : "সমস্যাটিকে যেদিক থেকেই দেখা যাক না কেন গ্রুপ গঠিত হবার সম্ভাবনা খুব কম। গ্রুপ 'এ' অর্থাৎ হিন্দুরা গ্রুপ গঠনের বিরোধিতা করবে। খুব জোরের সঙ্গেই বলা যায় যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশের পক্ষে গ্রুপ সমর্থন করার সম্ভাবনা আদৌ নেই। এর অর্থ হল গ্রুপ 'বি' ধসে যাবে। বাংলা এবং অসমেরও গ্রুপ গঠনের বিরোধিতা করার সম্ভাবনা বেশি।"[১৪]

নেহরুর সাংবাদিক সম্মেলনের বক্তব্য বিরূপ প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি করে। আপোসের যে পরিবেশ সৃষ্টি হয়েছিল তা নষ্ট হয়ে যায়। পাকিস্তানের ছায়াটুকু গ্রহণ করে জিন্নার মনে যে বেদনা সৃষ্টি হয়েছিল তা থেকে মুক্ত হবার সুযোগ তিনি এবার খুঁজে পান। কংগ্রেসের এবং হিন্দু নেতাদের প্রতি তাঁর যে অবিশ্বাসকে তিনি এত দিন প্রশ্রয় দিয়ে এসেছিলেন নেহরুর বিবৃতি তাকে আবার জাগিয়ে তোলে। তার ফলে তাঁর নেতৃত্বে মুসলিম লীগ মন্ত্রীমিশনের প্রতি তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়। শুধু তাই নয়। মুসলিম লীগ তাদের দাবি আদায়ের জন্য ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্টের দিনটিকে 'ডাইরেক্ট অ্যাকশন' বা প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিনরূপে উদ্‌যাপনের জন্য মুসলমান জনসাধারণের প্রতি আবেদন জানায়।

মুসলিম লীগ মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাবের প্রতি তাদের সমর্থন প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল ১৯৪৬ সালের ২৯শে জুলাই। তাতে লীগ জানিয়েছিল যে নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বেও তারা মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। কিন্তু যেহেতু কংগ্রেস এটি শর্তসাপেক্ষে গ্রহণ করার কথা বলেছে সেইহেতু তাদের পক্ষে প্রস্তাবটিকে আর সমর্থন

করা সম্ভব নয়। লীগের প্রস্তাবে বলা হয়েছিল : "কংগ্রেস এটি পরিষ্কার করে জানিয়েছে যে তারা পরিকল্পনাটির কোন নির্দেশ (term) অথবা তার মৌলিক বিষয়গুলি গ্রহণ করেনি। তারা কেবল গণপরিষদে যেতে সম্মত হয়েছে। তার বেশি নয়। আর গণপরিষদ হল একটি সার্বভৌম সংস্থা। যে উদ্দেশ্যের জন্য এটিকে গঠন করার প্রস্তাব করা হয়েছে তাকে সম্পূর্ণরূপে উপেক্ষা করে এই গণপরিষদ তার ইচ্ছামতো যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারে। পরবর্তী সময়ে এ কথা সন্দেহাতীতরূপে আরও পরিষ্কারভাবে বলা হয়েছে। ৬ই জুলাই বোম্বাইতে অনুষ্ঠিত অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের বক্তৃতায় এবং বোম্বাইতে ১০ই জুলাই কংগ্রেস সভাপতি পণ্ডিত জওহরলাল নেহরুর বিবৃতিতে। অতএব কাউন্সিল মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাবের প্রতি তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিচ্ছে।"

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম সম্পর্কিত প্রস্তাবটিতে বলা হয়েছিল : "অখিল ভারত মুসলিম লীগের কাউন্সিল এই দৃঢ় মত পোষণ করে যে মুসলমান জাতির কাছে এখন সেই সময় এসেছে যখন তারা তাদের ন্যায্য দাবি আদায় করার জন্য প্রত্যক্ষ সংগ্রামে প্রবৃত্ত হবে।"[১৫] প্রত্যক্ষ সংগ্রামের এই আহ্বান ইংলন্ডের শ্রমিক সরকারের কাছে ভাল লাগেনি। তার কারণ হয়তো এই যে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য মনে মনে তাঁরা যে ছক এঁকে রেখেছিলেন এর ফলে তা বিঘ্নিত হয়েছিল।

মুসলিম লীগের এই দুটি প্রস্তাবই যে জওহরলালের সাংবাদিক সম্মেলনে প্রদত্ত বিবৃতির প্রতিক্রিয়া তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু সম্ভবত সেটি উপলক্ষ হলেও একমাত্র কারণ নয়। মনে হয় এ ক্ষেত্রেও জিন্না এবং মুসলিম লীগের চিরাচরিত দ্বৈত ভূমিকা ক্রিয়াশীল হয়েছিল। এই কথা মনে করার কারণ হল এই যে মন্ত্রীমিশন যখন নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করছিলেন সেই সময়েই অর্থাৎ ১০-৪-৪৬ তারিখে মুসলিম লীগ পাকিস্তানের দাবি উল্লেখ করে জানিয়ে দিয়েছিল যে দুটি গণপরিষদ গঠিত না হলে তারা কোন পরিকল্পনা গ্রহণ করবে না এবং সর্বপ্রকারে তাকে বাধা দেবে।[১৬] আলোচনা চলার সময়েই এই রকম একটি প্রস্তাব গ্রহণের উদ্দেশ্য এই হতে পারে যে মুসলিম লীগ চাইছিল যে তাদের দাবির কথা তুলে ধরে একটি চাপ বজায় রাখা। কিন্তু যে দাবি আগে থেকেই তোলা ছিল এবং যে দাবি নিয়েই একটি মীমাংসায় পৌঁছবার জন্য আলোচনা শুরু হয়েছে তাকেই আলোচনার শর্তরূপে উত্থাপন করা কখনই সুস্থ পরিবেশ সৃষ্টির পক্ষে সহায়ক হতে পারে না। তা ছাড়া এই প্রস্তাবেই সব রকমে বাধা সৃষ্টির হুমকিও দেওয়া হয়েছিল। আরও মজার কথা হল যে এইরকম একটি প্রস্তাব থাকা সত্ত্বেও মুসলিম লীগ মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। অর্থাৎ সাময়িকভাবে তারা পিছু হটেছিল। এবার সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়ে তারা নিজেদের জায়গায় ফিরে আসে।

যাই হোক, লীগ কর্তৃক সমর্থন প্রত্যাহার করে নেবার প্রস্তাব দেশে এক অচলাবস্থার সৃষ্টি করেছিল। ওয়াভেল নিজেও বিপাকে পড়ে যান। কংগ্রেসও এক অবাঞ্ছিত অবস্থার মধ্যে জড়িয়ে পড়ে। মৌলানা আজাদের মতে জওহরলালের বিবৃতিতে কংগ্রেসের স্বীকৃত নীতি প্রকাশিত হয়নি। কংগ্রেস যখন একবার পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেছে তখন ইচ্ছা করলেও তার হেরফের সে করতে পারে না। যদি কোন রকম পরিবর্তন করতেই হয় তা হলে 'আলোচনায় অংশগ্রহণকারী এবং দলিলে স্বাক্ষরকারী অন্যান্য দলের মতামত' নেওয়া প্রয়োজন। আজাদ বলেছেন : "আমি স্পষ্ট দেখতে পাই, যে-পরিকল্পনা নিয়ে আমি এত দিন অক্লান্তভাবে কাজ করে এসেছি তা আমাদেরই অবিমৃষ্যকারিতার ফলে বানচাল হবার

অবস্থায় এসে পড়েছে।" কথাটি সম্পূর্ণ অসঙ্গত নয়। বস্তুত এই উদ্ভূত পরিস্থিতি কীভাবে অতিক্রম করা যায় তা আলোচনার জন্য ৮ই আগস্ট ১৯৪৬ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভা আহূত হয়। সেখানে 'জওহরলালের সাংবাদিক সম্মেলনের কথা উল্লেখ না করে শুধু এ আই সি সি (অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির) সিদ্ধান্তকেই কংগ্রেসের একমাত্র সিদ্ধান্ত বলে পুনরুল্লেখ করা হয়।'[১৭] উপরন্তু কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি এই সভায় মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাবটি সামগ্রিকভাবে গ্রহণ করেছিল। তার অর্থ হল কংগ্রেস যেমন সুদূরপ্রসারী পরিকল্পনাটি গ্রহণ করেছিল তেমনি অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠনের প্রস্তাবও মেনে নিয়েছিল। কংগ্রেসের এই প্রস্তাব ওয়াভেলেরও ভাল লাগে। তিনি জওহরলালকে সরকার গঠন করবার জন্য আহ্বান করেন। কিন্তু জিন্নার মতের কোন পরিবর্তন হয় না। তিনি তাঁর সিদ্ধান্তেই অটল থাকেন। ভাইসরয়ের অনুরোধে জওহরলাল জিন্নার বাড়িতে গিয়ে সহযোগিতা করার জন্য অনুরোধ জানান। কিন্তু সেই অনুরোধও প্রত্যাখ্যাত হয়। জিন্না প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কর্মসূচিতে অটল থাকেন। বস্তুত ১৯৪৬ সালের ১৫ই আগস্ট বোম্বাইতে জওহরলাল যখন জিন্নার সঙ্গে আলোচনা করছিলেন তখন মুসলিম লীগ কলকাতায় প্রত্যক্ষ সংগ্রামের প্রস্তুতির কাজ শেষ করে ফেলেছিল।

প্রকৃতপক্ষে মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ফলে ক্ষমতা হস্তান্তরের বাতাবরণ পরিবর্তিত হয়ে গিয়েছিল। কলকাতার ঘটনা রাজনীতিতে একটা নতুন মোড় এনে দেয়। ওয়াভেল কলকাতায় চলে আসেন এবং দাঙ্গা বিধ্বস্ত অঞ্চল পরিদর্শন করার পর দিল্লীতে ফিরে গিয়ে একটি বেতার ভাষণ দেন। তাতে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রসঙ্গ উত্থাপন করে তিনি প্রদেশগুলির স্বায়ত্তশাসনের অধিকারের কথা উল্লেখ করেন। তিনি বলেন যে প্রাদেশিক প্রশাসনে কেন্দ্রীয় সরকারের কোন রকম হস্তক্ষেপ করবার ক্ষমতা থাকবে না। কংগ্রেস নেতাদেরও তিনি পরামর্শ দেন যে তাঁরা যেন সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বার্থে প্রদেশগুলির গ্রুপভুক্ত হবার স্বাধীনতার বিষয়টি পুনর্বিচার করেন। ওয়াভেলের বক্তব্য থেকে এটি স্পর্শ হয়ে উঠেছিল যে তিনি এবং তাঁর ব্রিটিশ পরামর্শদাতারা কলকাতার দাঙ্গায় প্রাদেশিক সরকারের নিষ্ক্রিয়তা এবং সরাসরি উস্কানিকে তাঁদের স্বায়ত্তশাসনভুক্ত অবাধ স্বাধীনতার বিষয় বলে গণ্য করেছিলেন। আর যেহেতু মুসলিম লীগ রাজনৈতিকভাবে ক্ষুব্ধ সেইহেতু কলকাতায় তারা যে অরাজকতা সৃষ্টি করেছিল তা স্বাভাবিক, ক্ষমার যোগ্য এবং প্রাথমিকভাবে ন্যায়সঙ্গত বলেই ভাইসরয় এবং তাঁর সঙ্গীরা মনে করেছিলেন। এর অর্থ হল, সংখ্যাগরিষ্ঠের অগ্রগতিতে সংখ্যালঘুর ভেটো প্রদানের অধিকার দেওয়া হবে না—এটলির এই ঘোষণার পরেও ওয়াভেল সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির অজুহাতে মুসলিম লীগের সমর্থনকে গুরুত্ব দিচ্ছিলেন। এই মানসিকতা থেকেই তিনি প্রস্তাব করেছিলেন—সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির স্বার্থে কংগ্রেস ১৬ই মের বিবৃতির উদ্দেশ্যটি গ্রহণ করতে প্রস্তুত। সেই উদ্দেশ্যটি হল গ্রুপ যদি তৈরি হয় তবে নতুন সংবিধান রচিত এবং প্রথম সাধারণ নির্বাচন হওয়ার পর নতুন করে আইনসভা গঠিত না হওয়া পর্যন্ত প্রদেশগুলির গ্রুপে যোগদান করার বা না করার ব্যাপারে কোন স্বাধীনতা থাকবে না।[১৮]

ওয়াভেলকে এই রকম একটি প্রস্তাব উত্থাপন করতে প্ররোচিত করেছিলেন মুসলিম লীগ নেতা এবং জিন্নার কাছের মানুষ খাজা নাজিমুদ্দিন। তিনি বলেছিলেন যে গ্রুপের অন্তর্ভুক্ত কোন সংখ্যালঘুকে দশ বছরের মধ্যে বাইরে চলে যাবার অধিকার না দেওয়ার শর্ত যদি কংগ্রেস মেনে নেয় তা হলে মুসলিম লীগ মন্ত্রীপরিষদের প্রস্তাব এবং অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদানের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করতে পারে। মনে হয় ওয়াভেল

নাজিমুদ্দিনের কথায় প্রভাবিত হয়েছিলেন। কেননা বেতার ভাষণ করার তিন দিন পরে তিনি গান্ধীজী এবং জওহরলালকে সোজাসুজি প্রশ্ন করেছিলেন: "মুসলিম লীগ যে-গ্যারান্টি চাইছে তা কি আপনারা দেবেন?" গান্ধীজী এবং জওহরলাল এই রকম কোন গ্যারান্টি দেননি। পক্ষান্তরে ওয়াভেল যখন আবার বলেন যে মন্ত্রীমিশনের পরিকল্পনা তাঁরা গ্রহণ করেছেন এই গ্যারান্টি তাঁকে দেওয়া হোক তখন তার উত্তরে গান্ধীজী বলেছিলেন: "আমরা যে এটি গ্রহণ করেছি তা ইতিপূর্বেই বলে দিয়েছি। কিন্তু মন্ত্রীপরিষদ এটিকে যেভাবে সাজাতে চাইছেন (set out) আমরা সেইভাবে এটিকে গ্রহণ করার গ্যারান্টি দিতে প্রস্তুত নই।. তাঁরা যে প্রস্তাব দিয়েছে সে সম্পর্কে আমাদের নিজস্ব ব্যাখ্যা আছে।"

এরপর অন্তর্বর্তী সরকার সম্পর্কে কথা ওঠে। মুসলিম লীগকে বাদ দিয়ে সরকার গঠন করলে তা পক্ষপাতদুষ্ট হবে বলে ওয়াভেল মন্তব্য করেন। গান্ধীজী সেকথা মেনে নিতে অস্বীকার করেন। গান্ধীজী জানান যে কংগ্রেসের মধ্যেও অনেক মুসলমান আছেন। ওয়াভেল তাঁদের কংগ্রেসী মুসলমান বলে অভিহিত করেছিলেন। তখন গান্ধীজী বলেন যে ওয়াভেল ইতিপূর্বে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন। এখন তা থেকে সরে আসা উচিত নয়। ওয়াভেল তাতে সম্মত হননি। তিনি পরিবর্তিত পরিস্থিতির কথা বলেছিলেন। জওহরলাল প্রশ্ন করেছিলেন তা হলে কি ভাইসরয় মুসলিম লীগের ভীতি প্রদর্শনের কাছে নতি স্বীকার করেছেন! তার উত্তরে ওয়াভেল বলেছিলেন যে কেবল কংগ্রেসীদের নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হলে মুসলিম লীগ কলকাতার দাঙ্গার পুনরাবৃত্তি করবে। আলোচনা তর্কে পরিণত হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু কোন কিছুতেই গান্ধীজী এবং জওহরলাল ওয়াভেলের শর্ত মানতে রাজি হননি। তার ফলে এই আলোচনাও ব্যর্থ হয়ে যায়। তা হলেও ওয়াভেল বুঝতে পেরেছিলেন যে কেবল এক পক্ষ বয়কট করেছে বলে মন্ত্রীমিশনের পরিকল্পনাকে কার্যান্বিত করা থেকে বিরত থাকা যাবে না।[১৯] আর তাই শেষ পর্যন্ত জওহরলালকে প্রধানমন্ত্রী করে এবং মুসলিম লীগের সদস্যদের বাদ দিয়েই অন্তর্বর্তী সরকার গঠিত হয়েছিল।

প্রত্যক্ষ সংগ্রাম : দ্বি-জাতিতত্ত্বের বিভীষিকা

এ কথা আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে মুসলিম লীগ মন্ত্রীমিশনের পরিকল্পনাকে মন্দের ভালরূপে গ্রহণ করেছিল। তারপর জওহরলাল যখন সাংবাদিক সম্মেলনে মন্ত্রীমিশনের পরিকল্পনা কার্যকর করার ক্ষেত্রে কংগ্রেসের স্বাধীনতার কথা বিবৃত করেন তখন লীগ বেঁকে বসে। জিন্না মনে করেন যে ব্রিটিশদের চলে যাবার আগেই যদি কংগ্রেস মন্ত্রীমিশনের পরিকল্পনার প্রশ্নে নিজেদের ব্যাখ্যার কথা তুলতে পারে তবে ব্রিটিশরা চলে গেলে কংগ্রেস স্বেচ্ছাচারী হয়ে উঠবে এবং এমনকি মন্ত্রীমিশনের পরিকল্পনাটিই বাতিল করে দেবে। এই রকম আশঙ্কা করে লীগ পরিকল্পনার প্রতি তাদের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছিল এবং প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করবার কথা বলেছিল। ইংরেজরা ক্ষমতার হস্তান্তর করতে আগ্রহী অথচ তা করার আগে তারা পাকিস্তান সৃষ্টি করে দিচ্ছে না—এই মানসিকতার বিরুদ্ধে লড়াই করাই ছিল প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মৌল উদ্দেশ্য। এই রকম সংগ্রাম করার প্রয়োজন হতে পারে তা জিন্না অনেক আগেই অনুমান করেছিলেন এবং মুসলমানদের তার জন্য মানসিকভাবে প্রস্তুত করছিলেন। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের জন্য ডাক দেবার অনেক আগে

থেকেই জিন্না ভাবী সংগ্রামের রূপরেখা বর্ণনা করছিলেন। ১৯৪৫ সালের ১০ই অক্টোবর তিনি কোয়েটায় বেলুচিস্তান মুসলিম লীগের সভায় বলেছিলেন : "...নেতৃত্ব আদায় করবার জন্য পুলিশের লাঠি চার্জের সময় ছাগলের মতো বসে থাকা, পরে জেলে যাওয়া এবং তারপর ওজন কমে যাবার জন্য অভিযোগ তোলা আর মুক্তির ব্যবস্থা করে নেওয়া—এই জাতীয় সংগ্রামে আমি বিশ্বাস করি না। কিন্তু যখন আঘাত এসে উপস্থিত হবে তখন সর্বপ্রথম আমিই আমার বুকে গুলি গ্রহণ করব।"[২০] এই কথাগুলির মধ্য দিয়ে জিন্না যে গান্ধীজীকে ব্যাঙ্গ করেছিলেন তা বোঝা যায়। কিন্তু সত্যই যখন তাঁকে সংগ্রাম আহ্বান করতে হল তখন নিরাপদ দূরত্বে অবস্থান করেই তিনি তাঁর অনুগামীদের হিংসাত্মক কাজে লেলিয়ে দিয়েছিলেন। তবে এই সংগ্রামকেও তিনি এক মিথ্যা আবরণের আড়ালে রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। প্রস্তাবিত যুদ্ধ ঘোষিত হয়েছিল ইংরেজ সরকারের বিরুদ্ধে। কিন্তু কার্যত তা হয়ে দাঁড়ায় হিন্দুদের সঙ্গে। যুদ্ধ শুরুর তারিখটি নির্দিষ্ট হয়েছিল ১৬ই আগস্ট ১৯৪৬। বাংলায় তখন মুসলিম লীগের মন্ত্রীসভা। শহীদ সুরাবর্দী প্রধানমন্ত্রী। (প্রদেশের মুখ্যমন্ত্রীদের তখন 'প্রিমিয়র' অর্থাৎ প্রধানমন্ত্রী বলা হত।) তিনি দিনটিকে ছুটির দিন হিসেবে ঘোষণা করেন। তাতে উত্তেজনা বাড়ে। মুসলিম লীগ তার অনুগতদের একটি যুদ্ধ-ধ্বনি (battle slogan) দিয়েছিল 'লেকর রহেঙ্গে পাকিস্তান, লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'। অর্থাৎ পাকিস্তান আদায় করবই এবং তা করব লড়াই করে। ইসলাম ধর্মশাস্ত্রীরূপে পরিচিত উসমানী ঘোষণা করেছিলেন : "পৃথিবীর কোন শক্তিই মুসলমানদের দমিত করতে পারবে না। জীবিত অবস্থায় তারা গাজী এবং কার্যরত অবস্থায় মারা গেলে তারা শহীদ।"[২১] আরবী 'গাজী' শব্দের অর্থ যোদ্ধা যে কাফির বা বিধর্মীদের পরাভূত করে এবং শহীদ শব্দের অর্থ যে ঈশ্বর বা ধর্মের জন্য প্রাণ দেয়। জিন্নাও হিংসাকে এই বলে উত্তেজিত করেছিলেন : "এখন আমরা পিস্তল পেয়ে গিয়েছি এবং তাকে ব্যবহার করার অবস্থায় রয়েছি।"[২২] প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন মুসলিম লীগের মুখপত্র 'ডন' পত্রিকায় একটি বিজ্ঞাপন প্রকাশিত হয়েছিল। তাতে লেখা ছিল : "আজ প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিন।...প্রত্যক্ষ সংগ্রামই এখন তাদের (মুসলমানদের—ভ. প্র. চ.) একমাত্র পথ। ...এখন কেবল জোরজবরদস্তিই পারবে অধিকার অর্জন করতে।" কলকাতার মেয়র এবং মুসলিম লীগ সম্পাদক একটি প্রচার-পত্র বিলি করেছিলেন। তাতে লেখা ছিল : "কাফের ! তোদের ধ্বংসের আর দেরি নেই। সার্বিক হত্যাকাণ্ড ঘটবে। লীগপন্থী আর একটি কাগজ 'মর্নিং নিউজ' তার সম্পাদকীয়তে লিখেছিল : "কোন নাগরিক অথবা সেনার দ্বারা কোন ব্রিটিশ পুরুষ বা নারীকে উৎপীড়ন করা কেবল বোম্বাইতে গৃহীত প্রস্তাবের বিরোধিতা করা নয়, উপরন্তু তা হল ইসলাম ধর্মের তত্ত্ব ও বক্তব্যের পরিপন্থী।"[২৩] এই সম্পাদকীয় প্রবন্ধ যে সুচতুরভাবে মুসলিম সমাজকে হিন্দুদের বিরুদ্ধে উত্তেজিত করতে চেয়েছিল তা সহজেই বোঝা যায়। কেননা হিন্দুদের মতো ব্রিটিশরাও ছিল মুসলমানদের কাছে বিধর্মী। কিন্তু স্পষ্টতই বলা হয়েছিল যে ব্রিটিশদের উৎপীড়ন করা ইসলাম ধর্মবিরোধী। হিন্দুদের উপর হিংসা করাকে ইসলামের পরিপন্থী বলে গণ্য করা হয়নি। এর পরিণামে যা হবার প্রত্যক্ষ সংগ্রামের দিনে তাই হয়েছিল। মুসলিম লীগ এবং সুরাবর্দীর প্রত্যক্ষ এবং সক্রিয় প্ররোচনায় কলকাতায় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়ে যায়। শুরু করেছিল মুসলিম লীগের সক্রিয় সমর্থকরা অর্থাৎ মুসলমান সমাজের একাংশ। চার দিন যে অরাজকতা কলকাতায় চলেছিল তার শেষ দু দিনে হিন্দুরা প্রথম দু দিনের বদলা নেয়। এই দাঙ্গায় হতাহতের সংখ্যা সঠিকভাবে নির্ধারণ করা না গেলেও

অনুমান করা হয় যে পাঁচ হাজার লোক নিহত এবং পঞ্চাশ হাজার লোক সাংঘাতিকভাবে আহত হয়েছিলেন। অগ্নিসংযোগে এবং অন্যভাবে স্থাবর সম্পত্তির যে ক্ষতি হয়েছিল তার কোন পরিমাপ করা হয়নি।

প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক ছিল ভারতব্যাপী। তা সত্ত্বেও সেদিন ভারতবর্ষের আর কোথাও কলকাতার মতো নারকীয় ঘটনা ঘটেনি। তাই স্বাভাবিকভাবেই যে প্রশ্নটি এসে যায় তা হল মুসলিম লীগ এই কাজের জন্য কলকাতাকে কেন বেছে নিয়েছিল ? বাংলায় মুসলিম লীগের শাসন প্রতিষ্ঠিত ছিল আর কলকাতার মতো শহরে তার ক্ষমতা প্রদর্শন করতে পারলে সারা পৃথিবীতে আলোড়ন সৃষ্টি হবে, মুসলিম লীগের দাবির প্রতি বিশ্বজনের দৃষ্টি আকৃষ্ট হবে, এইটিই কি ছিল তার একমাত্র কারণ ? হতে পারে। তবে কেউ কেউ এর কারণ হিসেবে মুসলিম লীগের অন্তর্দ্বন্দ্বের কথাও উল্লেখ করেছেন। পাকিস্তান গঠন সম্পর্কে বাংলার প্রধানমন্ত্রী সুরাবর্দীর মনোভাব কেমন তা নিয়ে জিন্নার মনে সংশয় ছিল। সুরাবর্দী চেষ্টা করেও জিন্নার কাছের মানুষ হয়ে যেতে পারেননি। সেজন্য বাংলার মুসলমানদের উপর তাঁর প্রভাব কত তা দেখাবার সুযোগ সুরাবর্দী খুঁজছিলেন। প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আহ্বান তাঁর কাছে সেই সুযোগ এনে দেয়। লিওনার্ড মসলে লিখেছেন : সুরাবর্দী ছিলেন সেই জাতীয় পার্টি-বস যাঁরা বিশ্বাস করেন যে যে-রাজনীতিক তার ব্রাবাহী গুণ্ডাবাহিনী দ্বারা পোলিং বুথের নিয়ন্ত্রণ রক্ষা করতে পেরেছে, তার কখনই ক্ষমতাচ্যুত হবার সম্ভাবনা নেই ; কোন মন্ত্রীরই জনজীবনে যুক্ত থাকার সুবাদে আর্থিক অনটনে পড়তে হবে না ; তার কোন আত্মীয় বা বশংবদ অপুরস্কৃত থাকবে না। তিনি অর্থ, সুরা, সুসজ্জিতা নারী এবং নাইট ক্লাবের নৃত্য—এই সব ভালবাসতেন। যুদ্ধের সময় বেশ দু পয়সা কামিয়ে নিয়েছেন বলে তাঁর নাম ছিল। তিনি নোংরা এবং দূষিত বস্তিসহ কলকাতাকে ভালবাসতেন এবং হাওড়ার পূতিগন্ধময় অলিগলি থেকে গুণ্ডাদের নিয়ে এসেছিলেন যারা তাঁর দেহরক্ষী হয়ে সঙ্গে থাকত। বাহ্যত শিষ্টাচারী কিন্তু অন্তরে নির্দয় এই রাজনীতিকের কাছে ১৯৪৬ সালের ১৬ই আগস্ট প্রত্যক্ষ সংগ্রাম দিবসরূপে উদ্‌যাপনের জন্য জিন্নার ঘোষণা একটি সুবর্ণ সুযোগ এনে দিয়েছিল। বাংলার মুসলমানদের উপর তাঁর প্রভাব এবং পাকিস্তানের প্রতি তাঁর আগ্রহ দেখাতে তিনি এই সুযোগের সদ্ব্যবহার করেছিলেন।"[২৪]

সুরাবর্দির কার্যসিদ্ধি হয়েছিল। সেনাবাহিনীকে দূরে সরিয়ে রেখে এবং পুলিশকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়ে তিনি দেখাতে পেরেছিলেন যে তাঁর ডাকে মুসলমানদের একটি অংশ পাকিস্তানের দাবি নিয়ে কী বর্বরোচিত ঘটনা সংঘটিত করতে পারে। ওয়াভেল বলেছিলেন যে কলকাতার দাঙ্গায় যে প্রাণহানি হয়েছিল তা পলাশীর যুদ্ধে যত প্রাণহানি হয়েছিল তার চেয়ে বেশি। বস্তুত জিন্না প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে যা করতে চেয়েছিলেন তাই হয়েছিল। কলকাতার দাঙ্গা ওয়াভেলকে ঘাবড়ে দিয়েছিল। তিনি জিন্নাকে অন্তর্বর্তী সরকারে নিয়ে আসার জন্য উদগ্রীব হয়ে ওঠেন। আর সেজন্য কংগ্রেসের কাছে নতুন শর্ত আরোপ করতে থাকেন। ওয়াভেলের মতিগতির এই পরিবর্তন গান্ধীজীর দৃষ্টি এড়ায়নি। ওয়াভেলের সঙ্গে কথা বলার পর ২৭-৮-৪৬ তারিখে তিনি ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে একটি টেলিগ্রামে জানিয়েছিলেন : "বাংলায় যে বেদনাদায়ক ঘটনা ঘটেছে তাতে ভাইসরয় সংযম হারিয়ে ফেলেছেন (unnerved)। তাঁর একজন যোগ্যতর এবং আইন বোঝেন এমন সহায়ক দরকার। তা না হলে বাংলার দুঃখজনক ঘটনার পুনরাবৃত্তি হবে।"

ওয়াভেলকেও একটি চিঠিতে গান্ধীজী লিখেছিলেন : "গত সন্ধ্যায় এই কথাটি আপনি বারবার বলেছিলেন যে আপনি একজন সাদাসিধা মানুষ এবং সৈনিক। আপনি আইন জানেন না। আমরা সবাই সাদাসিধা মানুষ, যদিও আমরা হয়তো সৈনিক নই এবং আমাদের কেউ কেউ আইন জানেন। আমার মনে হয়, আমাদের উদ্দেশ্য হল কলকাতায় যে সাংঘাতিক কাণ্ড ঘটে গিয়েছে তার পুনরাবৃত্তি বন্ধ করা। আমাদের কাছে প্রশ্ন হল কত ভালভাবে আমরা তা করতে পারি। গত সন্ধ্যায় আপনার ভাষা ছিল ভীতিপ্রদ। সম্রাটের প্রতিনিধিরূপে আপনি কেবল একজন সেনাবাহিনীর লোক হয়ে থাকতে পারেন না। অথবা আইনকে এবং বিশেষ করে আপনার নিজেরই তৈরি আইনকে আপনি উপেক্ষা করতে পারেন না। প্রয়োজন হল আপনার এমন একজন সহায়ক যিনি আইন বোঝেন। এবং যিনি আপনার বিশ্বস্ত। আপনি এই বলে ভয় দেখিয়েছিলেন যে পণ্ডিত নেহরু এবং আমার কাছে আপনি যে ফর্মুলা দিয়েছিলেন তা যদি কংগ্রেস কার্যান্বিত না করে তবে আপনি গণপরিষদ আহ্বান করবেন না। তাই যদি হয় তবে ১২ই আগস্ট আপনি যে ঘোষণা করেছিলেন (অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের প্রস্তাব পাঠাতে কংগ্রেস সভাপতিকে আহ্বান—ভ. প্র. চ.) তা করা আপনার উচিত হয়নি। কিন্তু তা যখন করেছেন তখন এবার আপনার উচিত সেটি প্রত্যাহার করে নেওয়া এবং আপনার পূর্ণ আস্থাশীল অন্য একটি সরকার গঠন করা।"[২৫]

গান্ধীজীর অনুরোধে ওয়াভেল এই চিঠির প্রতিলিপি ইংলন্ডে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। মনে হয় গান্ধীজীর টেলিগ্রাম এবং ওয়াভেলকে লেখা এই চিঠি ইংলন্ডের নেতাদের মনকে নাড়া দিয়েছিল। কেননা এর পরেই ওয়াভেলের বিদায় আসন্ন হয়ে ওঠে। কে তাঁর স্থলাভিষিক্ত হবেন সেই প্রশ্ন নেতাদের মনে দেখা দেয়। এদিকে ওয়াভেলের পক্ষেও আর অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের বিষয়টি ঝুলিয়ে রাখা সম্ভব হয় না।

অন্তর্বর্তী সরকার : ঘৃতাহুতি

কলকাতার দাঙ্গা অনেকেরই চোখ খুলে দিয়েছিল। আগামী দিনে ভারতবর্ষে কী ঘটতে চলেছে তা অনেকেই অনুমান করতে পারেন। ক্ষমতার হস্তান্তর কীভাবে হবে তার চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে না উঠলেও একটি বড় ধরনের সাম্প্রদায়িক সংঘর্ষের দিকে দেশ যে এগিয়ে যাচ্ছে তা অনেকে বুঝতে পারেন। এই অবস্থায় ওয়াভেল দেশকে শান্ত রাখার দুটি পথ দেখতে পান। এক, ব্রিটিশ সেনাবাহিনীকে দিয়ে উত্তেজনাকে দমন করা, এবং দুই, কংগ্রেসের সঙ্গে লীগের একটি বোঝাপড়া করে দেওয়া। প্রথমটি সম্ভবপর ছিল না। দেশের মানুষদের অন্তর্কলহকে বিদেশী সেনা দিয়ে দমন করার প্রচেষ্টাকে গান্ধীজী এবং কংগ্রেস পরাধীনতার নামান্তর বলেই মনে করতেন। সুতরাং সেই পথ অবলম্বন করা যাবে না। তাই ওয়াভেল দ্বিতীয় পথ অবলম্বন করেন। জিন্নার অনমনীয় মনোভাবের কথা তিনি জানতেন। মুসলিম লীগের প্রতি তাঁর গোপন সহানুভূতিও ছিল। কংগ্রেসের স্বাধীনতার দাবি তিনি কোন দিনই সমর্থন করতে পারেননি। গান্ধীজীকে তিনি ইংরেজদের 'পয়লা নম্বর দুশমন' বলেই মনে করতেন। একটি চিঠিতে তিনি ইংলন্ডের সম্রাট ষষ্ঠ জর্জকে লিখেছিলেন : "ইংরেজদের পুরনো শত্রু ঐ বিষাক্ত সাপ গান্ধীই হল যত নষ্টের গোড়া। গান্ধী চেয়েছিলেন জনজাগরণের স্রোতে ইংরেজরা এ দেশ থেকে ভেসে যাক।"[২৬] মন্ত্রীমিশনের সঙ্গে আলোচনার সময় তিনি তাঁদের গান্ধীজীর সম্পর্কে

বলেছিলেন : "(তিনি) অবশ্যই একজন অসাধারণ বৃদ্ধ এবং আধুনিক কালে যে তিনজন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অংশকে বিচ্ছিন্ন করেছেন তাঁদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি ভয়ানক। বাকি দুজন হলেন মগলাট এবং ডি. ভেলেরা। কিন্তু ইনি হলেন একজন কঠিন রাজনীতিক, সাধু মোটেই নন।"[২৭]

ওয়াভেল এটিও বুঝেছিলেন যে তাঁর ব্যক্তিগত মনোভাব যাই থাক ভাইসরয়ের কর্তব্য সম্পাদনে তিনি গান্ধীজী এবং কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে কোন কিছুই করতে পারবেন না। আর জিন্নার প্রতি পক্ষপাতিত্ব দেখাবারও একটি সীমা আছে। এই অবস্থার সম্মুখীন হয়ে তিনি মুসলিম লীগের দাবি অনুযায়ী কংগ্রেসের কাছে কয়েকটি শর্ত উত্থাপন করেছিলেন। ২৭শে আগস্ট ১৯৪৬ গান্ধীজী এবং জওহরলালের সঙ্গে তিনি যখন আলোচনা করেছিলেন তখন তিনি এই কথা বলেছিলেন : "পরিকল্পনার মূল কথা হল গ্রুপে যোগদান বাধ্যতামূলক।" অমলেশ ত্রিপাঠী লিখেছেন : "জিন্নার এই কাণ্ডের (প্রত্যক্ষ সংগ্রাম—ভ. প্র. চ.) পরও বড়লাটকে তাঁরই পক্ষে ওকালতি করতে দেখে গান্ধীর মাথায় রক্ত চড়ে যায়। তিনি বলেন,- যদি রক্তস্নানের প্রয়োজন হয় তবে অহিংসা সত্ত্বেও তা হবে। ওয়াভেল অনেককেই বলেছেন যে গান্ধী এত উত্তেজিত হয়েছিলেন যে টেবিল চাপড়ে বলে ওঠেন "If India wants her blood bath she shall have it." অর্থাৎ ভারতবর্ষ যদি রক্তস্নাত হতে চায় তবে তাই হবে।[২৮] অ্যালেন ক্যাম্বেল জনসন লিখেছেন যে দেশবিভাগ ঠেকাতে গান্ধীজী রক্তস্নানের কথা মাউন্টবেটেনকেও পরবর্তী সময়ে বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন : "আপনাকে (মাউন্টবেটেনকে) এবার আপনারই পূর্বগামীদের অন্যায়ের প্রায়শ্চিত্ত করতে হবে। ব্রিটিশদের "ডিভাইড অ্যান্ড রুল" নীতি এখন এমন এক অবস্থার মধ্যে সমস্ত সমস্যাকে টেনে নিয়ে গিয়েছে যে সেখানে আমরা আমাদের সম্মুখে দুটি পথ ছাড়া আর কোন পথ দেখতে পাচ্ছি না। হয় ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনকে পূর্ববৎ অবাধে চলতে দেওয়া, নয়তো ভারতীয়দের নিজেদের রক্তস্নানের ভিতর দিয়ে নতুন পথ করে নেওয়া। এই দুটি পথের মধ্যে একটিকে বেছে নেবার প্রশ্ন আমাদের সামনে দেখা দিয়েছে। এর মধ্যে রক্তস্নানের পথটি অবশ্যই স্বীকার করে নিতে হবে এবং তার জন্য তৈরি হতে হবে।"[২৯] প্রায়-রক্তস্নানের পথটিই ভারতবর্ষ বেছে নিয়েছিল। কিন্তু এ বীরের রক্তস্নান ছিল না। এ ছিল মানুষের মধ্যে যে নরাধম আছে তারই নির্লজ্জ প্রকাশ।

আসল কথা হল, ওয়াভেল যখন দেখেছিলেন যে মুসলিম লীগের শর্ত মেনে নিতে কংগ্রেসকে রাজি করান যাবে না এবং নিজের কথা থেকে সরে আসা আইনগত অসুবিধা সৃষ্টি করছে তখন বাধ্য হয়েই তিনি জওহরলালকে অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করতে আহ্বান করেন। ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ জওহরলালের প্রধানমন্ত্রীত্বে তেরজন সদস্য নিয়ে একটি মন্ত্রীসভা গঠিত হয়েছিল। মন্ত্রীসভার আর যাঁরা সদস্য ছিলেন তাঁরা হলেন বল্লভভাই প্যাটেল, রাজেন্দ্রপ্রসাদ, আসফ আলি, রাজাগোপালাচারী, জন মাথাই, বলদেব সিং, শাফত আহমত খাঁ, জগজীবন রাম, আলি জাহির এবং সি. এইচ ভাবা। মন্ত্রীসভায় আরও দুজন মুসলমান সদস্যের জন্য জায়গা খালি রাখা হয়। মন্ত্রীসভা গঠনের আগে জওহরলাল জিন্নাকে এতে যোগদান করতে অনুরোধ করেছিলেন। জিন্না রাজি হননি। তাঁর রাজি না হওয়ার তিনটি কারণ দেখান হয়েছিল। সেগুলি হল : এটি মেনে নেওয়া হয়েছিল যে (১) অন্তর্বর্তী সরকারের কাজকর্মে ভাইসরয় কোন রকম 'ভেটো' প্রয়োগ করতে পারবেন না, (২) সরকার ভাইসরয়ের পরিবর্তে আইনসভার কাছে তাদের কাজকর্মের জন্য দায়ী

থাকবে, এবং (৩) একজন জাতীয়তাবাদী মুসলমানকে সরকারে স্থান দিতে হবে।[৩০]

বস্তুত কংগ্রেস তার নিজের কোটার মধ্যে জাতীয়তাবাদী মুসলমানকে মন্ত্রী করবে এতেও জিন্না বরাবর আপত্তি করে আসছিলেন। ১৬ই জুন ওয়াভেল অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের যে রূপরেখা দিয়েছিলেন তাতে একজন তফশিলী সম্প্রদায়ের সদস্য নিয়ে কংগ্রেসের ছজন হিন্দু, মুসলিম লীগের মনোনীত পাঁচজন মুসলমান এবং একজন করে শিখ, ভারতীয় খ্রীস্টান ও পার্শিকে মন্ত্রী করার প্রস্তাব করা হয়েছিল। কংগ্রেস এই প্রস্তাবে সম্মত হয়নি। কংগ্রেস জাকির হোসেনের নাম নিজের কোটার মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করেছিল। ওয়াভেল সেই নাম কেটে দিয়েছিলেন। কংগ্রেস শরৎচন্দ্র বসুর এবং ভারতীয় খ্রীস্টান রাজকুমারী অমৃতকুমারীর নাম দিয়েছিল। ওয়াভেল এই দুটি নামও কেটে দিয়েছিলেন। কিন্তু জিন্না যে নামগুলি দিয়েছিলেন ওয়াভেল সেগুলি নির্দ্বিধায় মেনে নিয়েছিলেন। ওয়াভেলের এই একদেশদর্শিতাতে গান্ধীজী বিরক্ত হয়েছিলেন। তিনি এর প্রতিবাদ করার উদ্দেশ্যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির জন্য প্রস্তাবের একটি খসড়া তৈরি করে দিয়েছিলেন। তাতে বলা হয়েছিল—(১) যেহেতু মুসলিম লীগ কেবল মুসলমানদের সংগঠন সেইহেতু লীগ মুসলমান সদস্যদের নাম দিতে পারে ; (২) যেহেতু কংগ্রেস একটি জাতীয় সংস্থা সেইহেতু একজন জাতীয়তাবাদী মুসলমানের নাম প্রস্তাব করবার অধিকার তার থাকবে ; (৩) মুসলিম লীগ তার কোটার পাঁচজন মুসলমান সদস্যের বাইরে অন্য কোন সদস্যের নাম সম্পর্কে কিছু বলতে পারবে না ; এবং (৪) অন্তর্বর্তী সরকার আইনসভার নির্বাচিত প্রতিনিধিদের কাছে দায়ী থাকবে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গান্ধীজীর এই খসড়া প্রস্তাব সম্পর্কে কোন সিদ্ধান্ত না নিয়ে সেটিকে ঝুলিয়ে রাখে। মজার কথা হল, ভাইসরয়ের প্রস্তাব যেমন তাদের ভাল লাগেনি তেমনি গান্ধীজীর প্রস্তাব গ্রহণ করে সরাসরি সেটিকে বাতিলও করেনি।[৩১] কংগ্রেস এক দ্বিধার মধ্যে পড়েছিল। তাদের কোটায় ছিল ছজন সদস্য। তার মধ্যে একজন আবার তফশিলী সম্প্রদায়ের। সুতরাং বাকি পাঁচজনের মধ্যে যদি একজন মুসলমান হন তা হলে বর্ণহিন্দুদের সংখ্যা দাঁড়ায় চার। অন্যদিকে মুসলিম লীগের পাঁচজন মুসলমানকে নিয়ে মুসলমানদের মোট সংখ্যা হয়ে দাঁড়ায় ছয়। অর্থাৎ জনসংখ্যার দৃষ্টিতে সংখ্যাগরিষ্ঠ বর্ণহিন্দুরা অন্তর্বর্তী সরকারে সংখ্যালঘু হয়ে পড়ে। মৌলানা আজাদের নাম যদি কংগ্রেসের সদস্য-তালিকায় থাকত তা হলে এই সংখ্যালঘুতা মেনে নেওয়া কংগ্রেসের পক্ষে সহজসাধ্য ছিল। কিন্তু তিনিও মন্ত্রীত্ব গ্রহণে রাজি হননি। ফলে এই রকম এক জটিল অবস্থায় কংগ্রেস গান্ধীজীর প্রস্তাব মেনে নিতে পারেনি। আর গান্ধীজীও এ ক্ষেত্রে আপোষ করতে রাজি ছিলেন না। তাঁর কাছে হিন্দু-মুসলমানের সংখ্যার সমতার চেয়েও জাতীয়তাবাদের মর্যাদা বড় ছিল। এই বিষয়ে জিন্নার দাবির কাছে নতি স্বীকার করে তিনি জীবনের মূল্যবোধকে পরাস্ত করতে রাজি ছিলেন না। তিনি ১৯শে জুন কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটিকে জানিয়ে দেন যে যদি কংগ্রেস জাতীয়তাবাদী মুসলমানকে মন্ত্রীসভায় না নেওয়ার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে তা হলে তিনি কোন আলোচনায় যোগ দেবেন না এবং দিল্লী ছেড়ে চলে যাবেন। গান্ধীজী একইভাবে আপত্তি করেছিলেন এডভোকেট জেনারেল এন. পি. ইঞ্জিনিয়ারকে মন্ত্রীসভায় গ্রহণ করার সিদ্ধান্তে। এই ভদ্রলোক আজাদ হিন্দ বাহিনীর সেনাদের মামলায় সরকার পক্ষে মামলা লড়েছিলেন। ওয়াভেল চেয়েছিলেন তাঁকে মন্ত্রীসভায় যুক্ত করতে।[৩২]

ওয়াভেল এবং মন্ত্রীমিশন যে মুসলিম লীগকে প্রীতির চক্ষে দেখতেন আর মৌলানা আজাদের সমর্থন ছিল ওয়াভেলের প্রতি সেকথা আর একটি ঘটনা থেকে জানা যায়।

অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা নিয়ে যখন আলোচনা চলছিল তখন ক্রিপস জানিয়েছিলেন যে মুসলিম লীগ সরকারে যোগদানে ইচ্ছুক এবং জিন্না স্বয়ং প্রতিরক্ষামন্ত্রী হতে চান।[৩৩] এর পরের ঘটনা আরও চমকপ্রদ। ২১-৬-৪৬ তারিখে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গান্ধীজীর খসড়া করা প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা করছিল। গান্ধীজী মন্ত্রীসভায় জাতীয়তাবাদী মুসলমানকে নেওয়ার কথা বলেছিলেন। আজাদ সম্মত হননি। কংগ্রেসও গান্ধীজীর প্রস্তাব মেনে নিতে পারছিল না। আবার বাতিলও করেনি। একটি অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যেই কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভা সেদিন শেষ হয়েছিল। এর পরের দিন ক্রিপসের কাছ থেকে খবর আসে যে আজাদ ইতিপূর্বে তাঁদের লিখিতভাবে জানিয়ে দিয়েছেন যে কংগ্রেস ভাইসরয়ের প্রস্তাব নিয়ে কোন রকম জেদাজেদি করবে না। সুতরাং এখন যদি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি অন্য কথা বলে তা হলে তাঁরা খুব অস্বস্তিকর অবস্থায় পড়ে যাবেন। ঐ দিন ওয়াভেলের কাছ থেকেও একটি চিঠি আসে। তাতে তিনি কংগ্রেসকে একজন মুসলমান মন্ত্রী নেওয়ার দাবি না তুলতে অনুরোধ করেন। এই চিঠি ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মন থেকে সংশয় দূর করে দেয়। তাঁরা এবার গান্ধীজীর মতে সায় দেন এবং একজন জাতীয়তাবাদী মুসলমানের নাম সুপারিশ করবার প্রস্তাব গ্রহণ করেন। ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের মধ্যে একমাত্র আজাদই এই প্রস্তাব সমর্থন করেননি।[৩৪]

যাই হোক আর যেভাবেই হোক ২রা সেপ্টেম্বর ১৯৪৬ কংগ্রেসের মনোনীত সদস্যদের নিয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের মন্ত্রীসভা গঠিত হয়। মুসলিম লীগ এই দিনটিকে শোকদিবসরূপে উদ্‌যাপনের নির্দেশ দেয়। জিন্না বলে দেন যে সর্বত্র কালো পতাকা প্রদর্শন করতে হবে। কয়েকটি জায়গায় দাঙ্গাও হয়। নেহরু তাঁর বেতার ভাষণে মুসলিম লীগসহ সকলের সহযোগিতা কামনা করেন। জিন্না তার উত্তরে কংগ্রেস এবং ব্রিটিশ মন্ত্রীসভার তীব্র সমালোচনা করেন। তিক্ততা বাড়তে থাকে। গৃহযুদ্ধের পরিবেশ সৃষ্টি হয়। এই রকম অবস্থায় ভূপালের নবাব একটি মীমাংসা-সূত্র নিয়ে উপস্থিত হয়েছিলেন। তাতে বলা হয়েছিল যে মুসলিম লীগ যে ভারতবর্ষের বিপুল সংখ্যক মুসলমানদের প্রামাণিক প্রতিনিধি কংগ্রেস তা মেনে নিচ্ছে। সুতরাং গণতান্ত্রিক নিয়মানুসারে ভারতবর্ষের মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার একমাত্র তাদেরই আছে। তবে কংগ্রেস তার সদস্যদের মধ্য থেকে যাকে খুশি প্রতিনিধি নির্বাচন করতে পারে এবং সেক্ষেত্রে কংগ্রেস কোন রকম বাধা মেনে নিতে পারে না।

এই মীমাংসা-সূত্রটির দ্বিতীয়াংশে বলা হয়েছিল যে অন্তর্বর্তী সরকারের মন্ত্রীরা সমগ্র ভারতবর্ষের মঙ্গলের জন্য কাজ করবেন এবং কোন সময়েই গভর্নর জেনারেল তাঁদের কাজে হস্তক্ষেপ করবেন না। ভূপালের নবাবের সঙ্গে গান্ধীজীর সম্পর্ক ভাল ছিল। গান্ধীজী তাকে বিশ্বাস করতেন। তা ছাড়া সব মন্ত্রীই ভারতবর্ষের সামগ্রিক কল্যাণের জন্য কাজ করবেন এবং গভর্নর জেনারেলের হস্তক্ষেপ চাওয়া হবে না এই আকাঙ্ক্ষিত বিষয়দুটির প্রতি বেশি মনোযোগ দিতে গিয়ে গান্ধীজী মীমাংসা-সূত্রের প্রথমাংশের বয়ানের প্রতি যথোচিত দৃষ্টি দেননি। তিনি ভূপালের নবাবকে বলেছিলেন যে সূত্রটির প্রথমাংশ তিনি তখনই গ্রহণ করতে রাজি আছেন যদি জিন্না সমগ্র সূত্রটি মেনে নেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি অবশ্য মীমাংসার সূত্রটির ভাষা পছন্দ করেননি। তাঁরা ভাষার কিছু পরিবর্তন চেয়েছিলেন। তাঁরা চেয়েছিলেন যে মুসলিম লীগ এই কথা মেনে নিক যে কংগ্রেস হল সকল অমুসলমান এবং যেসব মুসলমান কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁদের ভাগ্য যুক্ত করেছেন তাঁদের স্বীকৃত প্রাতিনিধিক প্রতিষ্ঠান। এই বিষয় নিয়ে আলোচনার সময়

গান্ধীজী বুঝতে পেরেছিলেন যে শব্দের মারপ্যাঁচে তিনি নিজের বিশ্বাসের কাছে পরাস্ত হয়েছেন। তিনি ভূপালের নবাবকে জানিয়ে দেন যে জনগণের কাছ থেকে তিনি সরে যাবেন সেও ভাল তবু কংগ্রেসকে এটি গ্রহণ করতে তিনি বলতে পারেন না। কিন্তু কংগ্রেস জিন্নার সঙ্গে যদি একটি মীমাংসায় আসা যায় সেকথা ভেবে সূত্রটি মেনে নেয়। জিন্না বেঁকে বসেন। গভর্নর জেনারেল হস্তক্ষেপ করতে পারবেন না এই শর্ত তিনি মেনে নিতে রাজি ছিলেন না। তার কারণ স্পষ্ট। তিনি জানতেন যে কেবল মুসলিম লীগের সদস্যদের নিয়ে তিনি তাঁর কার্যসিদ্ধি করতে পারবেন না। ওয়াভেলের মতো যাঁরা কংগ্রেসকে শত্রুরূপে দেখেন সেই রকম মানুষদের পৃষ্ঠপোষকতা তাঁর চাই। কিন্তু জিন্নার জিদ এবার টেঁকেনি। কংগ্রেস জিন্নার আবদার খারিজ করে দিয়েছিল। ফলে অনন্যোপায় হয়ে জিন্না ১৯৪৬-এর ১৫ই অক্টোবর জানিয়ে দেন যে মুসলিম লীগ অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান করবে।[৩৫]

মুসলিম লীগ কেন অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান করছে তার কারণ বলতে গিয়ে লীগের মনোনীত সদস্য গজনফর আলি খাঁ লাহোরের ইসলামিয়া কলেজের ছাত্রদের বলেছিলেন : "আমাদের আকাঙ্ক্ষিত লক্ষ্য পাকিস্তান অর্জন করবার জন্য যাতে আমরা সংগ্রাম করতে পারি তার একটি পদবিক্ষেপ প্রস্তুত করবার উদ্দেশ্যেই আমরা অন্তর্বর্তী সরকারে যাচ্ছি। এবং আমি আপনাদের এই প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি যে পাকিস্তান আমরা আদায় করবই।"[৩৬]

জিন্না অন্তর্বর্তী সরকারের জন্য তাঁর কোটার পাঁচজন সদস্যের যে নামের তালিকা পাঠিয়েছিলেন তার মধ্যে একজন ছিলেন তফশিলী হিন্দু।* এই পাঁচজন হলেন—লিয়াকত আলি খাঁ, আই. আই. চণ্ডীগড়, আবদুর রব নিস্তার, গজনফর আলি খাঁ এবং যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল। এঁদের মন্ত্রীসভায় স্থান করে দিতে জওহরলালকে তাঁর মন্ত্রীসভা থেকে শরৎচন্দ্র বসু, শফত আহমদ খান এবং আলি জহরকে বাদ দিতে হয়েছিল। দুটি স্থান তো খালি ছিলই।

ওয়াভেল চেয়েছিলেন যে অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান করার আগে মুসলিম লীগ ১৬ই মে মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন প্রত্যাহার করার যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিল তা প্রত্যাহার করে নিক। জিন্না তা করেননি। আর ওয়াভেলও লীগের সদস্যদের সরকারে পাবার আগ্রহে তা নিয়ে জেদাজেদি করেননি। এই যে ফাঁক থেকে গিয়েছিল তার অর্থ হল গণপরিষদে যোগদানের প্রতিশ্রুতি না দিয়েই লীগ অন্তর্বর্তী সরকারে তাদের আসন করে নেয়। অবশ্য এ কথাও ঠিক যে অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদানের জন্য জিন্না যে শর্ত এর আগে আরোপ করেছিলেন ওয়াভেলও তাতে স্বীকৃতি দেননি। জিন্না তো চেয়েছিলেন যে কংগ্রেস যেন কোন মুসলমান সদস্যকে মন্ত্রী না করে এবং বিভিন্ন দল থেকে পালা করে ভাইস প্রেসিডেন্ট বা প্রধানমন্ত্রী মনোনীত করা হবে। ওয়াভেল এই শর্ত মেনে নেননি। তা সত্ত্বেও মুসলিম লীগ শেষ পর্যন্ত অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দেয়। তাদের এই দ্বিমুখী আচরণ—নিজেদের দেওয়া শর্তকে চেপে যাওয়া এবং ভাইসরয়ের আরোপিত শর্ত মেনে না নেওয়া—এবং সেইভাবে সরকারে যোগদান করাকে গান্ধীজী সন্দেহের চোখে দেখেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল যে মুসলিম লীগ লড়াই করবার মনোভাব নিয়েই মন্ত্রীসভায় যোগদান করেছে। গজনফর আলি তো তাঁর বক্তৃতায় এ কথা

* মুসলিম লীগের অনেক সদস্যই মনে করেছিলেন যে মন্ত্রীসভার সদস্য পদে একজন হিন্দুর নাম পাঠান জিন্নার দ্বি-জাতি তত্ত্বের সঙ্গে খাপ খায় না।[৩৭] জিন্নাও কংগ্রেসকে টেক্কা দিতে গিয়ে পরোক্ষে স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে সাম্প্রদায়িক চরিত্র নিয়ে মন্ত্রীসভায় যোগ দেওয়া যায় না।

স্পষ্ট করে বলেছিলেন। বস্তুত কিছু দিন পরেই গান্ধীজীর সংশয় সত্যে পরিণত হয়েছিল। জিন্নার লক্ষ্য ছিল যে কংগ্রেস যেন মন্ত্রীসভায় যোগদান করার দ্বারা নিজেদের আরও সুসংগঠিত করার সুযোগ নিতে না পারে। আর এই জন্যই জিন্না তাঁর প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আহ্বান প্রত্যাহার করেননি।[৩৮]

মুসলিম লীগের সদস্যরা মন্ত্রীসভায় যোগদান করার ফলে তাঁদের কোন্ কোন্ বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হবে তা নিয়েও সমস্যা দেখা দিয়েছিল। জিন্না নিজে মন্ত্রীসভায় যাননি। তিনি তাঁর দক্ষিণ হস্তস্বরূপ লিয়াকত আলিকে পাঠিয়েছিলেন এবং চেয়েছিলেন যে তাঁকে যেন একটি ভাল বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া হয়। ওয়াভেলের ইচ্ছা ছিল লিয়াকতকে স্বরাষ্ট্র বিভাগের দায়িত্ব দেওয়া। প্যাটেল এটি ছাড়তে রাজি ছিলেন না। ফলে লিয়াকত পান অর্থ দফতর। এই বিষয় সম্পর্কে লিয়াকতের খুব বেশি জ্ঞান ছিল না। চৌধুরী মহম্মদ আলি তখন সরকারে চাকরি করতেন। তিনি অর্থনীতি ভাল বুঝতেন এবং পাকিস্তানের সমর্থক ছিলেন। তিনি লীগের নেতাদের জানান যে কংগ্রেস দেশের ধনীদের কাছ থেকে টাকা জোগাড় করে থাকে। তিনি এমন বাজেট করে দেবেন যাতে এইসব ধনী আর টাকা দিয়ে কংগ্রেসকে সাহায্য করতে না পারে। তাঁর পরামর্শ লিয়াকতের ভাল লাগে। তিনি অর্থ দফতরের মন্ত্রী হন। এর কয়েক দিন পরেই কংগ্রেস বুঝতে পারে যে তারা কী ভুল করেছে।[৩৯] কেননা লিয়াকত যে বাজেট উত্থাপন করেছিলেন তা কংগ্রেসকে অসুবিধায় ফেলে দিয়েছিল। বাজেটে ধনীদের উপর অত্যধিক কর চাপান হয়েছিল। এটি হয়েছিল কংগ্রেসের অস্বস্তির কারণ। লিয়াকত বলেছিলেন যে তিনি কংগ্রেসের নীতি মেনেই বাজেট প্রণয়ন করেছেন অর্থাৎ বাজেটে দরিদ্রজনের কল্যাণ করার প্রয়াস করা হয়েছে। মৌলানা আজাদ এ সম্পর্কে লিখেছেন : "ধনসম্পদ যাতে ধনী ও দরিদ্রের ভিতর সমভাবে বণ্টিত হয় এবং কর ফাঁকি দেনেওয়ালাদের বিরুদ্ধে আরও কার্যকরী ব্যবস্থা নেওয়া হয়, এটিই আমরা চেয়েছিলাম। সুষ্ঠু উপায়ে এইসব ব্যবস্থা কীভাবে করা যায় তার জন্য আমরা (অর্থাৎ কংগ্রেসীরা) সবাই উদ্বিগ্ন ছিলাম। সুতরাং নীতিগত দিক থেকে লিয়াকত আলি যখন মন্ত্রীসভার সামনে বিষয়গুলি উত্থাপন করেন তখন তিনি খোলাখুলিভাবে বলেন কংগ্রেসের দায়িত্বশীল নেতাদের ঘোষণাবলীকে ভিত্তি করেই তিনি তাঁর প্রস্তাবসমূহ রচনা করেছেন। তিনি আরও বলেছিলেন, জওহরলাল যদি এইসব কথা না বলতেন তা হলে তিনি এইসব কথা চিন্তাও করতেন না। কিন্তু সে সময় তিনি তাঁর প্রস্তাবসমূহ বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করেননি। সুতরাং নীতি সংক্রান্ত ব্যাপারে আমরা সাধারণভাবে তাঁর প্রস্তাবসমূহ (অর্থাৎ প্রস্তাবসমূহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ) মেনে নিয়েছিলাম। এবং এইভাবে আমাদেরই সম্মতি আদায় করে তিনি তাঁর বাজেট প্রস্তাবসমূহকে এমনভাবে তৈরি করেছিলেন যাকে বলা চলে জাতীয় অর্থনীতির উপর এক চরম আঘাত।"[৪০]

বল্লভভাই এবং রাজাগোপালাচারী মনে করেছিলেন যে লিয়াকত বাজেট তৈরি করেছিলেন শিল্পপতি এবং ব্যবসায়ীদের জব্দ করবার জন্য, যাঁদের মধ্যে হিন্দুরাই ছিলেন সর্বাধিক। একই রকম অভিযোগ উত্থিত হয়েছিল পরিবহণমন্ত্রী আবদুর রব নিস্তারের বিরুদ্ধে। তিনি হিন্দু এবং শিখ অফিসারদের দিল্লী থেকে সরিয়ে দিয়ে তাঁদের জায়গায় মুসলমান এবং অ্যাংলো-ইন্ডিয়ান অফিসারদের আনছিলেন। এই ঘটনার উল্লেখ করে জওহরলাল ২১-১১-৪৬ তারিখের একটি বক্তৃতায় বলেছিলেন : "ওয়াভেল ক্রমশ গাড়ির চাকা ঘুরিয়ে দিচ্ছেন। লীগের সঙ্গে উচ্চপদস্থ ব্রিটিশ অফিসারদের একটি মানসিক আঁতাত সংঘটিত হচ্ছে। মুসলিম লীগের মনোনীত ব্যক্তিরা নতুন দিল্লীর সেক্রেটারিয়েটে

তাঁদের প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন অফিসারদের আমদানি করে তাঁদের মধ্যে একটি গোলমাল সৃষ্টি করতে সক্ষম হয়েছেন।"

এই তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকেই বল্লভভাই পরে বলেছিলেন : "আমি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়েছি যে দেশের একাংশের মূল্যেও এই বিদেশীদের বিদায়কে ত্বরান্বিত করা হল শ্রেষ্ঠ পন্থা। আমি তখন বুঝতে পারি যে দেশকে নিরাপদ ও শক্তিশালী করার একটিই পন্থা এবং তা হল অবশিষ্ট ভারতবর্ষকে একীকরণ করা। আমি অনুভব করেছিলাম যে আমরা যদি দেশবিভাগ মেনে না নিই তা হলে ভারতবর্ষ খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে এবং সম্পূর্ণরূপে বিনষ্ট হবে। আমার এক বছরের অফিস অভিজ্ঞতা আমার মধ্যে এই বিশ্বাস এনে দিয়েছিল যে আমরা যেভাবে অগ্রসর হচ্ছিলাম তা আমাদের সর্বনাশের মধ্যে ঠেলে দেবে। আমাদের একটি নয়, অনেকগুলি পাকিস্তান হয়ে যাবে। প্রত্যেকটি অফিসে পাকিস্তানের সেল (cell) তৈরি হবে।"[৪১]

বস্তুত কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের বোঝাপড়ার মধ্য দিয়ে অন্তর্বর্তী সরকার পরিচালিত হচ্ছিল না। ব্রিটিশ অফিসারদের যোগসাজসে লীগের সদস্যরা কংগ্রেসের প্রতিটি পদক্ষেপকে পর্যুদস্ত করতে চেষ্টা করছিলেন। জওহরলাল প্রকাশ্যে তাঁদের রাজার দল বলে অভিযুক্ত করেছিলেন। ব্যবসায়ীদের উপর অত্যধিক কর চাপানর বিষয় নিয়ে জওহরলালের সঙ্গে লিয়াকতের মতবিরোধ হয়েছিল। অবশ্য করভার যথেষ্ট কমিয়ে তখনকার মতো একটি মীমাংসায় পৌঁছান হয়, কিন্তু বিরোধ ধূমায়িত হতেই থাকে। অবস্থা এমন হয়ে দাঁড়ায় যে ওয়াভেলও মনে করেছিলেন যে মুসলিম লীগ যখন মন্ত্রীমিশনের দীর্ঘমেয়াদী পরিকল্পনা গ্রহণ করেনি তখন তার অন্তর্বর্তী সরকারে থাকা উচিত নয়। ওয়াভেলের এই অভিমতের প্রত্যুত্তরে লিয়াকত জানিয়েছিলেন যে ভাইসরয় চাইলে তাঁরা পদত্যাগ করতে রাজি আছেন। কিন্তু সেক্ষেত্রে গৃহযুদ্ধ শুরু হয়ে যাবে এবং সেনাবাহিনী ভেঙে যাবে।[৪২]

এই রকম এক জটিল অবস্থার মধ্যে ওয়াভেল ৯ই ডিসেম্বর ১৯৪৬ গণপরিষদের সভা ডাকেন। জিন্না একে মারাত্মক ভুল বলে অভিহিত করেন এবং জানান যে মুসলিম লীগের কোন সদস্যই গণপরিষদে যোগদান করবেন না। অন্য দিকে জওহরলাল জানিয়ে দেন যে লীগের আপত্তি সত্ত্বেও গণপরিষদ বসবে। এক অবাঞ্ছিত অবস্থার সৃষ্টি হয় এবং তা নিরসনের জন্য ভারত সচিব ইংলন্ডে নেতাদের এক সভা আহ্বান করেন। নেহরু, জিন্না, লিয়াকত এবং বলদেব সিং সেই বৈঠকে যোগদান করেছিলেন। চার দিন ধরে বৈঠক চলে। বৈঠক শেষ হবার পর যে বিবৃতি প্রকাশ করা হয় তাতে বলা হয়েছিল : "ভারতীয় জনগণের একটি বড় অংশের অনুপস্থিতিতে গণপরিষদ যদি কোন সংবিধান রচনা করে তা হলে হিজ ম্যাজিস্টিস গভর্নমেন্ট কংগ্রেসের মতো এ কথা মনে করতে পারে না যে সেই সংবিধান দেশের একটি অনিচ্ছুক অংশের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে।"

ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের এই সিদ্ধান্ত সম্পর্কে ডঃ তারাচাঁদ বলেছেন : "রাজনৈতিক অচলাবস্থা দূর করবার দুটি মাত্র পদ্ধতি আছে—একটি হল আলাপ-আলোচনা এবং অন্যটি হল শান্তিপূর্ণ উপায়ে প্রবর্তনা (persuation)। এই দুটি ব্যর্থ হলে মানব ইতিহাসের কঠিন অভিজ্ঞতা যে-বিকল্প পথের ইঙ্গিত করে তা হল শক্তিপ্রয়োগ। কোন বিবাদের সময় একটি পক্ষ যদি বুঝতে পারে যে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতির ব্যর্থতা কোন প্রতিকূল পরিণাম সৃষ্টি করবে না তা হলে পরিণামের ভীতিমুক্ত বিবাদ চালিয়ে যেতে তার কোন বাধা থাকে না। যুদ্ধকে প্রতিহত করতে না পারলেও যুদ্ধের ভয় কিছু সাবধানতা এবং দায়িত্ববোধ জাগ্রত করে

দেয়। ব্রিটিশ শাসকদের আচরণ ছিল এই রকম যে যখন তারা মনে করত যে কংগ্রেসের দাবি অযৌক্তিক তখন তারা শক্তি প্রয়োগকে ন্যায়সঙ্গত বলেই মনে করত। দৃষ্টান্তস্বরূপ ১৯২০-২২ সালের অসহযোগ ও খিলাফত আন্দোলন, ১৯৩০-৩২ সালের লবণ সত্যাগ্রহ এবং ১৯৪২ সালের ভারত ছাড়ো দাবির কথা বলা যায়। কিন্তু মুসলমানদের* শর্তগুলি যখন অবশ্যই অযৌক্তিক ছিল তখন শক্তি প্রয়োগ করা উচিত বলে বিবেচিত হয়নি। বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে এই নীতিই অনুসৃত হয়েছিল—তা সেই দাবি পৃথক সাম্প্রদায়িক নির্বাচন, অত্যধিক প্রতিনিধিত্ব, নতুন প্রদেশ গঠন, সরকারী চাকরির ক্ষেত্রে অনুপাতের হার নির্ধারণ অথবা প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন কিংবা অন্তিমে দেশবিভাগ যাই হোক না কেন।"[৪৩]

ইংলন্ডে আলোচনা সেরে নেহরু এবং বলদেব সিং দেশে ফিরে এলেন। পূর্ব নির্দেশ অনুযায়ী ৯ই ডিসেম্বর গণপরিষদের বৈঠক বসল। মুসলিম লীগের প্রতিনিধিরা তাতে যোগ দিলেন না। কয়েক দিন পরে কংগ্রেস ইংলন্ডে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের পক্ষ থেকে যে বিবৃতি দেওয়া হয়েছিল তার সমালোচনা করে। কংগ্রেস এবার এ কথা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিয়েছিল যে কোন প্রদেশের পক্ষে কোন না কোন গ্রুপে যোগদান করাকে বাধ্যতামূলক করা এবং পাঞ্জাবের শিখদের অধিকারকে উপেক্ষা করা কংগ্রেস সমর্থন করতে পারে না। অসমের ক্ষেত্রেও কংগ্রেস অনুরূপ মনোভাব ব্যক্ত করেছিল। পক্ষান্তরে, জিন্নার মনোভাবের কোন পরিবর্তন হয়নি। অন্তর্বর্তী সরকার যে কোয়ালিশন মন্ত্রীসভার মতো কাজ করছে না ওয়াভেল নিজেও তা অনুভব করছিলেন। কংগ্রেস লীগের সদস্যদের মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ দাবি করে। লিয়াকত জানান যে কংগ্রেস এবং শিখরাও মন্ত্রীমিশনের পরিকল্পনা পুরোপুরি গ্রহণ করেনি। সুতরাং তাঁদেরও পদত্যাগ করা উচিত। কয়েক দিন পরে নেহরু লীগ সদস্যদের মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ দাবি করেছিলেন আর প্যাটেল বলেছিলেন যে লীগের সদস্যরা যদি পদত্যাগ না করেন তা হলে কংগ্রেসের সদস্যরাই সরকার থেকে বেরিয়ে আসবেন। অন্তর্বর্তী সরকারের এই টালমাটাল অবস্থার মধ্যে দেশের বিভিন্ন স্থানে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা শুরু হয়ে গিয়েছিল। এমন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল যে অনেকেই ভাবতে শুরু করেছিলেন যে হিন্দু-মুসলমান একসঙ্গে শান্তিতে বসবাস করতে পারবে না। দাঙ্গা দমন করতে কেন্দ্রীয় সরকারের যে ভূমিকা নেওয়া উচিত ছিল নিজেদের অন্তর্দ্বন্দ্বের ফলে তা তাঁরা নিতে পারছিলেন না। ভাইসরয়ের নির্লজ্জ পক্ষপাতিত্ব প্রকট হয়ে পড়ায় ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ওয়াভেলকে প্রায় অসম্মান করেই ভারতবর্ষ থেকে সরিয়ে নেন। অন্য দিকে দেশবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে বাংলা এবং পাঞ্জাবেরও যে বিভাজন হবে তাতে আর কোন সংশয় ছিল না। দেশবিভাগকে ভিত্তি করেই ক্ষমতার হস্তান্তর হবে এটি তখন নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল। প্রশ্ন হল, কবে এবং কীভাবে ?

---

* মুসলমান না বলে মুসলমানদের একাংশ বললে ঠিক হত।

॥ পরিশিষ্ট-ক ॥

আজাদ-নেহরু-প্যাটেল : স্বপ্নভঙ্গ

মৌলানা আবুল কালাম আজাদ ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাসে একটি স্মরণীয় নাম। সুপণ্ডিত, অসাম্প্রদায়িক এবং মধ্যপন্থা অনুসরণকারীরূপে তিনি বিশেষভাবে পরিচিত। অনেকের কাছেই তিনি শ্রদ্ধেয়। যদিও জিন্না এবং মুসলিম লীগ আজাদ এবং অন্যান্য জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের কংগ্রেসের দালাল এবং বিশ্বাসঘাতক বলে বিদ্রূপ করতে চেয়েছিলেন তবু এ কথা অনস্বীকার্য যে আজাদের ব্যক্তিগত মতামত এবং কর্মপদ্ধতি কোনভাবেই সঙ্কীর্ণতা দোষে দুষ্ট ছিল না। তাঁর সিদ্ধান্ত কোন কোন ক্ষেত্রে অবশ্যই সকলের কাছে মনঃপূত হয়নি, তিনি ঘটনাবলীর যেভাবে মূল্যায়ন করতে চেয়েছিলেন কখন কখন তাকেও ভ্রমাত্মক বলে কারও কারও মনে হয়েছে তবু এ কথাও ঠিক যে তিনি তাঁর সমগ্র চিন্তাকে ভারতবর্ষের সামগ্রিক কল্যাণের দিকেই প্রসারিত এবং পরিচালিত করেছিলেন।

১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের যখন প্রথম অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তখন আজাদ তাতে যোগ দিয়েছিলেন। তখন তাঁর বয়স খুবই কম। সেই অল্প বয়সেই তিনি তাঁর যুক্তি-নির্ভর রচনার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদের প্রচার করতে থাকেন। সেই সময় প্যান ইসলামের একটি ধুয়া রক্ষণশীল মুসলমানদের মনকে আচ্ছন্ন করে রেখেছিল। তুরস্কের সুলতান আবদুল হামিদ মুসলমানদের নিজ ভূমি স্থাপনের উদ্দেশ্যে প্যান ইসলামিক আন্দোলন শুরু করেছিলেন। উচ্চশ্রেণীর মুসলমানদের একটি বড় অংশ এই আন্দোলনের সমর্থক ছিলেন। অন্য দিকে স্যার সৈয়দ আহমেদ ছিলেন এর বিরোধী। কিছু দিন পরে তুরস্কেও যখন পরিবর্তন শুরু হয়ে গিয়েছিল তখন ভারতবর্ষের তরুণ মুসলমানরা সেই পরিবর্তনকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। আজাদ ছিলেন এই তরুণদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তিনি তত্ত্ব এবং তথ্য বিশ্লেষণ করে বোঝাতে চেষ্টা করেন যে ইসলামের সঙ্গে জাতীয়তাবাদের কোন বিরোধ নেই। আজাদের লেখনী এত শক্তিশালী ছিল যে তরুণ মুসলমানদের অনেকেই তার দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগও তখন সংগঠনরূপে পরস্পরের কাছে এসে গিয়েছিল। বস্তুত অনেক দিন ধরে বেশ কিছু হিন্দু নেতা একই সঙ্গে কংগ্রেস এবং হিন্দু মহাসভার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। অনুরূপভাবে অনেক মুসলমান নেতাও একই সঙ্গে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। জিন্নার নেতৃত্বে মুসলিম লীগ এবং সভারকরের নেতৃত্বে হিন্দু মহাসভা যখন জাতীয়তাবাদী আন্দোলন থেকে সম্পূর্ণরূপে মুখ ফিরিয়ে নেয় তখন আর নেতাদের পক্ষে এই দ্বৈত ভূমিকা পালন করা সম্ভব হয়নি। আজাদও মুসলিম লীগের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করে

একান্তভাবে কংগ্রেসের লোক হয়ে গিয়েছিলেন।

হিন্দু-মুসলমান ঐক্যকে আজাদ একটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ বিষয় বলেই মনে করতেন এবং তিনি বিশ্বাস করতেন যে ব্রিটিশ শাসন শুরু হবার আগে হিন্দু-মুসলমান সমস্যা বলে কোন সমস্যা ছিল না।[১] তিনি মনে করতেন যে মুসলমানদের জন্য একটি স্বতন্ত্র পবিত্রভূমি (পাকিস্তান) ইসলামবিরোধী। এই প্রসঙ্গে তাঁর অভিমত ছিল : "মুসলিম লীগ যেভাবে পাকিস্তানের পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছে সেটিকে আমি সম্ভাব্য সব দিক থেকে বিবেচনা করে দেখেছি। এটির পরিণতি সমগ্র ভারতবর্ষের উপর কী হতে পারে তা একজন ভারতীয়রূপে আমি বিচার করেছি। একজন মুসলমানরূপে আমি বিচার করেছি ভারতবর্ষের মুসলমানদের উপর এর কী প্রভাব পড়তে পারে। সমস্ত দিক বিবেচনা করে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছি যে এটি যে কেবল সাধারণভাবে সমগ্র ভারতবর্ষের ক্ষতি করবে তা নয়, এর ফলে বিশেষ করে মুসলমানরাও ক্ষতিগ্রস্ত হবেন। বস্তুত এর দ্বারা যতগুলি সমস্যার সমাধান হতে পারে বলে মনে করা হয় তার চেয়েও বেশি সমস্যা এটি সৃষ্টি করবে। আমাকে স্বীকার করতেই হবে যে পাকিস্তান শব্দটি আমার ভাবনার বিরোধী। এর দ্বারা মনে হয় যে পৃথিবীর কিছু অঞ্চল পবিত্র এবং বাকি অঞ্চল পবিত্র নয়। এইভাবে ভাগ করা ইসলামবিরোধী এবং ইসলামের ভাবাত্মার অস্বীকার। ইসলাম এই ধরনের চিন্তা অনুমোদন করে না। পয়গম্বর বলেছেন 'ঈশ্বর আমার জন্য গোটা পৃথিবীই মসজিদ করে দিয়েছেন।' তা ছাড়া আমার মনে হয়েছে যে পাকিস্তানের পরিকল্পনাটি পরাজিত মনোভাবের প্রতীক। ইহুদীরা যেমন তাদের জন্য একটি জাতীয় ভূমি চেয়েছেন পাকিস্তানের দাবিও সেইভাবেই করা হয়েছে। মুসলমানরা সমগ্র ভারতবর্ষকে তাদের করে নিতে পারবে না এবং তাদের জন্য নির্দিষ্ট একটি কোণে তাদের সরে যেতে হবে এটি হল তারই স্বীকৃতি। একজন মুসলমানরূপে সমগ্র ভারতবর্ষকে আমার নিজভূমি মনে করবার এবং তার রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক জীবন গড়ে তোলবার অধিকার আমি মুহূর্তের জন্যও ত্যাগ করতে পারি না।"[২]

পাকিস্তান সম্পর্কে এই দৃঢ় মনোভাব পোষণ করেও আজাদের মনে হয়েছিল যে মুসলমানদের মন থেকে হিন্দুভীতি দূর করবার জন্য এবং যেসব অঞ্চলে মুসলমানরা সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানে তাদের জন্য কিছুটা স্বাধিকারের ব্যবস্থা থাকা দরকার। কংগ্রেস তো প্রদেশগুলিতে স্বায়ত্তশাসন দেবার কথা স্বীকার করে। সুতরাং সেই সিদ্ধান্তের ভিত্তিতে মুসলমানদেরও কিছু বিশেষ সুবিধা দেওয়া উচিত। এই কথাই তাঁর মনে হয়েছিল। মন্ত্রীমিশনও এই কথা ভেবেছিলেন। ওয়াভেলও তার জন্য চেষ্টা করেছিলেন। আজাদ মনে করেছিলেন যে এই বিষয়ে তিনিই ছিলেন পথিকৃৎ, ওয়াভেল এবং মন্ত্রীমিশন তাঁর ফরমুলাই গ্রহণ করেছিলেন। এই প্রসঙ্গে আজাদ বলেছেন : "আমি যে-সমাধান মেনে নেবার জন্য কংগ্রেসকে সম্মত করাতে সক্ষম হয়েছি তাতে পাকিস্তান পরিকল্পনার অবাঞ্ছিত বিষয়গুলি থাকবে না, অথচ পাকিস্তানের মূল কথা তাতে অবশ্যই থাকবে। কেন্দ্রীয় সরকারে হিন্দুদের প্রাধান্য থাকবে বলে মুসলমানদের মনে এই ভয়টা ঢুকে গিয়েছে, মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশেও কেন্দ্রীয় সরকার অশুভ প্রভাব বিস্তার করে মুসলমানদের স্বার্থকে পদদলিত করবে। এই ভয় থেকেই পাকিস্তান পরিকল্পনা উদ্ভূত হয়েছে। মুসলমানদের এই ভীতি নিরসন করবার জন্য কংগ্রেস প্রাদেশিক স্তরে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসনাধিকার দিতে সম্মত হয়েছে।* এ ছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের অধীনে কী কী

* প্রদেশকে স্বায়ত্ত শাসনের অধিকার দেবার প্রশ্নটি কংগ্রেস কেবল মুসলমানদের ভীতি দূর করবার জন্যই দিতে

বিষয় থাকবে সে সম্বন্ধেও কংগ্রেস দুটি তালিকা তৈরি করেছে। ...ভারতবর্ষের পরিস্থিতি এমনই যাতে সর্বক্ষমতাযুক্ত কেন্দ্রীয় সরকার গঠন করার চেষ্টা করা হলে সে চেষ্টা বিফল হতে বাধ্য। আবার ভারতবিভাগের প্রচেষ্টাও অর্থাৎ ভারতবর্ষকে দুটি আলাদা রাষ্ট্রে পরিণত করার প্রচেষ্টাও বিপর্যয় ডেকে আনবে। এইসব প্রশ্ন নিয়ে গভীরভাবে চিন্তা করে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হই যে কংগ্রেসের পরিকল্পনাটিই সর্বোত্তম পন্থা। কারণ এই পরিকল্পনায় কেন্দ্র এবং প্রদেশসমূহের মধ্যে একটি সুষ্ঠু সমঝোতার সৃষ্টি হবে। কংগ্রেসের এই পরিকল্পনা মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশসমূহে বস্তুতপক্ষে পাকিস্তান পরিকল্পনারই সামিল হবে। অপরপক্ষে পাকিস্তান পরিকল্পনায় যেসব অসুবিধা রয়েছে সেগুলিও এতে থাকবে না। অর্থাৎ এই পরিকল্পনায় মুসলমান সংখ্যালঘিষ্ট হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠার ভয়ও মুসলমানদের থাকবে না।"[৩] আজাদ এ কথাও বলেছিলেন যে এটলি ১৬ই মে ইংলন্ডের হাউস অফ কমনস-এ যে-বিবৃতি দিয়েছিলেন তা তাঁরই ১৫ই এপ্রিলে দেওয়া প্রস্তাবের অনুরূপ। বস্তুত মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাবের আগে থেকেই আজাদ প্রাদেশিক শাসনাধিকারের কথা বলে আসছিলেন। এমনকি ওয়াভেলের প্রস্তাবকে বাতিল করার বিরোধিতাও তিনি করেছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল যে যুদ্ধ শেষ হয়ে যাওয়ায় ইংরেজরা আর কংগ্রেসের সাহায্যের প্রত্যাশা করবে না। এই অবস্থায় ওয়াভেল যা দিতে চান তা নিয়ে নেওয়া উচিত।[৪] প্রকৃতপক্ষে ওয়াভেলের আহুত সিমলা সম্মেলনের পর থেকেই ইংরেজদের মনোভাব সম্পর্কে আজাদের মনোভাব পরিবর্তিত হতে থাকে। গান্ধীজী এবং নেহরুর সঙ্গে আলোচনার সময় অন্তর্বর্তী সরকার ডাকা নিয়ে মুসলিম লীগের ইচ্ছাকে সমর্থন করতে গিয়ে ওয়াভেল তাঁর নিজের কথা থেকেই সরে যেতে চেষ্টা করেছিলেন এবং তিনি একজন সৈনিক, আইনের মারপ্যাঁচ বোঝেন না এই অজুহাত দেখিয়ে নিজেকে বাঁচাতে চেয়েছিলেন। তাঁর এই পলায়নী মনোবৃত্তিতে গান্ধীজী এবং নেহরু ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। গান্ধীজী তো তা নিয়ে ইংলন্ডে অভিযোগ করেছিলেন। কিন্তু ওয়াভেলের এই আচরণ আজাদের ভালই লেগেছিল। তিনি বলেছিলেন : "সিমলা সম্মেলনের প্রাক্কালে সকলের মনেই ইংরেজদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে সন্দেহ এবং অবিশ্বাস বিদ্যমান ছিল। বলতে বাধা নেই, পূর্ববর্তী তিন বছরের ঘটনার জন্য আমার মনটাও তিক্ত-বিরক্ত হয়েছিল। সেই রকম মানসিক অবস্থা নিয়েই আমি প্রস্তাবিত সিমলা সম্মেলনে অংশগ্রহণ করতে যাই, কিন্তু লর্ড ওয়াভেলের সঙ্গে দেখা হবার পরে আমার মানসিক অবস্থার দ্রুত পরিবর্তন হয়। তাঁকে আমি দেখতে পাই একজন বাস্তববাদী সৈনিক হিসেবে। ঘটনার মোকাবিলা করার অথবা বক্তব্য উপস্থাপিত করবার ব্যাপারে তিনি সব সময়েই প্রত্যক্ষ পন্থা অবলম্বন করতেন। রাজনীতিবিদদের মতো তাঁর মনে কোন ঘোর-প্যাঁচ ছিল না।"*

চায়নি। তার অন্য কারণও ছিল। পরবর্তী অনুচ্ছেদে এ সম্পর্কে আলোচনা করা হয়েছে।

* ওয়াভেল বলেছিলেন যে তিনি বাস্তববাদী লোক, আইনের ঘোরপ্যাঁচ বোঝেন না। আজাদও তাঁকে সার্টিফিকেট দিয়েছেন যে তিনি রাজনীতিকের মারপ্যাঁচ জানতেন না। ওয়াভেল ১২-৩-৪৭ তারিখে পেথিক লরেন্সকে একটি গোপনীয় চিঠি লিখেছিলেন। তাঁর সম্পর্কে মন্তব্য দুটি কতটা যথার্থ তা এই চিঠি থেকে বোঝা যাবে। চিঠির অংশবিশেষ হল :

"৩। আমার ভয় হয় যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব কংগ্রেস এবং লীগের একটি মীমাংসায় উপনীত হতে সাহায্য করবে না। চণ্ডীগড় নাকি বলেছেন যে মুসলিম লীগ ওয়ার্কিং কমিটির সভা ডাকার কোন দরকার নেই। পরে তিনি এই কথা অস্বীকার করেছেন। 'ডন'-এর কথা বিচার করলে মনে হয় যে লীগ কংগ্রেসের সঙ্গে কোন চুক্তিতে যেতে চাইছে না। পাঞ্জাবকে ভাগ করবার প্রস্তাব মুসলিম লীগ খুব খারাপভাবেই নিয়েছে। তারা যে সমগ্র পাঞ্জাব এবং বাংলা পেতে চায় তা খুব স্পষ্ট। তারা ক্রিপস কমনস-এ যে বক্তৃতা দিয়েছিলেন তার উল্লেখ করে। ৬ই ডিসেম্বর হিজ

যাই হোক, ওয়াভেল সম্পর্কে আজাদের এই প্রশস্তি নিশ্চয় খুবই মূল্যবান। সেই সঙ্গে এটিও সত্য যে সকলের দৃষ্টিভঙ্গী সমান নয়, সকলের ক্ষেত্রে কোন কিছুর মূল্যায়ন করবার মাপকাঠিও সমান নয়। কিন্তু ওয়াভেলকে রাজনীতিবিদদের সঙ্গে তুলনা করতে গিয়ে আজাদ কি ভুলে গিয়েছিলেন যে তিনি নিজে, নেহরু এবং প্যাটেল সকলেই ছিলেন রাজনীতির লোক ? গান্ধীজী সাধুর বেশধারী একজন কূট রাজনীতিবিদ, সাপের মতো ভয়ানক এমন কথা তো ওয়াভেলের কাছ থেকেই শোনা গিয়েছিল। আজাদ কি এ কথাও ভুলে গিয়েছিলেন যে অধিকাংশ মুসলমানের সমর্থনপুষ্ট মুসলিম লীগের দাবিকে সমর্থন না করা, ভ্রমাত্মক বলা রাজনীতিবিদদের মানসিক ঘোরপ্যাঁচ বলে জিন্না তাঁর বিরুদ্ধেও অভিযোগ তুলতে পারতেন ? জিন্না ঠিক এই ভাষা প্রয়োগ না করলেও তাঁর সম্পর্কে এবং কংগ্রেসের সম্পর্কেও প্রায় অনুরূপ অভিযোগই তো তুলেছিলেন। আজাদের কথামতো ওয়াভেল যদি বাস্তববাদীই হন তা হলে তো জিন্নাকেও বাস্তববাদী না বলার কোন কারণ নেই। যাই হোক, জেল থেকে বার হবার পর ইংরেজদের সম্পর্কে আজাদের মনোভাবের পরিবর্তন হয়। শাসনক্ষমতার হস্তান্তর সম্পর্কে ইংরেজদের সদিচ্ছার প্রতি তিনি আস্থা পোষণ করতে থাকেন। সেজন্য তিনি বলেছিলেন : "সকলেই জানেন প্রথম সিমলা সম্মেলনের পরে কংগ্রেসের ভিতর থেকে এবং এমনকি বাইরে থেকেও কংগ্রেসের উপর চাপ আসে প্রত্যক্ষ সংগ্রাম করবার জন্য। চারটি বিভিন্ন ঘটনায় চারবার এইরকম চাপ আসে। কিন্তু ইংরেজ সরকারের সহযোগিতাপূর্ণ মনোভাব লক্ষ্য করে ওই রকম কোন আন্দোলন শুরু করাটা আমি সঠিক বলে মনে করিনি।"[৬]

বিয়াল্লিশের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন অহিংস পন্থায় সংগঠিত করা যাবে কি না তা নিয়েও আজাদের মনে সংশয় ছিল। যুদ্ধ চলাকালীন অবস্থায় আন্দোলনের ডাক দিয়ে ইংরেজকে বিব্রত করা এবং তার দ্বারা পরোক্ষে ফ্যাসীবাদী শক্তিকে সহায়তা করা হবে, এই কথা ভেবে জওহরলালেরও সেই সময় আন্দোলন করায় আপত্তি ছিল। কিন্তু গান্ধীজী এই বিষয়ে অনড় ছিলেন। তার ফলে গান্ধীজীর সঙ্গে আজাদের তীব্র মতবিরোধ হয়েছিল। অবশ্য পরে তাঁদের এই মতবিরোধ দূর হয়েছিল। আজাদ 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের প্রস্তাব সমর্থন করেছিলেন। কারাগারে বন্দীও হয়েছিলেন। কিন্তু স্বাধীনতা যখন দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয় তখন আজাদ তাঁর স্বাধীন মতামত নিয়ে যেভাবে অগ্রসর হতে থাকেন তাতে কখন কখন তিনি সহকর্মীদের কাছ থেকে দূরে সরে যান। তিনি নিজেই বলেছেন যে ওয়াভেলের ডাকা সিমলা সম্মেলন ইংরেজদের দোষে ভেস্তে যায়নি। তা ভেস্তে গিয়েছিল সাম্প্রদায়িক কারণে, রাজনৈতিক কারণে নয়। আজাদের এই মত সকলে মেনে নেননি। অনেকেই মনে করেছিলেন যে সাম্প্রদায়িক কারণটি সৃষ্টি হয়েছিল ব্রিটিশ শাসকদের উস্কানিতে, তাদের গোপন পৃষ্ঠপোষকতায়।

আজাদ ছিলেন একজন প্রখর ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ। স্বার্থক্লিষ্ট সঙ্কীর্ণতা তাঁর মধ্যে ছিল না। এ কথা যেমন সত্য তেমনি এ কথাও অনস্বীকার্য যে তাঁর সঙ্গে কংগ্রেসের অন্যান্য নেতারা সব সময়ে একমত হতে পারেননি। গান্ধীজীর মতকেও আজাদ সব সময় মেনে

ম্যাজিস্টিস গভর্নমেন্টের বিবৃতিতে যেখানে 'অঞ্চলগুলি' বলা হয়েছিল ক্রিপস সেখানে 'প্রদেশগুলি' বলেছিলেন। লীগ এইটির উপরেই জোর দিতে চায়। আমার তো মনে হয় যে যে কোন রাজনৈতিক বিবৃতিকে বাস্তবিক দৃষ্টিভঙ্গীর বদলে আইনগত দৃষ্টিতে বিচার করা দরকার। (any political statement is examined from a legalistic rather than from a practical standpoint)।[৬১] ক্রিপস-কমনস-এ বলেছিলেন, যে-অনিচ্ছুক প্রদেশগুলি সংবিধান রচনার কাজে প্রতিনিধিত্ব করবে না তাদের আমরা জোর করে ঐক্যবদ্ধ ভারতে যুক্ত করব না।

নেননি। সেকথা আজাদ নিজেও উল্লেখ করেছেন। এমন একটি ঘটনা ঘটেছিল মন্ত্রীমিশনের সঙ্গে রাজাগোপালাচারীর দেখা করা নিয়ে। আজাদ লিখেছেন : "ক্রিপস মিশন বিফল হবার পর শ্রীরাজাগোপালাচারী এই মর্মে প্রচার শুরু করেন যে কংগ্রেসের পক্ষে মুসলিম লীগের দাবি মেনে নেওয়া উচিত। ভারতবিভাগের কথাও তিনি নীতিগতভাবে মেনে নিয়েছিলেন। এই রকম প্রচার ও মতবাদের ফলে তিনি ওয়ার্কিং কমিটি থেকে বেরিয়ে যান এবং কংগ্রেসীদের কাছে জনপ্রিয়তা হারান। গান্ধীজী রাজাজীর ক্রিয়াকলাপ সমর্থন করেননি। রাজাজী মন্ত্রীমিশনের সঙ্গে দেখা করেন অথবা আলোচনা করেন এটিও তিনি চাননি। রাজাজীকে তিনি মাদ্রাজেই থাকতে বলেছিলেন। রাজাজী এতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হন। তবে ক্ষুব্ধ হলেও তিনি কিছু দিন চুপচাপ থাকেন। আমি যখন বিশ্রামের জন্য মুসৌরিতে ছিলাম তখন রাজাজীর কাছ থেকে আমি একটি চিঠি পাই। সেই চিঠি থেকে আমি সর্বপ্রথম জানতে পারি যে গান্ধীজী তাঁকে দিল্লীতে আসতে নিষেধ করেছেন। আমার তখন মনে হয় গান্ধীজী হয়তো এখনও রাজাজীর দিল্লী আসাটা চান না! আমি তাই এই বিষয়ে গান্ধীজীর সঙ্গে পরামর্শ না করে নিজের দায়িত্বেই রাজাজীকে লিখি তিনি যদি ইচ্ছা করেন তা হলে দিল্লীতে আসতে পারেন। আমার চিঠি পেয়েই তিনি দিল্লীতে চলে আসেন। গান্ধীজী এতে একটু বিরক্ত হয়েছিলেন।"[৭]

আজাদ ছিলেন কংগ্রেসের সভাপতি। গান্ধীজীর কংগ্রেসের সঙ্গে কেবল নৈতিক বন্ধন ছিল। সুতরাং রাজাগোপালাচারীকে কোন কিছু নির্দেশ দেওয়া আজাদের পক্ষে অধিকার-বহির্ভূত কাজ হয়নি। তিনি তাঁর সীমা অতিক্রম করেননি। কিন্তু কেনই বা রাজাজীকে গান্ধীজী মন্ত্রীমিশনের সঙ্গে দেখা করতে বারণ করেছিলেন আর কেনই বা গান্ধীজীর আপত্তিকে উপেক্ষা করে এবং তাঁর অজ্ঞাতসারে আজাদ রাজাজীকে দিল্লীতে আসার অনুমতি দিয়েছিলেন তার কথা আজাদ জানাননি। এ ক্ষেত্রে কারণ অনুমান করা ছাড়া কোন উপায় নেই। গান্ধীজী রাজাজীর সূত্র পুরোপুরি না মেনেও তাকে অবলম্বন করে জিন্নার সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়েছিলেন। রাজাজী ছিলেন প্রচণ্ড ধীমান ব্যক্তি। দেশবিভাগ সমর্থন করায় অনেক কংগ্রেসীর কাছেও রাজাজী গ্রহণযোগ্য ছিলেন না। গান্ধীজী কি রাজাজীর মন্ত্রীমিশনের সঙ্গে সাক্ষাৎকার এইজন্যই চাননি যাতে তিনি মন্ত্রীমিশনকে কোনভাবে প্রভাবিত করতে না পারেন? অন্য দিকে, মন্ত্রীমিশন ভারতবর্ষে আসবার আগে থেকেই আজাদ যখন প্রদেশের স্বায়ত্তশাসনাধিকার সমর্থন করছিলেন, মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রদেশগুলি ভারতবর্ষে থাকবে কিনা তা স্থির করবার অধিকার তাদের আছে, এই মত তুলে ধরছিলেন[৮] তখন আজাদ কি চেয়েছিলেন যে রাজাজীর মন্ত্রীমিশনের সঙ্গে আলোচনা তাঁদের তাঁর (আজাদের) কথা মেনে নিতে প্ররোচিত করবে! এর কোন সঠিক উত্তর কারও জানা নেই। ঘটনার আনুপূর্বিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়েই তা খুঁজে নিতে হবে।

আজাদ জওহরলালকে এই বলে অভিযুক্ত করেছিলেন যে উত্তরপ্রদেশে মন্ত্রীসভা গঠনের সময় জওহরলাল যদি মুসলিম লীগের দাবি মেনে নিতেন তা হলে লীগ কংগ্রেসের সঙ্গে মিলে যেত। তা না করায় জিন্না সুবিধা পেয়ে যান আর তার ফলেই ভবিষ্যতে পাকিস্তান সৃষ্টি হয়। এ কথা আগেই আলোচনা করা হয়েছে। আজাদ এ কথাও মনে করেছিলেন যে জিন্নার সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে গান্ধীজী ভুল করেছিলেন এবং 'গান্ধীজীর ভ্রান্ত কার্যকলাপের ফলে মিঃ জিন্না আবার ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ক্ষেত্রে গুরুত্ব অর্জন করেন'।[৯]

আজাদের এই মূল্যায়ন অনেকে সমর্থন করেননি। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে উত্তরপ্রদেশে মুসলিম লীগ যখন কংগ্রেসের মন্ত্রীসভায় যোগ দেবার আগ্রহ দেখিয়েছিল তখন তারা সেখানে বেশি শক্তিশালী ছিল না। এ কথা আজাদও মেনে নিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে লীগ-বিরোধী শক্তি তখন সেখানে প্রবল ছিল। সুতরাং লীগের অন্যায্য দাবি যদি কংগ্রেস তখন মেনে নিত তা হলে তার প্রতিক্রিয়া হিন্দুদের মধ্যে এবং কংগ্রেসী মুসলমানদের মধ্যে কেমন হোত তা বলা যায় না। এর ফলে পরিণাম খারাপ হবার সম্ভাবনাই ছিল বেশি। আবার আজাদ যখন বলেছেন যে জিন্নাকে প্রতিষ্ঠিত করার দায় অনেকটা গান্ধীজীর তখন তিনি মনে মনে ইংরেজদের 'সদিচ্ছা'র প্রতি আস্থা পোষণ করছিলেন। জিন্নার প্রকৃত বল যে ইংরেজ শাসকবর্গ এ কথা আজাদ মনে রাখেননি। গান্ধীজীর প্রয়াস ছিল জিন্নাকে ইংরেজদের আশ্রয় থেকে সরিয়ে আনা। গান্ধীজী তাতে কৃতকার্য হননি। মনে হয় আজাদ গান্ধীজীর এই প্রয়াসের দিকটি উপেক্ষা করেছেন। তাই দেখা যায় যে আজাদ এক দিকে যেমন ওয়াভেলকে প্রশংসা করছিলেন তেমনি অন্য দিকে অসমের গ্রুপে যাওয়া নিয়ে যখন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগের মধ্যে প্রবল মত-পার্থক্য দেখা দিয়েছিল তখন তার মীমাংসা করে দেবার জন্য তিনি মাউন্টবেটেনের নাম প্রস্তাব করেছিলেন। আজাদ লিখেছিলেন: "আমার মতে কংগ্রেস এবং লীগের ভিতর মত-পার্থক্য এমন এক পর্যায়ে এসে উপস্থিত হয়েছে যে উভয়ের মধ্যে সমঝোতা সৃষ্টি করার জন্য কোন তৃতীয় পক্ষের হস্তক্ষেপ দরকার হয়ে পড়েছে। আমার অভিমত হল, এই বিষয়টি আমরা লর্ড মাউন্টবেটেনের উপর ছেড়ে দিতে পারি। অতএব কংগ্রেস ও লীগ তাঁর সালিশী মেনে নিতে স্বীকার করে তাঁর হাতেই বিষয়টি ছেড়ে দিক। কিন্তু জওহরলাল এবং প্যাটেল আমার এই পরামর্শ মেনে নিতে চাইলেন না।"[১০]

এ কথা ঠিক যে দেশ স্বাধীন হবার পর কংগ্রেস মাউন্টবেটেনকেই ভারতবর্ষের গভর্নর জেনারেল পদে চেয়েছিল। এ কথাও ঠিক যে দেশবিভাগ হয়ে যাবার পর কংগ্রেস র‍্যাডক্লিফকে সীমান্ত কমিশনের দায়িত্ব দিতে স্বীকৃত হয়েছিল। কিন্তু এই দুটির সঙ্গে অসমের সমস্যার সমাধানে মাউন্টবেটেনকে সালিশী করার বিষয়টি বোধহয় এক করে দেখা যায় না। অসমকে বাংলার সঙ্গে গোষ্ঠীবদ্ধ করার বিষয়টি সরাসরি বাতিল করাই তখন ছিল বড় প্রশ্ন। তা ছাড়া আজাদের মন্তব্য থেকে এই কথাও স্পষ্ট হয়ে উঠেছে যে সেই সময় ক্ষমতা হস্তান্তরের আনুষঙ্গিক বিষয় নিয়ে কংগ্রেসের নেতাদের মধ্যেও মতানৈক্য ছিল। হয়তো পারস্পরিক অবিশ্বাসও দানা বাঁধতে শুরু করেছিল, পরে তা প্রকট হয়ে ওঠে।

এই রকম একটি অবিশ্বাসের ঘটনা প্যারেলাল এবং সুধীর ঘোষ লিখেছেন। প্যারেলাল লিখেছেন: "কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যরা তখনও ক্যাবিনেট ডেলিগেশনের প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখছিলেন। সেই সময় ২৮শে এপ্রিলের অপরাহ্নে ক্যাবিনেট ডেলিগেশনের কাছ থেকে গান্ধীজী এই মর্মে একটি বার্তা পান যে লর্ড পেথিক লরেন্স এবং স্যার স্টাফোর্ড ক্রিপস অবিলম্বে তাঁর সঙ্গে দেখা করতে চান।...সন্ধ্যাবেলায় তাই গান্ধীজীই ভাইসরয়ের ভবনে গেলেন। সেখানে উদ্যানের গোল জলাশয়ের পাশে বসে তাঁদের সঙ্গে কথা বলতে বলতে গান্ধীজী বুঝতে পারলেন যে কংগ্রেসের মধ্যেই গণ্ডগোল বেঁধেছে। কংগ্রেসের মধ্যে যাঁরা গান্ধীজীর সহকর্মী তাঁদেরই একজনের কাছ থেকে মন্ত্রীমিশন সম্ভবত একটি চিঠি পেয়েছিলেন। অথচ গান্ধীজী কিংবা ওয়ার্কিং কমিটি সেই চিঠির ব্যাপারে কিছু জানতেন না। ব্যাপার দেখে গান্ধীজী স্তম্ভিত হয়ে যান।"

ঘটনাটি সুধীর ঘোষ আরও বিস্তৃতভাবে বর্ণনা করেছেন। তিনি লিখেছেন যে ঐ চিঠিটি আজাদ লিখেছিলেন। মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাব কংগ্রেস তখন গ্রহণ করেনি। কংগ্রেসের নেতাদের অনেকের মধ্যেই তখন এটি নিয়ে দ্বন্দ্ব ছিল। কিন্তু আজাদ এটি পছন্দ করেছিলেন। সম্ভবত তিনি চিঠিতে লিখেছিলেন যে কংগ্রেসকে দিয়ে তিনি প্রস্তাবটি মানিয়ে নিতে পারবেন। এই রকম একটি চিঠি আজাদ লিখেছেন এ কথা জানতে পেরে গান্ধীজী মর্মাহত হন। তার চেয়েও বেশি আঘাত তিনি পান যখন আজাদ চিঠি লেখার কথা অস্বীকার করেন। চিঠিটি তখন গান্ধীজী নিজের কাছে এনে রেখেছিলেন। তারপর "মৌলানাসাহেবকে গান্ধীজী সরাসরি প্রশ্ন করলেন যেসব আলোচনা চলছে সে বিষয়ে তিনি ভাইসরয়কে কোন চিঠি লিখেছেন কি না। উত্তরে মৌলানা বললেন, না, তিনি লেখেননি। মৌলানাসাহেব জানতেন না যে যে-চিঠি লেখার কথা যখন তিনি অস্বীকার করেন তখন তার মাত্র কয়েক গজ দূরে গান্ধীজীর সামনে ডেস্কের উপরে তাঁর সেই মূল চিঠিখানি রাখা ছিল।"[১১]

পারস্পরিক ভুল বোঝাবুঝি যে কতদূর পৌঁছিয়েছিল তার উল্লেখ করেছেন বাদশা খাঁ। আজাদ বলেছিলেন যে বাদশা খাঁর এবং তাঁর দাদা ডাঃ খানসাহেবের প্রভাব সীমান্তপ্রদেশে ক্রমেই কমে আসছিল। তার একটি কারণ হল তাঁরা তাঁদের অতিথিদের চা দিয়ে আপ্যায়িত করতেন না। বাদশা খাঁ এই অভিযোগ অস্বীকার করেছেন।[১২] জওহরলাল নিজের ইচ্ছায় সীমান্তপ্রদেশ ভ্রমণে গিয়েছিলেন আজাদের এই অভিযোগও বাতিল করে দিয়ে বাদশা খাঁ জানিয়েছেন যে তিনিই জওহরলালকে আমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়েছিলেন। পক্ষান্তরে বাদশা খাঁ-ই অভিযোগ করেছেন যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি সীমান্তবাসীদের সাহায্যে কিছুই করেননি। কিন্তু অসমের বেলায় তাঁরা এমন উদাসীন ছিলেন না।[১৩] অভিমানীর সুরে আবদুল গফুর খাঁ আরও বলেছেন যে কংগ্রেস যদি জোর করত তা হলে সীমান্তপ্রদেশে গণভোট আটকান যেত। আজাদ তা মনে করেননি। আজাদ বলেছেন যে কংগ্রেসের পক্ষে দেশবিভাগ একবার মেনে নেবার পর গণভোট থেকে সরে আসার উপায় ছিল না। বাদশা খাঁ জানিয়েছেন যে তাঁদের প্রতি যে অন্যায় করা হয়েছে পৃথিবীর সামনে তা তুলে ধরার জন্যই তাঁরা বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। কিন্তু আজাদ নাকি বাদশা খাঁকে মুসলিম লীগে যোগ দেবার পরামর্শ দিয়েছিলেন।[১৪]

কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের মনের অমিলের কথা আজাদও সরাসরি উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন যে প্যাটেলের চেয়ে নেহরুকেই বেশি প্রভাবিত করেছিলেন লেডী মাউন্টবেটেন এবং কৃষ্ণ মেনন। কৃষ্ণ মেনন সম্পর্কে আজাদ এবং প্যাটেল একই রকম মনোভাব পোষণ করতেন। তিনি যে অনেক সময় জওহরলালকে ভুল পথে পরিচালিত করতেন সে বিষয়ে তাঁরা দুজনেই একমত ছিলেন। আবার আজাদ এবং প্যাটেলের মধ্যেও সম্পর্ক ভাল ছিল না। আজাদ লিখেছেন : "সর্দার প্যাটেলকে আমি সব সময় সহ্য করতে পারতাম না।"[১৫] নিজেদের মধ্যেকার মতানৈক্যের জন্যই যে তাঁরা কখন কখন কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে পারছিলেন না সেকথাও আজাদ স্বীকার করেছেন। সেই সঙ্গে তিনি এ কথাও বলেছেন : "গান্ধীজীর প্যাটেল এবং মাউন্টবেটেনের সঙ্গে সাক্ষাৎকারে কী ঘটেছিল আমি জানি না। কিন্তু গান্ধীজীর সঙ্গে আমি যখন আবার দেখা করি তখন আমি জীবনের সবচেয়ে বড় আঘাত পাই। কেননা আমি দেখি যে তাঁর পরিবর্তন হয়েছে। তখনও তিনি প্রকাশ্যে দেশবিভাগের সমর্থন করেননি। কিন্তু তার বিরুদ্ধেও আর তত জোরের সঙ্গে কিছু বলেননি।"[১৬]

আজাদ ঠিকই লিখেছেন যে গান্ধীজীর মধ্যেও পরিবর্তন লক্ষিত হচ্ছিল। পরিবর্তন হচ্ছিল কংগ্রেসের প্রায় সব নেতার মধ্যেই। আজাদও যে পরিবর্তিত হয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু পরিবর্তনের কারণ হয়তো সকলের ক্ষেত্রে এক ছিল না। বাদশা খাঁ লিখেছেন যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় তিনি এবং গান্ধীজী দেশবিভাগের বিরোধী ছিলেন। প্যাটেল এবং রাজাগোপালাচারী ছিলেন এর সমর্থক। তাঁরা অন্যদের উপর চাপ সৃষ্টি করছিলেন। শেষ পর্যন্ত ওয়ার্কিং কমিটি দেশবিভাগে রাজি হয়ে যান।[১৭] রামমনোহর লোহিয়া লিখেছেন যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির যে সভায় দেশবিভাগের প্রস্তাব গৃহীত হয় সেই সভায় তিনি, জয়প্রকাশ নারায়ণ, গান্ধীজী এবং বাদশা খাঁ ছাড়া আর কেউ তার বিরোধিতা করেননি।[১৮]

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা সংগ্রামের সময় জনপ্রিয়তার দৃষ্টিতে জওহরলালের স্থান ছিল গান্ধীজীর পরেই। নেতৃত্বের সব কটি গুণই তাঁর মধ্যে ছিল। যদিও কখন কখন তিনি আবেগের দ্বারা তাড়িত হতেন অথবা কুপিত হতেন কারও কারও উপর তবু এ কথা অনস্বীকার্য যে কোন রকম খণ্ডপ্রিয়তা অথবা স্বৈরাচারী প্রবৃত্তিকে তিনি প্রশ্রয় দিতেন ন । তাঁর আচরণে যখন গণতন্ত্রের আবরণ খসে যেত তখন তা এ জন্য নয় যে তিনি গধিপত্যে বিশ্বাস করেছেন ; বরং তা এই জন্যই যে ব্যক্তিত্বে সঙ্গীসাথীদের অনেকেই তাঁর সমকক্ষ ছিলেন না। জওহরলাল ঠিক কট্টর আদর্শমার্গী ছিলেন না। অবশ্যই তিনি মনে মনে আদর্শের পরিমণ্ডলে পরিভ্রমণ করতেন এবং ভবিষ্যতের জন্য স্বপ্নও ছিল তাঁর মনে। কিন্তু তিনি তাঁর আদর্শ এবং স্বপ্নকে তাঁর নিজের ধারণার 'বাস্তবের মুখোমুখি' (facing the reality)-র সঙ্গে সমীকৃত করেই যে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতেন। বাস্তবের বিশ্লেষণে যেখানে তাঁর ভুল হয়েছে সেখানেই তিনি ভুল করেছেন। দেশবিভাগকে মেনে নেওয়াও জওহরলালের ক্ষেত্রে অনুরূপ এক ঘটনা। ভুল কিনা তা নিয়ে বিতর্কের অবকাশ থাকলেও জওহরলালের কাছে এটি ছিল 'বাস্তবকে' মেনে নেওয়া।

নেহরুকে আজাদ তাঁর 'ঘনিষ্ঠতম প্রিয় বন্ধুদের একজন' বলে বর্ণনা করেছেন। তিনি এ কথাও বলেছেন যে 'ভারতবর্ষের জীবনে তাঁর অবদান অসীম'। কিন্তু সেই সঙ্গে আজাদ এ কথাও বলেছেন যে নেহরু এমন সব 'দুর্ভাগ্যজনক' কার্যকলাপের জন্য দায়ী ছিলেন 'যাতে ইতিহাসের ধারা ভিন্ন পথে চলতে থাকে।' আজাদ নেহরুর দুটি ত্রুটির কথা বলেছেন। একটি হল, ১৯৩৭ সালে উত্তরপ্রদেশের মন্ত্রীসভায় মুসলিম লীগের সদস্যদের স্থান না দেওয়া। আজাদের এই অভিযোগ নিয়ে আগেই আলোচনা করা হয়েছে। সময়ের দূর প্রান্তে বসে সেদিনকার ঘটনার আপাত পরিণাম কল্পনা করে অভিযোগের সত্যাসত্য বিচার করা যায় না। আজাদের মতে জওহরলালের দ্বিতীয় ত্রুটি হল, কংগ্রেস সভাপতিরূপে মন্ত্রীমিশনের পরিকল্পনার স্থিতিস্থাপকতা (clacticity) মান্য করা। জওহরলাল যে কথা বলেছিলেন তা হল : "আমি আমার পূর্ণ আশ্বাস এবং বিশ্বাস নিয়ে বলতে পারি যে শেষ পর্যন্ত গ্রুপিং হবে না।...আপনারা দেখবেন যেদিক থেকেই দেখা যাক না কেন গ্রুপ ব্যাপারটা ঘটে উঠবে না।" জিন্না এই বিবৃতি দেখে ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন এবং মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাবে মুসলিম লীগের সমর্থন প্রত্যাহার করে নিয়েছিলেন। গান্ধীজীও তাঁর অসন্তোষ জানিয়ে ১৭-৪-৪৬ তারিখে একটি চিঠিতে জওহরলালকে লিখেছিলেন : "তোমার যে বিবৃতিটি পত্রিকাগুলিতে প্রকাশিত হয়েছে তা ভাল শোনায়নি। যদি এটি সঠিকভাবে প্রকাশিত হয়ে থাকে তা হলে তার কিছু ব্যাখ্যা

প্রয়োজন। এ কথা স্বীকার করতেই হবে যে আমাদের স্বেতপত্রের সীমার মধ্যেই কাজ করতে হবে। মৌলানার লেখার মধ্যে তা পরিষ্কার করে বলা হয়েছে। আমরা আমাদের ব্যাখ্যা দিয়েছি। কিন্তু ফেডারেল কোর্ট যদি অন্য রকম ব্যাখ্যা দেয় তা হলে আমার মনে হয় যে আমাদের পরিষ্কার করে বলে দিতে হবে যে আমরা আমাদের ব্যাখ্যাতেই অটল থাকব। আমরা যদি এটুকু স্বীকার করতে না পারি আমরা কিছুই করতে পারব না এবং জিন্নাসাহেবের অভিযোগ যথার্থ বলে বিবেচিত হবে।"[১৯] যাই হোক, নেহরুর বক্তৃতা থেকে জিন্না যে সুযোগ নিতে চেয়েছিলেন তা দূর করবার জন্য কংগ্রেস নতুন করে মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাব সমর্থন করে প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। জওহরলালও জিন্নার সঙ্গে দেখা করে ভুল বোঝাবুঝির অবসান ঘটাতে চেয়েছিলেন। কিন্তু জিন্না তাঁর মত পালটাননি। সুতরাং আজাদের এই অভিযোগ মেনে নিতেই হয় যে জওহরলালের বিবৃতি ইতিহাসকে ভিন্ন খাতে প্রবাহিত করে দিয়েছিল। কিন্তু তাই বলে এ কথা জোর করে বলা যায় না যে জওহরলাল ঐ বিবৃতি না দিলে দেশবিভাগকে আটকান যেত। কেননা বিভিন্ন প্রদেশকে নিয়ে গ্রুপ গঠনের মধ্যেই বিচ্ছিন্নতাকে উস্কানি দেওয়া হয়েছিল এবং গ্রুপ গঠন হয়ে যাবার পর তা যদি আবার ভেঙে যেত তা হলে ভারতবর্ষ আরও কয়েকটি খণ্ডে বিভক্ত হয়ে যেত কিনা তা আগে থেকে অনুমান করা সম্ভব ছিল না।

জওহরলাল মাউন্টবেটনের দ্বারা এবং বিশেষ করে লেডি মাউন্টবেটনের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তাঁর বিরুদ্ধে এমন অভিযোগও করা হয়ে থাকে। ভাইসরয়রূপে ভারতবর্ষে আসার পর মাউন্টবেটনের ভারতীয় নেতাদের মধ্যে জওহরলালের সঙ্গেই প্রথম সাক্ষাৎকার ঘটে। এই সাক্ষাৎকারটি ছিল তিন ঘণ্টার। লিওনার্ড মসলে লিখেছেন যে এই সাক্ষাৎকারেই মাউন্টবেটন জওহরলালকে জয় করে নিয়েছিলেন এবং সেই সঙ্গে তাঁর পরিমাপও করে নিয়েছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল যে জওহরলাল তোষামোদে তুষ্ট হন এবং তাঁকে প্ররোচিত করা যায়। মাউন্টবেটন জওহরলালকে বলেছিলেন : "আপনি আমাকে ব্রিটিশ রাজ গুটিয়ে নেবার জন্য শেষ ভাইসরয় হিসেবে দেখবেন না। আমাকে দেখবেন নতুন ভারতবর্ষ গড়ার পথ প্রদর্শকরূপে।" জওহরলাল সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিয়েছিলেন : "আমি এখন বুঝতে পারছি যে আপনার আকর্ষণ খুবই বিপজ্জনক বলে সবাই কী বোঝাতে চান।" সেই মুহূর্ত থেকেই জওহরলাল মাউন্টবেটনের লোক হয়ে যান এবং পরবর্তী কালে লেডি মাউন্টবেটনের সঙ্গে পরিচিত হবার পর মাউন্টবেটন-গৃহস্থালির প্রতি তাঁর আসক্তি বেড়ে যায়।[২০]

জওহরলাল আবেগপ্রবণ মানুষ ছিলেন এ কথা মেনে নিলেও দেশের ভাগ্য নির্ণয়ে তিনি মাউন্টবেটন পরিবারের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন এমন কথা বোধহয় এত সহজে বলা যায় না। এ কথা ঠিক যে মাউন্টবেটনের প্রথম থেকেই লক্ষ্য ছিল কংগ্রেস নেতাদের, বিশেষ করে নেহরু এবং প্যাটেলকে গান্ধীজীর প্রভাব থেকে সরিয়ে আনা। তাঁর মনে হয়েছিল যে প্রকৃত ধাপ্পার মুখোমুখি হলে ভারতীয় নেতারা কাগুজে বাঘ হয়ে যান (Indians were paper tigers when confronted by the right type of bluff)।[২১] তবে গান্ধীজীর সম্পর্কে তাঁর মনে কিছুটা ভয় ছিল। এ সম্পর্কে মাউন্টবেটনের প্রেস এটাচি এ্যালেন ক্যাম্বেল জনসন তাঁর ডাইরিতে লিখেছেন : "বেলা সাড়ে বারটার সময় (২রা জুন ১৯৪৭, দেশবিভাগের আলোচনা তখন অনেকটা এগিয়ে গিয়েছে। —ভ. প্র. চ.) মহাত্মা এলেন। আজকের সকালের নেতৃবৈঠকে মহাত্মা উপস্থিত ছিলেন না। কিন্তু বৈঠকের আলোচনায় তিনি অন্যভাবে উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে

উপস্থিত কংগ্রেস নেতাদের মনের মধ্যে ছিলেন গান্ধী। দেশখণ্ডনের এই প্রস্তাব শুনে শেষ পর্যন্ত মহাত্মা কী মনোভাব গ্রহণ করবেন সে সম্বন্ধে কংগ্রেস নেতাদের মনে নানা ধরনের দ্বন্দ্ব চলছিল। কোনই সন্দেহ নেই যে, গান্ধীজীর সম্ভাব্য অভিমত সম্পর্কে কোন সুস্পষ্ট ধারণা করতে না পারায় কংগ্রেস নেতারা আলোচনায় তেমন উৎসাহিত হয়ে উঠতে পারছিলেন না এবং কোন অভিমত প্রকাশ করতে মনে মনে একটা কুণ্ঠাও অনুভব করছিলেন। গান্ধী তাঁর অন্তরের বাণী থেকে প্রেরণা লাভ করে থাকেন। কিন্তু গান্ধীর অন্তরের বাণী কী হবে সেটা অনুমান করাও অসাধ্য। কংগ্রেস নেতারা গান্ধীর আচরণের এই বাস্তব সত্যটি সম্বন্ধে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। শুধু কংগ্রেস নেতারা নয়, সর্বত্রই এই ভয় ছড়িয়ে পড়েছিল যে গান্ধী তাঁর দুর্বোধ্য বিবেকের ইঙ্গিতে দেশখণ্ডনের এই উদ্যোগ শৈষবারের মতো একেবারে চূর্ণ করে দেবার জন্য তাঁর চেষ্টাকে চরমে নিয়ে যেতেও কুণ্ঠিত হবেন না। সুতরাং মাউন্টবেটেন মনের ভিতর যথেষ্ট শঙ্কা নিয়েই গান্ধীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। গান্ধী কতকগুলি পুরনো ও ব্যবহৃত খামের টুকরো সম্মুখে রেখে বসেছিলেন। প্রথমেই একটি খামের টুকরোর উপর লিখে গান্ধী জানিয়ে দিলেন—আজ তাঁর মৌন দিবস। এ কথা জানামাত্র মাউন্টবেটেনের শঙ্কাকুণ্ঠিত মন যেন হাঁফ ছেড়ে বাঁচল। যাক, গান্ধীজীর বক্তব্যের মুখোমুখি আজ আর হতে হবে না।"[২২]

পরের দিন মাউন্টবেটেন এবং কংগ্রেসের পক্ষে নেহরু, মুসলিম লীগের পক্ষে জিন্না এবং শিখ সমাজের পক্ষে বলদেব সিং অল ইন্ডিয়া রেডিয়ো থেকে মাউন্টবেটেনের দেশবিভাগের প্রস্তাব সম্পর্কে তাঁদের অভিমত প্রচার করলেন। ক্যাম্বেল জনসন লিখেছেন : "নেহরুর বক্তৃতায় রূঢ় শ্লাঘার ভাব কিছুমাত্র ছিল না। তেমনি সাফাই গাইবার, নিজেকে দোষমুক্ত করবার অথবা আত্মসমর্পণ করবারও কোন চেষ্টার ভাব ছিল না। নেহরুর বক্তৃতায় তাঁর মনের গভীরের সেই অনুভূতিরই সুর ফুটে উঠেছিল—প্রত্যেক বৃহৎ সাফল্যের সঙ্গে সঙ্গে একটা বিফলতাও মিশে থাকার যে অনুভূতি প্রত্যেক মানুষের মনে একটা বিষাদের ভাব নিয়ে জেগে ওঠে।"[২৩]

দেশবিভাগের সিদ্ধান্ত যখন কংগ্রেস প্রায় মেনেই নিয়েছে তখন গান্ধীজী বিহার থেকে দিল্লীতে এসে পৌঁছান। লিওনার্ড মসলে লিখেছেন : "ঠিক এই সময়ে গান্ধীজীর আগমনে মাউন্টবেটেন ভয় পাচ্ছিলেন। এ কথা ঠিক যে বিগত কয়েক সপ্তাহ ধরে নেহরু এবং প্যাটেলের মনে আশা এবং আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে তিনি কৌশলে গান্ধীজীকে ভারতবর্ষের রাজনীতির মূল স্রোত থেকে সরিয়ে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু এই তীক্ষ্ণ বুদ্ধিসম্পন্ন, দক্ষ, মহান বৃদ্ধ মানুষটির (shrewed, able, magnificient old man) মনের কথা কারুরই জানা ছিল না।"[২৪]

প্রকৃতপক্ষে গান্ধীজীর সম্পর্কে মাউন্টবেটেনের ধারণা ছিল যে তিনি এমনই একজন মানুষ যাঁকে আগে থেকে বোঝা যাবে না। আর সেজন্যই তিনি গান্ধীজীর কাছ থেকে নেহরু এবং প্যাটেলকে দূরে সরিয়ে আনতে চেয়েছিলেন। তাতে তিনি সফলও হয়েছিলেন। ক্যাম্বেল জনসন ১লা জুন ১৯৪৭ তাঁর মাকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন "ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের ২০শে ফেব্রুয়ারি তারিখের ঘোষণার একটি ফল এই হয়েছে যে, কংগ্রেস হাইকমান্ডের মনোভাবের মস্ত একটা পরিবর্তন হয়ে গিয়েছে। দেশখণ্ডন অপরিহার্য এই বাস্তব সত্যটি উপলব্ধি করেছেন তাঁরা এবং এই সত্য স্বীকার করে নিতে তাঁরা সম্মতও হয়েছেন। সম্মত হচ্ছেন না গান্ধী। দেশখণ্ডন অপরিহার্য বলে তিনি স্বীকার করে নিতে রাজি নন এবং এমন প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অতি প্রবল এক অভিযানও

তিনি অন্তরাল হতে চালিয়ে যাচ্ছেন। তবে এই অভিযান কতদূর পর্যন্ত তিনি এগিয়ে নিয়ে যেতে পারবেন তা বলা দুঃসাধ্য। কারণ সেটা বুঝে ওঠা দুষ্কর। নেহরু এবং প্যাটেল অন্তর্বর্তী গভর্নমেন্টের দুই কংগ্রেসী প্রধান দেশখণ্ডনের প্রস্তাব মেনে নিতে রাজি আছেন।"[২৫]

জনসনের কথা যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়। মাউন্টবেটনের কৌশল সার্থকতা লাভ করে। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি দেশবিভাগের জন্য মাউন্টবেটন যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন তা মেনে নেন। গান্ধীজী তাঁর অভিযানকে বেশিদূর এগিয়ে নিয়ে যেতে পারেননি। তবে এ কথাও ঠিক যে নেহরু স্বাধীনতার বিনিময়ে দেশবিভাগকে মেনে নিয়েও তার জন্য দর কষাকষি করেছিলেন। এই কারণে এবং হয়তো বা নিজের মনকে কিছুটা সান্ত্বনা দেবার জন্য জিন্নার দুটি রাষ্ট্রই স্বাধীন এবং সব দিক থেকে সমান রাষ্ট্র হবে এই কথার উত্তরে তিনি বলেছিলেন যে ভারতবর্ষের কয়েকটি অনিচ্ছুক প্রদেশকে ভারতবর্ষের বাইরে যাবার অনুমতি দেবার ফলেই পাকিস্তান নামে একটি নতুন রাষ্ট্র গঠিত হতে চলেছে। ভারতবর্ষ থেকে বিচ্যুত অংশ নিয়ে গঠিত এই নতুন রাষ্ট্র সব দিক থেকে ভারতবর্ষের সমান রাষ্ট্র হতে পারে না। জওহরলাল ভুল করেছিলেন। এটি ছিল তাঁর ইচ্ছা-চিন্তা (wishful thinking)। বাস্তবে পাকিস্তান ভারতবর্ষের মতোই বিশ্ব রাজনীতিতে সমান মর্যাদাসম্পন্ন রাষ্ট্ররূপেই জন্মগ্রহণ করেছিল।

এটলি ঘোষণা করেছিলেন যে ১৯৪৮ সালের ১লা জুন ক্ষমতা হস্তান্তরের কাজ শেষ করা হবে। এই দিনটি বেছে নেবার পিছনে একটি কাহিনী আছে। ওয়াভেল তো তাঁর প্রচেষ্টায় সফল হতে পারেননি। আজাদ ছাড়া কংগ্রেসের অন্য নেতারা তাঁর প্রতি ক্ষুণ্ন ছিলেন। এই রকম পরিস্থিতিতে তাঁকে ইংলন্ডে ফিরিয়ে নিয়ে যাওয়া স্থির হয়েছিল। বস্তুত তাঁকে অপদস্থ এবং অপমানিত হয়েই দেশে ফিরে যেতে হয়েছিল। তাঁর স্থলাভিষিক্ত হন মাউন্টবেটেন। যুদ্ধের অবসানে মাউন্টবেটেনের ইচ্ছা ছিল তাঁর পুরনো জায়গায় অর্থাৎ নৌবাহিনীতে ফিরে যাবার। এটলি তাঁকে ভারতবর্ষে গিয়ে দু বছরের মধ্যে কাজ শেষ করে নৌবাহিনীতে যোগ দিতে রাজি করিয়েছিলেন। মাউন্টবেটেনের মনে হয়েছিল যে সময়কালটি একটু বেশি ধরা হচ্ছে। সময়েরই এই টানাপোড়েনের মধ্যেই আটচল্লিশ সালের পয়লা জুন তারিখটিকে চিহ্নিত করা হয়েছিল। মাউন্টবেটেন বলেছিলেন যে ঐ তারিখের ত্রিশ দিন পরেই তিনি নৌবাহিনীতে ফিরে যাবেন। তারিখটি শুনে চার্চিল খেদোক্তি করেছিলেন—এত তাড়াতাড়ি।[২৬]

কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য ঐ তারিখটি পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হয়নি। তার দশ মাস আগেই সেই কাজ সম্পন্ন হয়ে গিয়েছিল। এই কাজ সমাধা করার নায়ক ছিলেন মাউন্টবেটেন। তাঁর ব্যক্তিত্বের সঙ্গে যুক্ত হয়েছিল ভি. পি. মেননের নেপথ্য থেকে সহযোগিতা। রঙ্গমঞ্চে মাউন্টবেটেনের প্রবেশ করার আগে থেকেই মেনন ভারতবর্ষকে ডোমিনিয়ন স্টেটস দেবার একটি পরিকল্পনা প্রস্তুত করেছিলেন। তাতে বলা হয়েছিল যে পাকিস্তান এবং হিন্দুস্থান নামে দুটি কেন্দ্রীয় সরকারের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরিত করা হবে। দুটি দেশে দুজন গভর্নর জেনারেল থাকবেন। দুটি দেশ তাদের সংবিধান রচনা করবে। যত দিন না তা হচ্ছে তত দিন ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন বিধি অনুসারে দুটি রাষ্ট্রের কাজকর্ম পরিচালিত হবে। এই পরিকল্পনা যখন নেহরুকে জানান হয় তখন তিনি ডোমিনিয়ন স্টেটাস ব্যবস্থার বিরুদ্ধে তাঁর আপত্তি তোলেন। তিনি বলেন পূর্ণ স্বাধীনতা ছাড়া দেশবাসী কিছুতেই সন্তুষ্ট হবে না। মেনন বলেছিলেন যে তিনি 'সম্রাট' (emperor)

কথাটি বাদ দিতে পারেন। উত্তরে নেহরু বলেছিলেন : "আমার ভাবপ্রবণতাবশত আমি ব্যক্তিগতভাবে সব সময়েই ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সঙ্গে যতদূর সম্ভব ঘনিষ্ঠতম সম্পর্ক বজায় রাখতে চাই। সে সম্পর্ক কী আকার নেবে সে বিষয়ে আমার স্পষ্ট ধারণা নেই। তবে আমার মনে হয় এবং আমি আশা করি যে পীড়াদায়ক নির্দিষ্ট শব্দটি বাদ দিয়েও* সম্পর্ক বজায় রাখা যায়। তবে ডোমিনিয়ন স্টেটাসের অবস্থায় থেকেও ভারতবর্ষ ইচ্ছা করলে কমনওয়েলথ থেকে বেরিয়ে আসতে পারবে।" মাউন্টবেটেন এতে সম্মত হন। তিনি বলেন যে সেই পরিস্থিতিতে সময়সীমাকে আরও এগিয়ে নিয়ে আসা যায়।[২৭]

এই আলোচনা থেকে যেটি স্পষ্ট হয়ে উঠেছে তা হল মাউন্টবেটেন ভারতবিভাগ সম্পর্কে নেহরুর সম্মতি তখনই আদায় করে নিতে সক্ষম হয়েছিলেন যখন এই বিভাজনের পরিকল্পনার মধ্যে বাংলা এবং পাঞ্জাবকেও ভাগ করার কথা পাকা হয়ে গিয়েছিল। বস্তুত ২০-২-৪৭ তারিখে নেহরু একটি বক্তৃতায় স্পষ্ট করে বলে দিয়েছিলেন যে মুসলিম লীগ যদি চায় তবে তারা পাকিস্তান পেতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষের কোন অংশ যদি পাকিস্তানে যেতে না চায় তা হলে সেই অংশকে তারা তাদের সঙ্গে নিয়ে যেতে পারবে না। রাজেন্দ্রপ্রসাদ কয়েক দিন পরে এই কথাগুলিকে আরও স্পষ্ট করে বলেছিলেন যে সব কটি প্রদেশকে নিয়ে যদি ইউনিয়ন রাষ্ট্র গঠিত না হয় তবে কোন সংবিধান কোন অনিচ্ছুক অংশের উপর জোর করে চাপিয়ে দেওয়া যাবে না ; এর অর্থ হল কেবল ভারতবর্ষের বিভাজন নয়, কতকগুলি প্রদেশেরও বিভাজন।[২৮]

মাউন্টবেটেন তাঁর পরিকল্পনাটি ইংলন্ডে পাঠিয়ে দেন এবং তা কিছু সংশোধিত হয়ে ফিরে আসে। স্থির হয় যে ১৭ই মে ১৯৪৭ একটি সভায় মাউন্টবেটেন পরিকল্পনাটি নেতাদের সামনে উপস্থিত করবেন। তার আগেই (১০-৪-৪৭) তিনি সেটি নেহরুকে দেখতে দিয়েছিলেন। নেহরু পরিকল্পনাটি পড়ে তীব্র আপত্তি জানিয়ে সেটিকে ঠেলে সরিয়ে দেন। তাঁর মনে হয়েছিল যে সংশোধিত পরিকল্পনাটি সম্পূর্ণ ভিন্ন প্রকারের, আগের পরিকল্পনাটির সঙ্গে তার বিশেষ মিল নেই। মাউন্টবেটেন অবশ্য এ কথা মানতে চাননি। ক্যাম্বেল জনসন লিখেছেন : "স্বাধীন ভারত রাষ্ট্রকে 'নতুন' রাষ্ট্র বলে গণ্য না করে রাজনীতিক অর্থে পূর্বের ভারত রাষ্ট্র বলে গণ্য করার নীতি অক্ষুণ্ণ আছে তা দেখে নেহরু অবশ্য খুশি হয়েছেন। কিন্তু লন্ডনের হাতে পড়ে পরিকল্পনার খসড়ায় যেসব পরিবর্তন হয়েছে তাতে ভারতকে বন্ধানীকরণের মতলবের মতোই একটা মতলবের প্রমাণ নেহরু দেখতে পেয়েছেন। ভারতবর্ষ এবং বর্তমান গণপরিষদই হল ব্রিটিশ ভারতের একমাত্র উত্তরাধিকারী রাজ্য ও কর্তৃত্ব এবং পাকিস্তান ও মুসলিম লীগ হল ভারতবর্ষ থেকে কতকগুলি বিচ্ছিন্ন অংশ এবং এই বিচ্ছিন্ন অংশের কর্তৃত্ব—এই নীতি পুরোপুরি স্বীকৃত দেখতে চান নেহরু।"[২৯]

এই খসড়া দেখার পর নেহরু মাউন্টবেটেনকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন : "মনে হচ্ছে মহামান্য ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ভারতবর্ষের বাস্তব অবস্থা থেকে বিচ্ছিন্ন নিজেদের এক গজদন্ত নির্মিত প্রাসাদে বসে কাজকর্ম করেন। ...আমার প্রতিক্রিয়া যদি খুব প্রবল হয়ে থাকে তা হলে আপনি সহজেই অনুমান করতে পারবেন যে আমার সহকর্মীরা এবং অন্যেরা এটিকে কী চোখে দেখবেন। ...আমি আপনাকে এই ইঙ্গিতটি জানাবার জন্যই এই চিঠি দিচ্ছি যে প্রস্তাবগুলি থেকে আমি কতদূর বিব্রত হয়েছি। আমার বিশ্বাস সমগ্র দেশ এই প্রস্তাবগুলি

---

* ডোমিনিয়ন স্টেটাস প্রসঙ্গে নেহরুর কথা—'without the offending phrasedoggy'

পছন্দ করবে না এবং এর প্রতিবাদ করবে।"[৩০]

নেহরুর এই প্রতিক্রিয়ায় মাউন্টবেটেন প্রমাদ গোনেন। তিনি এটলিকে বিষয়টি জানিয়ে দেন এবং বলেন যে পুনঃ সংশোধিত পরিকল্পনার খসড়া খুব তাড়াতাড়ি পাঠান হচ্ছে। তিনি ভি. পি. মেননকে পরিকল্পনাটি সংশোধন করতে বলেন। মেনন তা করেন। ক্ষমতা হস্তান্তর এবং দেশখণ্ডনের মতো গুরুত্বপূর্ণ পরিকল্পনাটি তৈরি করতে এবার তাঁর মাত্র চার ঘণ্টা সময় লাগে। মাউন্টবেটেন এই পরিকল্পনাটি ইংলন্ড থেকে ঘুরে আসার পর ২রা জুন ১৯৪৭ নেতাদের সামনে উপস্থাপিত করেছিলেন। এটিই হল মাউন্টবেটেন পরিকল্পনা। নেহরু এটি মেনে নিয়েছিলেন।

কংগ্রেসের মধ্যে বাস্তববাদী এবং দৃঢ়চেতা মানুষ বলে বল্লভভাই প্যাটেল পরিচিত ছিলেন। আজাদ যেমন কোন দিনই নিজেকে গান্ধী-অনুগামী বলে প্রতিষ্ঠিত করতে চাননি এবং নেহরু যেখানে বরাবর গান্ধী ভাবধারার বিরোধী মনোভাব প্রকাশ করেছেন সেখানে প্যাটেল একজন গান্ধীপন্থী বলেই গণ্য হতেন। গান্ধী-পন্থার গঠনকর্মের দিকে নয় প্যাটেল ছিলেন স্বাধীনতা সংগ্রামে গান্ধী-নেতৃত্বের অনুসারী। প্যাটেলের এই পরিচয় অনেকখানি সত্য হলেও ক্ষমতা হস্তান্তরের সময়, মুসলিম লীগের সঙ্গে কথাবার্তা বলার বিষয়ে এবং দেশবিভাগের প্রশ্নে তিনি গান্ধীজীর চিন্তা-ভাবনাকে গ্রহণযোগ্য বলে মনে করেননি। স্পষ্টতই তিনি জানিয়েছিলেন যে কংগ্রেস একটি গান্ধীবাদী প্রতিষ্ঠান নয়। একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন : "কংগ্রেস দেশের প্রতিরক্ষার জন্য অথবা দেশের আভ্যন্তরীণ শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার জন্য জাতীয় সেনাবাহিনী রাখার বিরুদ্ধে নয়। কংগ্রেসের অল্প কিছু লোকই গান্ধীজীর পরিপূর্ণ অহিংসায় বিশ্বাস করেন। গান্ধীজীর মতো পরিপূর্ণ অহিংসায় বিশ্বাসী লোকেদের নিয়ে যদি কংগ্রেস গঠিত হোত তা হলে তা মুষ্টিমেয় লোকের সংগঠনে পরিণত হোত।"[৩১]

প্যাটেল খাঁটি কথাই বলেছিলেন। কংগ্রেসের মধ্যে গান্ধী-পন্থী বলে পরিচিত অনেকেই প্রকৃত অর্থে গান্ধীজীর মতাদর্শকে পুরোপুরি মেনে নেননি। তাঁরা কেবল স্বাধীনতার সংগ্রামে গান্ধীজীর নেতৃত্বকে মেনে নিয়েছিলেন। প্যাটেল ছিলেন এই দলের মানুষ। নেতাকে অন্ধ অনুগমন করার চেয়ে নিজের বিচার-বিবেচনা অনুসারে চলাকেই তিনি যথোচিত কাজ বলেই মনে করতেন। বিশেষ করে ক্ষমতা হস্তান্তর কীভাবে হবে সে সম্পর্কে তিনি নিজের মতকেই প্রাধান্য দেওয়া শ্রেয় বলে মনে করেছিলেন। মাউন্টবেটেনের এটি নজর এড়ায়নি। ভারতবর্ষে আসবার আগেই তিনি বুঝে নিয়েছিলেন যে এই কঠিন হৃদয়, কংগ্রেসী মহলে লৌহমানব বলে পরিচিত প্যাটেলকে বাদ দিয়ে ক্ষমতা হস্তান্তরের দিকে বেশি দূর এগোন যাবে না। জনসন জানিয়েছেন যে ভারত সরকারের সংবাদ দফতরের সচিব জি. এস. বজম্যান তাঁকে জানিয়েছিলেন যে "প্যাটেলই হলেন ভারতীয় নেতাদের মধ্যে সবচেয়ে বেশি শক্তিশালী। যদি প্যাটেলকে বাদ দিয়ে কোন আলোচনা বা সিদ্ধান্ত করা হয় তবে সে আলোচনা বা সিদ্ধান্তের দ্বারা কোন ফল হবে না।"[৩২]

এই কথা মনে রেখে মাউন্টবেটেন নেহরুর সঙ্গে সঙ্গে প্যাটেলকেও তাঁর নিজের দিকে টেনে নিতে সচেষ্ট হয়েছিলেন। নেহরুকে তিনি সম্মোহিত করতে চেয়েছিলেন তাঁর ব্যক্তিত্ব দিয়ে আর প্যাটেলকে প্রভাবিত করতে চেয়েছিলেন দেশের বাস্তব অবস্থার দিকে আঙুল দেখিয়ে—সেই বাস্তব অবস্থা হল মুসলিম লীগ এবং মুসলমানদের একটি বড়

অংশের অনমনীয় মনোভাব, দেশে বিশৃঙ্খলা ও হানাহানি, গান্ধীজীর 'মুসলমানদের প্রতি অহেতুক দরদ' এবং স্বাধীনতা হাতছাড়া হয়ে যাবার সম্ভাবনা। দেশবিভাগকে আটকাবার জন্য গান্ধীজী মরিয়া হয়ে মাউন্টবেটেনকে বলেছিলেন যে তিনি জিন্নাকে বলুন যে জিন্না তাঁর মনোমত মন্ত্রীসভা গঠন করুন। তিনিই ঠিক করবেন যে মন্ত্রীসভার সদস্যরা সকলে মুসলমান হবেন অথবা মুসলমান এবং হিন্দু হবেন। ভারত শাসনের পূর্ণ ক্ষমতা এই সরকারের থাকবে। মাউন্টবেটেন গান্ধীজীকে বলেছিলেন যে তিনি এই প্রস্তাবের প্রতি সহানুভূতিশীল এবং কংগ্রেস যদি এর সম্ভাব্যতা মেনে নেয় তা হলে তিনি একে রূপ দিতে চেষ্টা করবেন। মাউন্টবেটেনের এটি কথার কথা ছিল। বলা যায় যে এর মধ্যেই তিনি কূট কৌশল প্রয়োগের ইঙ্গিত পেয়েছিলেন। কেননা তিনি জানতেন যে তা হবার নয় এবং যাতে তা না হয় তার জন্য চেষ্টা করতেও তিনি কসুর করেননি। তিনি কংগ্রেস নেতাদের বলেছিলেন : "উনি (গান্ধীজী) একজন বাস্তববাদী লোক নন। দেখুন কেমন এক বোকা বোকা (silly) পরিকল্পনা তিনি উপস্থিত করেছেন। তিনি বলছেন ভারতবর্ষকে জিন্নার হাতে তুলে দিতে। এখন আদর্শবাদীর হাবভাব দেখাবার সময় নয়, এখন হল কাজের সময়।"[৩৩]

মাউন্টবেটেনের কূটনীতি কাজ করে। এর পর থেকেই কংগ্রেসের নেতারা গান্ধীজীকে এড়িয়ে সিদ্ধান্ত নিতে থাকেন। গান্ধীজীও ভাইসরয় এবং কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গে কথা বলার গুরুত্ব হারিয়ে গিয়েছে বুঝতে পেরে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির কাজ করতে বিহারে চলে যান। বস্তুত ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসেই প্যাটেল, নেহরু, রাজেন্দ্রপ্রসাদরা দেশবিভাগ মেনে নিয়েছিলেন। আজাদ লিখেছেন এবং দুর্গাদাসও লিখেছেন যে প্যাটেলই সর্বপ্রথম প্রদেশভাগসহ দেশবিভাগের সিদ্ধান্ত মেনে নিয়েছিলেন। বস্তুত সেই সময় অনেক কংগ্রেস নেতাই মনে করেছিলেন যে ইংলন্ডের পরবর্তী নির্বাচনে শ্রমিক দলের ক্ষমতায় আসবার সম্ভাবনা কম। তা হলে স্বাধীনতা সুদূরপরাহত হয়ে যাবে। অতএব পাকিস্তান মেনে নিয়ে স্বাধীনতা আদায় করে নেওয়ার সেইটিই ছিল সুবর্ণ সুযোগ।[৩৪]

আসল কথা কলকাতার সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা প্যাটেলের মনকে গভীরভাবে নাড়া দিয়েছিল। অন্তর্বর্তী সরকারে লিয়াকত আলির বাজেট তাঁর পায়ের তলা থেকে মাটি সরিয়ে দিচ্ছিল। তাঁর মনে হচ্ছিল যে মাউন্টবেটেনের দেশবিভাগের প্রস্তাব যদি মেনে নেওয়া না হয় তবে দেশের মধ্যেই একাধিক পাকিস্তান সৃষ্টি হয়ে যাবে। স্বাধীনতা লাভের এক বছর পরে (২৫-১১-৪৮) প্যাটেল একটি বক্তৃতায় স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে বলেছিলেন : "আমার মনে হয়েছিল যে আমরা যদি দেশবিভাগ মেনে না নিই তা হলে ভারতবর্ষ খণ্ড খণ্ড হয়ে যাবে। এক বছর অফিসে কাজ করে আমাদের এই বিশ্বাস জন্মেছিল যে যেভাবে আমরা অগ্রসর হচ্ছিলাম তা আমাদের বিপর্যয়ের মধ্যে টেনে নিয়ে যাবে। তখন আমাদের একটি নয় অনেকগুলি পাকিস্তান হয়ে যাবে। প্রত্যেকটি অফিসে পাকিস্তানের কেন্দ্র সৃষ্টি হবে।"[৩৫*] প্যাটেলের ধারণার সঙ্গে আজাদের মনোভাবের কোন মিল ছিল না। আজাদ লিখেছেন যে তিনি মাউন্টবেটেনকে মন্ত্রীমিশনের পরিকল্পনা কার্যকর করতে বলেছিলেন। তিনি গান্ধীজীকেও বলেছিলেন যে বর্তমান অবস্থা যেন আরও বছর দু-তিন বজায় থাকে। কেননা 'প্রকৃত ক্ষমতা ভারতীয়দের হাতে এসে

---

* এই প্রসঙ্গ আগের পরিচ্ছেদে উল্লেখ করা হয়েছে।

গিয়েছে। এখন শুধু আইনানুগভাবে ক্ষমতা হস্তান্তরই বাকি আছে।'[৩৬] যেহেতু প্যাটেল আজাদের এই মতের সমর্থক ছিলেন না সেইহেতু তিনি ভি. পি. মেননের তৈরি ডোমিনিয়ান স্টেটাস এবং তৎসহ দেশবিভাগের প্রস্তাব মেনে নিয়েছিলেন। সাতচল্লিশ সালের জানুয়ারি মাসেই (২৫-৬-৪৭) তিনি কংগ্রেস যাতে গণপরিষদ গঠনের প্রস্তাব মেনে নেয় তার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। আর সেই সঙ্গে এই কথাও বলেছিলেন যে দেশবিভাগ যদি করতেই হয় তবে প্রদেশকেও ভাগ করতে হবে। তাঁর আশা ছিল যে প্রদেশ ভাগের দাবি তুলে দেশবিভাগকে আটকানো যাবে। সেজন্য তিনি বলেছিলেন : "লীগ যদি পাকিস্তানের জন্য জিদ করতে থাকে তবে তার একমাত্র বিকল্প হল পাঞ্জাব এবং বাংলার বিভাজন। ... আমার মনে হয় ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট বিভাজনে রাজি হবেন না। অন্তিমে তাঁরা দেখবেন যে সবচেয়ে বেশি ও শক্তিশালী দলকে দেশ শাসনের ভার তুলে দেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ। তাঁরা যদি তা না করেন তা হলেও কিছু এসে যায় না। পূর্ববঙ্গ, পাঞ্জাবের একাংশ, সিন্ধু এবং বেলুচিস্তানকে বাদ দিয়ে সমগ্র ভারতবর্ষে একটি শক্তিশালী কেন্দ্রীয় সরকার থাকলে এবং তার কাছে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন থাকলে কেন্দ্র এত ক্ষমতাসম্পন্ন হবে যে অবশিষ্ট অংশগুলি শেষ পর্যন্ত ভারতবর্ষে এসেই যাবে।"[৩৭]

প্যাটেলের এই মনোবাঞ্ছা অথবা বলা যায় যে আত্ম-সান্ত্বনা বাস্তবায়িত হয়নি। সে তো পরের কথা। কিন্তু প্যাটেলের কথা থেকেই মাউন্টবেটেন বুঝতে পেরেছিলেন যে প্যাটেল ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয় নিয়ে কতদূর পর্যন্ত যেতে পারেন। ফলে তিনি প্রদেশভাগসহ দেশবিভাগের প্রস্তাবই তুলে ধরেন। জিন্না তা মেনে নেন। কংগ্রেসও মেনে নেয় ১৬ই মার্চ ১৯৪৭ সালে অনুষ্ঠিত সভায়। এই সভাতে গান্ধীজী উপস্থিত ছিলেন না। তিনি তখন পাটনায়। পরে তিনি প্যাটেলকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন যে পাঞ্জাবকে ভাগ করবার প্রস্তাব কেন মেনে নেওয়া হল। অর্থাৎ পাঞ্জাব অখণ্ড থাকলে বাংলা ভাগ হত না, আর ভারতভাগও আটকে যেত। উত্তরে প্যাটেল গান্ধীজীকে জানিয়েছিলেন যে তিনি যে দেশবিভাগ চান না সেকথা তাঁরা কেবল সংবাদপত্রের মাধ্যমেই জানতে পেরেছিলেন।[৩৮]

কথাটি যে পুরোপুরি সত্য নয় এ কথা বোধহয় প্যাটেল নিজেও জানতেন। দেশবিভাগের সম্পর্কে গান্ধীজী তাঁর অভিমত অনেক আগে থেকেই বলে আসছিলেন। গান্ধীজীর কাছের মানুষ প্যাটেলের তা না জানার কথা নয়। আসলে তিনি যে গান্ধীজীর চিন্তা-ভাবনা থেকে নিজেকে দূরে সরিয়ে নিচ্ছিলেন এটি তারই প্রমাণ। নিজের স্বতন্ত্র অভিমত থাকা কোনভাবেই দূষণীয় হতে পারে না। বিশেষ করে প্যাটেলের মতো ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষের তা থাকতেই পারে। আসল কথা হল গান্ধীজীর নেতৃত্বের প্রতি প্যাটেল ক্রমশই সন্দিহান হচ্ছিলেন। গান্ধীজীর ভাবধারার সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে নিজেকে মিলিয়ে না দিলেও এতকাল গান্ধীজীর নেতৃত্বকে তিনি মেনে এসেছিলেন। স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে এসে সেই নেতৃত্বকেও তিনি অস্বীকার করেন। গান্ধীজী নিজেও এ কথা পরবর্তী সময়ে প্রকাশ্যে ঘোষণা করেছিলেন। স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে যখন দিল্লীতে দাঙ্গা প্রবল আকার ধারণ করেছিল তখন প্যাটেলের বিরুদ্ধে সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগ উঠেছিল। গান্ধীজী সেই অভিযোগ খণ্ডন করে দিয়ে বলেছিলেন : "সরদার যে বলেছিলেন যে মুসলিম লীগের লোকরা রাতারাতি বন্ধু হয়ে উঠতে পারে না তা নিয়ে কেউ কেউ তাঁকে তিরস্কার করেন। ঐ মন্তব্যের জন্য আমি প্যাটেলকে দোষ দিই না। আপনাদেরও তাঁকে দোষ দেওয়া উচিত নয়। বেশির ভাগ হিন্দুই ঐ মত পোষণ করেন। আমি চাই মুসলিম লীগের বন্ধুরা মুখের কথায় নয় আচরণের দ্বারা প্রমাণ করুন যে

সরদারের এই কথা ঠিক নয়।" এর পরেই গান্ধীজী বলেছিলেন : "সরদারকে এক সময় লোকেরা ভালবেসে আমার প্রতিধ্বনি (yesman) বলে ডাকত। যদিও এখন আর তিনি তা নন, তবুও তিনি আমার বিশিষ্ট বন্ধু।"[৩৯]

প্যাটেল কেন দেশবিভাগ মেনে নিয়েছিলেন সেকথা তিনি পরবর্তী সময়ে স্পষ্ট করে উল্লেখ করেছেন। তিনি তার জন্য দুটি কারণ দেখিয়েছেন। একটি হল, যেহেতু কংগ্রেস অহিংসায় বিশ্বাসী ছিল সেইহেতু কংগ্রেসের পক্ষে হিংসার পথে তাকে প্রতিহত করা সম্ভব ছিল না। কংগ্রেস যদি নীতি পরিবর্তন করত তা হলেও সেই অবস্থায় সহিংস প্রতিরোধ করতে গিয়ে কংগ্রেস নিজের ধ্বংস ডেকে আনত। মুসলিম লীগের সঙ্গে সাংঘাতিক রকমের সহিংস সংঘর্ষ দীর্ঘদিন ধরে চলত। আর ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তার সেনাবাহিনী এবং পুলিশ নিয়ে দেশের উপর চেপে বসে থাকত। দ্বিতীয় কারণ হল, দেশবিভাগ যদি মেনে না নেওয়া হত তা হলে শহরে এবং গ্রামাঞ্চলে ব্যাপক সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হত। এমনকি সেনাবাহিনী এবং পুলিশও সাম্প্রদায়িক বিবাদের দ্বারা ছিন্নভিন্ন হয়ে যেত। হিন্দুদের মধ্যে ধর্মোন্মত্ততা কম থাকায় তারা একটি সুসংগঠিত সংগঠনের অভাবে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হোত। পক্ষান্তরে, সংঘর্ষ যদি একান্ত হোতই তবে দুটি প্রতিষ্ঠিত রাষ্ট্রের মধ্যে তা হলে তাকে সহজে নিবৃত্ত করা যেত। সমগ্র দেশে ছড়িয়ে পড়া দুটি সম্প্রদায়ের বিরোধের মীমাংসা করা কঠিনতর কাজ বলেই বিবেচিত হয়েছিল।"[৪০] আরও পরে ১৪-১-৫০ তারিখে কলকাতায় চেম্বার অফ কমার্সের এক সভায় প্যাটেল বলেছিলেন : "আমরা দেশবিভাগ এই জন্যই মেনে নিয়েছিলাম যে আমরা দেখেছিলাম, বিকল্প ব্যবস্থা আরও খারাপ। সেইজন্যই আমরা তা মেনেছিলাম। কিন্তু আমরা একটি শর্ত করেছিলাম। তা হল কলকাতাকে যদি আমাদের হারাতে না হয় তবেই আমরা দেশবিভাগ মানতে পারি। কলকাতাকে হারানর অর্থ দেশকেই হারিয়ে ফেলা।"[৪১] কলকাতার উল্লেখ প্যাটেল এই জন্যই করেছিলেন যে মুসলিম লীগকে খুশি করবার জন্য গভর্নর বরোজ কলকাতাকে 'ফ্রি সিটি' অর্থাৎ মুক্ত শহর করার প্রস্তাব সেই সময় করেছিলেন। কংগ্রেস তাতে সম্মত হয়নি।

স্বায়ত্তশাসনের অধিকার : কংগ্রেসের ধর্মসঙ্কট

গান্ধীজী যখন রাজাজীর প্রস্তাব নিয়ে জিন্নার সঙ্গে আলোচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন তখন একজন পত্রলেখক গান্ধীজীকে এই রকম একটি প্রশ্ন করেছিলেন : গান্ধীজী রাজাজীর ফরমুলা সমর্থন কী করে করেন এবং পাকিস্তানের নীতিতে তিনি সম্মত হন কী করে ? তিনি কি দেশবিভাগের পরিকল্পনাকে মিথ্যা এবং ভারতবর্ষের অঙ্গচ্ছেদকে পাপ বলে বর্ণনা করেননি ? গান্ধীজী তার উত্তরে বলেছিলেন যে তিনি যা করেছেন তা কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি স্বায়ত্তশাসনাধিকারের যে নীতিতে প্রতিশ্রুতিবদ্ধ তার থেকে ভিন্ন কিছু নয়। এর অর্থ হল প্রকৃত গণভোটের দ্বারা যদি কোন বিশেষ অঞ্চলের অধিবাসীরা স্বতন্ত্র হয়ে যাবার ইচ্ছা প্রকাশ করে এবং তা যদি সামগ্রিকভাবে দেশের সুরক্ষা, সংহতি এবং অর্থনৈতিক প্রগতির পরিপন্থী না হয় তবে সেই ইচ্ছাকে মান্যতা দেওয়া হবে। তাঁর প্রস্তাবে এবং রাজাজীর ফরমুলায় পারস্পরিক সংঘাতে লিপ্ত হবার স্বাধীনতাকে বাতিল করে দেবার কথা বলা হয়েছে। এই সংঘাতকেই তিনি পাপ বলেছিলেন।[৪২]

বস্তুত স্বায়ত্তশাসনের অধিকারের আন্দোলন দীর্ঘদিনের। এটি কোন নতুন আন্দোলন

নয়। কংগ্রেসের মঞ্চ থেকে পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি উত্থাপিত হবার অনেক আগেই, যখন কংগ্রেস দেশের শাসনকাজে ভারতবাসীদের যুক্ত করার জন্য ব্রিটিশের দরবারে সানুনয় আবেদন করছিল সেই সময় থেকে স্বায়ত্তশাসনাধিকারের কথা বিভিন্ন কণ্ঠ থেকে উচ্চারিত হচ্ছিল। ইংরেজ সরকার আংশিকভাবে এই দাবি মেনে নিয়েছিল। তার ফলে দেশের পৌর প্রতিষ্ঠানগুলির পরিচালনা স্বায়ত্তশাসনাধিকারের ভিত্তিতে চলতে থাকে। কংগ্রেস এই নীতিও মেনে নিয়েছিল যে স্বাধীন ভারতবর্ষে কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে প্রদেশগুলি স্বায়ত্তশাসনের অধিকার লাভ করবে। অর্থাৎ সেই সময় ফেডারেল ইউনিয়নের কথা স্পষ্ট করে উল্লেখ করা না হলেও প্রদেশগুলিকে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দেবার নীতি কংগ্রেসের স্বীকৃত নীতি বলে মান্য করা হয়েছিল। এই সঙ্গে এ কথাও মনে রাখা দরকার যে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনে ইংরেজ সরকার যে ফেডারেল ব্যবস্থা চালু করার প্রস্তাব করেছিল কংগ্রেস তা সরাসরি বাতিল করে দেয়। তার কারণ প্রস্তাবিত এই ব্যবস্থায় প্রদেশগুলিতে গভর্নরের এবং কেন্দ্রে গভর্নর জেনারেলের হাতে অতিরিক্ত ক্ষমতা দেবার প্রস্তাব করা হয়েছিল। সেই ক্ষমতা বলে শাসকদের আশ্রয়পুষ্ট গভর্নরেরা ইচ্ছা করলে নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মতামতকে উপেক্ষা এবং এমনকি বাতিল করে দিয়ে নিজেদের হাতে সমস্ত ক্ষমতা অধিকার করতে পারতেন। কংগ্রেস তো এই ব্যবস্থা নিতে চায়নি। মৌলানা আজাদ জানিয়েছেন যে এই আপত্তি সত্ত্বেও বিশেষ করে তাঁরই আগ্রহে কংগ্রেস নির্বাচনে অংশগ্রহণ করেছিল এবং অধিকাংশ প্রদেশে মন্ত্রীসভা গঠন করেছিল। তবে নীতিগতভাবে কংগ্রেস যে ফেডারেল রাষ্ট্র ব্যবস্থা সমর্থন করেছিল তার লক্ষ্য ছিল প্রদেশগুলিকে যতটা বেশি সম্ভব আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দেওয়া।

গান্ধীজী ১৯২৪ সালে কংগ্রেসের সভাপতিরূপে যে ভাষণ দিয়েছিলেন তাতে স্বরাজের পরিকল্পনা সম্পর্কে বলতে গিয়ে তিনি বলেছিলেন : "ভাষার ভিত্তিতে প্রদেশগুলি পুনর্গঠিত হবে এবং আভ্যন্তরীণ প্রশাসন ও প্রগতির জন্য প্রদেশগুলিতে যতদূর সম্ভব পরিপূর্ণ আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থাকবে।"[৪৩]

কংগ্রেসের এই স্বীকৃত নীতির কারণে মন্ত্রীমিশন প্রদেশগুলিকে নিয়ে যে গ্রুপ গঠনের কথা বলেছিলেন তাতে আপত্তি করাকে যুক্তিযুক্ত বলে মনে করা যায় না। ডঃ তাঁরাচাদও সেই কথাই বলেছেন : "রাজাগোপালাচারীর ফরমুলা, গান্ধী-জিন্না আলোচনা, ওয়ার্কিং কমিটির এবং কংগ্রেসের প্রস্তাবগুলি পশ্চিম ও পূর্বাঞ্চলের মুসলমান অধ্যুষিত অঞ্চলগুলির আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করে নিয়েছিল। সুতরাং প্রদেশগুলির গ্রুপে যোগদান সম্পর্কে কংগ্রেসের সরাসরি বিরোধিতা অযৌক্তিক ছিল। অবশ্য এইসব প্রদেশ থেকে হিন্দু সংখ্যাগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলির আলাদা হয়ে যাবার দাবি যথার্থ এবং তার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করা যায়। কিন্তু অমুসলমান অঞ্চলগুলিকে বাদ দিয়েও প্রদেশগুলির গ্রুপে যোগদান করার বিষয়ে কংগ্রেসের আপত্তি দুর্বল ছিল।"[৪৪]

প্রকৃতপক্ষে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নিয়ে তদানীন্তন ভারতীয় রাজনীতিতে একটি জটিল আবর্তের সৃষ্টি হয়েছিল। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারী কারা হবে এবং তার পরিধিই বা কেমন হবে তা নিয়ে স্বাভাবিকভাবেই সে সময় প্রশ্ন উত্থিত হয়েছিল। হোক না শিখরা ভারতবর্ষের একটিমাত্র প্রদেশের মূল বাসিন্দা তবু মুসলিম লীগের দাবি মেনে নিয়ে যদি মুসলমানদের আলাদা রাষ্ট্র দেওয়া হয় তা হলে শিখরাই বা সেই সুযোগ থেকে বঞ্চিত হবে কেন ? শিখদের পক্ষ থেকে সেই দিন সেরকম দাবি উত্থিত হতে আরম্ভ করেছিল। তাঁরা বলছিলেন যে পাঞ্জাব যদি পাকিস্তানকে দিতে হয় তবে পাঞ্জাবের যে অংশে শিখরা

সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই অংশ শিখদের আলাদা রাষ্ট্র গঠনের জন্য দিয়ে দেওয়া হোক। শিখ নেতা মাস্টার তারা সিং বলেছিলেন যে মুসলমানরা যদি ভারতবর্ষের গরিষ্ঠ হিন্দুদের বিশ্বাস করতে না পারেন তবে শিখরাও মুসলমানদের বিশ্বাস করতে পারবেন না।[৪৫] এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেস পাঞ্জাবকে খণ্ডন করার প্রস্তাবের প্রতি সমর্থন জানিয়েছিল।[৪৬]

অর্থাৎ আত্মনিয়ন্ত্রণ এবং স্বায়ত্তশাসনের অধিকারের স্বীকৃতি যে পাকেচক্রে দেশখণ্ডনের যুক্তিজালে কংগ্রেসকে আটকে ফেলছে সেকথা তখন অনেকেই বুঝতে আরম্ভ করেছিলেন। ক্যাম্বেল জনসনের সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে পানিক্কর বলেছিলেন যে ত্রিশ কোটি মানুষ ও তাদের ধর্মমত নিয়ে সমুদ্রোপকূলভাগকে অবলম্বন ও ভৌগোলিক একাত্মকে (contiguity) ভিত্তি করে একটি সুদৃঢ়, সংহত ও কেন্দ্রীয় শাসনসম্পন্ন রাষ্ট্র স্থাপনা করা উচিত। হিন্দুস্থান হল হাতির মতো এবং পাকিস্তান সেই হাতির দুটি কান। কান দুটি না থাকলেও হাতি বেঁচে থাকতে পারবে।

তিনি আরও বলেছিলেন যে জিন্না যে দাবি করেছেন সেই দাবির যৌক্তিকতাও জিন্না দেখাতে পারেন। চার ঘর বিশিষ্ট একটি বাড়ির মধ্যে জিন্না কেবল একটি ঘর দাবি করেছেন। জিন্না শুধু চাইছেন যে এই ঘরটি যেন সত্যি সত্যি তাঁর নিজের ঘর হয়। শিখদের সম্পর্কে জিন্না যে অভিজ্ঞতা লাভ করেছেন তাতে তাঁর নিশ্চয় এই উপলব্ধি হয়েছে যে পাঞ্জাবকে আর অখণ্ড রাখা সম্ভব নয়।[৪৭]

ভারত ছাড়ো আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করার 'অপরাধে' কংগ্রেসের নেতারা যখন জেলে বন্দী তখন শ্যামাপ্রসাদও জিন্নার সঙ্গে কথা বলে একটি মীমাংসায় উপনীত হতে উদ্যোগী হয়েছিলেন। বস্তুত তিনি জনগণের স্বতঃস্ফূর্ত আন্দোলনকে প্রতিহত করতে গভর্নমেন্ট যে-অত্যাচার চালিয়েছিল তাতে অত্যন্ত ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। ১২-৮-৪২ তারিখে লিনলিথগোকে একটি চিঠিতে তিনি লিখেছিলেন : "কংগ্রেস তার বিগত প্রস্তাবে যে দাবি উত্থাপন করেছে তা সামগ্রিকভাবে অবশ্যই জাতীয় দাবি।...এই সঙ্কটময় মুহূর্তে দমন কোন প্রতিকার নয়। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের যে সিদ্ধান্তটিকে চরম দুঃখজনক বলে মনে করা হয় তা হল সম্মানজনক মীমাংসার জন্য সব রকম প্রয়াস না করে আন্দোলন ডাকা হবে না, মহাত্মাজীর এই স্পষ্ট প্রতিশ্রুতি দেওয়া সত্ত্বেও গভর্নমেন্ট তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে অস্বীকার করেন।"[৪৮]

মনে হয় এই দুঃখজনক পরিস্থিতির কথা ভেবেই শ্যামাপ্রসাদ জিন্নার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। জিন্না নাকি সেই সময় বলেছিলেন যে হিন্দুরা যদি নীতিগতভাবে দেশবিভাগ মেনে নেয় তা হলে তিনি ক্ষমতা হস্তান্তরের দাবিতে হিন্দুদের সঙ্গে সহযোগিতা করতে প্রস্তুত। অবশ্য জিন্না এ কথাও বলেছিলেন যে তাঁর ঐ কথা জানাজানি হলে তিনি যে এ কথা বলেছেন তা অস্বীকার করবেন। তবে মুসলিম লীগপন্থী বলে পরিচিত জনৈক ব্যক্তি জিন্নার সঙ্গে কথা বলার পর একটি প্রস্তাব পাঠিয়েছিলেন। তাতে বলা হয়েছিল যে মুসলিম লীগ হিন্দু মহাসভার জাতীয় দাবি সম্পর্কিত প্রস্তাবটি সমর্থন করছে এবং মুসলিম লীগের সঙ্গে মীমাংসায় উপনীত হলে তারা স্বাধীনতার দাবিতে অন্য দলের সঙ্গে যুক্ত হবে এবং জনসংখ্যার ভিত্তিতে কেন্দ্রে ও প্রদেশগুলিতে সাময়িক মন্ত্রীসভা গঠনে সাহায্য করবে। যুদ্ধের অবসান হলে মীমাংসার সূত্র অনুসারে একটি কমিশন গঠিত হবে এবং সেই কমিশন উত্তর-পশ্চিম এবং উত্তর-পূর্ব ভারতবর্ষের পরস্পর সংলগ্ন যে-অঞ্চলগুলিতে শতকরা ৬৫ ভাগ ও তার বেশি মুসলমানরা বসবাস করেন সেগুলি চিহ্নিত করবে। সেইসব অঞ্চলে সার্বজনীন গণভোট হবে এবং যদি অধিকাংশ মানুষ চায় তা হলে স্বতন্ত্র

রাষ্ট্র গঠিত হবে।

এই প্রস্তাবটি নিয়ে কেউই বেশি দূর অগ্রসর হননি। তবে পাঞ্জাবের মুখ্যমন্ত্রী সিকন্দর হায়াত খাঁর নিজস্ব একটি প্রস্তাব ছিল। তাতে বলা হয়েছিল যে পাঞ্জাব বিধানসভার অন্যূন ৭৫ জন নির্বাচিত সদস্য ভারতীয় যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে থাকা বা তা থেকে বেরিয়ে আসার সম্পর্কে যে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করবে সেইটিই সকল সম্প্রদায়ের মানুষদের মেনে নিতে হবে। শ্যামাপ্রসাদ এই বিষয়টি নিয়েও জিন্নার সঙ্গে আলোচনা করেছিলেন।[৪৯]

এই প্রসঙ্গটি উল্লেখ করার অর্থ এই নয় যে শ্যামাপ্রসাদ তখনই দেশবিভাগ মেনে নিতে প্রস্তুত হয়েছিলেন। এর উল্লেখ এই জন্যই করা হল যে ক্ষমতা হস্তান্তরের সম্ভাবনা উজ্জ্বল হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আত্মনিয়ন্ত্রণের পরিধি নিয়ে সর্বস্তরেই তখন আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছিল।* কমিউনিস্ট পার্টি তখন নতুনভাবে গঠিত হয়েছিল। বোম্বাই-তে তাঁদের প্রথম অধিবেশন হয়। সেই অধিবেশনে তাঁরা আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মেনে নিয়ে মুসলিম লীগের পাকিস্তানের দাবি সমর্থন করেন। রাজাজীর দেশবিভাগের পরিকল্পনারও তাঁরা ছিলেন জোরদার সমর্থক।[৫১]

শ্যামাপ্রসাদ রাজাজীর প্রস্তাব সমর্থন করেননি। তিনি তাঁর ডাইরিতে লিখেছেন: "কংগ্রেস আত্মনিয়ন্ত্রণতার হিসাবে সমগ্র সিন্ধুপ্রদেশ, উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ, অর্ধেক পাঞ্জাব এবং বাংলাকে দিতে রাজি। অর্থাৎ যেসব অঞ্চলে মুসলমান খুব বেশি সেখানে যদি সবাই মিলিতভাবে ভারত থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চায় কংগ্রেস তাতে বাধা দেবে না। আমরা এর ঘোর প্রতিবাদ করি।...বাংলায় যাতে কংগ্রেস এবং হিন্দুসভার ঝগড়া না বাধে এ কথা আমি বরাবরই বলে এসেছি।"[৫১]

পরবর্তীকালে দেশবিভাগ যখন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল এবং সুরাবর্দী-শরৎ বসু মিলিতভাবে ভারতবর্ষ ও পাকিস্তানের বাইরে সার্বভৌম বাংলা গঠনের কথা বলেছিলেন তখন সেটিকেও শ্যামাপ্রসাদ সমর্থন করেননি। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার নিয়ে বাংলার হিন্দুগরিষ্ঠ অঞ্চলগুলিকে প্রস্তাবিত পাকিস্তান থেকে বাইরে থাকাকেই তিনি সমর্থন করেছিলেন।

পৃথক রাষ্ট্র হলে এবং পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থার প্রচলন হলে ভারতবর্ষের চেয়ে পাকিস্তানের অবস্থা যে বেশি খারাপ হবে সেকথা আয়েঙ্গার ক্রিপসকে জানিয়েছিলেন। তিনি বলেছিলেন: "জিন্না বিভক্ত ভারতের যে ছবি আঁকছেন তাতে হিন্দুস্থানে হিন্দুদের সংখ্যা দাঁড়াবে ১৫ কোটি আর সংখ্যালঘু মুসলমানদের সংখ্যা দাঁড়াবে ২ কোটি। পক্ষান্তরে পাকিস্তানে মুসলমানদের সংখ্যা হবে ৭ কোটি আর সংখ্যালঘু অমুসলমানদের সংখ্যা হবে ৪ কোটি ৪০ লক্ষের মতো।" আয়েঙ্গারের এই কথা শুনে ক্রিপসের মনে হয়েছিল যে পাকিস্তান এক অবাস্তব কল্পনা।[৫২]

ক্রিপসের দৌত্যকর্ম ব্যর্থ হবার পর ১১-৪-৪২ তারিখে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি আত্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কে তাঁদের মত স্পষ্ট করে জানিয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করেছিলেন। তাতে বলা হয়েছিল: "ওয়ার্কিং কমিটি কোন অঞ্চলের মানুষদের তাদের ঘোষিত এবং বিধিবদ্ধ ইচ্ছার বিরুদ্ধে ভারত ইউনিয়নে থাকতে বাধ্য করার কথা ভাবতেই পারে না।"[৫৩] জোর করে কাউকে ভারতবর্ষে ধরে রাখা হবে না এই অভিমত নেহরুও ব্যক্ত

---

* ১৯৪৪ সালের ডিসেম্বর মাসে বিলাসপুরে শ্যামাপ্রসাদের সভাপতিত্বে হিন্দু মহাসভার অধিবেশন প্রদেশগুলিকে কিছুটা স্বশাসনের এবং অবশিষ্ট বিষয়গুলি কেন্দ্রের কাছে রাখার সুপারিশ করেছিল।

করেছিলেন। জিন্না এতে সন্তোষ প্রকাশ করেন।[৫৪]

আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে কংগ্রেস গণতান্ত্রিক রীতিনীতির প্রায়োগিক অবস্থা বলেই বিবেচনা করেছিল। সেজন্য কোন অঞ্চলকে কেন্দ্রীয় শাসনের তাঁবেদার হিসেবে না রেখে যতদূর সম্ভব ক্ষমতা সেই অঞ্চলকে দিয়ে দেবার প্রস্তাব কংগ্রেস গ্রহণ করেছিল। অবশ্য কংগ্রেস চেয়েছিল যে একটি ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষের মধ্যেই প্রদেশগুলি আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার ভোগ করুক। তাই আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে কংগ্রেস বিভেদ এবং বিচ্ছিন্নতার প্রকাশরূপে উপস্থাপিত করতে চায়নি। মুসলিম লীগ যে স্বাতন্ত্র্য দাবি করছিল তার রূপ ভিন্ন হলেও তার মধ্যে গণতান্ত্রিক অধিকারের মর্যাদা নিহিত ছিল। এর ফলে মুসলিম লীগের বিচ্ছিন্নতার দাবি কংগ্রেসের মধ্যে এক নৈতিক সঙ্কট সৃষ্টি করেছিল। জানা কথা যে একমাত্র নৈতিক মূল্যবোধের আলোকেই নৈতিক সঙ্কট অতিক্রম করা সম্ভব। গান্ধীজী সেই অভিমুখেই তাঁর প্রয়াস চালাতে চেয়েছিলেন। যে মানসিকতা মুসলমানদের অধিকাংশের মধ্যে গণতান্ত্রিক অধিকারের নামাবলী গায়ে দিয়ে বিভেদ এবং বিচ্ছিন্নতাকে প্রশ্রয় দিচ্ছিল গান্ধীজী তাকেই বদলাতে চাইছিলেন। সেই পথ সহজ ছিল না। স্বাধীনতার প্রলোভন এবং ভ্রাতৃহত্যার ভীতি প্রবল হয়ে ওঠায় কংগ্রেস গান্ধীজীর এক অনিশ্চিত এবং দীর্ঘ পথ অনুসরণ করতে রাজি ছিল না। মাউন্টবেটেন কংগ্রেস নেতাদের এ কথা বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে গান্ধীজী একজন কল্পবিলাসী। তা না হলে কি আর কেউ ভারতবর্ষের সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানদের প্রতিনিধি জিন্নার হাতে সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের ভাগ্য ছেড়ে দিতে পারেন? সংখ্যালঘুর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার তো সংখ্যাগুরুর স্বায়ত্তশাসনের অধিকার কেড়ে নিতে পারে না। বস্তুত গান্ধীজীর কাছে যেটি আপতকালীন জরুরী ছিল কংগ্রেসের কাছে সেটি তা ছিল না। মূল্যবোধ নয় উদ্ভুত পরিস্থিতি থেকে বেরিয়ে আসাটাই ছিল কংগ্রেসের তৎকালীন সমস্যা। এই পরিস্থিতির মধ্যেই কংগ্রেস বুঝতে পেরেছিল যে তাদের কাছে গান্ধীজীর প্রয়োজন ফুরিয়ে গিয়েছে।

কেবল গান্ধীজীর প্রয়োজন ফুরিয়ে যাওয়া নয় কংগ্রেসের নেতাদের কারও কারও এমন কথাও মনে হয়েছিল যে তাড়াতাড়ি একটি সিদ্ধান্তে আসার ক্ষেত্রে গান্ধীজী বাধা হয়ে উঠতে পারেন। তাই গান্ধীজীকে এড়িয়েই তাঁরা সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছিলেন। অবিশ্বাসের এই বাতাবরণ গান্ধীজীও অনুভব করতে পেরেছিলেন। পেথিক লরেন্সকে লেখা কংগ্রেস সভাপতিরূপে মৌলানা আজাদের চিঠি তার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। এ কথা মনে করলে নিশ্চয় ভুল হবে না যে তাড়াতাড়ি সিদ্ধান্তে আসার আগ্রহেই আজাদ এই রকম একটি চিঠি লিখেছিলেন এবং তার সত্যতা গোপন করতে চেয়েছিলেন। কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সভায় যখন মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনা চলছিল ঠিক সেই সময়েই মন্ত্রীমিশন গান্ধীজীর সঙ্গে জরুরী আলোচনার প্রয়োজন বোধ করেন। তাঁরা গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করতে ভাঙ্গী কলোনিতে আসতে রাজি ছিলেন। কিন্তু তাতে গোপনীয়তা বিঘ্নিত হবে বলে গান্ধীজীকেই ভাইসরয় ভবনে আমন্ত্রণ করেন। গান্ধীজী সেখানেই আজাদের চিঠির কথা জানতে পারেন। তিনি ফিরে এসে সেকথা দুজন সহকর্মীকে জানান। তাঁরা এ কথা বিশ্বাস করতে চাননি। তাঁদের মনে হয়েছিল যে গান্ধীজী ভুল শুনেছিলেন। তাঁদের সংশয়ের কথা শুনে গান্ধীজী বলেছিলেন: "আমি কালা নই অথবা এত বোকা নই যে এমন একটি সাধারণ কথা আমি সঠিকভাবে শুনতে এবং বুঝতে অক্ষম।" পরে বিষয়টি তো জানাজানি হয়ে গিয়েছিল।

এই চিঠি হল এক ব্যাধির উপসর্গ। সেই ব্যাধি হল ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের বিভেদ নীতির

পরিশীলিত প্রয়োগে আক্রান্ত মানসিক দুর্বলতা। বস্তুত কংগ্রেস নেতাদের মানসিক বল ভেঙে যাচ্ছিল। মনে মনে তাঁরা দুর্বলতা অনুভব করছিলেন। যা হোক একটা কিছু হয়ে যাক এই রকম হতাশা তাঁদের সংহতিতেও ফাটল ধরিয়ে দিয়েছিল। দেশবিভাগ হয়ে যাবার তের বছর পরে নেহরু তাঁদের এই দুর্বলতার কথা স্বীকার করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন : "আসল কথা হল আমরা ক্লান্ত হয়ে পড়েছিলাম এবং আমাদের বয়স বেড়ে যাচ্ছিল। আমাদের মধ্যে অল্প কয়েকজনই আবার জেলে যাবার সম্ভাবনাকে মেনে নিতে পারতেন। আমরা যা চেয়েছিলাম সেইভাবেই যদি অবিভক্ত ভারতবর্ষের জন্য চেষ্টা চালাতাম তা হলে আমাদের জেলে যেতে হত। আমরা দেখেছিলাম পাঞ্জাবে আগুন জ্বলছে। প্রতিদিন হত্যার খবর আমাদের কানে আসছিল। দেশবিভাগের পরিকল্পনা এই অবস্থা থেকে বেরিয়ে আসার পথ দেখিয়েছিল এবং আমরা তা গ্রহণ করেছিলাম।"[৫৫]

এমন স্পষ্ট করে নিজেদের দুর্বলতার কথা কংগ্রেস নেতারা সেদিন প্রকাশ করেননি। তা করা সহজ ছিল না এবং হয়তো তা সেদিন তাঁদের পক্ষে সম্ভবও ছিল না। কিন্তু ঘটনাসমূহের বিশ্লেষণ করলে বেশ বোঝা যায় যে মনে মনে তাঁরা অন্তর্বিরোধের শিকার হয়েছিলেন। আত্মনিয়ন্ত্রণের সিদ্ধান্ত তাঁদের মনের বিরোধকে বাড়িয়ে দিয়েছিল। গান্ধীজীর ব্যতিক্রমী চিন্তাও তাঁদের চিত্তকে বিক্ষুব্ধ করছিল। তাঁরা পথভ্রষ্ট হচ্ছিলেন। নেহরুর আত্মবিশ্লেষণ তারই বেদনাদায়ক স্বীকৃতি। অনুরূপ আর একটি ঘটনার উল্লেখ করা যেতে পারে। অন্তর্বর্তী সরকারে মুসলিম লীগের কোটা ছিল পাঁচ। অর্থাৎ লীগ অন্তর্বর্তী সরকারে পাঁচজন সদস্যের নাম প্রস্তাব করতে পারবে। যেহেতু মুসলিম লীগের নেতারা নিজেরাই স্বীকার করতেন যে লীগ হল কেবল মুসলমানদের প্রতিষ্ঠান সেইহেতু এটি স্বতঃসিদ্ধ ছিল যে মুসলিম লীগ কেবল মুসলমান প্রতিনিধিদেরই নাম প্রস্তাব করবে। আর যেহেতু কংগ্রেসে সব ধর্মের মানুষ আছে এবং কংগ্রেস নিজেকে জাতীয় প্রতিষ্ঠান বলে দাবি করে সেইহেতু কংগ্রেস ইচ্ছা করলে যে কোন ধর্মের মানুষদের নাম প্রস্তাব করতে পারবে। অবশ্য তা নিজের কোটার মধ্যে, তার বাইরে নয়। গান্ধীজীর কাছে এটি ছিল নৈতিক বিষয়। তাই কংগ্রেস এবং গান্ধীজীকে উপহাস করার জন্য জিন্না যখন তাঁর কোটার মধ্যে চারজন মুসলমান এবং একজন তফশিলী হিন্দুর নাম প্রস্তাব করলেন তখন গান্ধীজী তাকে ভাল চোখে দেখেননি। তিনি এটাকে সমর্থন করতে পারেননি। তিনি বলেছিলেন যে মন্ত্রীদের মধ্যে হরিজনদের সংখ্যা বেশি হলে তাঁর আনন্দ হবারই কথা। তিনি তো ইতিমধ্যেই জানিয়েছেন যে যেদিন স্বাধীন ভারতবর্ষের প্রধানমন্ত্রী একজন ভাঙ্গী (মেথর) মহিলা হবেন সেই দিনই তিনি মনে করবেন যে ভারতবর্ষ প্রকৃত স্বাধীন হয়েছে। কিন্তু তাই বলে মুসলিম লীগের মনোনীত সদস্যদের তালিকায় একজন হরিজনের নাম দেওয়াকে তিনি সমর্থন করতে পারেন না। কংগ্রেস গান্ধীজীর এই অভিমতকে সরাসরি বাতিল করে দিয়েছিল।[৫৬]

কংগ্রেস তো গান্ধীজীকে অনেকবারই অস্বীকার করেছে। কংগ্রেসের কর্মপদ্ধতিতে 'সত্য ও অহিংসার' নীতি অন্বিত করতে না পারায় ১৯৩৪ সালে গান্ধীজী কংগ্রেসের সদস্যপদ ত্যাগ করেছিলেন। আবার দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় স্বাধীনতার বিনিময়ে যুদ্ধে সহায়তা করার প্রশ্নে গান্ধীজীর সঙ্গে মতবিরোধ হওয়ায় কংগ্রেস গান্ধীজীকে নেতৃত্বের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিয়েছিল। কিন্তু এই দুটি ঘটনার কোনটিই কংগ্রেসের সঙ্গে গান্ধীজীর নৈতিক সম্পর্ক ছিন্ন করেনি। নেতৃত্ব থেকে মুক্তি দেবার প্রশ্নটি তো ছিল একেবারেই সাময়িক। কিন্তু ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রাক্কালে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দ গান্ধীজীকে

আড়াল করেই তাঁদের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করছিলেন। তার কারণ অবশ্যই এই যে নিজেদের সিদ্ধান্তের প্রতিও তাঁদের বিশ্বাস আন্তরিক ছিল না। নিজেদের মধ্যেই তা তাঁরা অনুভব করছিলেন। এটি এক উদ্ভূত পরিস্থিতিরই পরিণাম।

মন্ত্রীমিশন যখন তাঁদের খসড়া প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন তখন কংগ্রেস তার ঘোষিত নীতি থেকে সরে আসেনি। মনে করা যেতে পারে যে দাঙ্গায় উদ্ভূত পরিস্থিতি এবং মাউন্টবেটেনের প্রভাব কংগ্রেসের মধ্যে নতুন ভাবনার উদ্রেক ঘটিয়েছিল। আর তখন থেকেই কংগ্রেস তার নীতি এবং নেতৃত্বকে অস্বীকার করে বাস্তবের মুখোমুখি হবার স্বপ্ন দেখেছিল। বাস্তবের ভবিষ্যৎ রূপ কী হতে পারে সেদিকে তার খেয়াল ছিল না। এ কথা মনে করবার কারণ হল এই যে মন্ত্রীমিশনের সুপারিশ সম্পর্কে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির যে প্রস্তাব তাতে কংগ্রেস তার পুরাতন ঐতিহ্যকেই তুলে ধরতে চেষ্টা করেছিল। তাতে বলা হয়েছিল : "কংগ্রেস যে স্বাধীনতা চায় তার লক্ষ্য হল একটি ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক ভারত যুক্তরাষ্ট্র (Indian Federation) গঠন করা। সেখানে একটি কেন্দ্রীয় কর্তৃত্ব থাকবে। এটি পৃথিবীর জাতিগুলির কাছে শ্রদ্ধেয় হবে। এখানে প্রদেশগুলিতে সর্বাধিক স্বায়ত্তশাসন থাকবে এবং দেশের প্রত্যেকটি নরনারী সমান অধিকার লাভ করবে। প্রস্তাবে (মন্ত্রীমিশনের) কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের যে সীমাবদ্ধতার এবং প্রদেশগুলিকে গোষ্ঠীবদ্ধ হবার কথা বলা হয়েছে তা কাঠামোকে দুর্বল করবে। তা ছাড়া উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ ও অসমের মতো প্রদেশগুলির প্রতি এবং কিছু সংখ্যালঘুর প্রতি, বিশেষ করে শিখদের প্রতি, যে অন্যায় করা হয়েছে কমিটি তা অনুমোদন করে না। যাই হোক কমিটি মনে করে যে সমগ্র প্রস্তাবটি যদি বিবেচনা করা হয় তা হলে দেখা যাবে যে তাতে কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বকে ব্যাপক ও শক্তিশালী করার, প্রদেশগুলিকে তাদের ইচ্ছামতো গোষ্ঠীবদ্ধ হবার অধিকার এবং যেসব সংখ্যালঘুকে অসুবিধাজনক অবস্থায় ফেলা হয়েছে তাদের সুরক্ষার যথেষ্ট সুযোগ এতে দেওয়া হয়েছে।"

ওয়ার্কিং কমিটির এই প্রস্তাবের দ্বিতীয়াংশে অন্তর্বর্তী সরকারে যোগদান সম্পর্কে অভিমত ব্যক্ত করা হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল : "১৬ই জুনের ঘোষণায় অন্তর্বর্তী সরকারের যে প্রস্তাব করা হয়েছে তাতে এমন কতকগুলি ত্রুটি আছে যা কংগ্রেসকে ভাবিত করে। কংগ্রেস সভাপতি ২৫শে জুন ভাইসরয়কে যে চিঠি দিয়েছেন তাতে তার উল্লেখ করা হয়েছে। প্রাদেশিক সরকারগুলির কাছে অবশ্যই ক্ষমতা, অধিকার ও দায়িত্ব থাকবে। সেগুলি আইনত না হলেও কার্যত স্বাধীন সরকারের মতো কাজ করবে, যার পরিণামে পূর্ণ স্বাধীনতা অর্জিত হবে। এই সরকারের সদস্যরা কেবল জনগণের কাছেই দায়ী থাকবেন। তাঁরা বাইরের কোন কর্তৃত্বের কাছে দায়ী থাকবেন না। প্রাদেশিক এবং অন্য সরকার গঠনের ক্ষেত্রে কংগ্রেসীরা তাঁদের জাতীয় চরিত্র বর্জন করতে পারেন না অথবা কোন কৃত্রিম ও অন্যায় তুল্যতা মেনে নিতে পারেন না। কিংবা কোন সাম্প্রদায়িক গোষ্ঠীর 'ভেটো' স্বীকার করতে পারেন না। সুতরাং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি ১৬ই জুনের ঘোষণা অনুসারে সরকার গঠনের প্রস্তাব গ্রহণ করতে অক্ষম।"

কংগ্রেস অবশ্য পরে অন্তর্বর্তী সরকারে যেতে সম্মত হয়েছিল। সেকথা আগেই আলোচিত হয়েছে। যাই হোক কংগ্রেসের ঐ প্রস্তাবটি উল্লেখ করে গান্ধীজী তাঁর প্রার্থনান্তিক ভাষণে বলেছিলেন : "তাঁদের (কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সদস্যদের) একটিই লক্ষ্য এবং তা হল ভারতবর্ষের কল্যাণ সাধন করা। এ থেকে আমি এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে চাই যে সরল বিশ্বাসে যে কাজ করা হয় তার পরিণাম যে শুভ হয় এই বিশ্বাস

আপনাদের পোষণ করা উচিত। কংগ্রেসের বিগত ষাট বছরের অবিচ্ছিন্ন সেবার রেকর্ড আপনাদের মনে এই বিশ্বাস সঞ্চার করে থাকবে। যে পুরুষ অথবা নারী সর্বান্তঃকরণে দেশের সেবা করেন তাঁর আসন কংগ্রেসের সর্বোচ্চ নেতার সমান। ঈশ্বরের চোখে দীনতমের সেবা কংগ্রেসের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত মানুষটির সমতুল ; তবে তা এই একটি শর্তে যে আদর্শের প্রতি পরম নিষ্ঠা তাঁর থাকা চাই।"[৫৭]

সাধারণভাবে জনগণের এবং বিশেষ করে কংগ্রেসকর্মীদের সম্বোধন করে এই কথাগুলি বলা হলেও কংগ্রেসের নেতাদের প্রতিও তা সমানভাবে উদ্দীষ্ট ছিল। গান্ধীজী এই কথাগুলি বলার জন্য ঠিক সময়ই বেছে নিয়েছিলেন। আদর্শের প্রতি নিষ্ঠাই যে স্বাধীনতা সংগ্রামীর মহত্তম গুণ এ কথা তিনি নেতাদেরও মনে করিয়ে দিতে চেয়েছিলেন। নেতাদের জীবন-মন থেকে সেই নিষ্ঠা ক্রমশ অপসারিত হচ্ছে দেখে তিনি পীড়িত হচ্ছিলেন কিনা তা অনুমানসাপেক্ষ। কিন্তু যেকথা নেহরু স্বীকার করেছেন যে তাঁরা ভিতরে ভিতরে দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন আর তাই মীমাংসার একটা পথ খুঁজছিলেন তার ইঙ্গিত হয়তো গান্ধীজী পেয়ে থাকবেন।

মন্ত্রীমিশন এবং পরে মাউন্টবেটেন যে প্রস্তাব দিয়েছিলেন তাতে পূর্ণ স্বাধীনতার কথা বলা হয়নি। তাতে ডোমিনিয়ন স্টেটাসের কথা বলা হয়েছিল। দেশের সার্বভৌমত্ব ক্ষুণ্ণ হবে এমন ব্যবস্থা নেহরু অথবা প্যাটেল কারও কাছে গ্রহণযোগ্য ছিল না। তবে স্বাধীনতা পাওয়া গেলে ভারতবর্ষকে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের সঙ্গে যুক্ত রাখতে তাঁদের আপত্তি ছিল না। নেহরু রাজি হয়েছিলেন মাউন্টবেটেনের পরামর্শে। আর ভি. পি. মেনন প্যাটেলকে বুঝিয়েছিলেন যে ডোমিনিয়ন স্টেটাসের অবস্থাতেও যখন কমনওয়েলথ থেকে বার হয়ে আসার অধিকার থাকছে তখন তা স্বাধীনতার সমতুল। প্যাটেল মেননের যুক্তি মেনে নিয়েছিলেন। এই অবস্থায় ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসে কংগ্রেস নীতিগতভাবে পাঞ্জাবের শিখপ্রধান এবং বাংলার হিন্দুপ্রধান জেলাগুলিকে ভারতবর্ষের সঙ্গে যুক্ত রাখার শর্তে স্বাধীন পাকিস্তানের গঠন মেনে নিয়েছিল। নেহরু ঘোষণা করেছিলেন যে মুসলিম লীগ যদি চায় তবে পাকিস্তান পেতে পারে। কিন্তু ভারতবর্ষের যে সব অংশ পাকিস্তানে যেতে চায় না সেই অংশগুলিকে তাদের ছেড়ে দিতে হবে। রাজেন্দ্রপ্রসাদ গণপরিষদে বিষয়টির আরও ব্যাখ্যা করে বলেছিলেন যে কংগ্রেস মন্ত্রীমিশনের যে পরিকল্পনাটি মেনে নিয়েছে তাতে ভারতবর্ষের প্রদেশগুলিকে নিয়ে একটি ইউনিয়ন গঠনের কথা আছে। তার মানে এই নয় যে ভারতবর্ষের সব প্রদেশকে নিয়েই এই ইউনিয়ন গঠিত হবে। এমন দুঃখজনক ঘটনা ঘটতে পারে যে ভারতবর্ষের একটি অংশকে নিয়েই ইউনিয়ন গঠিত হবে। তার অর্থ কেবল ভারতবর্ষের বিভাজন নয়, প্রদেশগুলিরও বিভাজন।[৫৮] যাই হোক, ১৯৪৭ সালের ৮ই মার্চ কংগ্রেস পাঞ্জাবকে ভাগ করবার প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। গান্ধীজী তখন বিহারের দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চলে পরিভ্রমণ করছিলেন।[৫৯] প্রস্তাবের খসড়াও তাঁকে দেখান হয়নি।

এর আগে ২রা জুন তো মাউন্টবেটেন নেতাদের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের এবং দেশবিভাগের পরিকল্পনা উপস্থাপন করেছিলেন। সব দলের নেতারাই তা মেনে নিয়েছিলেন। তবে কংগ্রেসের নেতারা এ কথাও জানিয়ে দিয়েছিলেন যে এ সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত কংগ্রেসের পূর্ণ অধিবেশনে নেওয়া হবে। ১৪ই জুন থেকে সেই অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়েছিল। গোবিন্দবল্লভ পন্থ কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবটি অধিবেশনে উত্থাপন করেছিলেন। বক্তৃতায় তিনি বলেছিলেন যে মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাবের অপেক্ষা

মাউন্টবেটেনের প্রস্তাব ভাল। কেননা মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাব গ্রহণ করলে শক্তিশালী কেন্দ্র গড়া যেত না এবং গোষ্ঠীবদ্ধ হওয়ার প্রশ্ন নিয়ে প্রদেশগুলিতে অশান্তি দেখা দিত। তার ফলে দেশের অর্থনৈতিক প্রগতি ব্যাহত হত।

ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব সমর্থন করে নেহরু বলেছিলেন যে এই প্রস্তাব মুসলিম লীগের কাছে নতি স্বীকার নয়। কংগ্রেস আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার অনেক দিন আগেই মেনে নিয়েছে। তার অর্থ হল কোন প্রদেশকে তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে জোর করে ইউনিয়নের সঙ্গে যুক্ত করা যাবে না।

প্যাটেল বলেছিলেন যে অন্তর্বর্তী সরকারের তিক্ত অভিজ্ঞতা থেকে তাঁদের এই শিক্ষাই হয়েছে যে মুসলিম লীগের সঙ্গে ক্ষমতা ভাগাভাগি করে দেশ পরিচালনা করা যাবে না।

আজাদ প্রস্তাবটি সমর্থন করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন : "দেশবিভাগ ভারতবর্ষের কাছে এক দুঃখজনক ঘটনা। এর সমর্থনে যে একটিমাত্র কথা বলা যায় তা হল এই যে আমরা এটিকে আটকাতে সব রকম চেষ্টা করেছিলাম। কিন্তু ব্যর্থ হয়েছি। এখন আমাদের কাছে কোন বিকল্প নেই। আর আমরা যদি এখনই স্বাধীনতা চাই তা হলে ভারতবর্ষকে বিভক্ত করবার দাবি আমাদের মেনে নিতেই হবে।"

কংগ্রেসের এই পূর্ণ অধিবেশনে গান্ধীজী উপস্থিত ছিলেন। তাঁর আসবার ইচ্ছা ছিল কিন্তু কংগ্রেস সভাপতি আচার্য কৃপালনীর অনুরোধে তিনি সভায় এসেছিলেন এবং প্রস্তাবটিকে অনুমোদন করার কথা বলেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে ওয়ার্কিং কমিটি যে প্রস্তাব গ্রহণ করেছে কংগ্রেসের প্রতিনিধিরা সেটিকে বাতিল করে দিতে পারেন। কিন্তু কোন রকম পরিবর্তন করতে পারেন না। আর বাতিল করা হবে চরম দায়িত্বহীনতার পরিচয়। ইচ্ছা করলে কংগ্রেস সদস্যরা ওয়ার্কিং কমিটিকেও বাতিল করতে পারেন। তার ফলে যে ক্ষমতা তাঁদের হাতে আসবে তাকে তাঁরা কার্যান্বিত করতে পারবেন তো ?

গান্ধীজী প্রস্তাবটির গুণাগুণ আলোচনায় গুরুত্ব না দিয়ে তাকে বাতিল করলে কী পরিস্থিতি সৃষ্টি হতে পারে সেই ভয়ের দিকটির প্রতি ইঙ্গিত করেছিলেন। তাঁর এই যুক্তি সকলে সমর্থন করেননি। যাঁরা সমর্থন করেননি তাঁদের সংখ্যা কম ছিল। আলোচনার শেষে ১৫ই জুন পন্থ প্রস্তাবের উপর ভোটাভুটি হয়। ১৫৭ জন* পক্ষে এবং ২৯ জন বিপক্ষে ভোট দিয়েছিলেন। ৩২ জন ভোটদান থেকে বিরত থেকেছিলেন।[৬০]

প্রস্তাব গৃহীত হবার পর কৃপালনী কেন কংগ্রেস গান্ধীজীকে বাতিল করেছে তার কারণ দর্শাতে গিয়ে বলেছিলেন : "আমি একটি কূপ দেখেছি যেখানে ১০৭ জন নারী এবং শিশু সম্মান বাঁচাতে নিজেদের কূপের মধ্যে নিক্ষেপ করেছিলেন। আর একটি জায়গায়, সেটি ধর্মস্থান, পঞ্চাশটি যুবতীকে তাদের পুরুষরা একই কারণে হত্যা করেছে।... এই মর্মান্তিক অভিজ্ঞতা নিঃসন্দেহে আমাকে আমার পথ বেছে নিতে প্রভাবিত করেছে। কোন কোন সদস্য অভিযোগ করেছেন যে আমরা ভয় পেয়ে এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছি। এই অভিযোগের সত্যতা আমি স্বীকার করি। কিন্তু যেভাবে তা করা হয়েছে সেভাবে নয়। ভয় এজন্য নয় যে কিছু প্রাণ নষ্ট হয়েছে অথবা বিধবারা শোকাহত হয়েছেন, অনাথ শিশুরা কাঁদছে কিংবা অনেক বাড়ি পুড়িয়ে ফেলা হয়েছে। ভয় এই জন্য যে আমরা যদি এইভাবে চলতে থাকি তবে আমরা ক্রমশই নিজেদের নরখাদকের অথবা তার চেয়েও হীন স্তরে নামিয়ে ফেলব।"

---

* লুই ফিশার লিখেছেন ১৫৩ জন।

এই কথাগুলি বলার পরেই কৃপালনী বলেছিলেন : "বিগত ত্রিশ বছর ধরে আমি গান্ধীজীকে অনুগমন করেছি। চম্পারণে আমি তাঁর সঙ্গে যোগ দেই। তাঁর প্রতি আমার আনুগত্য থেকে আমি কোন দিন সরে আসিনি। আমার এই আনুগত্য ছিল রাজনৈতিক, ব্যক্তিগত নয়। এমনকি যখন তাঁর সঙ্গে আমার মতভেদ হয়েছে তখনও আমি মনে করেছি যে আমার ব্যাপক যুক্তিপূর্ণ সহজাত প্রবৃত্তির চেয়েও তাঁর সহজাত প্রবৃত্তি নির্ভুল। আজও আমার মনে হয় যে তাঁর পরম নির্ভরতা নিয়ে তিনিই ঠিক এবং আমার পদক্ষেপ ভুল। তা হলে কেন আমি তাঁর সঙ্গে নেই? তার কারণ হল এখনও পর্যন্ত তিনি শামগ্রিকভাবে সমস্যার সমাধানে কোন পথ দেখাতে পারেননি।"[৬১]

কৃপালনী ঠিক কথাই বলেছিলেন।* গান্ধীজী যে নৈতিক স্তর থেকে সমস্যার সমাধানে অগ্রসর হতে চেয়েছিলেন, দেশবিভাগকে আটকাতে চেয়েছিলেন কংগ্রেস তার উপর আস্থা এবং ভরসা রাখতে পারেনি। কংগ্রেসের সামনে এক ধর্মসঙ্কট উপস্থিত হয়েছিল। সেই সঙ্কট কাটাতেই কংগ্রেস উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। সুদূরের পরিণাম সম্পর্কে মাথা ঘামাবার অবকাশ তখন কংগ্রেসের ছিল না। প্রকৃতির নিয়মে নদীর একটি তট যখন ভাঙে তখন অন্য দিকে মাটি জেগে ওঠে। জনজীবনে মূল্যবোধের তট তখন ভাঙতে শুরু করেছিল। কংগ্রেস তাতেই তলিয়ে যাওয়া থেকে বাঁচতে অন্য তটে স্বাধীনতার সৌধটি গড়তে চেয়েছিল। জিন্না পাকিস্তান চেয়েছিলেন। তা আদায় করতে মানুষের পাশব প্রবৃত্তিকে তিনি উস্কিয়ে দিয়েছিলেন। কংগ্রেস পাকিস্তান সৃষ্টিতে রাজি ছিল না। কিন্তু যুক্তির জালে সে আটকে গিয়েছিল, ভয় পেয়েছিল মানুষের উন্মুক্ত জিঘাংসা দেখে। অতএব জিন্নার 'নিজ ভূমি' পাবার দাবি তাকে মেনে নিতে হয়েছিল। এক ধর্মসঙ্কট থেকে মুক্তি পেতে এক অভাবিত পরিস্থিতির মধ্যেই সে নিজেকে জড়িয়ে ফেলেছিল। কিন্তু যা ভেবেছিল তা হয়নি। পাকিস্তানের সৃষ্টিতে সাম্প্রদায়িকতার অবসান ঘটেনি।

জিন্না : যাহা চাই তাহা ভুল করে চাই

ভারত সচিব স্যার স্যামুয়েল হোর ১৯৩৪ সালের ৫ই এপ্রিল গভর্নর জেনারেল ওইলিংডনকে একটি চিঠিতে জিন্না সম্পর্কে তাঁর মনোভাব ব্যক্ত করেছিলেন। তিনি লিখেছিলেন : "যেসব ভারতবাসীর সঙ্গে আমি মিলিত হয়েছি তাঁদের মধ্যে আমার মনে হয় জিন্নাকেই আমার অপছন্দ বেশি। গোলটেবিল বৈঠকের সময় ভদ্রলোক আগাগোড়া নিঃসন্দেহে সর্পবৎ আচরণ করছিলেন এবং কেউ তাঁকে বিশ্বাস করত বলে মনে হয় না।"[৬২] সাপের সঙ্গে সেই চরিত্রের মানুষের তুলনা করা হয় যিনি কুটিল এবং হিংসাপরায়ণ ; যিনি স্বার্থান্বেষী এবং যিনি প্রতিহত হলে প্রত্যাঘাত করেন। স্যামুয়েল হোর জিন্নাকে এই চরিত্রের মানুষ বলে বর্ণনা করেছিলেন। এ কথা অবশ্যই ঠিক যে

---

* কৃপালনীর কথার উত্তরে গান্ধীজী যা বলেছিলেন তা ২৯-৬-৪৭ তারিখের 'হরিজনে' (পৃ ২৫৫) প্রকাশিত হয়েছিল। গান্ধীজী বলেছিলেন যে তিনি অন্ধকারে হাতড়াচ্ছেন বলে যে কথা বলেছেন তার অর্থ হল তিনি তাঁর দৃষ্টিভঙ্গী লোকেদের কী করে বোঝাবেন তা জানেন না। অহিংসা ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে একটি শক্তিশালী অস্ত্ররূপে যেমন প্রমাণিত হয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার ক্ষেত্রেও তার কার্যকারিতা সম্পর্কে তাঁর কোন সংশয় নেই। জনগণ তখন তাঁকে অনুসরণ করেছিল, কেননা ব্রিটিশ শক্তির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করার অন্য কোন অস্ত্র তাদের জানা ছিল না। সেটি ছিল দুর্বলের অহিংসা। সাম্প্রদায়িক হাঙ্গামায় তা দিয়ে কাজ হবে না। তার জন্য বীরের পবিত্র অহিংসা প্রয়োজন।

সাম্রাজ্যলিপ্সু রাষ্ট্রপ্রধানদের মন্তব্যকে গুরুত্ব দেবার কোন অর্থ নেই। কেননা সাম্রাজ্যের সঙ্কীর্ণ স্বার্থের দৃষ্টিতেই তাঁরা বিরোধী পক্ষের মানুষের বিচার করে থাকেন। প্রায় চোদ্দ বছর পরে ওয়াভেল গান্ধীজীর সম্পর্কে অনুরূপ উক্তিই করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে নোয়াখালির এক অখ্যাত অঞ্চল থেকে গান্ধীজী ব্রিটিশ সরকারের কূটচাল ভেঙে দেবার জন্য একটি চিঠিতে প্যাটেলের কাছে বিষ উদগীরণ করেছেন। ওয়াভেলের নিজের কথা থেকেই তাঁর উষ্মার কারণ অনুমান করা যায়। তেমনি স্যামুয়েল হোরের কথা থেকেও এটি বোঝা যায় যে জিন্না তখনও সাম্রাজ্যবাদীদের আস্থা অর্জন করতে পারেননি। এমনও হতে পারে যে সাম্রাজ্যবাদী মানসিকতা নিজেদের কার্যসিদ্ধির জন্য এমন মানুষই খুঁজছিলেন। সেক্ষেত্রে তাঁরা হয়তো সেই সময়েই বুঝতে পেরেছিলেন যে এমন সাপের মতন আচরণ করতে পারেন যে লোক তাঁকে দিয়েই তাঁদের কাজ উদ্ধার হতে পারে। এই সবই অনুমানের কথা। আসল কথা হল যে পাকিস্তানের দাবি তখনও উত্থিত হয়নি এবং জিন্নার আচরণও তখন দোদ্যুলমান ছিল। বস্তুত জিন্না-চরিত্রের বৈশিষ্ট্যই হল একজন উদার জাতীয়তাবাদীর উগ্র সাম্প্রদায়িকতাবাদীতে পরিবর্তন। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন, মুসলিম লীগের জন্ম প্রভৃতি ঘটনাগুলিকে কেন্দ্র করে যখন অনেক মুসলমান নেতা সাম্প্রদায়িকতার আবর্তে ঘুরপাক খাচ্ছিলেন তখন ১৯০৬ সালে জিন্না কংগ্রেস সভাপতি দাদাভাই নৌরজীর একান্ত সচিব হয়ে কাজ করছিলেন এবং পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা ভারতবর্ষে জোর করে চাপিয়ে দেবার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করছিলেন। ১৯১৩ সালে তিনি মুসলিম লীগে যোগদান করেন। মহম্মদ আলিই তাঁকে মুসলিম লীগে যোগ দিতে প্ররোচিত করেছিলেন। কংগ্রেসের আদর্শের সঙ্গে মুসলিম লীগের আদর্শের কোন সংঘাত নেই এই বিষয়ে নিশ্চিত হয়েই জিন্না লীগে যোগ দিয়েছিলেন।[৩৩] জিন্নার প্রয়াসের ফলেই মুসলিম লীগ রাজভক্তদের (loyalist) কবল থেকে মুক্ত হয়ে কংগ্রেসের সমভূমিকায় এসে দাঁড়িয়েছিল। তিনি তখন ছিলেন হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রবক্তা এবং লক্ষ্ণৌ চুক্তির রূপকার। মুসলিম স্বাতন্ত্র্যবোধ ধীরে ধীরে তাঁর চিত্তকে গ্রাস করতে থাকলেও ১৯১১ সালে তিনি বলেছিলেন যে মুসলিম লীগ জাতীয় কংগ্রেসের সামান্যতম বিরোধী কোন নীতি বা কর্মসূচি গ্রহণ করবে বলে তিনি মনে করেন না। তিনি আরও বলেছিলেন : "আমি এখনও নিজেকে একজন পরীক্ষিত জাতীয়তাবাদীরূপে দেখাতে চাই এবং মুসলমানদের যদি সংঘবদ্ধ হতেই হয় তা হলে তা জাতীয় প্রগতির বাধা হয়ে দাঁড়াবে না। পক্ষান্তরে তা হবে অবশিষ্ট ভারতবর্ষের সঙ্গে একই পথে চলার পথে নিয়ে আসার জন্য।"[৩৪]

জিন্না ১৯২৩ সালে কংগ্রেসের সঙ্গে সম্পর্ক ত্যাগ করেন। কংগ্রেসের গণ-সংগঠনে পরিণত হওয়া এবং অসহযোগ আন্দোলনের দ্বারা প্রত্যক্ষ সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়া জিন্নার মনঃপূত হয়নি।[৮] এই কারণেই তিনি কংগ্রেস থেকে দূরে সরে গিয়েছিলেন। কিন্তু তখনও তিনি তাঁর জাতীয়তাবাদী চরিত্র ছেড়ে দেননি। ১৯২৭ সালে যখন সাইমন কমিশন ভারতবর্ষে এসেছিলেন তখন মুসলিম লীগ বহুধা বিভক্ত হয়ে পড়েছিল। তাঁদের এক পক্ষ চাইছিলেন কমিশনের সঙ্গে সহযোগিতা করতে। জিন্না সেই পক্ষের সঙ্গে ছিলেন না। তাঁর সমর্থন ছিল সাইমন কমিশন বয়কট করার যে সিদ্ধান্ত কংগ্রেস নিয়েছিল তার প্রতি। জিন্না সেই সঙ্গে এই কথাও মনে করছিলেন যে নেহরু কমিটির প্রস্তাবিত যৌথ নির্বাচন ব্যবস্থা মুসলমান সমাজকে সন্তুষ্ট করতে পারবে না। সেজন্য তিনি কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলমানদের জন্য এক তৃতীয়াংশ আসন সংরক্ষণ করতে বলেছিলেন। তাঁর

প্রস্তাব সর্বদলীয় সম্মেলন এবং কংগ্রেস কেউই সমর্থন করতে পারেনি। আর হিন্দু মহাসভার নেতারা তো এজন্য জিন্নার সমালোচনা করেছিলেন। গান্ধীজীরও জিন্নার দৃষ্টিভঙ্গীর প্রতি সমর্থন ছিল না। এইসব কারণে জিন্না নিজেকে মূল স্রোত থেকে বিচ্ছিন্ন মনে করছিলেন। ১৯২৯ সালে কংগ্রেস পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি তুলেছিল। জিন্না মনে করেছিলেন যে কংগ্রেসের এই দাবির মধ্যে মুসলিম লীগের আকাঙ্ক্ষার প্রতি সমর্থন জানান হয়নি। তা সত্ত্বেও গোলটেবিল বৈঠকে জিন্না কংগ্রেসের দাবি অনুযায়ী যৌথ নির্বাচন প্রথা মেনে নিতে অন্যান্য মুসলমান নেতাদের কাছে আগ্রহ প্রকাশ করেছিলেন। মুসলমান নেতারা তাঁকে পাত্তা দেননি। ব্রিটিশ রাজনীতিবিদরা তাঁকে সমর্থন করেননি। (জিন্নার প্রতি স্যামুয়েল হোরের রাগের এটিও কারণ হতে পারে।) কংগ্রেস তো আগেই তাঁকে অস্বীকার করেছিল। এইসব কারণে জিন্না আশাহত হয়েছিলেন। তিনি নিজেকে গুটিয়ে নিয়েছিলেন। ভারতবর্ষ থেকে চলে গিয়ে ইংলন্ডে বসবাস শুরু করেছিলেন।

অবশ্য জিন্না কেন ইংলন্ডে চলে গিয়েছিলেন তা নিয়ে আর একটি কাহিনী বিবৃত হয়েছে। বোম্বাই-এর গভর্নর লর্ড ওয়েলিংডন জিন্নাকে একটি পার্টিতে আমন্ত্রণ করেছিলেন। জিন্না তাঁর পার্শি স্ত্রীকে নিয়ে সেখানে যান। যে-পোশাক তাঁর স্ত্রী সেদিন পরেছিলেন তা লেডি ওয়েলিংডনের ভাল লাগেনি। তিনি এ.ডি.সি.-কে একটি শাল এনে জিন্নার স্ত্রীকে দিতে বলেছিলেন। জিন্নার মনে হয়েছিল যে এর দ্বারা তাঁর স্ত্রীকে অপমান করা হয়েছে। তারপর থেকেই তিনি ওয়েলিংডনের সঙ্গে ভাল সম্পর্ক রাখতেন না। পরে ওয়েলিংডনই যখন ভাইসরয় হন তখন জিন্না ভারতবর্ষ ছেড়ে ইংলন্ডে বসবাস করতে চলে গিয়েছিলেন। আর পরে ওয়েলিংডন যখন ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যান তখনই জিন্না আবার দেশে ফিরে এসেছিলেন।[৬৫]

কেন তিনি দেশ ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন এবং কেন বিদেশে আইন ব্যবসা শুরু করেছিলেন তার কারণ বলতে গিয়ে জিন্না নিজে বলেছেন: "আমি যে ভারতবর্ষকে ভালবাসতাম না তা নয়, আমি নিজেকে অত্যন্ত অসহায় মনে করেছিলাম।"[৬৬]

ইতিমধ্যে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা কার্যকর হয়েছিল। নির্বাচন আসন্ন। ১৯৩৪ সালে মুসলিম লীগের বোম্বাই শাখা জিন্নাকে দেশে ফিরে আসতে অনুরোধ করে। লিয়াকত আলি ইংলন্ডে গিয়ে সেই অনুরোধ জিন্নাকে জানিয়ে আসেন। জিন্না সম্মত হন। তিনি দেশে ফিরে আসেন। বিনা প্রতিদ্বন্দ্বিতায় মুসলিম লীগের সভাপতি নির্বাচিত হন এবং মুসলিম লীগের পুনর্গঠনে মনোনিবেশ করেন। এই জিন্না এখন অন্য মানুষ। তিনি এখন একটি সম্প্রদায়ের নেতা। তিনি আর জাতীয় নেতা নন। জিন্না যে একজন সাম্প্রদায়িক নেতা এই অভিযোগ তিনি নিজেই মেনে নিয়েছিলেন। তিনি স্পষ্টতই জানিয়েছিলেন যে তাঁর কাছে সাম্প্রদায়িক বিষয়গুলিই প্রথম বিচার্য বিষয়, স্বাধীনতা হল গৌণ।[৬৭]

কারণ যাই থাক এবং হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীদের প্রভাব জিন্নার উপর যতই পড়ে থাকুক, এ কথা অনস্বীকার্য যে মুসলিম লীগে সক্রিয়ভাবে যোগদানের পর থেকেই জিন্না এক পরিবর্তিত মানুষ হয়ে গিয়েছিলেন। ইসলামের আদর্শের সঙ্গে জিন্নার যে খুব পরিচয় ছিল তা নয়। তা সত্ত্বেও তিনি মুসলমান জনসাধারণের হয়েই দাবি তুলেছিলেন এবং তাঁদের প্রতিনিধিরূপেই কথা বলতেন। তাঁর সেই দাবি ছিল সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুদের প্রভুত্ব থেকে মুসলমানদের রক্ষা করা। এই উদ্দেশ্যেই তিনি যৌথ নির্বাচন সমর্থন করেও পরে তা থেকে সরে এসে পৃথক নির্বাচনের সমর্থনে কথা বলেছেন এবং শেষ পর্যন্ত মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবি তুলেছিলেন। এই রাষ্ট্র যে অখণ্ড ভারতবর্ষের সকল

মুসলমানের প্রকৃত নিজভূমি হতে পারে না তা জিন্না নিজেও জানতেন। কেননা অখণ্ড ভারতবর্ষের যে অংশগুলিকে নিয়ে জিন্না মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবি তুলেছিলেন সেখানে সংখ্যালঘিষ্ঠ হিন্দুদের হার মূল জনসংখ্যার যে অনুপাতে ছিল তার তুলনায় অবশিষ্ট ভারতবর্ষে অর্থাৎ ভারতবর্ষের যে অঞ্চলগুলি হিন্দুপ্রধান এবং যা পাকিস্তানের মধ্যে সন্নিবিষ্ট হবে না সেখানে সংখ্যালঘিষ্ঠ মুসলমানদের হার মোট জনসংখ্যার অনুপাতে অনেক বেশিই ছিল। অর্থাৎ যেসব অঞ্চলে মুসলমানরা সংখ্যায় বেশি তাঁদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র চাইলেও যে বিপুল সংখ্যক মুসলমান হিন্দুপ্রধান ভারতবর্ষে থেকে যাবেন তাঁদের 'নিজ ভূমি' সম্পর্কে জিন্নার কোন চিন্তা ছিল না। বিদ্বেষ এবং বিভেদের মানসিকতাকে ভিত্তি করে একটি মুসলিম রাষ্ট্র গঠিত হলে হিন্দু ভারতবর্ষের মুসলমানরা নিরাপদ হয়ে যাবেন অথবা লোক বিনিময় করে এই সমস্যার সমাধান করা যাবে এমন কোন কথা তখন কেউই বাস্তবোচিত বলে মনে করেননি, যদিও জিন্না একবার লোক বিনিময়ের কথা বলেছিলেন।

এইভাবে সামগ্রিকতার দৃষ্টিতে বিচার করলে জিন্নার প্রস্তাবে ত্রুটি লক্ষ্য করা যায়। জিন্নাও যে তা জানতেন না তা নয়। সেজন্য এ কথা মনে করলে হয়তো ভুল হবে না যে সমগ্র ভারতবর্ষের মুসলমানদের হিন্দুপ্রাধান্য থেকে মুক্ত করবার কোন স্থায়ী পরিকল্পনা নিয়ে জিন্না মাথা ঘামাননি। তিনি চেয়েছিলেন নিজেকে মুসলমানদের দাবি-দাওয়ার একমাত্র প্রবক্তারূপে প্রতিষ্ঠিত করতে। এই মানসিক ভূমিকা থেকেই তিনি কংগ্রেস এবং গান্ধীজীকে বিচার করেছিলেন এবং সেই দৃষ্টিতে তিনি তাঁদের তাঁর প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে গণ্য করেছিলেন। ১৯৩৮ সালের লীগ কাউন্সিলের সভায় তিনি বলেছিলেন : 'কংগ্রেস প্রধানত একটি হিন্দু প্রতিষ্ঠান'। ঐ বছরেই তিনি পাটনায় অনুষ্ঠিত সভায় সভাপতির ভাষণে বলেছিলেন যে গান্ধীজীই একমাত্র লোক যিনি কংগ্রেসকে হিন্দুত্ব জাগিয়ে তোলার এবং হিন্দুরাজ প্রতিষ্ঠা করার যন্ত্রে পরিণত করেছেন।[৬৮] এবং এ কথাও বলেছিলেন যে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে বোঝাপড়া গান্ধীজী মারা যাবার পরই হতে পারে। 'যত দিন তিনি জীবিত আছেন তত দিন মুসলমানদের সঙ্গে বোঝাপড়ার কোন সম্ভাবনা নেই।'[৬৯] জিন্নার এই উক্তি যেমন গান্ধীজীর প্রতি তাঁর তীব্র বিদ্বেষসূচক তেমনি গান্ধীজীর ব্যক্তিত্বের প্রতি তাঁর ভীতিজড়িত স্বীকৃতি। জিন্না গান্ধীজীর এই ব্যক্তিত্বের বিরুদ্ধেই নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে চেয়েছিলেন। ভারতবর্ষের জনগণের উপর গান্ধীজীর প্রভাব যেমন যেমন বর্ধিত হচ্ছিল জিন্নাও তারই সঙ্গে তাল রেখে তাঁর দাবিগুলিকে স্থাপিত করছিলেন। গান্ধীজীর প্রতি ১৯৩৮ সালে তাঁর যে মনোভাব তা ১৯১৮ সালে ছিল না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে সৈন্য সংগ্রহের কাজে তিনি গান্ধীজীকে সাহায্য করতে প্রস্তুত ছিলেন। ১৯১৯ সালে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনে মন্টেগু-চেমসফোর্ড শাসন সংস্কার সম্পর্কিত যে প্রস্তাব গান্ধীজী উত্থাপন করেছিলেন জিন্না তা সমর্থন করেছিলেন এবং বক্তৃতায় গান্ধীজীকে 'মহাত্মা' বলে সম্বোধন করেছিলেন। তাঁর দীর্ঘ রাজনৈতিক জীবনে জিন্না দ্বিতীয়বার গান্ধীজীকে মহাত্মা বলেছিলেন ১৯৪৫ সালে সিমলা সম্মেলনের সময়। তিনি বলেছিলেন : "মহাত্মা গান্ধী যদি পাকিস্তান মেনে নেন তা হলে সম্মেলনের সার্থকতা নিয়ে আমাদের মাথা ঘামাতে হবে না।"[৭০]

জিন্নার এই কথায় পাকিস্তানের প্রতি তাঁর আগ্রহের এবং বলা যায় যে গান্ধীজীর প্রভাবের স্বীকৃতি সূচিত হয়ে থাকলেও তার দ্বারা গান্ধীজীর প্রতি তাঁর মনোভাব পরিবর্তনের কোন প্রকাশ ঘটেনি। বস্তুত গান্ধীজী এবং কংগ্রেসকে তিনি ভারতবর্ষের

সকল সম্প্রদায়ের মানুষদের প্রতিনিধি বলে জীবনের শেষ দিন পর্যন্ত মেনে নিতে পারেননি। ১৯২৪ সালে মুসলিম লীগের অধিবেশনে জিন্না বলেছিলেন : "আমাদের এ কথা ভুললে চলবে না যে স্বরাজ অর্জনের অন্যতম শর্ত হল হিন্দু-মুসলমানের রাজনৈতিক ঐক্য। আমি এ কথাও বলতে প্রস্তুত যে যেদিন হিন্দু এবং মুসলমানরা ঐক্যবদ্ধ হবে সেই দিনই ভারতবর্ষ দায়িত্বশীল ডোমিনিয়ন গভর্নমেন্ট লাভ করবে।"[৭১] জিন্না এই মতও ব্যক্ত করেছিলেন যে বিংশ শতাব্দীর প্রথম দিকে যে দাঙ্গাগুলি হয়েছিল তার কারণ ছিল ভুল বোঝাবুঝি এবং কোন পক্ষের দিকে পুলিশের প্রশ্রয়। ১৯৩৪-৩৫ সালে অর্থাৎ নির্বাচনের প্রাক্কালে উত্তরপ্রদেশে একটি 'ইউনিটি বোর্ড' গঠিত হয়েছিল। মুসলিম লীগের প্রতিনিধিরূপে জিন্না তাতে যোগ দিয়েছিলেন। বোর্ড একটি বোঝাপড়ায় উপনীত হয়েছিল বটে কিন্তু বোর্ডের উত্থাপিত স্বাধীনতার দাবি জিন্না সমর্থন করেননি। তাঁর লক্ষ্য ছিল নির্বাচনে জয়লাভ করা। মুসলমানদের নেতৃত্বই জিন্নার কাছে আকাঙ্ক্ষিত বস্তু ছিল। তিনি জানতেন যে গান্ধীজী জীবিত থাকতে সমগ্র ভারতবাসীর হয়ে কথা বলবার অধিকার তিনি অর্জন করতে পারবেন না। আর মুসলমান জনসাধারণের একমাত্র নেতা হবার মাঝখানে কংগ্রেস এবং গান্ধীজী এসে দাঁড়াবেন এটিকেও তিনি বরদাস্ত করতে পারেননি। তাই কংগ্রেস ও গান্ধীজীর বিরোধিতার সত্য-মিথ্যা কোন সুযোগকেই তিনি হাতছাড়া করতে চাননি। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে তিনি যেমন জেহাদ ঘোষণা করেছিলেন তেমনি 'হিন্দ' এবং 'বন্দেমাতরম' শব্দদুটিরও তিনি বিরোধিতা করেছিলেন।[৭২] কংগ্রেস শাসিত প্রদেশগুলিতে মুসলমানদের উপর অত্যাচার হয়েছে এ কথা প্রমাণ করতে পারবেন না জেনেও তিনি সেই অভিযোগ তুলেছিলেন এবং মন্ত্রীসভা পদত্যাগ করলে 'মুক্তি দিবস' উদযাপন করতে বলেছিলেন। এই দাবি এবং অভিযোগগুলির চূড়ান্ত রূপ হল পাকিস্তানের দাবি এবং প্রত্যক্ষ সংগ্রামের আহ্বান।

এটি অনুমান করা বোধহয় ভুল হবে না যে জিন্নার উদ্দেশ্য ছিল গান্ধীজীর এক সমান্তরাল নেতৃত্ব গড়ে তোলা। তার নেতা হবেন তিনি নিজেই। ওয়ালি খাঁ মন্তব্য করেছেন যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট জানত যে জিন্না কখনই গান্ধীজীর সমস্তরে পৌঁছতে পারবেন না। তাই জিন্নাকে গঠনাত্মক কাজের জন্য ব্যবহার করেই তাঁরা সন্তুষ্ট থাকতে চাননি। তাঁরা চেয়েছিলেন জিন্নাকে ধ্বংসাত্মক কাজে ব্যবহার করতে।[৭৩] গান্ধীজী গণআন্দোলন পরিচালনা করেছিলেন। এই রকম আন্দোলনের নেতৃত্ব দেবার ক্ষমতা এবং প্রবৃত্তি জিন্নার ছিল না। সমস্ত কাজে যে মানসিকতা তাঁকে তাড়িত করেছে তা হল গান্ধীজীর প্রতি তাঁর প্রচণ্ড বিদ্বেষ। মুসলমানদের জন্য তাঁর উত্থিত দাবি-দাওয়া এই গান্ধী-বিদ্বেষের দ্বারা নিষিক্ত হয়ে গিয়েছিল। গান্ধীজীর কর্মধারার প্রতি সহানুভূতিশীল ছিলেন না এমন অনেক মানুষই তখন ছিলেন এবং পরেও হয়েছেন। কিন্তু জিন্নার মধ্যে গান্ধীজীর প্রতি ব্যক্তিগত বিদ্বেষ যেন একটু বেশিই প্রকট হয়েছিল। এই বিদ্বেষের কারণ সম্পর্কে গান্ধীজীর মন্তব্য হল : 'যেদিন আমি একটি সভায় জিন্নাকে ইংরেজি ভাষার বদলে গুজরাটিতে বক্তৃতা দিতে বলেছিলাম সেদিন থেকেই তিনি আমাকে ঘৃণা করে আসছেন। স্যার চিমনলাল শীতলবাদও সেদিন থেকে আমার প্রতি একই মনোভাব পোষণ করে আসছেন। এবং এখনও পর্যন্ত তার কোন পরিবর্তন হয়নি।'[৭৪]

গান্ধীজীর এই অনুমান সত্য হতে পারে আবার না-ও হতে পারে। জিন্নাও যে একজন প্রবল ব্যক্তিত্বসম্পন্ন মানুষ ছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। কংগ্রেসের সঙ্গে তাঁর বিচ্ছেদের অন্যতম কারণ ছিল গণ-আন্দোলনের প্রতি তাঁর অনীহা। তিনি কেতা-দরস্ত

রাজনীতিতে অভ্যস্ত ছিলেন। তবে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হবার পর তিনি যখন রাজনীতিতে ফিরে আসেন এবং মুসলমান সমাজের একটি বড় অংশের নেতা হয়ে ওঠেন তখন গণ-আন্দোলন না করেও মুসলিম লীগকে গণসংগঠনে পরিণত করতে তিনি পেরেছিলেন। সে কৃতিত্ব তাঁর। ১৯৩৭ সালে, যখন জিন্না পৃথক রাষ্ট্রের দাবি তোলেননি তখনই তিনি বলেছিলেন যে রাজনীতি নির্ভর করে ক্ষমতার উপর।[৭৫] জিন্না সারা জীবন সেই ক্ষমতা অর্জনের জন্যই লড়াই করেছেন। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের কাছ থেকে ক্ষমতা ছিনিয়ে নেবার আন্দোলনে তিনি শরিক হননি। গান্ধীজী এবং কংগ্রেসের নেতৃত্বের এবং আন্দোলনের সমান্তরাল পথে চলে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত নেতৃত্বকে প্রতিষ্ঠিত করেছিলেন এবং কংগ্রেসের আন্দোলনের ফলশ্রুতিরূপে যে ক্ষমতা ভারতবর্ষের জনগণের কাছে আসবে তার একটা বড় অংশ মুসলমানদের জন্য আলাদা করে ছিনিয়ে নিতে চেয়েছিলেন। এই চাওয়ার পিছনেও তাঁর মানসিক বিবর্তন ঘটেছে। ১৯৩৭ সালে মুসলিম লীগের লক্ষ্ণৌ অধিবেশনে জিন্না গণতান্ত্রিক রাষ্ট্রগুলির ফেডারেশনের ভিতর পূর্ণ স্বাধীনতার দাবি ঘোষণা করেছিলেন।[৭৬] দু বছর পরে লীগ ফেডারেল ব্যবস্থার বিরোধিতা করে। তার কারণ হল এই যে জিন্না বিশ্বাস করতেন যে ভারতীয় পরিস্থিতিতে পার্লামেন্টারী ব্যবস্থা এবং গণতান্ত্রিক পদ্ধতি ফলপ্রসূ হতে পারে না। কেননা এই ব্যবস্থা এবং পদ্ধতি যদি অনুসরণ করা হয় তা হলে সংখ্যাধিক্যের জোরে হিন্দুরা সব সময়েই মুসলমানদের উপর আধিপত্য করে যাবে। এ জন্যই জিন্না মুসলমানদের জন্য ক্ষমতা চেয়েছিলেন। আর তাঁর কাছে ক্ষমতার অর্থ ছিল রাষ্ট্র ক্ষমতা অর্থাৎ আইনসভাগুলিতে সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করা। পরবর্তীকালে জিন্না ক্ষমতা এবং নেতৃত্ব নিজের অধিকারে রাখার জন্যই পাকিস্তান অর্জনের উদ্দেশ্যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক দিয়েছিলেন। এই ডাক দেওয়া ছাড়া নিজের নেতৃত্ব বজায় রাখার আর কোন পথ তাঁর কাছে তখন খোলা ছিল না। কেননা জিন্না ক্রমশই হতাশাগ্রস্ত হয়ে পড়ছিলেন। তখন তাঁর মনে হয়েছিল যে তিনি 'বাঁধা দড়ির শেষ প্রান্তে পৌঁছে গিয়েছেন, আর অগ্রসর হবার শক্তি তাঁর নেই।' (I am at the end of my teather)। ওয়াভেলের কাছে তাঁর কাতর প্রার্থনা ছিল 'দয়া করে লীগকে ভেঙে দেবেন না।' ওয়াভেল তাঁর সেই প্রার্থনায় সাড়া দিয়েছিলেন। পরে অবশ্য তাঁর মনে হয়েছিল যে ৫ : ৫ : ২ ফরমুলা (এটি আগে উল্লেখ করা হয়েছে) তুলে ধরে এবং জিন্নাকে ঐকমত্যে আসার জন্য জোর না করে তিনি ভুল করেছিলেন।[৭৭] বস্তুত জিন্না তাঁর স্বাতন্ত্র্য প্রদর্শন করার জন্য সিমলা সম্মেলনে কোন রকম বোঝাপড়ায় আসতে রাজি হননি। তার ফলে তাঁর নিজের দলের লোকেরাই তাঁর প্রতি হতাশ হয়েছিলেন।[৭৮] আজাদও বলেছেন যে সিমলা সম্মেলনে এসে জিন্না বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর পুরনো চাল আর কার্যকর হবে না। আজাদ এ কথাও বলেছেন যে জিন্নার দাবিতে এবং ওয়াভেলের অনুমোদনে যদি সিমলা প্রস্তাব বাতিল না হোত তা হলে ঐ প্রস্তাব অনুসারে ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে ১৪ জন সদস্যের মধ্যে ৭ জন মুসলমান হতেন যদিও ভারতবর্ষের জনসংখ্যা হিসেবে মুসলমানদের অনুপাত শতকরা ২৫ ভাগের বেশি ছিল না।[৭৯] অবশ্য এ ক্ষেত্রে জিন্নার পক্ষেও একটি বক্তব্য থাকতে পারে। তিনি মুসলিম লীগের বাইরের মুসলমান নেতাদের অর্থাৎ যাঁরা তাঁর নেতৃত্ব মেনে নেননি তাঁদের তো দেশদ্রোহী, জাতিদ্রোহী এবং বিশ্বাসঘাতক বলেই মনে করতেন। সেই রকম মানুষদের নিয়ে মুসলমানদের সংখ্যাবৃদ্ধি করাকে তিনি মুসলমানদের যথার্থ প্রতিনিধিত্ব বলে মেনে নিতে পারেননি। যেমন পরবর্তী সময়ে অন্তর্বর্তী সরকারে তিনি যখন যোগেন্দ্র মণ্ডলের

নাম মুসলিম লীগের কোটায় যুক্ত করেছিলেন তখন তফশিলী সম্প্রদায়ের বড় অংশ মণ্ডলকে তাঁদের প্রতিনিধি বলে স্বীকার করেননি।

জিন্নার মধ্যে যুক্তিবাদী মন যে ছিল না তা নয়। তাঁকে কখনই গোঁড়া বা ধর্মান্ধ মুসলমান বলে অভিহিত করা যায় না। মুসলমানদের মধ্যে অনেকে এক সময় নিজেদের এক বিশ্ব-ভ্রাতৃত্বের (অবশ্যই কেবল মুসলমানদের) অঙ্গ বলে মনে করতেন। তাঁরাই তুরস্কের খলিফাকে ক্ষমতাচ্যুত করায় ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। তাঁরা আন্দোলনে প্রবৃত্তও হয়েছিলেন। কিন্তু জিন্নার এতে সায় ছিল না। মুসলিম লীগের ১৯১৮ সালের অধিবেশনে তিনি খিলাফত নিয়ে আলোচনায় আপত্তি জানিয়েছিলেন।[৮০] ১৯২৫ সালে তিনি মুসলিম লীগের কলকাতা অধিবেশনে ভারতবর্ষের সংবিধান রচনায় কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করতে এবং সংরক্ষিত আসনসহ যৌথ নির্বাচন মেনে নিতে রাজি হয়েছিলেন দুটি শর্তে। তার একটি ছিল সিন্ধু অঞ্চলকে বোম্বাই থেকে পৃথক করে একটি স্বতন্ত্র প্রদেশের মর্যাদা দেওয়া এবং সীমান্তপ্রদেশ ও বেলুচিস্তানে 'সংস্কার' প্রবর্তন করা।[৮১] সর্বোপরি চৌধুরী রহমৎ আলি যখন ব্রিটিশদের প্ররোচনায় পাকিস্তানের পরিকল্পনা উপস্থিত করেছিলেন তখন জিন্না সেটিকে উপহাস করেছিলেন।[৮২]

অদৃষ্টের পরিহাস, এই জিন্নাই পরে পাকিস্তানের বড় প্রবক্তা হয়ে উঠেছিলেন। বস্তুত যে জিন্না ১৯৩৭ সালে স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির ফেডারেশনের কথা বলেছিলেন তিনিই মাত্র তিন বছর পরে মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের দাবি নিয়ে সোচ্চার হয়ে ওঠেন। জিন্নার এই পরিবর্তন অহেতুক ছিল এ কথা জোরের সঙ্গে বলা যায় না। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা যে সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে মুসলমানদের উপর আধিপত্য বিস্তারের প্রয়াসী ছিলেন এ কথা অস্বীকার করা যায় না। সভারকর, মদনমোহন মালব্য, কে. এম. মুন্সী প্রমুখ নেতাদের অখণ্ড ভারত গঠনের আহ্বানের পিছনে হিন্দু-প্রীতি অবশ্যই জোরদার ছিল। জিন্না স্বভাবতই এতে ভীত হয়েছিলেন। আর যেসব মুসলমান নেতা জাতীয়তাবাদী, প্রকৃত অসাম্প্রদায়িক হিন্দু নেতাদের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁদের প্রতি তিনি তীব্র বিদ্বেষ পোষণ করতেন। মৌলানা আজাদকে তিনি এই মনোভাব থেকেই বিচার করেছিলেন।

১৯৪০ সালে কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে যুদ্ধে সহযোগিতা করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে কংগ্রেস যখন গান্ধীজীকে নেতৃত্বের দায় থেকে মুক্তি দিয়েছিল তখন কংগ্রেসের সভাপতিরূপে আজাদ জিন্নাকে একটি একান্ত (confidential) টেলিগ্রাম পাঠিয়েছিলেন। তাতে তিনি লিখেছিলেন : "কংগ্রেস দিল্লী প্রস্তাবে জাতীয় সরকার বলতে সকলকে নিয়ে গঠিত মন্ত্রীসভার কথাই বলতে চেয়েছে। এটি কোন একটি দলের দ্বারা গঠিত সরকার হবে না। লীগ কি দ্বি-জাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে গঠিত নয় এমন একটি সাময়িক ব্যবস্থায় রাজি হতে পারে না ?" জিন্না এর উত্তরে জানিয়েছিলেন : "আমি আপনার সঙ্গে চিঠিপত্রে বা অন্য কোনভাবে আলোচনা করতে রাজি নই। কেননা আপনি মুসলিম ভারতের আস্থা হারিয়েছেন। আপনি কি বুঝতে পারেন না যে কংগ্রেসের গায়ে জাতীয়তার রং চাপাবার জন্য এবং বিদেশীদের প্রতারণা করবার জন্য আপনাকে একজন লোক দেখানো মুসলমান কংগ্রেস সভাপতি করা হয়েছে ? আপনি মুসলমান এবং হিন্দু কাউকেই প্রতিনিধিত্ব করেন না। আপনার যদি আত্মমর্যাদা জ্ঞান থাকে তবে আপনি এখনই পদত্যাগ করুন।"[৮৩]

মুসলমান সমাজের ভাল একমাত্র তাঁর নেতৃত্বেই হওয়া সম্ভব এই কথাটি জিন্না প্রথমাবধি বোঝাতে চেষ্টা করেছিলেন। সেজন্য মুসলমান জনসাধারণ এবং তাঁর মাঝখানে

আর কোন নেতার অস্তিত্বকে তিনি সহ্য করতে পারতেন না। যখন থেকে তিনি জাতীয়তাবাদীর চরিত্র ঝেড়ে ফেলে কেবল মুসলমানদের জন্যই কথা বলতে শুরু করেছিলেন তখন থেকেই তাঁর লক্ষ্য ছিল মুসলিম লীগকে এবং নিজেকে মুসলমানদের অপ্রতিদ্বন্দ্বী প্রতিনিধিরূপে প্রতিষ্ঠা করা। তিনি তার জন্য সুযোগ খুঁজছিলেন। এবং প্রত্যেক সুযোগটিকেই তিনি সরকারের বদান্যতায় সদ্ব্যবহার করছিলেন। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় কংগ্রেস এই রকম একটি সুযোগ জিন্নার অনুকূলে করে দিয়েছিল।

১৯৩৯ সালে বিশ্বযুদ্ধ যখন শুরু হয় তখন ভারতবর্ষের অনেকগুলি প্রদেশে কংগ্রেসের মন্ত্রীসভা প্রতিষ্ঠিত ছিল। ভারতবাসীর অনুমতি না নিয়ে ভারতবর্ষকে যুদ্ধে যুক্ত করার প্রতিবাদে কংগ্রেস মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করে এবং ১৯৪২ সালে 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণ করে। মন্ত্রীসভা থেকে পদত্যাগ করার ফলে দেশে এক শূন্যতা সৃষ্টি হয়েছিল। এই শূন্যতা দূর করতে ইংরেজ সরকার মুসলিম লীগকে কাছে টেনে আনে। মনে মনে মুসলিম লীগ এর জন্য প্রস্তুত ছিল। কংগ্রেস যখন যুদ্ধে সহযোগিতা করতে নারাজ তখন তারা তাদের সীমিত শক্তি নিয়েই সেই সহযোগিতা করতে এগিয়ে আসে। কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের প্রস্তাব গ্রহণের বার দিন পরে অর্থাৎ ২০শে আগস্ট ১৯৪২ মুসলিম লীগ কংগ্রেসের প্রস্তাবের সম্পর্কে তাদের প্রতিক্রিয়া জানিয়ে একটি প্রস্তাব গ্রহণ করে। তাতে বলা হয়েছিল : "এইরকম পরিস্থিতিতে লীগের কর্মপরিষদ উদ্বেগ ও সাবধানতাপূর্বক আলোচনার পর (after anxious and careful consideration) মুসলমানদের কংগ্রেসের দ্বারা শুরু করা আন্দোলনের সঙ্গে যে কোনভাবে যুক্ত হওয়া থেকে বিরত থাকতে আহ্বান করছে এবং তাদের স্বাভাবিক শান্তিপূর্ণ জীবন অনুসরণ করে যেতে বলছে। কর্মপরিষদ আশা করে যে কারও দ্বারা এবং কোনভাবে মুসলমানদের স্বাভাবিক জীবনযাত্রায় বাধা সৃষ্টি করা হবে না। তা যদি করা হয় তবে মুসলমানরা তাদের জীবন, সম্মান এবং সম্পদ রক্ষার জন্য যে কোনভাবে প্রতিরোধ করতে বাধ্য হবে।"[৮৪] এই প্রস্তাবের মধ্যে যে প্রচ্ছন্ন হুমকি রয়েছে তাতে পরবর্তী সময়ের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের বীজ ব্যপ্ত হয়েছিল বলে মনে করা ভুল হবে না। এইভাবে রাজনৈতিক ভারসাম্য যখন অনিশ্চিত হয়ে পড়েছিল তখনই মুসলিম লীগ দেশখণ্ডনের প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল। খালিকুজ্জমানের কথা উল্লেখ করে আগেই বলা হয়েছে যে দেশখণ্ডনের প্রস্তাব গ্রহণের আগেই ব্রিটিশ অফিসাররা মুসলিম লীগের পরবর্তী পদক্ষেপের কথা জানতেন এবং তাঁরা তার বিরোধিতা করবেন না বলেই স্থির করেছিলেন। লিনলিথগো তো জিন্নাকে বলেই দিয়েছিলেন যে তাঁর (জিন্নার) সম্মতি ছাড়া কোন সিদ্ধান্তই গ্রহণ করা হবে না। আর যুদ্ধে অসহযোগিতা করায় ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কংগ্রেসের উপর এতদূর বিরক্ত হয়েছিল যে দৌত্য করতে এসে ক্রিপস পরিষ্কার বলে দিয়েছিলেন যে এক অথবা একাধিক প্রদেশ যদি নতুন সংবিধান মেনে না নেয় তা হলে তারা নিজেদের মতো সংবিধান রচনা করতে পারবে এবং সেই প্রদেশ ভারতীয় ইউনিয়নের সমান মর্যাদা লাভ করবে। এর উল্লেখ আগেই করা হয়েছে।

ক্রিপসের দৌত্য সফল হয়নি। কংগ্রেস যুদ্ধে সহযোগিতা করতে রাজি হয়নি এবং জিন্নার প্রত্যাশাও পূর্ণ হয়নি। কিন্তু তার জন্য জিন্নার ইংরেজদের উপর নির্ভরতা এবং জিন্নার প্রতি ইংরেজদের তরসা কোনটিই কমে যায়নি। ১৯৪০ সালে জিন্না বলেছিলেন যে 'গ্রেট ব্রিটেনের সহযোগিতায় মুসলমানদের দ্বারা পরিচালিত একটি মুসলিম অঞ্চল তিনি প্রত্যাশা করেন।' আবার ১৯৪৪ সালে তিনি বলেছিলেন যে দুটি রাষ্ট্র গঠিত হলে

হিন্দু রাষ্ট্র ভারতবর্ষের দ্বারা পাকিস্তানকে আক্রমণের কোন সম্ভাবনা থাকবে না। কেননা দেশরক্ষার ক্ষেত্রে ব্রিটিশ কর্তৃত্ব অনেক দিন বজায় থাকবে। তাঁরাচাদ বলেছেন যে গান্ধীজী জিন্নার এই চরিত্র ধরতে পারেননি। তিনি জিন্নাকে একজন জাতীয়তাবাদী এবং ভারত-প্রেমিক বলে ধরে নিয়েছিলেন। আর সেইভাবেই তিনি তাঁর সঙ্গে কথাবার্তা বলতেন। গান্ধীজী এতে সফল হননি। তাঁর ব্যর্থতা জিন্নার জনপ্রিয়তা এবং গুরুত্ব বাড়াতে সহায়ক হয়েছিল।[৮৫]

অবশ্য এ কথা মনে করা মোটেই ঠিক হবে না যে জিন্না নেতৃত্বের পক্ষে উপযুক্ত ছিলেন না। তিনি কেবল শূন্যতারই সদ্ব্যবহার করেছিলেন। তিনি নিশ্চয় সুযোগসন্ধানী ছিলেন, পরিস্থিতিকে চিনে নেবার স্বাভাবিক ক্ষমতা তাঁর ছিল এবং সুযোগ ও পরিস্থিতিকে নিজের অনুকূলে নিয়ে আসার বুদ্ধি এবং দক্ষতা তাঁর ছিল। নেতৃত্বের বাঞ্ছনীয় দৃঢ়তা নিয়েই তিনি অগ্রসর হয়েছিলেন। যা চেয়েছিলেন শেষ পর্যন্ত তা পাননি বটে কিন্তু দেনাবিভাগকে অবশ্যম্ভাবী করে তোলার কৃতিত্ব তাঁরই। প্রথম থেকেই তিনি এই দাবি উত্থাপন করেননি। ধীরে ধীরে তাঁর দাবির পরিধি বর্ধিত হয়েছে। শেষ পর্যন্ত একটি মীমাংসায় পৌঁছবার জন্য তাঁকে দাবির কিছুটা ছেড়ে দিতেও হয়েছে। এটি তাঁর জীবনের ট্রাজেডী, বিয়োগব্যথা, না সাফল্য—সেই মূল্যায়ন হয়তো সহজে করা যাবে না।

১৯২৯ সালে জিন্না স্বয়ং কংগ্রেসের সঙ্গে একটি বোঝাপড়ায় আসতে চেষ্টা করেছিলেন। তাঁর সেই চেষ্টা ছিল মুসলিম লীগের সভাপতিরূপে। রাজনৈতিক সচেতন মুসলমানরা তখন বিভিন্ন মতে বিভক্ত ছিলেন। শুফী মতাবলম্বীরা মুসলমানদের জন্য পৃথক নির্বাচন এবং সরকারের প্রতি-আনুগত্য বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। আগা খাঁর নেতৃত্বে মুসলিম সম্মেলন পৃথক নির্বাচন চাইতেন এবং মুসলমানদের স্বার্থরক্ষার যথেষ্ট ব্যবস্থাসহ ধীরে ধীরে স্বাধীনতার দিকে অগ্রসর হবার পক্ষপাতী ছিলেন। জাতীয়তাবাদী মুসলমানরা কংগ্রেসের আদর্শ এবং পদ্ধতি মেনে নিয়েছিলেন। তাঁরা সংঘবদ্ধ ছিলেন এবং তাঁদের নেতৃত্বে মৌলানা আজাদের সঙ্গে ছিলেন চৌধুরী খালিকুজ্জমান। জিন্না-গোষ্ঠী রাজনৈতিক আদর্শরূপে ডোমিনিয়ন স্টেটাস মেনে নিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা নেহরু কমিটির সুপারিশ গ্রহণ করেননি। তার বদলে কংগ্রেসের সঙ্গে সহযোগিতা করার উদ্দেশ্যে যে চোদ্দ দফার শর্ত তিনি উত্থাপন করেছিলেন তার মধ্যে ছিল : (১) সংবিধানের রূপ হবে ফেডারেল রাষ্ট্রের, অবশিষ্ট ক্ষমতা থাকবে প্রদেশগুলির কাছে ; (২) প্রত্যেক নির্বাচিত সংগঠন এমনভাবে গঠিত হবে যাতে সেখানে সংখ্যালঘুদের পর্যাপ্ত এবং কার্যকর প্রতিনিধিত্ব থাকে, (৩) যদি কোন আইনসভায় কোন সম্প্রদায়ের তিন-চতুর্থাংশ সদস্য কোন বিল বা প্রস্তাবকে তাঁদের স্বার্থের প্রতিকূল বলে মনে করেন তবে তা গৃহীত হবে না ; (৪) কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলমানদের প্রতিনিধিত্ব এক তৃতীয়াংশের কম হবে না ; (৫) মন্ত্রীসভাগুলিতে এবং চাকুরিতে যথেষ্ট সংখ্যক মুসলমানদের গ্রহণ করার কথা সংবিধানে উল্লেখ থাকবে ; (৬) কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার সব বিরোধিতা প্রত্যাহার করে নেবে ; (৭) মুসলমানদের গোহত্যা করার স্বাধীনতা থাকবে ; (৮) 'বন্দেমাতরম' গান গাওয়া চলবে না ; (৯) ত্রিবর্ণ পতাকার পরিবর্তন করতে হবে এবং মুসলিম লীগের পতাকাকে সমান মর্যাদা দিতে হবে।[৮৬]

জিন্নার দেওয়া শর্তগুলি যে খুব কঠিন ছিল তা সহজেই বোঝা যায়। জিন্না কেন্দ্রীয় আইনসভায় মুসলমান জনসংখ্যার অনুপাতের চেয়ে বেশি সদস্য চেয়েছিলেন এবং সেই সঙ্গে 'বন্দেমাতরম' গান গাওয়া যাবে না, ত্রিবর্ণ পতাকা বদলাতে হবে এমন দাবিও

করেছিলেন। বলা বাহুল্য এই দাবি মানা হিন্দুদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। মুসলমানদের অন্যান্য গোষ্ঠীও জিন্নাকে সমর্থন করেননি। ফলে রাজনৈতিক ঘটনাবলীর উপর প্রভাব বিস্তার করার তাঁর প্রয়াস ব্যর্থ হয়েছিল। এই সময়েই জিন্নার প্রথমা স্ত্রী তাঁকে পরিত্যাগ করে চলে গিয়েছিলেন। বস্তুত রাজনৈতিক ব্যর্থতা এবং বিবাহ বিচ্ছেদের অবসাদ জিন্নার দেশত্যাগকে ত্বরান্বিত করেছিল।[৮৭] তিনি ইংলন্ডে চলে গিয়েছিলেন এবং কয়েক বছর পরে যখন ফিরে এসেছিলেন তখন তিনি পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে নতুন মানুষ। জাতীয়তাবাদী চরিত্র থেকে তাঁর বিদায় তখন সম্পূর্ণ হয়ে গিয়েছে। তত দিনে তিনি বুঝে নিয়েছেন যে মুসলমান সমাজের নেতারূপেই তিনি নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারেন। এই আলোচনা আগে করা হয়েছে। এখানে তার প্রাসঙ্গিক উল্লেখ করা হল।

জিন্না তাঁর নেতৃত্বের শিখরে উঠেছিলেন দেশবিভাগের দাবি তোলার পর। কিন্তু কিসের ভিত্তিতে দেশবিভাগ হবে? ধর্ম উপলক্ষ হতে পারে, কিন্তু কারণ হতে পারে না। জিন্না তাই ধর্মকে জাতি নির্ণয়ের সূত্র বলে গ্রহণ করেছিলেন। অবশ্য তার জন্য কেবল জিন্নাকেই দোষ দেওয়া যায় না। হিন্দু নেতারাও কেউ কেউ এইভাবে ধর্ম এবং জাতিকে মিশ্রিত করেছিলেন। জিন্নাসহ এইসব নেতারা কেবল হিন্দু এবং মুসলমানদের ক্ষেত্রেই ধর্মভিত্তিক জাতিত্বের কথা বলেছিলেন। তাঁদের কেউ প্রশ্ন করেছিলেন কিনা জানা নেই যে পৃথিবীর যে কোন ভূখণ্ডের ছোটখাট প্রত্যেকটি ধর্মের মানুষরাই কি ভিন্ন জাতির লোক এবং যাঁরা ধর্ম মানেন না তাঁরা কি কোন জাতির অন্তর্ভুক্ত মানুষ নন? বস্তুত এই প্রশ্নের কোন সদুত্তর ছিল না। আসলে ধর্মান্ধতা রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির জন্য জাত্যাভিমানের রূপ নিয়ে ভারতবর্ষের রাজনীতিকে প্রভাবিত করেছিল। লালা লাজপত রায় তো পৃথক নির্বাচনসহ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরোধিতা করে বলেছিলেন যে একে যদি একবার স্বীকার করে নেওয়া হয় তবে তাকে রদ করতে গৃহযুদ্ধ ছাড়া অন্য কোন পথ থাকবে না। তিনি একটি ব্যক্তিগত চিঠিতে চিত্তরঞ্জন দাশকে লিখেছিলেন যে মুসলিম ইতিহাস, মুসলিম আইন এবং এমনকি মুসলমানদের মধ্যে যাঁরা সর্বোত্তম এবং শ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক তাঁদের ধর্মীয় নির্দেশগুলির প্রতি আনুগত্য দেখলে মনে হয় যে হিন্দু-মুসলমান ঐক্য অবাস্তব পরিকল্পনা। বস্তুত প্রায় এই সূত্রটি ধরেই জিন্না ১৯৪০-এর লাহোর অধিবেশনে বলেছিলেন: "হিন্দু এবং মুসলমানরা একটি সাধারণ জাতিতে বিকশিত হবে এ এক স্বপ্ন। তাদের ধর্ম আলাদা, তাদের দর্শন, সামাজিক আচার-ব্যবহার, সাহিত্য আলাদা, তারা পরস্পর বিবাহ করে না, একত্রে ভোজন করে না। অতএব তারা জাতি হিসেবেও আলাদা।"[৮৮]*

---

* রেনাইন বলেছেন: কুলকে (race) জাতির (nation) সঙ্গে গুলিয়ে ফেলা যায় না। সত্য হল এই যে শুদ্ধ কুল বলে কিছু নেই। টমসের মত হল—জাতীয়তা হল এক সামাজিক অনুভূতি। এটি হল একত্বের বিধিবদ্ধ অনুভূতি (corporate sentiment of oneness)। এই অনুভূতি সম-অনুভূতিসম্পন্ন মানুষদের আপনজন মনে করতে উদ্বুদ্ধ করে। এই জাতীয় অনুভূতির দুদিকে ধার। এটি এক দিকে আপনজনদের মধ্যে একাত্মবোধ জাগিয়ে তোলে আবার অন্যদিকে যাদের আপনজন মনে করা হয় না তাদের প্রতি বিরূপতা জাগ্রত করে দেয়। অন্য গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত আমরা নই এই এক ভাবনা সৃষ্টি করে দেয়। (Quoted in Pakistan or Partition of India, p. 13, 16)

অধ্যাপক হীরেন মুখোপাধ্যায় দুঃখ করেছেন যে জিন্নার এই কথাগুলির বিরোধিতা যতটা গুরুত্বসহকারে করা উচিত ছিল ততটা করা হয়নি। কেবল ভারতবর্ষের কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে গঙ্গাধর অধিকারী কিছুটা আলোচনা করেছিলেন। এই আলোচনাও সম্পূর্ণ ত্রুটিহীন ছিল না। হীরেনবাবুর কথায় হয়তো যুক্তি আছে। কিন্তু তাঁর মন্তব্যও আলোচনার অপেক্ষা রাখে। সকলেই জানেন যে গান্ধীজী যখন 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের কথা বলছিলেন এবং রাশিয়াও বিশ্বযুদ্ধে শরিক হয়ে পড়ে তখন ভারত সরকার কমিউনিস্ট পার্টির উপর থেকে নিষেধাজ্ঞা তুলে নিয়েছিল। কমিউনিস্টরা এর ফলে যেমন বিশ্বযুদ্ধকে জনযুদ্ধ আখ্যা দিয়েছিলেন তেমনি পাকিস্তানের দাবিকেও সমর্থন

জিন্না আরও বলেছিলেন : "আমি আন্তরিকভাবে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্যের প্রয়োজনীয়তা এবং বাঞ্ছনীয়তা বিশ্বাস করি। মুসলমান নেতাদেরও আমি বিশ্বাস করতে প্রস্তুত। কিন্তু কোরাণ এবং হদিসের নির্দেশের কী হবে ? নেতারা তো তাকে অতিক্রম করতে পারেন না। তা হলে কি আমাদের কোন আশা নেই ?"[৯] আশা অবশ্যই আছে। জিন্নাই সেই আশা মুসলমানদের মনে জাগিয়ে তুলেছিলেন। সেটি হল মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্র, পাকিস্তান।

দেশবিভাগের দাবি উত্থাপন করলেও নতুন রাষ্ট্রের পরিকাঠামো কেমন হবে সে সম্পর্কে জিন্নার তখন কোন স্পষ্ট ধারণা ছিল না। দেশবিভাগের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক এবং সামাজিক প্রতিক্রিয়া কী হতে পারে সেই বিষয়টিও জিন্না সযত্নে এড়িয়ে গিয়েছিলেন। তিনি মূলত সাংস্কৃতিক জীবনের ভিন্নতাকে নতুন রাষ্ট্র গঠনের জন্য রাজনৈতিক হাতিয়ার করে নিয়েছিলেন। ভি. পি. মেনন জানিয়েছেন যে জিন্না যে ঠিক কী চেয়েছিলেন তা তিনি নিজেই ভাল করে জানতেন না। মাদ্রাজের গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎকারের সময় তিনি একবার বলেছিলেন যে 'ভারতবর্ষকে চারটি অঞ্চলে ভাগ করতে হবে। সেই অঞ্চলগুলি হল (১) দ্রাবিড়স্থান (মাদ্রাজ প্রেসিডেন্সি), (২) হিন্দুস্থান (বোম্বাই প্রেসিডেন্সি ও মধ্যপ্রদেশ), (৩) বাঙালিস্থান (বাংলা ও অসম), এবং (৪) পাঞ্জাব (কিছু অংশ বাদ দিয়ে), সিন্ধুপ্রদেশ এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশ। এগুলি আত্মনিয়ন্ত্রণাধীন ডোমিনিয়ন হবে, কারও সঙ্গে কারও সম্পর্ক থাকবে না, প্রত্যেকের নিজস্ব গভর্নর জেনারেল থাকবে এবং ভারত সচিবের মাধ্যমে ব্রিটিশ পার্লামেন্টের কাছে তারা দায়বদ্ধ থাকবে।' তারাচাঁদ দেশী-বিদেশী কয়েকজনের কথা উল্লেখ করেছেন যাঁদের জিন্নার সঙ্গে কথা বলে মনে হয়েছিল যে 'পাকিস্তানের রচয়িতা নিজেই নিশ্চিত ছিলেন না যে তিনি কী বলছেন।' সমস্যার গভীরে না গিয়ে তিনি মানুষের মধ্যে আবেগ সৃষ্টির দিকেই বেশি জোর দিতেন।

আসলে জিন্না বিশ্বাস করতেন অথবা তিনি যে বিশ্বাস করেন সে কথা জানাতেন যে হিন্দু ধর্ম এবং মুসলমান ধর্ম সম্পূর্ণ পৃথক, তাদের মধ্যে কোথাও মিল নেই। হিন্দু ও মুসলমান দুটি পৃথক জাতি এবং তারা পরস্পরের প্রতি যুযুমান। সুতরাং ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষে ইংলন্ডের ধাঁচের গণতন্ত্র চালালে হিন্দুরা চিরকাল প্রাধান্য পেয়ে যাবে এবং মুসলমানরা চিরকাল সংখ্যালঘু হিসেবে হিন্দুদের পদানত থাকবে। জিন্নার এই ভাবনাকে সম্পূর্ণ অলীক বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। মানুষকে যদি কেবল তার ধর্ম দিয়ে চিহ্নিত করা হয় এবং গণতন্ত্র যদি কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠতার মাপকাঠিতেই অনুসৃত হতে থাকে তা হলে অখণ্ড ভারতবর্ষে মুসলমানরা যে ইসলাম ধর্মাবলম্বীরূপে প্রাধান্য পাবে না তাতে সন্দেহের কোন অবকাশ ছিল না। হিন্দুদের অনেকেই তো সংখ্যাগরিষ্ঠতার ভরসাতেই অখণ্ড ভারতের স্বপ্ন দেখতেন। বস্তুত বাংলা ও পাঞ্জাবকে ভাগ করবার এবং সার্বভৌম বাংলার প্রস্তাবকে অগ্রাহ্য করার পিছনে তো ঐ একই যুক্তি কার্যকর ছিল। এ কথা অবশ্যই ঠিক যে ঐ প্রদেশ দুটিকে ভাগ করবার এবং সার্বভৌম বাংলা গঠন করার কথা যখন উঠেছিল তখন জিন্না এবং মুসলিম লীগের প্ররোচনায় সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ঘনীভূত হয়ে বিস্ফোরণের রূপ নিয়েছিল। পরস্পরের প্রতি বিশ্বাস তখন অন্তর্হিত। জিন্নার কাছে

করেছিলেন। পাঞ্জাবে যখন নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তখন মুসলিম লীগের নির্বাচনী ইস্তেহার গঙ্গাধর অধিকারী রচনা করেছিলেন। জিন্না সেটির সামান্যই সংশোধন করেছিলেন।[৮৯] আর রাজাজীর ফরমুলাকে সামনে রেখে যখন গান্ধী-জিন্না আলোচনা চলছিল তখন কমিউনিস্ট পার্টির সম্পাদক পি. সি. জোশী বলেছিলেন যে ভারতবর্ষ গঠিত হয়েছে অনেকগুলি জাতির পরিবারদের নিয়ে (family of nationalists)[৯০]

একটিই অস্ত্র ছিল। যে-বিভেদ অনেক দিনের, অনেক পাপের ফলে সৃষ্টি হয়েছিল জিন্না তাকে দূর করতে চেষ্টা না করে তাকেই তিনি অস্ত্ররূপে ব্যবহার করেছিলেন। সেদিক থেকে তিনি সার্থক হয়েছিলেন। অখণ্ড ভারতবর্ষে ধর্মকে জাতিরূপে তুলে ধরা তাঁর সার্থকতার সোপান। অবশ্য তাঁর জাতিতত্ত্বও টিকে থাকেনি। স্বতন্ত্র রাষ্ট্ররূপে বাংলাদেশের আত্মপ্রকাশ প্রমাণ করে দিয়েছে যে ধর্ম দিয়ে জাতিকে বেঁধে রাখা যায় না।

জিন্নার দ্বি-জাতিতত্ত্বকে গান্ধীজী সমর্থন করতে পারেননি। কেন, তার উল্লেখ করে ১৯৪০ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর তিনি জিন্নাকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন : "ইতিহাসের কোথাও আমি এমন ঘটনা পাই না যেখানে ধর্মান্তরিত ব্যক্তিরা এবং তাদের বংশধররা তাদের পিতৃপুরুষদের থেকে স্বতন্ত্র একটি জাতি বলে দাবি করেছেন। ইসলামের আসবার আগে যদি ভারতবাসী একটি জাতি বলে পরিগণিত হয়ে থাকে তবে তাদের সন্তানদের একটি বড় অংশ ধর্মান্তরিত হলেও একটি জাতিই থাকবে।"*

কয়েক দিন পরেই জিন্না এর উত্তর দিয়েছিলেন : "আপনি কি বুঝতে পারছেন না যে আমরা একটি জাতিরূপে আত্মনিয়ন্ত্রণের দাবি তুলেছি। একটি আঞ্চলিক ইউনিটের জন্য তা চাইনি। মুসলিম জাতিরূপে আমাদের এই দাবি করার অধিকার আছে এবং এটি আমাদের জন্মগত অধিকার। আর আপনি এই ভুল ধারণা নিয়ে পরিশ্রম করছেন যে 'আত্মনিয়ন্ত্রণ' অঞ্চল ভিত্তিতে হতে পারে। কিন্তু এই রকম দাবি করা হয়নি এবং তাকে ব্যাখ্যাও করা হয়নি।"[৯২]

এই পত্রালাপ হয়েছিল গান্ধী-জিন্না আলোচনার সময়। গান্ধীজীর 'ভুল ধারণা' দূর করতে গিয়ে জিন্না যে কথাগুলি বলেছিলেন সেইগুলিই ছিল গান্ধীজীর কাছে সঠিক ভূমিকা। তিনি সর্বব্যাপী কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের পরিবর্তে প্রাদেশিক আত্মনিয়ন্ত্রণ চেয়েছিলেন। কিন্তু কর্তৃত্বের এই বিন্যাসকে তিনি দ্বি-জাতি তত্ত্বের নীতি দিয়ে বাঁধতে চাননি। জিন্নার দাবি ছিল সেইটিই। তাঁর কাছে দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত ছাড়া আত্মনিয়ন্ত্রণ অর্থহীন ছিল। অথচ জিন্নার মধ্যেও ছিল স্ব-বিরোধিতা। পাঞ্জাব এবং বাংলাকে ভাগ করার বিরোধিতা করতে গিয়ে তিনি মাউন্টবেটেনকে বলেছিলেন : "পাঞ্জাবীরা হল একটি জাতি। বাঙালীরাও একটি জাতি। একজন মানুষ প্রথমে পাঞ্জাবী অথবা বাঙালী। তারপরে সে একজন হিন্দু অথবা মুসলমান।" মাউন্টবেটেন এর উত্তরে বলেছিলেন—আমি আপনার সঙ্গে একমত। একজন মানুষ একজন মুসলমান অথবা হিন্দু হবার আগে সে একজন পাঞ্জাবী বা বাঙালী নয়। সে একজন ভারতীয়।"[৯৩] জিন্না সেদিন নিজের যুক্তির জালে আটকে পড়েছিলেন।

কিন্তু তিনি পরাস্ত হবার মানুষ ছিলেন না। যুক্তির চেয়ে আবেগকেই তিনি বেশি প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। পাকিস্তানের দাবিতে তিনি ছিলেন অটল। তাঁর দাবির সমর্থনে ছিলেন তাঁর অনুগামীরা, যাঁদের কাছেও যুক্তির চেয়ে আবেগটাই ছিল বড়। আর ছিলেন বিদেশী সরকারের কর্তাব্যক্তিরা। তাঁদের কাছে যুক্তিও নয়, আবেগও নয়, তাঁদের কাছে বড় ছিল সাম্রাজ্যবাদীদের স্বার্থ। এই দুটি শক্তিই ছিল যেন জিন্নার দুটি হাত—যে হাত দিয়ে তিনি দেশের অখণ্ডতাকে ভাঙতে চেয়েছিলেন। ১৯৩৮ সালে তিনি যখন বলেছিলেন যে

---

* আসলে জাতি পরিচয়ের কোন অপরিবর্তনীয় নীতি নেই। মানুষ নিজের সুবিধা অনুসারে দেশের সীমা নির্ধারণ করে এবং তার দ্বারাই জাতি পরিচিত হয়। দেশ স্বাধীন হবার আগে অখণ্ড ভারতবর্ষের সকল অধিবাসীই ভারতীয় জাতি বলে চিহ্নিত হত। দেশ স্বাধীন হবার পর পূর্ববঙ্গের মানুষরা পাকিস্তানী হয়েছিলেন। আর বাংলাদেশ জন্ম নেবার পর তাঁরা হয়েছেন বাংলাদেশী। অর্থাৎ প্রায় চল্লিশ বছরের মধ্যে কয়েক কোটি মানুষের তিনবার জাত বদলেছে।

রাজনীতি হল শক্তি এবং সেই শক্তি প্রদর্শনের জন্য মুসলমান জনতাকে ডাক দিয়েছিলেন তখন গান্ধীজী জিন্নাকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন যে এই ধরনের ডাক দেবার অর্থ যুদ্ধঘোষণা, জিন্না কি সেই আগের জাতীয়তাবাদী মানুষ নন। উত্তরে জিন্না জানিয়েছিলেন যে তাঁর ডাক হল আত্মরক্ষার ঘোষণা। আর জাতীয়তাবাদ কারও একার (monopoly) জিনিস নয়।[১৪] আর কে না জানে যে যুদ্ধশাস্ত্রে আক্রমণকেই আত্মরক্ষার শ্রেষ্ঠ পন্থা বলে গণ্য করা হয়ে থাকে? জিন্না কি তারই জন্য রণভূমি তৈরি করে রাখছিলেন?

স্বাধীনতা এবং আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার—এই দুটিকে জিন্না এবং গান্ধীজী দুটি ভিন্ন কোণ থেকে দেখেছিলেন। আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার মেনে নিয়ে গান্ধীজী নিজের শর্তে দেশবিভাগ কিছুটা স্বীকার করেছিলেন। ১৯৪৪-এর ২৪শে সেপ্টেম্বর একটি চিঠিতে গান্ধীজী জিন্নাকে লিখেছিলেন: "সাধারণভাবে আপনার মত মেনে না নিয়েও আমি আমার মতানুসারে এবং নিম্নলিখিত শর্তে কংগ্রেস এবং দেশকে মুসলিম লীগের ১৯৪০ সালের প্রস্তাবে উল্লেখিত দেশবিভাগের দাবি মেনে নিতে পরামর্শ দিতে পারি। শর্তটি হল—কংগ্রেস এবং লীগের অনুমোদিত একটি কমিশন এলাকাগুলিকে চিহ্নিত করবে। এইভাবে চিহ্নিত এলাকাগুলির অধিবাসীদের মতামত সেইসব এলাকার বয়স্ক জনগণের ভোটের দ্বারা অথবা অনুরূপ কোন পদ্ধতির দ্বারা জেনে নেওয়া হবে। যদি আলাদা হওয়ার অনুকূলে মত জানা যায় তা হলে ভারতবর্ষ বিদেশী শাসন থেকে মুক্ত হবার পর যত তাড়াতাড়ি সম্ভব সেই এলাকাগুলি একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠন করবে এবং তার ফলে দুটি সার্বভৌম স্বাধীন রাষ্ট্র গঠিত হবে। পৃথক হয়ে যাবার শর্তে এ কথাও বলা থাকবে যে পররাষ্ট্র, দেশরক্ষা, শুল্ক, বাণিজ্য প্রভৃতি বিষয়গুলি উভয় পক্ষের মধ্যে সাধারণ বিষয় বলে পরিগণিত হবে।" জিন্না এই শর্তে রাজি হননি। তা হওয়া তাঁর পক্ষে সম্ভবও ছিল না। তার কারণ, প্রথমত, গান্ধীজী একটি 'কনফেডারেশনের' মধ্যে দুটি রাষ্ট্রকে যুক্ত করতে চেয়েছিলেন। জিন্না এতে সম্মত ছিলেন না। দ্বিতীয়ত, দেশ স্বাধীন হবার পর এবং গণভোটের মাধ্যমে দুটি রাষ্ট্র গঠনের কথা বলা হয়েছিল। জিন্নার এতে সংশয় ছিল। এবং তৃতীয়ত, উল্লেখিত শর্তে দ্বি-জাতি তত্ত্বকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়নি। এতে জিন্নার নেতৃত্ব ক্ষুণ্ণ হয়েছিল। এই কারণেই গান্ধীজীর চিঠি পাবার পরের দিন জিন্না অভিযোগ করে উত্তরে লিখেছিলেন যে গান্ধীজী দ্বি-জাতি তত্ত্ব, মুসলমানদের আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার এবং দুটি অঞ্চল নিয়ে গঠিত পাকিস্তানের দাবি মেনে নেননি। গান্ধীজী জিন্নাকে এই প্রতিশ্রুতিও দিয়েছিলেন যে কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাব তাঁদের মধ্যে একটি মীমাংসায় পৌঁছতে প্রতিবন্ধক হবে না। জিন্না তাতেও রাজি হননি। তিনি বলেছিলেন যে আগস্ট প্রস্তাবে মুসলিম লীগের আদর্শের বিরোধিতা করা হয়েছিল। তা ছাড়া আর একটি প্রস্তাবেও* কংগ্রেস মুসলিম লীগের আদর্শের বিরোধিতা করেছে। সুতরাং যতক্ষণ পর্যন্ত এই প্রস্তাব বজায় থাকছে ততক্ষণ দেশবিভাগের উপর কোন মীমাংসায় আসা যায় না। জিন্না আরও অভিযোগ করে গান্ধীজীকে জানিয়েছিলেন যে 'ভারতবর্ষকে পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানে বিভক্ত করার বিষয়টি আপনার মুখের কথা, অন্তরের কথা নয়।'[১৫] জিন্নার অভিযোগ সম্পূর্ণ ভুল ছিল না। গান্ধীজী মন থেকে দেশের বিভাজন মানতেন না।

---

* ১৯৪২ সালের মে মাসে অর্থাৎ আগস্ট প্রস্তাব গ্রহণের আগেই কংগ্রেসের একটি প্রস্তাবে বলা হয়েছিল: "অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি মনে করে যে ভারতবর্ষের ফেডারেল রাষ্ট্র থেকে কোন করদ রাজ্য (component) বা কোন এলাকাকে বেরিয়ে গিয়ে ভারতবর্ষের সংহতি নষ্ট করার স্বাধীনতা দেবার প্রস্তাব বিভিন্ন রাজ্য ও প্রদেশগুলির জনগণের এবং সমগ্র ভারতবর্ষের স্বাধীনতার পরিপন্থী। সুতরাং কংগ্রেস এই রকম প্রস্তাবে সম্মত হতে পারে না।

তিনি পরিস্থিতিকেই মেনে নিতে চেয়েছিলেন। এইখানেই জিন্নার সংশয় ছিল। তিনি গান্ধীজী এবং কংগ্রেসের উপর ভরসা করতে পারেননি। ইংরেজরাই ছিলেন তাঁর ভরসার স্থল। এই মানসিকতা গান্ধী-জিন্না আলোচনাকে সফল হতে দেয়নি। আর এইজন্যই গান্ধীজীকে বলতে হয়েছিল যে জিন্না পথ আটকে নেই। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টই তাঁকে স্বাধীনতাকে অস্বীকার করবার অস্ত্ররূপে ব্যবহার করছে। আর জিন্নাও বলেছিলেন যে গান্ধীজী যা দিতে চেয়েছেন তা একটি বিকলাঙ্গ, কীটদষ্ট পাকিস্তান।

জিন্না এবং গান্ধীজী পরস্পরের সম্পর্কে যে অভিমত প্রকাশ করেছিলেন তার মধ্যে ভুল বিশেষ ছিল না। জিন্না তাঁর দাবিকে যে ভূমিকায় দাঁড় করিয়েছিলেন সেখানে দেশবিভাগকে দেশের স্বাধীনতার সঙ্গে অন্বিত করা তাঁর পক্ষে সম্ভব ছিল না। অন্যদিকে জিন্না সম্পর্কে গান্ধীজীর অভিযোগের সত্যতা প্রমাণিত হয়েছিল যখন তিনি ছেঁটে ফেলা পাকিস্তান মেনে নিতে চার্চিলের পরামর্শে রাজি হয়ে যান। তারাচাঁদ লিখেছেন যে ২রা জুন ১৯৪৭ মাউন্টবেটেন যখন তাঁর পরিকল্পনা বিভিন্ন দলের নেতাদের সামনে উপস্থিত করেছিলেন তখন নেহরু তাতে সম্পূর্ণ একমত না হয়েও তাঁর সমর্থন জানিয়েছিলেন। আর জিন্না চেয়েছিলেন লীগের অধিবেশন পর্যন্ত অপেক্ষা করতে। সেই দিনই গভীর রাতে মাউন্টবেটেন জিন্নাকে চার্চিলের লেখা একটি চিঠি দিয়েছিলেন। তাতে লেখা ছিল যে জিন্না যদি এই পরিকল্পনা সমর্থন না করেন তা হলে তা পাকিস্তানের স্বপ্নকে ধূলিসাৎ করে দেবে। জিন্না এই চিঠি দেখে ছেঁটে ফেলা পাকিস্তানেই রাজি হয়ে গিয়েছিলেন।[১৬] ক্যাম্বেল জনসনও তাঁর ৩১-৫-৪৭ তারিখের দিনলিপিতে লিখেছেন : "জিন্নার সঙ্গে আচরণে কী মনোভাব নিয়ে চলতে হবে সে সম্বন্ধে মাউন্টবেটেন তাঁর ধারণা স্পষ্ট করে নিয়েছেন। জিন্নার 'করিডর' দাবিতে মাউন্টবেটেন ব্যক্তিগতভাবে কীরকম বিড়ম্বিত ও বিব্রত বোধ করছেন, সেই কথা উল্লেখ করে তিনি বললেন যে আর রাগ করে নয়, বরং দুঃখের সঙ্গেই জিন্নাকে স্বীকার করে নিয়ে তাঁকে প্রত্যেক কাজে ও আলোচনায় অগ্রসর হতে হবে।" তিনি আরও লিখেছেন : "মাউন্টবেটেন অবশ্য লন্ডন থেকেই একটি অস্ত্র নিয়ে এসেছেন, যেটা তিনি জিন্নার বিরোধিতার বিরুদ্ধে সময় বুঝে এবং প্রয়োজন বুঝে ইচ্ছামতো কাজে লাগাতে পারবেন। অস্ত্রটি হল জিন্নার কাছে লেখা চার্চিলের একটি চিঠি। চিঠিতে জিন্নার উদ্দেশ্যে চার্চিলের একটি অত্যন্ত অর্থগূঢ় অনুরোধ-বাণী উল্লেখিত আছে। চার্চিল জিন্নাকে জানিয়েছেন যে মাউন্টবেটেনের প্রস্তাব সমর্থন ও গ্রহণ করা জিন্নার পক্ষে এখন বস্তুত জীবন-মরণ সমস্যার সমাধানের মতোই ব্যাপার।"[১৭] চিঠি দেখিয়েই মাউন্টবেটেন জিন্নাকে জয় করেছিলেন।

মাউন্টবেটেন জানিয়েছেন যে চার্চিল তাঁকে বলেছিলেন : "আমি তোমাকে একটি কথা বলতে চাই।...যে কোন ব্যবস্থাই তুমি করো না কেন তুমি দেখ যেন তার দ্বারা একজন মুসলমানের মাথার একটি চুলেরও ক্ষতি না হয়।"[১৮] জিন্না যে দারুণভাবে অসুস্থ ছিলেন এ কথা ওয়াভেলের জানা ছিল। কিন্তু মাউন্টবেটেনের কাছে সেকথা তিনি প্রকাশ করেননি।* ওয়াভেল ছিলেন ইংলন্ডের রক্ষণশীল দলের অনুগত। আর মাউন্টবেটেন

* ওয়াভেল তাঁর ১০-১-৪৭ এবং ২৮-২-৪৭ তারিখের দিনলিপিতে লিখেছেন যে জিন্না একজন অসুস্থ ব্যক্তি। জিন্নার দুটি ফুসফুসই যক্ষায় আক্রান্ত হয়েছিল। ফুসফুসের এক্স-রে ডাঃ জে. আর. প্যাটেলের কাছে গোপনে রক্ষিত ছিল। তিনি জানতেন যে জিন্না যেভাবে আক্রান্ত হয়েছিলেন তাতে দু-তিন বছরের বেশি তাঁর বেঁচে থাকার সম্ভাবনা নেই। ডাক্তার তাঁকে পূর্ণ বিশ্রাম, ধূমপান বন্ধ করা প্রভৃতি কয়েকটি নির্দেশ দিয়েছিলেন। জিন্না রাজি হননি। জিন্নার মৃত্যু ঘনিয়ে আসছে এ কথা মাউন্টবেটেন যদি জানতেন তা হলে ইতিহাস অন্য রকম লিখিত হত। ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তরের একমাত্র বাধারূপী জিন্নার সঙ্গে তিনি অন্যরকম ব্যবহার করতেন।[১৯]

ছিলেন শ্রমিক দলের মনোনীত ভাইসরয়। জিন্নার চার্চিলের প্রতি নির্ভরতা এবং ওয়াভেল প্রভৃতি রক্ষণশীল দলের প্রতিনিধিদের জিন্নাকে ঢাল হিসেবে সামনে রেখে সাম্রাজ্যবাদীদের আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার প্রয়াসের মধ্যে একটি যোগসূত্র খুঁজে পাওয়া অসম্ভব নয়। ভারতবর্ষকে ঐক্যবদ্ধ হতে না দিয়ে তাকে দুর্বল করে দেওয়াই ছিল এই গ্রন্থীবন্ধনের মূল লক্ষ্য। মাউন্টবেটেন অনুভব করেছিলেন যে ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষ গঠনের প্রচণ্ড বাধা হচ্ছেন জিন্না। মাউন্টবেটেন এটিও বুঝতে পেরেছিলেন যে সমস্যার জট খোলার চাবিকাঠি ছিল জিন্নার কাছে। গান্ধীজী এবং নেহরুর কাছে তা নেই। তবে প্যাটেলও পারেন এই সমস্যার জট খুলতে।[১০০]

মাউন্টবেটেন যে সমস্যার সম্মুখীন হয়েছিলেন তা হল, ক্ষমতা হস্তান্তরের পদ্ধতি এবং প্রতিক্রিয়া কী হবে? স্বাধীনতা অর্জন করতে কে কতটা ছাড়তে রাজি হবেন তা নিয়ে। প্যাটেল মুসলিমপ্রধান অঞ্চল ছাড়তে রাজি ছিলেন। জিন্নাও শেষ পর্যন্ত রাজি হয়েছিলেন কাটা ছেঁড়া পাকিস্তান নিতে। এক দিক থেকে এটিও তাঁর বিজয়। কেননা সাম্প্রদায়িকতাকে অবলম্বন করে, দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতেই তো দেশ খণ্ডিত হয়েছিল। কিন্তু মজা হল সাফল্যের শিখরে চড়েই জিন্না তাঁর সযত্নে লালিত তত্ত্ব এবং আদর্শের ভিত নাড়িয়ে দিয়েছিলেন। সাম্প্রদায়িকতার যে আবরণে তিনি নিজেকে আবৃত করে এত দিন লড়াই করে এসেছিলেন পাকিস্তান পেয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গেই তিনি তাকে নস্যাৎ করে দিয়েছিলেন। দিল্লী ছেড়ে তিনি যখন নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে যাচ্ছিলেন তখন ইসকিন্দার মির্জা তাঁকে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, পাকিস্তান কি এক ঐস্লামিক রাজ্য হবে? জিন্না উত্তর দিয়েছিলেন, 'দূর আমি একটি আধুনিক রাষ্ট্র গঠন করতে চলেছি।' পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মনোনীত হয়ে ১৯৪৭ সালের ১১ই আগস্ট প্রদত্ত ভাষণে তিনি বলেছিলেন যে 'জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের জন্যই আমাদের কাজ করতে হবে। সময়ের অগ্রগতির সঙ্গে সঙ্গে সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ, হিন্দু সম্প্রদায় বা মুসলমান সম্প্রদায়ের প্রশ্নটি অন্তর্হিত হয়ে যাবে। কোন ধর্মের, কোন বর্ণের, কোন জাতির (creed) মানুষ তা নিয়ে রাষ্ট্রের কাজকর্মের কোন সম্পর্ক থাকবে না।"

খালিকুজ্জমান মনে করেছেন যে এই বক্তৃতার মধ্য দিয়েই জিন্না তাঁর নিজের গড়া দ্বি-জাতি তত্ত্বের বিসর্জন করে দিয়েছিলেন।[১০১]

গান্ধী : যাহা পাই তাহা চাই না

স্টাফোর্ড ক্রিপস বিশ্বাস করতেন যে তাঁর ১৯৪২ সালের দৌত্য গান্ধীজীই বানচাল করে দিয়েছিলেন। তাই মন্ত্রীমিশনের অন্যতম সদস্যরূপে তিনি যখন ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয় নিয়ে আলোচনা করার জন্য আবার ভারতবর্ষে এসেছিলেন তখন তিনি প্রথম থেকেই গান্ধীজীর সঙ্গে সরকারী এবং বেসরকারীভাবে যোগাযোগ রক্ষা করতে চেষ্টা করেন। গান্ধীজীর সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক বজায় রাখতে তিনি আগ্রহী ছিলেন। মন্ত্রীমিশনের দিক থেকে এই প্রয়াস ওয়াভেলের ভাল লাগেনি। মন্ত্রীমিশন গান্ধীজীর প্রতি অতিমাত্রায় সশ্রদ্ধ আচরণ করছেন মনে করে ওয়াভেল ভীত হয়েছিলেন। এ সম্পর্কে নিজের মত স্পষ্টাস্পষ্টি ব্যক্ত করে তিনি লিখেছিলেন : "আমার মনে হয়েছিল যে একটি ধুতি ছাড়া উলঙ্গ গান্ধীর সঙ্গে, যাঁকে দেখতে স্বাস্থ্যবান বলেই মনে হত তাঁর সঙ্গে দেখা করাটাই একটি মর্মান্তিক ব্যাপার। এই হিংসুটে (malevolent) বৃদ্ধ রাজনীতিকের

সঙ্গে ভারত সচিব তাঁর স্বাভাবিক যত্নহীন উপচিকীর্ষা দিয়ে কথাবার্তা শুরু করেছিলেন। আমি এই বিষয়ে নিশ্চিত যে গান্ধী ধর্মের ভানকারী কথাবার্তা যতই বলে থাকুন না কেন তাঁর গঠনের মধ্যে কোন নমনীয়তা ছিল না।"[১০২]

ওয়াভেল অন্যত্র বলেছিলেন : "তিনি (গান্ধীজী) যতই দুমুখো হয়ে থাকুন না কেন' একটি বিষয়ে তিনি ছিলেন একাগ্রচিত্ত। গত চল্লিশ বছরে তিনি এই দিকটির কোন পরিবর্তন করেননি। আর এটি হল ভারতবর্ষ থেকে ঘৃণিত ব্রিটিশ প্রভাবের অবসান। সম্মেলন (সিমলা) শুরু হবার আগেই এই কূট, বকধার্মিক বৃদ্ধ রাজনীতিকের প্রতি আমার অবিশ্বাস ছিল গভীর ; এখন তা গভীরতর হয়েছে।"[১০৩]

এই কথাগুলির মধ্য দিয়ে ওয়াভেল গান্ধীজীর প্রতি তাঁর ক্রোধ এবং ঘৃণা প্রকাশ করেছেন। তা সত্ত্বেও তাঁর কথার মধ্য দিয়ে গান্ধী-চরিত্রের একটি সত্য উদ্‌ভাসিত হয়েছে। একজন রক্ষণশীল সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রপ্রধানরূপে তিনি মনে করেছিলেন যে গান্ধীজী তাঁর চল্লিশ বছরের কর্মজীবনে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবি থেকে কোন দিন সরে আসেননি। আর এই দাবি উত্থাপনে তাঁর মধ্যে বিন্দুমাত্র নমনীয়তা ছিল না। নেতাজী সুভাষচন্দ্র গান্ধী-পথের পথিক ছিলেন না। গান্ধীজীর প্রতি তাঁর সশ্রদ্ধ বিরোধিতার মনোভাব ছিল এবং তা তিনি অকপটে প্রকাশ করতেন। গান্ধী-আরউইন চুক্তির পর গান্ধীজী যখন গোলটেবিল বৈঠকে যোগদান করে কিছু না পেয়ে শূন্য হাতে ফিরে আসেন তখন তাঁর ব্যর্থতার কারণ বলতে গিয়ে সুভাষচন্দ্র বলেছিলেন যে গান্ধীজী ইংলন্ডে একটি ব্যক্তিতে দুটি ভূমিকায় কাজ করেছেন—রাজনৈতিক নেতারূপে এবং বিশ্ব-শিক্ষকরূপে। কোথাও কোথাও তিনি নিজেকে এমনভাবে পরিচালিত করেছিলেন যাতে মনে হয়েছিল যে তিনি একজন রাজনৈতিক নেতা, এসেছেন শত্রুর সঙ্গে সমঝোতা করতে। আবার কখন মনে হয়েছে যে তিনি এসেছেন একজন শিক্ষক হয়ে অহিংসা এবং বিশ্বশান্তির নতুন বিশ্বাস প্রচার করতে।[১০৪]

সমালোচনার ভঙ্গীতে বলা হলেও সুভাষচন্দ্রের এই কথা গান্ধী-চরিত্রের একটি উল্লেখযোগ্য দিক তুলে ধরেছিল। স্বাধীনতার দাবিতে তিনি যেমন ছিলেন অটল তেমনি তার জন্য ন্যায়-নীতিকেও তিনি বিসর্জন দিতে প্রস্তুত ছিলেন না। দেশবিভাগের ক্ষেত্রেও গান্ধীজী এই ভূমিকা পালন করতে চেষ্টা করেছিলেন। তাতে পরিপূর্ণ সাফল্য তিনি অর্জন করতে পেরেছিলেন কিনা তা তর্কাতীত নয়।

প্রকৃতপক্ষে এই ভূমিকায় দাঁড়িয়েই তিনি ক্রিপস প্রস্তাব সমর্থন করতে পারেননি। প্রধানত তিনটি কারণে গান্ধীজী ক্রিপস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেছিলেন। সেই কারণগুলি হল : (১) প্রস্তাবটিতে যুদ্ধোত্তর পরিকল্পনার কথা বলা হয়েছিল, তাৎকালিক কোন ব্যবস্থার প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয়নি ; (২) প্রস্তাবটিতে চিরস্থায়ী দেশবিভাগের কথা বলা হয়েছিল, যা ভারতবর্ষের স্বাধীনতার ক্ষেত্রে প্রতিবন্ধক হয়ে উঠবে ; এবং (৩) দেশীয় রাজ্যগুলিকে ব্যাপকভাবে সংহতির বিরুদ্ধে উপস্থাপিত করার প্রয়াস এতে হয়েছিল।[১০৫] গান্ধীজীর ক্রিপস প্রস্তাবের এই মূল্যায়ন থেকে যা বোঝা যায় তা হল তিনি গোঁজামিল দিয়ে পরশাসনের অবসান চাননি। তিনি যেমন বলেছিলেন যে কোন দেশের ক্ষতি করে ভারতবর্ষের স্বাধীনতা তিনি চান না তেমনি ভবিষ্যতে স্বাধীনতা পাবার মেকী প্রতিশ্রুতির বিনিময়ে ইংরেজকে যুদ্ধে সহযোগিতা করতেও তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। প্রথম বিশ্বযুদ্ধে ইংরেজদের কথা বিশ্বাস করার তিক্ত অভিজ্ঞতা তিনি ভুলে যাননি। এইভাবে তাঁর কর্মকাণ্ডের মধ্যে যে আপাত স্ব-বিরোধিতা লক্ষ্য করা যায় তার কারণ হল এই যে তিনি

ভারতবর্ষের স্বাধীনতা এবং স্বাধীনতা সংগ্রামের সঙ্গে এক উচ্চতর আদর্শকে সমীকৃত করেছিলেন। তাই দেখা যায় যে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার স্বীকার করে নিয়েও তিনি দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে পাকিস্তানের দাবি যথার্থ বলে মেনে নিতে পারেননি। আবার বয়স্ক ভোটাধিকারের ভিত্তিতে নির্বাচিত হয়ে মুসলিম প্রতিনিধিরা যদি আত্মনিয়ন্ত্রণ চান তা মেনে নিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন।[১০৬] নির্দিষ্ট অঞ্চলের হিন্দু-মুসলমানের মিলিত ভোটে যদি বিচ্ছিন্ন হবার দাবি স্বীকৃত হয় তবে তা মেনে নিতে গান্ধীজী ছিলেন প্রস্তুত।

১৯৪৪ সালের ১২ই আগস্ট মুন্সিকে যে চিঠি তিনি দিয়েছিলেন তাতে বলেছিলেন : "অপরে যদি আমাকে বুঝতে না পারে তাতে আমার কিছু আসে যায় না। যারা আমাকে জানে তুমি তাদের একজন। আমি এই বিষয়ে নিশ্চিত যে তুমি জান, আমি নীতিগতভাবে অখণ্ড ভারতবর্ষ মেনে নিলেও আমি হলাম কংগ্রেসের আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির উদ্গাতা। একজন অহিংসায় বিশ্বাসী হয়ে ভারতবর্ষের ঐক্য আমি তখনই যুক্তি দিয়ে সমর্থন করতে পারব যখন আমি এর প্রত্যেকটি অংশের স্বাধীনতা স্বীকার করব। যে মুহূর্তে আমি অনুভব করেছিলাম যে জিন্নার কল্পিত পাকিস্তান একটি পাপ সেই মুহূর্তেই আমি কংগ্রেসের আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতি বিশ্বাস করতে শুরু করি। (The moment I felt that Pakistan of Jinnah's imagination was sinful. I started believing in the Congress principle of self-determination.)[১০৭]

কথাটির মধ্যে কি একটু ভুল আছে? গান্ধীজী নিজেই বলেছিলেন যে তিনিই হলেন কংগ্রেসের আত্মনিয়ন্ত্রণ নীতির উদ্গাতা। আর সেটি হয়েছিল জিন্নার দেশবিভাগের দাবি তোলার অনেক আগে। বস্তুত মুন্সিকে চিঠিটি লেখা হয়েছিল গান্ধী-জিন্না আলোচনার প্রসঙ্গক্রমে। অখণ্ড ভারতবর্ষে বিশ্বাসী মুন্সির মনে হয়েছিল গান্ধীজী কি মুসলমানদের স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবি মেনে নিতে চলেছেন! গান্ধীজী তাঁর কল্পিত স্বরাজ ব্যবস্থায় কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বকে ন্যূনতম করতে চেয়েছিলেন। সেখানে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের প্রস্তাব থাকলেও আঞ্চলিকতাবাদের এবং সাম্প্রদায়িকতার কথা ভাবা হয়নি। জিন্নার পাকিস্তানের দাবি ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণের দৃষ্টিতে করা হয়নি। তার উৎস ছিল সাম্প্রদায়িকতার বোধ। মনে হয় গান্ধীজীর মনে এই সংশয়ই জাগ্রত হয়েছিল। ক্ষমতাকে আত্মনিয়ন্ত্রণের নীতিতে নিচের স্তরে নামিয়ে আনতে হবে অথচ তা সাম্প্রদায়িকতার দোষে দুষ্ট হবে না। গান্ধী-জিন্না আলোচনার মধ্য দিয়ে গান্ধীজী এরই উত্তর খুঁজতে চেষ্টা করেছিলেন। মুন্সিকে লেখা চিঠিতেও এই কথাই তিনি বলতে চেয়েছিলেন। পাকিস্তানের প্রস্তাব সম্পর্কে 'হরিজন' পত্রিকাতেও তিনি লিখেছিলেন : "আট কোটি মুসলমানকে অবশিষ্ট ভারতবর্ষের—সেই ভারতবর্ষ যত শক্তিশালী সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রতিনিধিত্ব করুক না কেন তার প্রতি অনুগত হতে বাধ্য করবে এমন কোন অহিংস পদ্ধতি আমার জানা নেই। অবশিষ্ট ভারতবর্ষের মতো মুসলমানদেরও আত্মনিয়ন্ত্রণের সমান অধিকার আছে। আমরা এখন যৌথ পরিবারে বাস করছি। যে কোন সদস্যই আলাদা হয়ে যাবার দাবি করতে পারে।...কিন্তু আমি এ কথা বিশ্বাস করি না যে সত্যসত্যই যখন সিদ্ধান্ত নেবার সময় আসবে তখন মুসলমানরা দেশকে খণ্ডিত করতে চাইবেন।"[১০৮] গান্ধীজীর আশা পূর্ণ হয়নি। সময় যখন এসেছিল তখন মুসলমানদের বড় অংশ দেশখণ্ডনের দাবি থেকে সরে আসেননি। ফলে দেশ খণ্ডিত হয়েছে। সেই পরিস্থিতি পরে আলোচিত হবে। তবে গান্ধীজীর মনের যে সংশয়ের কথা উপরে আলোচনা করা হয়েছে তার যাথার্থ্য 'হরিজনে' লেখা গান্ধীজীর এই প্রবন্ধ প্রমাণ করে দেয়।

যেভাবে দেশবিভাগের দাবি উত্থিত হয়েছিল তাকে গান্ধীজী সমর্থন করতে পারেননি। তিনি বলেছিলেন : "দেশবিভাগকে আমি বিষের মতো মনে করি। কেননা দেশবিভাগ করাকে আমি পাপ কাজ বলে মনে করি।" তিনি দেশবিভাগকে ক্ষমতার বিকেন্দ্রীকরণ বা আত্মনিয়ন্ত্রণ বলে মনে করেননি। তাঁর ভয় ছিল যে বিদ্বেষের মধ্য দিয়ে যদি পাকিস্তান গঠিত হয় তবে তার উপর বিদেশী প্রভাব থাকবে। অর্থাৎ তাঁর মনে হয়েছিল যে স্বাধীনতার বিনিময়ে যদি পাকিস্তানকে মেনে নিতে হয় তবে সর্বতোভাবে বিদেশী প্রভাব থেকে মুক্ত হওয়া যাবে না। আর তার ফলে যে স্বাধীনতা পাওয়া যাবে তা মিথ্যা হয়ে যাবে। ল্যারি কলিনস এবং ডোমিনিক লেপিয়ার কেন গান্ধীজী পাকিস্তান সমর্থন করতেন না তার কারণ এইভাবে বর্ণনা করেছেন : "গান্ধীজী যে কেবল ভারতীয় ঐক্যের প্রতি এক অতীন্দ্রিয় অনুরাগের জন্যই পাকিস্তানের বিরোধিতা করেছিলেন তা নয়। বহু বছর ধরে গ্রামে বাস করার ফলে দেশের আত্মার প্রতি তাঁর এক সহজাত অনুভূতিই তাঁকে জানিয়েছিল যে দেশবিভাগ মাউন্টবেটেনকে দেওয়া জিন্নার অঙ্গীকারের মতো শল্য চিকিৎসার (Surgical operation) ব্যাপার নয়। এটি হবে পীড়া উদ্রেককারী নরহত্যা (sickening slaughter), যা যে-গ্রামজীবনের সঙ্গে তাঁর একান্ত পরিচয় সেই গ্রামজীবনে বন্ধুকে বন্ধুর বিরুদ্ধে, প্রতিবেশীকে প্রতিবেশীর বিরুদ্ধে, আগন্তুককে আগন্তুকের বিরুদ্ধে লেলিয়ে দেবে। তাদের যে রক্ত ঝরবে তা বহন করে আনবে এক নিয়মচ্যুত অবাঞ্ছিত (abhorrent useless) পরিণাম। উপ-মহাদেশের বিভাজন দুটি বিরোধী অংশ সৃষ্টি করবে যারা পরস্পরের টুঁটি ছিড়ে নেবার জন্য সর্বদা উদ্যত থাকবে। গান্ধীজী বিশ্বাস করেছিলেন যে বহু যুগ ধরে ভারতবর্ষের বংশপরম্পরায় মানুষরা আজ যা করা হচ্ছে তার মূল্য দিতে থাকবে।"[১০৯]

যখন বাংলা ও পাঞ্জাবকে ভাগ করবার কথা অনেক দূর এগিয়ে গিয়েছিল তখনও গান্ধীজী এক প্রশ্নের উত্তরে বলেছিলেন : "পাকিস্তানের বিকল্প হচ্ছে অবিভক্ত ভারতবর্ষ। এর মধ্যবর্তী কোন কিছু নেই। আপনারা একবার যদি কোন প্রদেশকে ভাগ করার নীতিকে মেনে নেন তা হলে আপনারা বিপদের সমুদ্রে গিয়ে পড়বেন। অবিভক্ত ভারতবর্ষের নীতিতে যদি আপনারা অটল থাকেন তা হলে আপনারা সব বিপদকেই নিয়ন্ত্রিত করতে পারবেন।"[১১০]

গান্ধীজীর এই কথাগুলি থেকে যা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হল এই যে গান্ধীজী দেশবিভাগের বিরোধিতা কোন রাজনৈতিক উদ্দেশ্যসাধনের দৃষ্টিতে করেননি। তাঁর ভূমিকা ছিল একজন আদর্শ শিক্ষকের, যিনি আপন আচরণের মধ্য দিয়ে মানুষের মনে শুভবুদ্ধিকে জাগ্রত ও ক্রিয়াশীল রাখতে চান। কিন্তু বাস্তব পরিস্থিতিকেও তিনি উপেক্ষা করতে পারেননি। মুসলমান সমাজের একটি বড় অংশ মুসলিম লীগের অনুগামী। আর মুসলিম লীগের অবিসংবাদী নেতা হলেন জিন্না। সুতরাং জিন্নাকে সমর্থন করতে না পারলেও তাঁর পক্ষে জিন্নাকে অস্বীকার করা সম্ভব ছিল না। এর জন্য তাঁকে সমধর্মীদের কাছ থেকে কম ধিক্কার শুনতে হয়নি। জিন্নাকে তিনি চিঠিপত্রে সাধারণত কায়েদ-এ-আজম (অর্থাৎ মহান নেতা) বলে সম্বোধন করতেন। অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের সময়ে কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের মধ্যে নামের তালিকা নিয়ে ঐকমত্য না হওয়ায় মন্ত্রীমিশন এবং ওয়াভেল যখন নিজেরাই একটি তালিকা প্রস্তুত করেছিলেন এবং কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তাঁদের পর্ব সিদ্ধান্ত পরিবর্তন করে নিজেদের তালিকায় জাতীয়তাবাদী মুসলমানের নাম যুক্ত না করতে স্বীকৃত হয়েছিলেন তখন গান্ধীজী তাতে বাধা দেন।

জিন্না 'বন্দেমাতরম' কথাটিতে আপত্তি করেছিলেন। গান্ধীজী সেই আপত্তিকেও অগ্রাহ্য করে বলেছিলেন যে 'ভারতমাতাকী জয়' ধ্বনির চেয়ে 'বন্দেমাতরম' তিনি বেশি বরণীয় বলে মনে করেন। কিন্তু জিন্না যে স্বাতন্ত্র্যের দাবি তুলেছিলেন তাকে গান্ধীজী সরাসরি উপেক্ষা করতে পারেননি। এই দ্বিধা তাঁর আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারের স্বীকৃতিজনিত কিনা তা অনুমানসাপেক্ষ। তিনি বলেছিলেন : "দেশবিভাগ অথবা প্রদেশগুলির বিভাজন এবং অনুরূপ বিষয়গুলি সম্পর্কে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত জনগণ ব্রিটিশরা দেশত্যাগ করার পর নেবে।"[১১১] তিনি বলেছিলেন : "আমরা মরুভূমি এবং জলাভূমির দেশে বাস করছি না। আমাদের দেশ ঘনবসতিপূর্ণ এবং (সম্প্রদায় ও সংস্কৃতির ভিত্তিতে) পুনর্বণ্টনের সামান্যতম সম্ভাবনাও দেখতে পাচ্ছি না। সেই দিক থেকে লাহোর প্রস্তাব যেখানে বলছে যে মুসলমানরা যে অঞ্চলে নিশ্চিতভাবে সংখ্যাগরিষ্ঠ সেই অঞ্চলে তাদের একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গড়তে দেওয়া হোক সেখানে তার গুরুত্বকে অস্বীকার করা যায় না। এই বিষয়টি রাজাজীর অথবা আমার ফরমুলার মধ্যে রয়েছে। এই দুটি ফরমুলার মধ্যে খুব বেশি পার্থক্য নেই। কোনরকম গোপনতা না রেখেই তা মেনে নেওয়া হয়েছে। কিন্তু তার অর্থ যদি হয় সম্পূর্ণ স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র তা হলে তাকে আমি এক অবাস্তব কল্পনা বলেই মনে করব। এর অর্থ নিজেদের মধ্যে লড়াই করা (war to the knife)। বিচ্ছেদ হবে নিজেদের মধ্যে, সমগ্র পৃথিবীর সামনে দাঁড়িয়ে ভাগাভাগি হবে না।"[১১২] আরও এগিয়ে গিয়েছিলেন গান্ধীজী। ২৪-৯-৪৪ তারিখে তিনি তো সরাসরি জিন্নাকে জানিয়েছিলেন যে দ্বি-জাতি তত্ত্বকে বাতিল করেও তিনি কয়েকটি শর্তসাপেক্ষে মুসলিম লীগের দেশবিভাগের প্রস্তাব মেনে নিতে রাজি আছেন। এর উল্লেখ আগে করা হয়েছে। গান্ধীজীর প্রস্তাবে অন্যান্য শর্ত ছাড়া এ কথাও ছিল যে লীগ এবং কংগ্রেস যৌথভাবে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার জন্য কাজ করবে। তবে কংগ্রেসের যে কোন প্রত্যক্ষ সংগ্রামে লীগের যোগদান না করার স্বাধীনতা থাকবে।[১১৩]

জিন্না তো স্বাভাবিক কারণেই এই শর্ত মেনে নেননি। তা হলেও এই ঘটনার কার্যকারণ বিশ্লেষণ করার যথেষ্ট অবকাশ আছে। গান্ধীজী যে ধর্মের নামে দেশবিভাগের প্রস্তাবকে মেনে না নিয়েও মুসলমানদের জন্য স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবি স্বীকার করেছিলেন এবং চেয়েছিলেন যে ব্রিটিশরা দেশ ছেড়ে চলে যাবার পর হিন্দু-মুসলমানের যৌথ ভোটে যদি এই দাবি সমর্থিত হয় তবেই তাকে কার্যান্বিত করা যাবে তার কারণ কি এই ছিল যে গান্ধীজী মনে করেছিলেন, ব্রিটিশরা চলে গেলে এই দাবির ধার কমে যাবে এবং জাতীয়তাবাদী মুসলমানদের অতিরিক্ত মুসলমানদের একাংশ হিন্দুদের সঙ্গে মিলিত হয়ে স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের দাবিকে নাকচ করে দেবে ? আর যদি না দেয় তা হলে গণতান্ত্রিক নীতি অনুসারে তাকে মান্য করতে আপত্তি করা যাবে না। আবার পরবর্তী কোন এক সময়ে ঐ একইভাবে বিভক্ত অঞ্চলগুলি মূল ভূখণ্ডের সঙ্গে মিলে যেতে পারবে ! এই রকম অবস্থার সৃষ্টি হলে উভয় দিক থেকেই সাম্প্রদায়িকতার বিষকে প্রশমিত করার প্রয়াস করা হয়তো সম্ভব হবে। মনে করা যেতে পারে যে গান্ধীজীর যেখানে বিশ্ব-শিক্ষকের ভূমিকা সেখান থেকেই তিনি এই শর্তগুলি জিন্নাকে দিয়েছিলেন। এটি ছিল তাঁর সাম্প্রদায়িকতা দূর করার কলা-কৌশল। পক্ষান্তরে, হয়তো এই কথা বুঝতে পেরেই জিন্না গান্ধীজীর দেওয়া শর্তগুলি মানতে রাজি হননি। তাঁর মনে এই ভয় থাকা স্বাভাবিক ছিল যে ব্রিটিশরা চলে গেলে তাঁর পায়ের তলার মাটি সরে যাবে, মুসলমানদের যে অংশ তাঁর নেতৃত্ব মানেন না তাঁরা প্রবল হয়ে উঠবেন এবং সংখ্যালঘুদের অদ্বিতীয় নেতার অবস্থান আর তাঁর থাকবে

না। হিন্দু সাম্প্রদায়িকতাবাদীরা প্রবল হয়ে মুসলমানদের দমিত করবে এমন ভয়ও তাঁর মনে থাকা স্বাভাবিক ছিল। এই অনিশ্চিত ভবিষ্যতের ঝুঁকি নিতে তিনি চাননি। গান্ধীজীর চেয়ে ব্রিটিশ আমলাদের প্রতি তাঁর ভরসা ছিল বেশি। ভারতবর্ষের শাসনকাজের সঙ্গে যুক্ত আমলাদের কাছ থেকে তিনি এই গোপন আশ্বাস পেয়েছিলেন যে কংগ্রেসের সঙ্গে যদি তিনি অসহযোগ চালিয়ে যান তা হলে এবং কংগ্রেসের কোন রকম শর্তে তিনি যদি রাজি না হন তা হলে তাঁরা তাঁকে পাকিস্তান পাইয়ে দেবেন। জিন্না নিজেই এ কথা স্বীকার করেছেন।[১১৪]

আমলারা তাঁদের কথা রেখেছিলেন। ইংলন্ডে যে দলেরই সরকার হোক অথবা ভাইসরয়ের ব্যক্তিগত অভিরুচি যেমনই থাক না কেন অধস্তন ব্রিটিশ আমলারা তাঁদের প্রয়াস চালিয়ে যেতেন। একটি দৃষ্টান্ত দেওয়া যেতে পারে। ক্ষমতা হস্তান্তরের পদ্ধতি কী হবে তা নিয়ে আলোচনা করার জন্য মন্ত্রীমিশন যখন ভারতবর্ষে এসেছিলেন তখন তাঁরা তাঁদের বিশ্বাসমতো আন্তরিকভাবে কিছু করার চেষ্টা করেছিলেন। তবে নিজেদের দিকে ঝোল কতটা টেনে নেওয়া যায় সেই চেষ্টা থেকে তাঁরা বিরত ছিলেন না। গান্ধীজী তাঁদের উপস্থাপিত পরিকল্পনাকে স্বাগত জানিয়েছিলেন। তবে তাঁর ব্যাখ্যা এই ছিল যে প্রস্তাবিত গণপরিষদ বাইরের কোন কর্তৃত্বের কাছ থেকে কোনরকম বাধা না পেয়ে সংবিধান রচনা করার জন্য একটি সার্বভৌম সংগঠন হবে। তার অধিকার থাকবে মন্ত্রীমিশনের যে কোন সুপারিশকে (proposal) বাতিল বা উন্নত করার, মুসলমান এবং অমুসলমানদের মধ্যে যে প্রভেদ সৃষ্টি করা হয়েছে তা বাতিল করবার। উপ-ফেডারেশনের (sub-federation) ধারণাকে বাতিল করার অধিকারও গণপরিষদের থাকবে। সর্বোপরি গৃহীত সিদ্ধান্তগুলিকে এখনই কার্যকর করা হবে। ভবিষ্যতের জন্য ফেলে রাখা হবে না।[১১৫] গান্ধীজী গণপরিষদ সম্পর্কে এই ব্যাখ্যা এই জন্যই দিয়েছিলেন যে পেথিক লরেন্সের একটি চিঠি তাঁর মনে সংশয় জাগিয়ে দিয়েছিল। পেথিক লরেন্স ২১-৫-৪৬ তারিখে একটি চিঠিতে গান্ধীজীকে লিখেছিলেন : "প্রতিনিধিদল বিশেষ করে একটি কথা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে বলেছেন যে, যে-স্বাধীনতা আসবে সেটি নতুন সংবিধান রচনার আগে নয়, পরে।" গান্ধীজী এই চিঠির উত্তরে লিখেছিলেন : "...উত্তরটি শোচনীয়। পুরান সেই আমলাসুলভ গন্ধই এতে পাওয়া গেল। 'সত্যিকারের স্বাধীনতা' বলে যে আওয়াজ তোলা হয়েছে তার তবে কি কোন ভিত্তি নেই ?... আমি ভেবেছিলাম যে গোঁড়া সাম্রাজ্যবাদী ভঙ্গীটি বুঝি চিরতরে বিদায় নিয়েছে। আপনার চিঠিটি কিন্তু সেই ভঙ্গীতেই লেখা।"

মন্ত্রীমিশনের আচরণেও মুসলিম লীগকে খুশি করার চেষ্টা লক্ষ্য করা গিয়েছিল। সেজন্য তাঁরা কোন সিদ্ধান্তে আসতে গড়িমসি করছিলেন। এই রকম অবস্থায় গান্ধীজী পেথিক লরেন্সকে আর একটি চিঠিতে ১৩-৪-৪৬ তারিখে লিখেছিলেন : "মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেস—এই দুটিই তো আপনাদের সৃষ্টি। এই দুটির একটিকে আপনাদের বেছে নিতে হবে। পর্যায়ক্রমে আপনারা কখন কংগ্রেসের দিকে ঢলে পড়ছেন, কখন লীগের দিকে। এবং এইভাবেই আপনাদের উদ্যম নষ্ট হচ্ছে। এটি চলবে না। হয় যেটি ন্যায়সঙ্গত সেটি করুন, আর নয়তো ব্রিটিশ-নীতির প্রয়োজন মেটাবার জন্য যা করা দরকার তাই করুন।"[১১৬]

এই প্রসঙ্গে আরও আলোচনা করার আগে চিঠিটিতে উল্লেখিত গান্ধীজীর দুটি মন্তব্য বিশ্লেষণ করা যেতে পারে। প্রথমত, গান্ধীজী কেন বলেছিলেন যে মুসলিম লীগ এবং

কংগ্রেস ইংরেজদের সৃষ্টি ? মুসলিম লীগের জন্ম যেভাবে এবং যে উদ্দেশ্যে হয়েছিল কংগ্রেসের জন্ম তো সেভাবে হয়নি। ইংরেজ গভর্নর জেনারেল মুসলিম লীগ গঠনে উৎসাহ দিয়েছিলেন। তাঁর উদ্দেশ্য ছিল মুসলিম লীগকে দিয়ে কংগ্রেসের আন্দোলনকে দুর্বল করে দেওয়া। স্বদেশী আন্দোলন হিন্দুদের মধ্যে স্বাদেশিকতার চেতনা সৃষ্টি করেছিল। তার তরঙ্গ মুসলমানদের মনকেও তো স্পর্শ করতে পারে! অবশ্য মুসলমানদের একাংশ এর বিরোধিতায় সক্রিয় ছিলেন। তবু শাসনকর্তারা মনে করেছিলেন যে 'মুসলমানদের এই ধরনের আন্দোলনগুলি পরোক্ষভাবে সরকার পরিচালিত হওয়া দরকার।'[১১৭] বস্তুত মুসলমানদের মধ্যে কেউ কেউ তখন একটি রাজনৈতিক দল গঠনের প্রয়োজন অনুভব করছিলেন। সেইভাবেই মুসলিম লীগের জন্ম হয়েছিল। কংগ্রেসের জন্মের সঙ্গেও একজন অবসরপ্রাপ্ত ইংরেজ সিভিলিয়ন হিউম যুক্ত ছিলেন। কংগ্রেসের জন্ম হয় ১৮৮৫ সালে। কারও কারও ধারণা যে সিপাহী বিদ্রোহ ব্যর্থ হবার পর দেশে একটি হিংসাত্মক আন্দোলনের গোপন প্রস্তুতি চলছিল। তাকে আটকাবার জন্য তখন একটি সংগঠনের প্রয়োজন দেখা দেয়। কংগ্রেসকে সেই উদ্দেশ্যেই গঠন করা হয়েছিল। আর তাই কেউ কেউ কংগ্রেসকে safety valve অর্থাৎ নিরাপত্তার কপাট আখ্যা দিয়েছিলেন। কিন্তু ঘটনা ঠিক তা ছিল না। কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠায় হিউমের অবদান থাকলেও কংগ্রেস প্রথম থেকেই সরকারী আমলাদের বিষ নজরে ছিল। এর রাজনৈতিক কার্যকলাপের প্রতি গভর্নমেন্টের কোন সমর্থন ছিল না। তাই মুসলিম লীগের সঙ্গে কংগ্রেসকে একাসনে বসালে ভুল বোঝার অবকাশ থাকে। দ্বিতীয়ত, গান্ধীজী বলেছিলেন যে মন্ত্রীমিশন যদি কংগ্রেস এবং লীগের মধ্যে একটিকে সাহস করে বেছে নিতে না পারেন তবে তাঁরা যেন ব্রিটিশ-নীতির অনুকূলে যা করা প্রয়োজন তা করতে পারেন। অবশ্যই সেই নীতি সাম্রাজ্যকে ধরে রাখার কর্মসূচি হবে। গান্ধীজী তাতে ভীত ছিলেন না। ১৯৪৫ সালে কংগ্রেসের নেতারা কারামুক্ত হয়েছিলেন। গান্ধীজী তার কিছু দিন আগেই ছাড়া পেয়েছিলেন। তিনি তাঁর ভগ্নস্বাস্থ্য কিছুটা উদ্ধার করতে পেরেছিলেন। সেই সময় তিনি ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে আর একটি সংগ্রামের কথা ভাবছিলেন। তাঁর মনে হয়েছিল যে স্বাধীনতা লাভের সেইটিই হবে শেষ সংগ্রাম।[১১৮] দেশবিভাজন বন্ধ করতে এবং সংযুক্ত ভারতবর্ষ বজায় রাখতে যদি রক্তস্নান করতে হয় তবে তার জন্যও তিনি প্রস্তুত ছিলেন। দেশবিভাগ যখন এক রকম নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল, কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি তাঁর কথা না শুনেই দেশবিভাগ মেনে নিয়েছে তখনও তিনি বলেছিলেন যে "এ কথা যেন কেউ না বলে যে গান্ধী এই দেশ ব্যবচ্ছেদের একজন শরিক ছিলেন। কিন্তু সকলেই আজ স্বাধীনতার জন্য অধীর হয়ে উঠেছেন। কংগ্রেস দেশবিভাগের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে রাজি। এই পরিকল্পনার মধ্য দিয়ে তাদের একটি বিষমাখানো রুটি (wooden loaf) দেওয়া হয়েছে। এটি যদি তারা খায় তা হলে অসুখে মারা যাবে। আর যদি না খায় তা হলে তাদের অভুক্ত থাকতে হবে।" এই রকম পরিস্থিতিতেও তিনি শেষ রক্ষা করার জন্য বিহার থেকে দিল্লীতে আসার পর বলেছিলেন : "আমি সারা জীবন একজন সংগ্রামী। দিল্লীতে আমি হেরে যাওয়া যুদ্ধে লড়াই করতে এসেছি।"[১১৯] পাকিস্তান আটকাবার জন্য তখন তিনি মরিয়া হয়েই মাউন্টবেটেনকে বলেছিলেন যে জিন্নাকেই তিনি প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত করুন। জিন্না তাঁর মনোমত মন্ত্রীপরিষদ গঠন করবেন। আর জিন্না যদি সেই সুযোগ গ্রহণ করতে অসম্মত হন তা হলে কংগ্রেসকে মন্ত্রীসভা গঠন করতে বলা হোক। গান্ধীজীর এই আগ্রহ অরণ্যে রোদন প্রতিপন্ন হয়েছিল।

ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রক্রিয়া এবং দেশবিভাগের পরিকল্পনা নিয়ে কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের সঙ্গে গান্ধীজীর মতবিরোধ ক্রমশই স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। এই অবস্থায় গান্ধীজী নিজেও কোন রকম উদ্যোগ নিতে পারছিলেন না। তাঁর মনেও দ্বন্দ্ব ছিল। মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাব নিয়ে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি যখন সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে চলেছিল তখন তিনি কমিটির সদস্যদের বলেছিলেন যে তাঁরা যেন নিজেরাই সিদ্ধান্ত নেন। কেননা তিনি কোন আলো দেখতে পাচ্ছিলেন না। তাঁর এই মন্তব্য প্রচারিত হওয়ায় তখন একটি ভুল ধারণার সৃষ্টি হয়েছিল। সেই ধারণাটি হল এই যে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি গান্ধীজীর বিরোধিতা সত্ত্বেও মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাব সমর্থন করেছে। কথাটি ঠিক ছিল না। ওয়ার্কিং কমিটি তাঁদের গৃহীত প্রস্তাবে প্রথমে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের প্রস্তাব বর্জন করে গণপরিষদ গঠনের প্রস্তাব মেনে নিয়েছিল এবং দাবি করেছিল যে অচিরেই যেন একটি প্রাতিনিধিক ও দায়ত্বশীল অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা হয়। তাঁদের মনে হয়েছিল যে মন্ত্রীমিশন যেভাবে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের কথা বলেছিলেন তা গ্রহণযোগ্য নয়। পরে এই নিয়ে অনেক জল ঘোলা হয় এবং কংগ্রেস তার সিদ্ধান্ত বিস্তৃত করেছিল। এই নিয়ে আগে বিশদ আলোচনা করা হয়েছে।

গান্ধীজী তাঁর প্রার্থনান্তিক ভাষণে জনগণকে ওয়ার্কিং কমিটির উপর বিশ্বাস স্থাপন করতে বলেছিলেন। শুধু তাই নয়। কিছু দিন পরে এই প্রস্তাবটিকে যখন অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির সভায় সমর্থনের উদ্দেশ্যে উত্থাপন করা হয়েছিল তখন গান্ধীজী প্রস্তাবটিকে মেনে নিতে সুপারিশ করেছিলেন। জয়প্রকাশ নারায়ণের নেতৃত্বে কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টির সদস্যরা এর বিরোধিতা করেছিলেন। গান্ধীজী বলেছিলেন : "আমি এ কথা মেনে নিতে রাজি আছি যে প্রস্তাবিত গণপরিষদকে জনগণের পার্লামেন্ট বলা যায় না। এর মধ্যে অনেক ত্রুটি আছে। কিন্তু আপনারা তো সকলেই পোড়-খাওয়া পুরানো যোদ্ধা। সৈনিকরা কখন বিপদকে ভয় করে না। বিপদে সে উল্লসিত হয়। প্রস্তাবিত গণপরিষদে যদি ত্রুটি কিছু থাকেই তা হলে আপনারা তা দূর করে দেবেন। ত্রুটিকে লড়াই করার চ্যালেঞ্জ রূপে গ্রহণ করুন। তাকে প্রত্যাখ্যান করার কারণ হিসেবে নেবেন না। শ্রীজয়প্রকাশ নারায়ণ গতকাল বলেছিলেন যে প্রস্তাবিত গণপরিষদে যোগদান করা বিপজ্জনক। সুতরাং তাঁরা যেন ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব নাকচ করে দেন। তাঁর কথায় আমি বিস্মিত হয়েছি। জয়প্রকাশের মতো একজন ঝানু যোদ্ধার মুখ থেকে এমন পরাজিত মনোভাবাপন্ন কথা শুনতে আমি প্রস্তুত নই।"[১২০]

অবশ্য মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাব গান্ধীজী প্রথমে সমর্থন করতে পারেননি। তাঁর মনে দ্বিধা ছিল। পরে প্রদেশগুলির গোষ্ঠীবদ্ধ হবার বিষয়টি সম্পর্কে মন্ত্রীমিশনের ব্যাখ্যা পেয়ে তিনি সেটিকে সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু প্রধানত মুসলিম লীগের দিক থেকে বাধা আসায় মন্ত্রীমিশনের একপেশে মনোভাব প্রকট হয়ে পড়ে এবং তাঁদের সুপারিশ বাতিল হয়ে যায়। কিন্তু পরিস্থিতি সেখানেই থেমে থাকেনি। তার দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে। মাউন্টবেটেনের ভারতবর্ষে পৌঁছানর পর থেকে পরিস্থিতির উপর গান্ধীজীর নিয়ন্ত্রণ ক্ষীণতর হয়। গান্ধীজীর অবস্থা তখন অন্ধকারে পথ খোঁজার মতো। দেশবিভাগ দেশের পক্ষে ক্ষতিকর কেবল এই বিশ্বাসটুকু অন্তরে জাগিয়ে রেখে তিনি আলোর সন্ধান করছিলেন। তাই মাউন্টবেটেনের প্রস্তাব নিয়ে আলোচনার সময় যখন বোঝা যাচ্ছিল যে দেশবিভাগ সেই প্রস্তাব অনুসারে প্রায় অনিবার্য হয়ে উঠেছে তখন গান্ধীজী মন্ত্রীমিশনের বাতিল করা পরিকল্পনা নিয়ে আবার আলোচনা শুরু করতে বলেছিলেন।[১২১]

২৬-৫-৪৭ তারিখে লিখিত প্রার্থনান্তিক ভাষণে গান্ধীজী বলেছিলেন : "আবেদনটি সত্ত্বেও (গান্ধীজী এবং জিন্নার স্বাক্ষরমত যে আবেদনে জনগণকে হিংসা থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছিল—ভ. প্র. চ.) যদি জনগণ বড় আকারের হিংসা করার উন্মত্ততায় মেতে থাকেন এবং ব্রিটিশ শাসন এই মিথ্যা আশার কাছে আত্মসমর্পণ করে যে এই সাময়িক আক্রমণের উন্মত্ততার অবসান হলে সব ঠিক হয়ে যাবে তা হলেও এটি যে সাক্ষ্য পিছনে রেখে যাবে তার জন্য কেবল ভারতবর্ষ নয় সমগ্র পৃথিবী অপরাধী বলে পরিগণিত হবে। সে জন্য সকল দেশপ্রেমিক এবং অবশ্যই ব্রিটিশ শাসনের কাছে আমার আবেদন যে তাঁরা যেন গত বছর মে মাসে মন্ত্রীমিশন যে পরিকল্পনা উপস্থাপিত করেছিলেন তার কাছেই ভারতবর্ষকে ছেড়ে চলে যান। এখন ব্রিটিশ শাসনের উপস্থিতিতে আমরা রক্তপাতের তাণ্ডব, অহেতুক নরহত্যা, অগ্নিসংযোগ এবং আরও হীনতর কাজের দ্বারা নীতিভ্রষ্ট হয়ে গিয়েছি।"

বস্তুত যে-বেদনা এবং উদ্বেগ নিয়ে গান্ধীজী 'দেশকে বিভক্ত করার আগে আমার দেহের ব্যবচ্ছেদ করে দাও' কথাটি বলেছিলেন তারই প্রকাশ ঘটেছিল তাঁর এই আলোর সন্ধানে ঘুরে বেড়ানর মধ্যে। কিন্তু সময় তাঁর জন্য অপেক্ষা করেনি। পরিস্থিতি থেমে থাকেনি। তাঁর রাজনৈতিক অনুগামীরাও তখন তাঁকে ঠেলে সরিয়ে দিয়েছিলেন। গান্ধীজী তাঁর এই মনোভাব ব্যক্ত করে ঘনশ্যামদাস বিড়লাকে বলেছিলেন : "ওয়ার্কিং কমিটির কাছে আমার কথার কোন মূল্য নেই।... যেসব ঘটনা ঘটে চলেছে তা আমার পছন্দ নয়। কিন্তু সেকথা আমি বলতে পারি না।"[১২২] ওয়ার্কিং কমিটি পাঞ্জাবকে ভাগ করার প্রস্তাব কেন গ্রহণ করেছে এই প্রশ্ন যখন তিনি নেহরু এবং প্যাটেলকে জিজ্ঞেস করেছিলেন তখন নেহরু উত্তর দিয়েছিলেন : "এখন একটি সিদ্ধান্ত নেবার সময় এসেছে। আমাদের কী মত তা ব্যাখ্যা করে প্রস্তাব গ্রহণ করবার কোন মানে নেই। আমি নিজে মনে করি এবং ওয়ার্কিং কমিটির অধিকাংশ সদস্য মনে করেন যে আমাদের এই বিভাজনের জন্য চাপ দেওয়া উচিত। তা হলে প্রকৃত চিত্রটি স্পষ্ট হয়ে উঠবে।" আর প্যাটেল বলেছিলেন যে গভীরভাবে আলোচনার পর তাঁরা এই সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। তবে গান্ধীজী যা ঠিক মনে করেন তা বলে যেতে পারেন।[১২৩] আসলে প্যাটেল এবং নেহরু পাঞ্জাবকে ভাগ করবার দাবি জানিয়ে দেশবিভাগের বিষয়টিকে জটিল করে দেবার কথা ভেবেছিলেন। আর গান্ধীজী বুঝেছিলেন যে এই দাবিই দেশবিভাগের পথকে সুগম করে দেবে।

কংগ্রেস যে গান্ধী-নীতি প্রচারের প্রতিষ্ঠান নয় তা ১৯৩৪ সাল থেকেই ক্রমশ স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। কংগ্রেস একটি রাজনৈতিক দল। এতে বহু মানুষের সমাবেশ ঘটেছিল। কংগ্রেসের ভিতর বিভিন্ন মতাদর্শের মানুষদের স্বতন্ত্র গোষ্ঠীও ছিল। তাঁরা সকলেই একত্রে সমবেত হয়েছিলেন একটি উদ্দেশ্যে এবং সেই উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষকে পরশাসন থেকে মুক্ত করা। কংগ্রেসের অনেকে প্রকাশ্যেই গান্ধীজীর বিরোধিতা করতেন। তা সত্ত্বেও সাধারণভাবে মনে করা হোত যে কংগ্রেসের অন্তত যাঁরা প্রথমসারির নেতা তাঁরা সকলেই গান্ধীজীর অনুগত। গান্ধীজীও ছিলেন কংগ্রেসের অপ্রতিদ্বন্দ্বী নেতা। তাঁদের মধ্যে একমাত্র সুভাষচন্দ্রই ১৯৩৯ সালে গান্ধীজীর নেতৃত্বকে প্রকাশ্যে চ্যালেঞ্জ করেছিলেন। তাঁকেও শেষ পর্যন্ত কংগ্রেস ছেড়ে চলে যেতে হয়েছিল। প্যাটেল এবং আজাদ বারবার বলেছিলেন যে কংগ্রেস গান্ধীতত্ত্বে বিশ্বাসী কোন প্রতিষ্ঠান নয়। কিন্তু তাতে কংগ্রেস কর্মীদের উপর গান্ধীজীর প্রভাব দুর্বল হয়ে যায়নি। গান্ধীজী নিজে কখন কখন

কংগ্রেসকে নেতৃত্ব দিতে অস্বীকার করেছেন, আবার কংগ্রেসও কখন কখন গান্ধীজীকে নেতৃত্বের দায় থেকে অব্যাহতি দিয়েছে। কিন্তু যখনই সংগ্রামের প্রয়োজন হয়েছে তখনই গান্ধীজী কংগ্রেসের হাল ধরেছেন। অবশ্য সংগ্রামের প্রয়োজন এবং কৌশল নিয়ে কেউ কেউ কখন কখন বিরূপ মন্তব্য করেছেন। জেল থেকে বেরিয়ে আসার পর আজাদ 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলন সম্পর্কে এই রকম এক মন্তব্য করে প্যাটেলের বিরক্তির উদ্রেক করেছিলেন।[১২৪] আজাদ তো এই আন্দোলন সম্পর্কে প্রথম থেকেই দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন। কিন্তু তিনি তখন গান্ধীজীর নেতৃত্বকে চ্যালেঞ্জ করেননি। কারাবন্দীও হয়েছিলেন। এই রকম অবস্থাই চলছিল মন্ত্রীমিশন আসার আগে পর্যন্ত। মন্ত্রীমিশনের পরিকল্পনা গ্রহণ-বর্জন নিয়েই কংগ্রেসের এই সংহতি নষ্ট হতে শুরু করে। আর তার ভাঙন ধরে জিন্নার 'প্রত্যক্ষ সংগ্রাম'-এর পর থেকেই। জিন্না কী চেয়েছিলেন আর কী পাননি তার হিসাব যদি নাও মেলান হয় তা হলেও এ কথা নিঃসন্দেহে বলা যায় যে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের মধ্য দিয়ে তিনি ক্ষমতা হস্তান্তর আর দেশবিভাগ নিয়ে কংগ্রেস নেতাদের সঙ্গে গান্ধীজীর বিচ্ছেদ ঘটাতে সক্ষম হয়েছিলেন। অবশ্য এই সাফল্য জিন্নার একার নয়। মাউন্টবেটেনই হলেন এর প্রকৃত কারুকৃৎ। জিন্না তার জন্য অনুকূল পরিবেশ রচনা করেছিলেন। মাউন্টবেটেন তাকেই কাজে লাগিয়েছিলেন।

মাউন্টবেটেনের ভারতবর্ষে এসে পৌঁছবার আগেই প্যাটেল বুঝতে পেরেছিলেন যে দেশবিভাগকে আটকান যাবে না। গান্ধীজী আর একটি সংগ্রামের কথা ভাবছিলেন। প্যাটেলের তাতে সায় ছিল না। তিনি তার জন্য প্রস্তুতও ছিলেন না। ইতিমধ্যে তিনি একবার হৃদরোগে আক্রান্ত হয়েছিলেন। তাঁর বয়সও হয়েছিল। তা ছাড়া তাঁর দৃঢ় ধারণা হয়েছিল যে পাকিস্তান গঠিত হলে সেটি পাঁচ বছরের বেশি টিকবে না। আর তখনই মুসলিম লীগ ভারতবর্ষের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হতে চাইবে।* আর গান্ধীজী বিশ্বাস করতেন যে ব্রিটিশদের সহায়তা ব্যতিরেকে পাকিস্তান কখনই গঠিত হবে না। সুতরাং ব্রিটিশদের আগে দেশ থেকে চলে যেতে হবে; সেই কাজটিই ত্বরান্বিত করা হোক। তার জন্য দেশ যদি সাময়িক অরাজকতার মধ্যে পড়ে তবে তাও বাঞ্ছনীয়। কংগ্রেসের নেতারা গান্ধীজীর এমন কথায় রাজি ছিলেন না। অন্য দিকে প্রায় সমগ্র উত্তর ভারতে দাঙ্গা তখন এক ভয়াবহ অবস্থার সৃষ্টি করেছিল। নানা জায়গা থেকে মানুষের চরম দুর্দশার খবর পাওয়া যাচ্ছিল। এর মোকাবিলা করা সহজসাধ্য কাজ ছিল না। গান্ধীজীর কাছে মানুষের শুভবুদ্ধি জাগ্রত করার আবেদন ছাড়া আর কোন অস্ত্র ছিল না। নিজেকে বলিদান করা ছাড়া আর কোন পথও তাঁর ছিল না। এই অবস্থায় এক সময় যাঁরা গান্ধীজীর নেতৃত্ব মানতেন তাঁদের মনে হয়েছিল যে যারা একসঙ্গে থাকতে চায় না, আলাদা হতে চায় তাদের বাইরে যেতে দেওয়াই ভাল। তাতে সুখ না পাওয়া গেলেও শান্তি পাওয়া যাবে। এই বিচ্ছিন্নতার বিনিময়ে পাওয়া যাবে স্বাধীনতা। গান্ধীজী এইভাবে স্বাধীনতাকে পেতে চাননি। যে-শান্তি নেতারা আশা করছিলেন গান্ধীজীর মনে হয়েছিল তা মরীচিকা মাত্র। তাঁর অনুগামীরাই তাঁকে অস্বীকার করছেন। তাঁদের তিনি সমর্থন করতে পারছিলেন না:

* ব্রিটিশ প্রধানমন্ত্রী বলেছিলেন যে তিনি একান্তভাবে আশা করেন যে এই বিচ্ছেদ বেশি দিন টিকবে না। নতুন দুটি রাষ্ট্র যথাসময়ে আবার মিলিত হয়ে যাবে। ভারতসচিবও বলেছিলেন যে অভিজ্ঞতার আলোকে যখন বিচ্ছেদের অসুবিধাগুলি প্রকট হয়ে যাবে তখন দুটি রাষ্ট্রই একটি ভারতীয় রাষ্ট্রে সংঘবদ্ধ হবার কথা স্বাধীনভাবে চিন্তা করবে। প্যাটেলও ১-৩-৪৭ তারিখে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন যে পূর্ববাংলা, পাঞ্জাবের কিছু অংশ, সিন্ধুপ্রদেশ এবং বেলুচিস্তানকে বাদ দিয়ে অবশিষ্ট ভারতবর্ষ একটি শক্তিশালী কেন্দ্রের অধীনে পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন ভোগ করছে এটি দেখলে বাকি অঞ্চলও অবশ্যই তার মধ্যে এসে যাবে।[১২৫]

অথচ তাঁদের বিরুদ্ধে কঠোরও হতে পাচ্ছিলেন না। মনের দিক থেকে তিনি হয়ে পড়েছিলেন একা। সেই বেদনাই ঝঙ্কৃত হয়েছিল তাঁর কথায় : "ওরা আমাকে মহাত্মা বলে। কিন্তু আমার প্রতি ওরা একজন ঝাড়ুদারের মতোও ব্যবহার করে না।"[১২৬]

গান্ধীজী একা ! 'গান্ধারীর আবেদন' কবিতায় রবীন্দ্রনাথ ধৃতরাষ্ট্রের যে চরিত্র এঁকেছেন গান্ধীজীর অবস্থা তখন প্রায় সেই রকম হয়ে পড়েছিল। পাপিষ্ঠ দুর্যোধনকে ত্যাগ করার আবেদন জানিয়ে গান্ধারী ধৃতরাষ্ট্রকে বলেছিলেন—

অধর্মের মধুমাখা বিষফল তুলি
আনন্দে নাচিছে পুত্র ; স্নেহমোহে ভুলি
সে ফল দিয়ো না তারে ভোগ করিবারে—
কেড়ে লও, ফেলে দাও, কাঁদাও তাহারে।

গান্ধীজীর অন্তরাত্মা কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের সিদ্ধান্তকে মেনে নিতে পারছিল না। তিনি বুঝতে পারছিলেন যে স্বাধীনতার ফলটি দেশবিভাগের অধর্ম আর শান্তি স্থাপনের মধু মাখান রয়েছে। তাকে গ্রহণ করার পরিণাম কখনই শ্রেয় হতে পারে না। কিন্তু ধৃতরাষ্ট্রের মতোই তিনিও তখন 'অন্ধ আমি ভিতরে বাহিরে'। তিনি বুঝতে পারছিলেন যে কংগ্রেস এত দিন যে-অহিংসার নীতি অনুসরণ করে এসেছে তা তাঁর অহিংসা নয়—তাঁর অহিংসা তো চরম বিপদের মধ্যেও মিথ্যার সঙ্গে আপোষ করে না। তিনি বুঝতে পারছিলেন যে তাঁর সহকর্মীরা আপাত শান্তির মিথ্যা প্রলোভনে সত্যের মুখোমুখি হতে ভয় পাচ্ছেন। আর তিনিও এত দিন দুর্বলের অহিংসার সঠিক মূল্যায়ন করতে পারেননি। ঈশ্বরই কি তাঁকে ভুলিয়ে রেখেছিলেন ! এখন সত্য উদ্ভাসিত হয়েছে। মন বিদ্রোহ করে উঠছে। সামনে কোন পথ নেই। এক অনশন করা ছাড়া ! তাতে কি কোন কাজ হবে ? সত্যাগ্রহী তো সত্যের প্রতি আগ্রহ নিয়ে কাজ করেন, ফলের আকাঙ্ক্ষা তো তাঁর কাজকে নিয়ন্ত্রিত করতে পারে না। কিন্তু সত্যাগ্রহও তো সংগ্রাম। সংগ্রামে ফলাফলের বিষয়টি যেমন গুরুত্বপূর্ণ বিষয় তেমনি সংগ্রামের কলা-কৌশল বা 'স্ট্রাটেজি'-কেও তো উপেক্ষা করা যায় না। যে পরিস্থিতি সৃষ্টি হয়েছে তাতে অনশনে মৃত্যুবরণ করে শহীদ হওয়া যায়, কিন্তু তার দ্বারা দেশকে কি আরও অনিশ্চিত অবস্থার মধ্যে ঠেলে ফেলে দেওয়া হবে না ?* এই রকম সংশয় এবং শঙ্কা নিয়েই গান্ধীজী ভিন্ন পথের কথা চিন্তা করেছিলেন। ক্যাম্বেল জনসনের মনে গান্ধীজীকে নিয়ে সংশয় ছিল, ভয়ও ছিল। ২৪-৬-৪৭ তারিখে তিনি তাঁর দিনলিপিতে লিখেছিলেন : "নিখিল ভারত কংগ্রেস কমিটির বৈঠকে '৩রা জুনের' প্রস্তাবের আলোচনায় গান্ধীজী সাহসের সঙ্গে যেভাবে তাঁর অভিমত ব্যক্ত করেছেন এবং আপত্তিকারীদের কতকগুলি যুক্তির সমালোচনা করেছেন তাতে '৩রা জুন' প্রস্তাবের পক্ষেই তাঁর সমর্থন প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু এ সত্ত্বেও নিশ্চিন্ত হতে পারা যাচ্ছে না। গান্ধীজীর অহিংস আগ্নেয়গিরি কখন যে হঠাৎ আবার '৩রা জুন' প্রস্তাবের বিরুদ্ধে অগ্নি উদ্গীরণ করে বসে তার কোন নিশ্চয়তা নেই।"[১২৭] কিন্তু গান্ধীজী নিজেই জনসনের ভয় ভেঙে দিয়েছিলেন। যা প্রায় ঘটে গিয়েছে তার বিরোধিতা করে তিনি পরিস্থিতিকে আরও জটিল করে দেননি। তাঁর মধ্যে শিক্ষাগুরুর কর্তব্যবোধ বোধহয় তখন প্রখর হয়ে উঠেছিল। ৩০-৭-৪৭ তারিখে তিনি জনসনকে বলেছিলেন : "দেশখণ্ডনকে দেশের

** ১৯৪৭-এর ৫ই জুন তিনি বলেছিলেন : "যাঁরা আমাকে প্রশ্ন করেন যে আমি যদি দেশবিভাগের বিরোধী হই তা হলে কেন আমি অনশনে প্রাণ বিসর্জন করছি না ? তাঁদের প্রতি আমার উত্তর হল—কংগ্রেস কিছু ভুল করেছে বলে আমাকে কি মৃত্যুবরণ করতে হবে ?

একটি অকল্যাণ ও ক্ষতি বলেই তিনি মনে করেন। তবে এই অকল্যাণের ব্যাপার সত্ত্বেও কল্যাণ দেখা দিতে পারে, যদি দুই গভর্নমেন্ট পরস্পরের প্রতি সৎ ও সঙ্গত আচরণের প্রমাণ দিতে পারে।"[১২৮]

গান্ধীজী সেই দিকেই অগ্রসর হয়েছিলেন। আর সেজন্যই তাঁকে প্রাণ দিতে হয়েছিল। মুসলিম লীগের কোন অনুগামী তাঁকে হত্যা করেনি। তাঁকে হত্যা করেছিল হিন্দু সংগঠনের একজন সমর্থক। এঁরাই মনে করতেন যে যারা দেশবিভাগ ঘটিয়েছে, নারকীয় কাণ্ডের জনক যারা গান্ধীজী এ দেশে তাদের রক্ষা করতে কেন চাইবেন? যে-রাষ্ট্র বিরোধ আর বিচ্ছিন্নতার মানসিকতা থেকে জন্ম নিয়েছে গান্ধীজী তার সঙ্গে সৌহার্দ সৃষ্টির চেষ্টা কেন করবেন? গান্ধীজী কেন তাঁর পুত্রসম অনুগামীদের হাত থেকে মধুমাখা বিষফল কেড়ে ফেলে দেননি।

প্রশ্ন সঙ্গত। ধৃতরাষ্ট্রের মতো গান্ধীজীও কি কংগ্রেস নেতৃবৃন্দকে স্নেহমোহের দুর্বলতার দ্বারা প্রশ্রয় দিয়েছিলেন? গান্ধীজীর অবচেতন মনের সম্পর্কে এই জিজ্ঞাসার কোন স্বতঃসিদ্ধ উত্তর নেই। তবে ঘটনাপ্রবাহকে বিশ্লেষণ করলে যা স্পষ্ট হয়ে ওঠে তা হল এই যে কংগ্রেস নেতৃবৃন্দের প্রতি দুর্বলতা অথবা পরিস্থিতিকে জটিলতর না করার বাসনা—যে কোন কারণেই তিনি অনশন করা থেকে বিরত থাকুন না কেন দেশবিভাগকে আটকান তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছিল। গান্ধীজীর তখন মনে হয়েছিল যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট নয়, মাউন্টবেটেনও নন দেশের নেতৃবৃন্দই দেশকে বিভক্ত করার জন্য বেশি উদগ্রীব হয়ে উঠেছেন। গভর্নমেন্ট ক্ষমতা হস্তান্তর সত্যই করতে চায়। হিন্দু-মুসলমান নেতারা সেই ক্ষমতা পাবার জন্যই দেশবিভাগ তাড়াতাড়ি করে ফেলতে চান। ৬-৬-৪৭ তারিখে প্রার্থনাস্তিক ভাষণে গান্ধীজী বলেছিলেন যে কেউ কেউ ব্রিটিশদের আন্তরিকতা (bonafide) নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁরা ভারতবর্ষকে বিভক্ত করছেন না। তাঁদের দাবি হল ঐক্যবদ্ধ শাসন তাঁদের সর্বশ্রেষ্ঠ কীর্তি। ভারতবিভাগ হল কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের চুক্তির পরিণাম। সেই চুক্তি যতই অনিচ্ছাকৃত হোক না কেন!"[১২৯]

সত্যিই কি গান্ধীজী কংগ্রেস নেতাদের প্রতি স্নেহবশত দেশবিভাগকে আটকাবার জন্য অনশন করা থেকে বিরত ছিলেন? তা যদি হোত তা হলে স্বাধীনতা লাভের অব্যবহিত পরে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা রোধে এবং কংগ্রেসকে প্রতিশ্রুতি ভঙ্গের অপবাদ থেকে মুক্ত করতে কলকাতায় এবং দিল্লীতে কেন তিনি দুবার অনশন করেছিলেন? দিল্লীর অনশন তো সরাসরি নেতাদের বিব্রত করেছিল। কিন্তু সেজন্য গান্ধীজী নিজেকে গুটিয়ে নেননি। দিল্লীকে শান্ত করে পাকিস্তানে যাবার কথা তিনি বলেছিলেন। এই সব ঘটনা থেকে অনুমান করা যায় যে গান্ধীজী বোধহয় বুঝতে পেরেছিলেন যে তাঁর অনশন দেশবিভাগের বিরুদ্ধে করা হলে তাতে হিন্দু-মুসলমানের সম্পর্ক আরও বিষিয়ে যাবে, মিলন-প্রয়াসের কোন পথ খোলা থাকবে না। অনশনের দ্বারা সেই সময় দেশবিভাগকে আটকান গেলেও সাম্প্রদায়িকতার বিষ পুলিশ ও সেনাবাহিনীতে অনুপ্রবেশ করে ভারতবর্ষে ব্রিটিশ কর্তৃত্বকে আরও অনেক দিনের জন্য অনিবার্য করে তুলত। দীর্ঘ দিন ক্ষমতা হস্তান্তরের কথা বলা যেত না। আর বলা হলে তখনও দেশবিভাগ নিয়ে দরাদরি এড়ান যেত না।

গান্ধীজী মাউন্টবেটেনকে সংযুক্ত ভারতবর্ষের জন্য চেষ্টা করতে অনুরোধ করেছিলেন। মাউন্টবেটেন জানিয়েছিলেন যে যথেষ্ট দেরি হয়ে গিয়েছে। যে-সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়ে গিয়েছে এখন আর তা থেকে ফিরে আসার পথ নেই। এখন ব্যাপারটি তাঁর হাতের বাইরে

চলে গিয়েছে। তবু মাউন্টবেটেনের কথামতো শেষ চেষ্টারূপে গান্ধীজী জিন্নার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তাতেও কোন ফল হয়নি। আলোচনার শেষে জিন্না একটি বিবৃতিতে বলেছিলেন : "দুটি বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করেছি। একটি বিষয় হল ভারতবর্ষকে পাকিস্তান ও হিন্দুস্থানে বিভক্ত করা। মিঃ গান্ধী বিভাজনের নীতি স্বীকার করেন না। তিনি মনে করেন যে দেশবিভাগ অনিবার্য নয়। আর আমার মতে পাকিস্তান অনিবার্য তো বটেই, উপরন্তু এইটিই হল ভারতবর্ষের রাজনৈতিক সমস্যার একমাত্র বাস্তব সমাধান।"[১৩০] মাউন্টবেটেন এক সাক্ষাৎকারে বলেছিলেন : "আমি এই সিদ্ধান্তে এসে পৌঁছাই যে প্রকৃতপক্ষে সবাই তাঁর (গান্ধীজীর) বিরুদ্ধে এবং আমার* পক্ষে। এটি খুবই মজার ব্যাপার। তাঁর সঙ্গে আলোচনা করতে গিয়ে (dealing with him) এটি আমাকে খুবই শক্তি দিয়েছিল।"[১৩১]

বস্তুত মাউন্টবেটেন যখন ভারতবর্ষে আসেন তখন তিনি এই সিদ্ধান্ত নিয়েই এসেছিলেন যে ক্ষমতা হস্তান্তরের ব্যাপারে আর গড়িমসি করার অবকাশ নেই। এখন প্রশ্ন হল, কোন্ ব্যবস্থায় ইংরেজদের স্বার্থ বেশি করে রক্ষিত হবে। ডোমিনিয়ন স্টেটাস এবং ব্রিটিশ কমনওয়েলথের ভিতর থাকার বিষয় নিয়ে কোন চিন্তা ছিল না। কংগ্রেস এতে রাজি হয়েছিল। গান্ধীজীও তা নিয়ে বিরোধিতা করেননি। অতএব সংযুক্ত ভারতবর্ষের কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে বৈষয়িক দিক থেকে ইংরেজদের আপত্তি করার কারণ ছিল না। বরং দুই গোষ্ঠীর ঝগড়া মিটিয়ে ভারতবর্ষকে এক রাখতেই তাঁদের আগ্রহ রয়েছে। এই কথাটি মাউন্টবেটেন গান্ধীজীকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন। কিন্তু দেশকে অগ্নিকুণ্ডের মধ্যে ফেলে দিয়ে তো তাঁরা ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যেতে পারেন না। গান্ধীজীর কথামতো ঈশ্বরের কাছে, আর তাকে বাড়াবাড়ি বলে মনে হলে অরাজকতার মধ্যেও ভারতবর্ষকে ছেড়ে দিতে তাঁদের বাস্তব বুদ্ধি রাজি হয়নি। তাতে ভারতবর্ষ ছিন্নভিন্ন হয়ে যেতে পারে এই দরদের জন্য নয়; তেমন হলে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে বিক্ষিপ্ত ভারতবর্ষের সম্পর্ক কেমন হবে, এই ভয় থেকেই অরাজকতাকে তাঁরা এড়াতে চেয়েছিলেন। সেজন্যই দু পক্ষকে একটি মীমাংসায় আনতে তাঁরা আগ্রহী ছিলেন। অন্য কারণে হলেও গান্ধীজীও তা চাইতেন। তিনি এক সময় বলেছিলেন : "আমি এমনকি জিন্নাকেও বিশ্বাস এবং ভালবাসা দিয়ে জয় করতে চাই। আমার কাছে অন্য কোন অস্ত্র নেই।"[১৩২] কিন্তু জিন্নাকে তিনি জয় করতে পারেননি। জিন্না তাঁর স্থান থেকে সরে আসতে রাজি হননি। গান্ধীজীর প্রতি একই মনোভাব তিনি শেষ দিন পর্যন্ত বজায় রেখেছিলেন। মাউন্টবেটেন গান্ধী-জিন্নার তুলনামূলক আলোচনা করতে গিয়ে বলেছিলেন : "জিন্না ছিলেন খুবই গোলমেলে। আর গান্ধী ছিলেন অন্যরকম। ...তিনি ভয়াবহ সংকটের মধ্যে পড়ে পাগলের মতো স্বাধীনতা চাইছিলেন আর সেইভাবে

---

* ১৯৪৭ সালের এপ্রিল মাসের প্রথম পনের দিনের মধ্যে মাউন্টবেটেন জিন্নার সঙ্গে ছবার মিলিত হয়েছিলেন। মোট দশ ঘন্টাব্যাপী তাঁদের আলোচনা খুবই গুরুত্বপূর্ণ হয়েছিল। মাউন্টবেটেন জানিয়েছেন যে তিনি সমস্ত রকম কৌশল এবং সম্ভাব্য সব রকমের আবেদনের মধ্য দিয়ে জিন্নাকে পাকিস্তানের দাবি থেকে বিরত রাখতে চেষ্টা করেছিলেন। কিন্তু কোন যুক্তি তর্কের দ্বারা তিনি জিন্নাকে নিরস্ত করতে পারেননি। মাউন্টবেটেনের এই প্রয়াসের কথা গান্ধীজী বিশ্বাস করেছিলেন। আর তাই তাঁর মনে হয়েছিল যে শেষ পর্যন্ত দেশবিভাগের জন্য দায়ী হলেন ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমান নেতৃবৃন্দ। কিন্তু প্রশ্ন হল, মাউন্টবেটেন দেশবিভাগ রদ করার প্রশ্নে কেন বলেছিলেন যে সবাই তাঁর পক্ষে এবং গান্ধীজীর বিরুদ্ধে? গান্ধীজীর বিরোধী হওয়ার অর্থ তো দেশবিভাগের পক্ষে হওয়া। মাউন্টবেটেন এই কথাগুলি বলেছিলেন দেশবিভাগ হয়ে যাবার অনেক পরে। সুতরাং এ থেকে বোঝা যায় যে মাউন্টবেটেনও দেশবিভাগকে একমাত্র নিদান হিসেবে ভেবেছিলেন। তাই প্রথম থেকেই তাঁর চেষ্টা ছিল গান্ধীজীকে কোণঠাসা করার।

ভারতবর্ষকে ঐক্যবদ্ধ রাখতে চাইছিলেন। ...ব্রিটিশদের অধীনতা ছাড়া আর যেকোনভাবেই হোক তিনি একতা চাইছিলেন।"[১৩৩] আর জিন্নাও সেই একই আগ্রহে পাকিস্তানের দাবি করে যাচ্ছিলেন। এই পরিস্থিতিরই সুযোগ নিয়েছিলেন মাউন্টবেটেন। তাঁর মনে হয়েছিল যে গান্ধীজীকে আগে থেকে বোঝা মুশকিল। মাউন্টবেটেনের সঙ্গে কথা বলার পরেও গান্ধীজী তাঁর প্রার্থনা সভায় বলেছিলেন যে "সমস্ত দেশে যদি আগুন জ্বলে তো জ্বলুক, পাকিস্তানের প্রস্তাবে আমরা কিছুতেই রাজি হব না।" গান্ধীজীর এই মানসিকতাকেই মাউন্টবেটেন ভয় করতেন। ৩রা জুন নেতারা যখন মাউন্টবেটেনের পরিকল্পনার প্রতি সমর্থন জানিয়ে বেতার ভাষণের জন্য প্রস্তুত হচ্ছিলেন তখন গান্ধীজী তাঁর প্রার্থনান্তিক ভাষণে বলেছিলেন যে নেতাদের বিরুদ্ধেও কথা বলার আছে। রাজা অর্থাৎ নেহরু যা কিছু করেন বা করেন না তার সবগুলির প্রশংসা আমরা করতে পারি না। গান্ধীজীর এই মন্তব্য শুনে মাউন্টবেটেন ভয় পেয়ে গিয়েছিলেন। দেশবিভাগের বিরুদ্ধে গান্ধীজীকে প্রচার করতে দেখে মাউন্টবেটেন ৫ই জুন ১৯৪৭ তাঁর ব্যক্তিগত রিপোর্টে লিখেছিলেন : "তিনি একজন সাধু হতে পারেন। কিন্তু তিনি একজন ট্রটস্কির শিষ্য।"[১৩৪] মনে হয় যে রাশিয়ার কমিউনিস্ট আন্দোলনের অন্যতম নায়ক ট্রটস্কির অশান্ত বিদ্রোহী চরিত্রের কথা মনে করেই মাউন্টবেটেন গান্ধীজীর সম্পর্কে এই কথা বলেছিলেন। কেননা ট্রটস্কির মতাদর্শ ও কর্মধারার সঙ্গে গান্ধীজীর জীবন ও কর্মের কোন মিল ছিল না। যাই হোক পরের দিনই গান্ধীজীর প্রার্থনা সভায় যাবার আগে মাউন্টবেটেন তাঁর সঙ্গে দেখা করেছিলেন। আলোচনার মাধ্যমে তিনি তাঁর এবং মনে হয় কংগ্রেসেরও ভূমিকা কী তা গান্ধীজীকে বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন। কেননা দেখা যায় যে এই দিন গান্ধীজী অন্য সুরে কথা বলেছেন। তিনি বলেছিলেন : "ওয়ার্কিং কমিটি মনে করে যে তারা অস্ত্রের কাছে নতি স্বীকার করেনি। তারা পরিস্থিতির চাপের কাছে নতি স্বীকার করেছে। বিরাট সংখ্যক কংগ্রেসীরা অনিচ্ছুক অংশীদারদের চায় না। তাদের আদর্শ হল অহিংসা। সুতরাং তারা বলপ্রয়োগ করতে চায় না। তাই সব দিক বিবেচনা করে তারা অনিচ্ছাকৃতভাবে ভারতীয় ইউনিয়নের ব্যবচ্ছেদ মেনে নিয়েছে।" কংগ্রেসীদের সম্পর্কে গান্ধীজীর এই মন্তব্যকে অবস্থার যথার্থ বিশ্লেষণ না বলে খেদোক্তি বলেই মনে করা যায়। কেননা অস্ত্রের কাছে নতি স্বীকার না করে পরিস্থিতির কাছে নতি স্বীকার—এই পার্থক্যটি খুবই সূক্ষ্ম। কেননা তখন পরিস্থিতি সৃষ্টির অন্যতম কারণ ছিল মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের ডাক এবং তার পরবর্তী ঘটনাসমূহ, যেখানে অস্ত্রের যথেষ্ট প্রয়োগ হয়েছিল। তা ছাড়া অহিংসা কি কোন অবস্থাতেই নতি স্বীকার করে? আসলে গান্ধীজী যে কথা বলতে চেয়েছিলেন তা হল যে এক সম্প্রদায়ের অধিকাংশ মানুষই যখন দেশবিভাগ চাইছেন তখন অহিংসায় বিশ্বাসী কারও পক্ষে জোর করে তাঁদের ধরে রাখা যায় না। ঐ বক্তৃতাতে গান্ধীজী এ কথাও বলেছিলেন যে এই ব্যবচ্ছেদের জন্য তিনি মাউন্টবেটেনকে দোষ দিতে পারেন না। এটি হল কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগের কাজ।[১৩৫] আর তাঁর কাছেও অন্য কোন বিকল্প না থাকায় তিনিও তা মেনে নিয়েছেন। হিন্দু এবং মুসলমানরা যদি এক সঙ্গে থাকতে না চান তা হলে তাঁদের এক সঙ্গে রাখা যাবে কী করে?

এই সাক্ষাৎকার প্রসঙ্গে মাউন্টবেটেন ১২-৬-৪৭ তারিখে তাঁর ব্যক্তিগত রিপোর্টে লিখেছেন : "...(২) গত সপ্তাহের শেষের দিকে আমি খবর পেলাম যে গান্ধী খুবই অসন্তুষ্ট এবং আবেগপ্রবণ মেজাজে রয়েছেন। কোন কোন কংগ্রেস নেতার ভয় হয়েছিল যে তিনি তাঁর পরবর্তী প্রার্থনা সভায় পরিকল্পনাকে নিন্দা করবেন এবং সেটিকে গ্রহণ করবার

বিরোধিতা করবেন। সেজন্য আমি তাঁকে প্রার্থনা সভার আগে আমার সঙ্গে দেখা করবার আমন্ত্রণ জানাই। সত্যই তিনি খুব বিগড়ে ছিলেন এবং তাঁর সারা জীবনের কাজকে আমি কীভাবে নষ্ট করে দিয়েছি তারই কথা বলতে শুরু করেন। ... (৫) ভি. পি. মেননকে গান্ধীজীর সঙ্গে দেখা করে অনুরূপ কাজ করতে বলা হয়েছিল। তিনি জানান যে আমার আলোচনা উল্লেখযোগ্যভাবে সফল হয়েছে এবং গান্ধী এখন আন্তরিকভাবে বিশ্বাস করছেন যে আমি তাঁর পরামর্শমতো চলতে চেষ্টা করেছি। তখন থেকে তিনি ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ রচনার কাজে নিজেকে ব্যাপৃত রাখেন। প্রথম দৃষ্টিতে এটিকেই পরিকল্পনা রচনার কাজ বলে মনে হয়েছিল।"[১৩৬]

গান্ধীজী মাউন্টবেটনের দ্বারা প্রতারিত হয়েছিলেন কি না তা নিয়ে সংশয় থাকতে পারে। কেউ কেউ সেরকম অভিযোগও করেছেন। তবে তিনি যে মাউন্টবেটনের কথা বিশ্বাস করেছিলেন এবং তাঁর দ্বারা প্রভাবিত হয়েছিলেন তাতে কোন সন্দেহ নেই। বস্তুত কারণ যাই থাক এ কথা ঠিক যে গান্ধীজীর ধারণার পরিবর্তন হয়েছিল। এক সময় তো তিনি বলেছিলেন যে ইংরেজরা জিন্নাকে স্বাধীনতার বিরোধিতা করার জন্য অস্ত্র হিসেবে ব্যবহার করছেন। এর উল্লেখ আগে করা হয়েছে। পুনরুল্লেখ করে বলা যায় যে ১৩-৭-৪৪ তারিখে তিনি যে-কথা বলেছিলেন তা হল : "আমি দৃঢ়ভাবে অনুভব করি যে মিঃ জিন্না পথ আটকে নেই। আসলে যে-স্বাধীনতা অনেক দিন আগেই আসা উচিত ছিল ভারতবাসীর সেই দাবি সম্পর্কে কোন মীমাংসা হোক ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট তা চায় না। আর সেজন্য তারা মিঃ জিন্নাকে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার অস্বীকার করণের অস্ত্ররূপে ব্যবহার করছে। ... প্রত্যেক শুভবুদ্ধিসম্পন্ন মানুষের কর্তব্য হল ভারতবর্ষের আকাঙ্ক্ষাকে ধূলিসাৎ করার এই ষড়যন্ত্রকে নষ্ট করে দেওয়া।"[১৩৭] কিন্তু মাউন্টবেটনের সঙ্গে কথা বলার পর তাঁর মনে হয়েছিল যে দেশকে বিভক্ত করছে ইংরেজরা নয়, মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেসের নেতারা। কথাটি একেবারেই মিথ্যা নাও হতে পারে। সংযুক্ত ভারতবর্ষের প্রতি ইংরেজদের আগ্রহের কারণ কী হতে পারে সে সম্পর্কে উপরে আলোচনা করা হয়েছে। যদি ধরে নেওয়া যায় যে ইংরেজদের এই আগ্রহ আন্তরিক ছিল না, তা ছদ্মবেশ ধারণ করে প্রতারণা করছিল তবু তাকে মেনে নেবার দায় থেকে কংগ্রেস এবং লীগ নিজেদের মুক্ত করতে পারে না। ফাঁদ যে পাতে অন্যায় তার। কিন্তু যে জেনেশুনে এবং সাময়িক স্বার্থসিদ্ধির তাড়নায় কিংবা বুদ্ধিহীনতাবশত সেই ফাঁদে ধরা দেয় তার অপরাধও কিছু কম নয়।

গান্ধীজী যে পরিস্থিতির কথা বলেছিলেন সেইটিই ছিল ফাঁদ। তখন জনসাধারণ যুযুমান হিন্দু ও মুসলমান দুটি গোষ্ঠীতে বিভক্ত হয়ে গিয়েছিল। সেনাবাহিনীর মধ্যেও ভাঙন ধরার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছিল। তারই মধ্যে ইংরেজ সরকার স্বাধীনতার মাকাল ফলটি সামনে ঝুলিয়ে রেখেছিল। নিরাপত্তার অভাবে ভীতসন্ত্রস্ত লক্ষ লক্ষ মানুষের মনে আবার নিরাপত্তার বোধ জাগিয়ে তুলতে স্বাধীনতাকেই তখন অনেকে একমাত্র উপায় বলে মনে করেছিলেন। দেশকে ঐক্যবদ্ধ রাখার সযত্ন প্রয়াসে কেউই এগিয়ে আসেননি। সর্বত্রই তখন দাঙ্গার ভয়াবহ পরিস্থিতি থেকে মুক্তিলাভের বাসনা উদগ্র হয়ে উঠেছিল। দেশবিভাগ একবার মেনে নিলে তার শেষ পরিণাম কী হতে পারে সেকথা ভাববার সংযত মন তখন দেশে ছিল না বললেই চলে। এই পরিস্থিতিতে কংগ্রেস নিজেকে অসহায় মনে করেছিল। কৃপালনী কংগ্রেস অধিবেশনে এই অসহায় অবস্থা স্বীকার করে নিয়েছিলেন। গান্ধীজী চাননি অনশন করে এই অসহায় অবস্থাকে আরও বিড়ম্বিত করতে।

এরই মধ্যে একমাত্র ব্যতিক্রম ছিল শরৎ বসু-সুরাবর্দীর সার্বভৌম বাংলার প্রস্তাব। এই প্রস্তাবে দ্বি-জাতি তত্ত্বের স্বীকৃতি ছিল না। বরং তার বিরোধিতাই করা হয়েছিল। এ জন্য গান্ধীজী একে স্বাগত জানিয়েছিলেন। বাংলার হিন্দু ও মুসলমানের একটিই ভাষা, একই সংস্কৃতি। তাদের ধর্মভেদ তাদের ভিন্ন জাতিতে পরিণত করে না। গান্ধীজীর মনে হয়েছিল যে সার্বভৌম বাংলা গঠনের মধ্যে এই সত্যকে উদ্ভাসিত করা যাবে। শ্যামাপ্রসাদ সার্বভৌম বাংলার প্রস্তাব সমর্থন করেননি। তাঁর ভয় ছিল যে একবার সার্বভৌম বাংলা গঠিত হয়ে যাবার পর সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানরা সংযুক্ত বাংলাকে পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হবার ইচ্ছা প্রকাশ করতে পারেন। তাঁর এই ভয় অলীক ছিল না। তবে প্রস্তাবে এই আশা প্রকাশ করা হয়েছিল যে সার্বভৌম বাংলার আইনসভার হিন্দু এবং মুসলমানদের পারস্পরিক সম্মতিতেই এই রকম সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা যাবে। পারস্পরিক সম্মতি বলতে এ কথা মনে করা হয়েছিল যে সংখ্যাগরিষ্ঠদের কোন সিদ্ধান্ত সংখ্যালঘুদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে না। কিন্তু এমন যদি হয় যে সার্বভৌম বাংলার হিন্দুরা ভারতবর্ষের সঙ্গে যুক্ত হতে চাইলেন আর মুসলমানরা চাইলেন পাকিস্তানের সঙ্গে যুক্ত হতে তখন কী হবে? গান্ধীজীকে এই প্রশ্ন করা হলে তিনি বলেছিলেন যে তখন বাংলাকে ভাগ করা যেতে পারে। তবে তা হবে ব্রিটিশদের প্রভাব থেকে সম্পূর্ণভাবে মুক্ত হয়ে। আসলে ব্রিটিশদের দ্বারা দেশবিভাগকে আটকান গান্ধীজী একটি বড় কাজ বলে গণ্য করেছিলেন। কিন্তু কোন সিদ্ধান্তই কেবল সংখ্যাগরিষ্ঠতার জোরে গৃহীত হবে না এমন কথা সার্বভৌম বাংলার খসড়ায় স্পষ্ট করে উল্লেখ করা হয়নি। ২৪-৫-৪৭ তারিখে একটি চিঠিতে গান্ধীজী শরৎচন্দ্র বসুর দৃষ্টি সেদিকে আকৃষ্ট করেছিলেন। গান্ধীজী লিখেছিলেন: "গভর্নমেন্টের (প্রস্তাবিত সার্বভৌম বাংলার) প্রত্যেকটি কাজ এক্সিকিউটিভ এবং আইনসভায় অন্তত দুই তৃতীয়াংশ হিন্দু সদস্যদের সহযোগিতায় পরিচালিত হওয়া দরকার। প্রস্তাবে এটিও সমর্থিত হওয়া দরকার যে বাংলার একটি সাধারণ সংস্কৃতি এবং সাধারণ মাতৃভাষা আছে। সেটি হল বাংলা। কেন্দ্রীয় মুসলিম লীগ বিরোধী বিবরণ থাকা সত্ত্বেও এই কথা মেনে নিচ্ছে সে বিষয়ে নিশ্চিত হও।"

এ সম্পর্কে একটি পাকা সিদ্ধান্তে পৌঁছবার আগেই কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ মাউন্টবেটেন পরিকল্পনা মেনে নেয়। ২১-৬-৪৭ তারিখে গান্ধীজী শরৎচন্দ্র বসুকে একটি চিঠিতে লেখেন: "ভৌগোলিক ঐক্য যখন ভেঙে গিয়েছে তখন ঐক্যের কাজ কীভাবে করা যাবে তার ইঙ্গিত আমি করেছি।"[১৩৮]

নেতারা ৩রা জুন মাউন্টবেটেন পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। সেই খবর গান্ধীজীর কাছে সেদিন সন্ধ্যায় এসে পৌঁছায়। খবরটি শুনে গান্ধীজী স্বগোক্তি করেছিলেন: "ঈশ্বর এঁদের রক্ষা করুন এবং এঁদের বুদ্ধি দিন।" পরের দিন তিনি যখন মাউন্টবেটেনের সঙ্গে দেখা করেছিলেন তখনও তিনি অনুরূপভাবে বারবার বলে উঠেছিলেন: "এটি খুবই বেদনাদায়ক।" গান্ধীজীকে দেখে মাউন্টবেটেনের মনে হয়েছিল যেন এক ডানা-ভাঙা পাখি।[১৩৯] তারও কারণ ছিল। দাঙ্গার প্রথম অবস্থাতেই গান্ধীজী বুঝতে পেরেছিলেন যে এর রাজনৈতিক অনুষঙ্গ কী হতে পারে! নোয়াখালির দাঙ্গাবিধ্বস্ত অঞ্চলে গিয়ে তিনি সেখানকার ক্ষয়ক্ষতির চেয়েও তার রাজনৈতিক পরিণতি নিয়ে বিশেষ চিন্তিত ছিলেন। নোয়াখালির দাঙ্গার প্রতিশোধ যখন হিন্দুরা বিহারে নিয়েছিল এবং তাতে বিব্রত হয়ে অন্তর্বর্তী সরকারের প্রধানরূপে জওহরলাল যখন দাঙ্গা থামাতে আকাশ থেকে বোমা ফেলার কথা বলেছিলেন তখন গান্ধীজী তা সমর্থন করতে পারেননি। তিনি জানতেন যে

অন্তর্বর্তী সরকার তখনও পুরো ক্ষমতা পায়নি। দাঙ্গা দমনে বাংলার মুসলিম লীগ সরকারের যদি সেরকম কিছু করার ক্ষমতা না থাকে তবে বিহার সরকারও সেরকম কিছু করতে পারে না। জওহরলালের উচিত একজন কংগ্রেসকর্মী রূপে কথা বলা। দ্বি-জাতি তত্ত্ব মিথ্যা এটি প্রমাণ করাই হল দাঙ্গা নিরসনের বড় কাজ। তিনি নিজে সেই কাজে যত্নশীল। তাই নোয়াখালিতে তিনি বলেছিলেন : "আমি পাকিস্তানের একজন ইচ্ছুক পক্ষ হতে পারি না। আমি যদি তাকে আটকাতে নাও পারি এবং সব হিন্দু যদি চলেও যায় তা হলেও আমি এখানে থাকব এবং আমার ধর্মানুসরণের কিছুমাত্র পরিবর্তন করব না।" তিনি আরও বলেছিলেন : "আমার মতাদর্শ ব্যর্থ হতে চলেছে। আমি ব্যর্থ হয়ে মরতে চাই না, আমি সফল হয়েই মরতে চাই। তবে এমন হতে পারে যে আমার মৃত্যু হবে ব্যর্থ হয়েই।"[১৪০]

গান্ধীজী নোয়াখালিতেই থেকে যাননি। তিনি চলে এসেছিলেন বিহারে। সেখানে হিন্দুরা মুসলমানদের উপর নোয়াখালির প্রতিশোধ নিতে তাণ্ডব ঘটিয়েছিল। এই অবস্থায় তিনি যদি ক্ষতিগ্রস্ত মুসলমানদের পাশে না দাঁড়ান তা হলে নোয়াখালিতে তাঁর কাজ পক্ষপাতদুষ্ট হয়ে যেতে পারে। সেজন্যই তিনি বিহারে চলে এসেছিলেন এবং বলেছিলেন 'আবার আসব'। স্বাধীনতার দিনটিতে নোয়াখালিতে থাকবেন বলে কলকাতাতে চলেও এসেছিলেন। কিন্তু কলকাতাকে শান্ত রাখতে পারলে পূর্ববঙ্গে দাঙ্গা হবে না, মুসলমান নেতাদের এই প্রতিশ্রুতি পেয়ে তিনি তখন কলকাতাতেই থেকে যান। তারপর অশান্ত দিল্লীতে। শান্তির কাজ করতে পশ্চিম পাকিস্তানে যাবার ইচ্ছাও তাঁর ছিল। কিন্তু সেই সুযোগ তিনি পাননি। এ কথা ঠিক যে কংগ্রেস তাঁকে হতাশ করেছিল। সেদিক থেকে তিনি ব্যর্থই হয়েছিলেন। তবে গান্ধীজীর মধ্যে যে মহান শিক্ষকের ভূমিকা ছিল সেই দৃষ্টিতে দেখলে গান্ধীজীর মৃত্যুকে সফলতার নিদর্শন হিসেবেও চিহ্নিত করা যায়। কেননা শিক্ষকের কাছে প্রাপ্তিই একমাত্র বিচার্য বিষয় নয়, জীবন দিয়ে নিজের আদর্শকে তুলে ধরাই তাঁর কাছে বড় কথা। গান্ধীজী সেই কাজ সার্থকভাবে সম্পন্ন করেছেন। 'ভারত ছাড়ো' প্রস্তাবের প্রসঙ্গ আলোচনা করতে গিয়ে গান্ধীজী একবার বলেছিলেন : "এক দিন নিশ্চয় আসবে যেদিন তিনি (জিন্না) বুঝতে পারবেন যে আমি তাঁর প্রতি অথবা মুসলমানদের প্রতি কখনও কোন অন্যায় করিনি।"[১৪১] গান্ধীজী নিহত হবার পরেও জিন্না তাঁকে 'হিন্দু নেতার' বেশি কিছু বলতে পারেননি বটে তবে পাকিস্তানের অন্যান্য নেতাদের তাঁর সম্পর্কে ধারণার তত দিনে পরিবর্তন হয়ে গিয়েছিল। দিল্লীতে যখন গান্ধীজী অনশন করছিলেন, যেটি ছিল তাঁর শেষ অনশন, তখন পশ্চিম পাকিস্তানের আইনসভার স্পিকার গান্ধীজীকে যে টেলিগ্রামটি পাঠিয়েছিলেন তাতে তাঁদের এই পরিবর্তিত মনোভাব স্পষ্ট হয়ে উঠেছিল। তিনি লিখেছিলেন : "আপনার মহান অনশনের নিঃস্বার্থ ও মহৎ লক্ষ্য সম্পর্কে ১৩ই জানুয়ারি (১৯৪৮) এই কক্ষে যেসব বক্তৃতা দেওয়া হয়েছিল তার প্রাসঙ্গিক অংশ আপনার কাছে পাঠাতে আমি খুবই আনন্দবোধ করছি। যে মনোভাব এখানে প্রকাশ করা হয়েছে তা আমি এবং এই সভার সকল সদস্য সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করেন। মালিক ফিরোজ খাঁ নুন* বলেছেন— 'ধর্ম প্রণেতাদের কথা বাদ দিলে পৃথিবীর কোন দেশই

* নুন ১৯৪৫ সালে গান্ধীজীকে জাপানীদের সমর্থক বলে নিন্দা করেছিলেন এবং গান্ধীজীকে পরামর্শ দিয়েছিলেন যে তিনি যেন নেহরুর হাতে নেতৃত্ব ছেড়ে দেন। নেহরু তখনও জেলে বন্দী। ফিরোজ খাঁর কথার উত্তরে গান্ধীজী বলেছিলেন যে তিনি ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে কখনই জাপানীদের কাছে বিলিয়ে দিতে চান না। তিনি চান সকল রকম পরশাসন থেকেই মুক্তি। আর নেহরু তো নেতৃত্বের আসনে প্রতিষ্ঠিত আছেনই। তাঁরা পরস্পরের বন্ধু, কেউ কারও

মহাত্মা গান্ধীর চেয়ে মহত্তর মানুষ জন্ম দেয়নি।' মাননীয় জিয়া মহম্মদ মুমতাজ খাঁ দৌলতনা, অর্থমন্ত্রী—'মহাত্মা গান্ধীর অনশন মুসলমানদের প্রতি তাঁর যে অনুভূতি প্রকাশ করেছে তা যথোচিত উপলব্ধি করা আমাদের একান্ত কর্তব্য। এ থেকে এইটুকু বোঝা যায় যে ভারতবর্ষে অন্তত একজন আছেন যিনি হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের জন্য প্রাণ পর্যন্ত বিসর্জন দিতে প্রস্তুত। আমরা সর্বশক্তিমান ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি যে এই অনশন চালিয়ে যাবার আর দরকার হবে না। আমি এই সভায় দাঁড়িয়ে মহাত্মা গান্ধীকে এই আশ্বাস দিচ্ছি যে সংখ্যালঘুদের রক্ষা করবার জন্য তাঁর আগ্রহ আমরা সম্পূর্ণরূপে সমর্থন করি।' মাননীয় খাঁ ইফতিকার হুসেন খান, মুখ্যমন্ত্রী—'মহাত্মা গান্ধী একটি মহৎ লক্ষ্যে উপনীত হতে যে পদক্ষেপ নিয়েছেন তার প্রতি আমি আমার এবং আমার সহকর্মীদের পক্ষ থেকে হার্দিক প্রশংসার সঙ্গে আমাদের অনুভূতি প্রকাশ করছি। তাঁর মূল্যবান জীবন রক্ষার জন্য এই প্রদেশে আমাদের চেষ্টার কোন রকম ত্রুটি হবে না'।"[১৪৩]

গান্ধীজী তো এইটিই চেয়েছিলেন। পরস্পরের মধ্যে আবার বিশ্বাস ফিরিয়ে আনা। বাদশা খাঁকে তিনি বলেছিলেন : "আমার ইচ্ছা অবস্থা অনুকূল হবার সঙ্গে সঙ্গেই সীমান্ত প্রদেশে যাওয়া। যেহেতু আমি বিভাজন মানি না সেইহেতু আমি পাশপোর্ট নেব না। তার ফলে আমাকে যদি কেউ হত্যা করে তবে সেইভাবে নিহত হতে আমি খুশি হব। পাকিস্তান যদি সৃষ্টি হয় তবে আমার স্থান হবে পাকিস্তানে।"[১৪৪] গান্ধীজী এই মত অবশ্য পরে কিছুটা পরিবর্তন করেছিলেন। ২৩-১-৪৮ তারিখে প্রার্থনাসভায় তিনি বলেছিলেন : "আমি পাকিস্তানেও যেতে চাই। কিন্তু আইনত পাকিস্তান এখন ভিন্ন রাষ্ট্র। অতএব পাকিস্তান গভর্নমেন্টের আমন্ত্রণ যদি নাও পাই, তাঁদের অনুমতি বা সম্মতি ছাড়া আমি সেখানে যেতে পারি না।"[১৪৫]

মাউন্টবেটেন ৮-৮-৪৭ তারিখে একান্ত গোপনীয় এবং ব্যক্তিগত রিপোর্টে কতকগুলি কৌতুকপ্রদ ঘটনার উল্লেখ করেছিলেন—

"২০। ১৫ই আগস্টের অনুষ্ঠানে গান্ধীজীর যোগদান না করা তাঁর ইচ্ছাকৃত। ৩রা জুনের পরিকল্পনাকে তিনি কখনই আন্তরিকতার সঙ্গে আশীর্বাদ করেননি। তাঁর অবস্থা খুবই কষ্টদায়ক।...

"২১। গান্ধীজী তাঁর বাকি জীবনটা সংখ্যালঘুদের দেখাশোনা করার জন্য পাকিস্তানেই কাটাবেন বলে ঘোষণা করেছেন। এটি জিন্নাকে ক্ষিপ্ত করবে, তবে কংগ্রেসের কাছে এটি হবে খুবই স্বস্তির বিষয়। আমি আগেই বলেছি যে তাঁর প্রভাব খুবই নঞর্থক অথবা এমনকি ধ্বংসাত্মক এবং যে একমাত্র মানুষটি শক্ত ভূমিতে দাঁড়িয়ে আছেন সেই বল্লভভাই প্যাটেলের বিরুদ্ধে পরিচালিত।

"৪৯। নেহরু তাঁর মন্ত্রীপরিষদের প্রস্তাবিত নামের তালিকা আমার কাছে পাঠিয়েছেন।...তিনি আমার উপদেশ গ্রহণ করেছেন।...এটি নতুন সদস্য গ্রহণ করার বিষয়ে। আমার সঙ্গে কথা বলার পর তিনি সদস্য তালিকা থেকে চারজনকে পরিবর্তন করেছেন। আমি জেনেছি যে গান্ধীজী অল্পবয়স্কদের জন্য স্থান করে দিতে মৌলানা আজাদকে লিখেছেন। এটি হবে কংগ্রেসের প্রতি তাঁর একটি ভাল আচরণ। কিন্তু বয়োবৃদ্ধ মৌলানা এখনও পর্যন্ত সেই ইঙ্গিতটি গ্রহণ করেননি এবং তিনি নিজে থেকে ছেড়ে না দিলে তাঁকে কেউ বাদ দিতে পারবেন না।"[১৪৬]

প্রতিদ্বন্দ্বী নন। ফিরোজের সত্যই যদি দরদ থাকে তবে তিনি যেন নেহরুর কারামুক্তির চেষ্টা করেন।[১৪২]

প্রসঙ্গত দুটি ঘটনার উল্লেখ করা এখানে অসমীচিন হবে না। ওয়াভেল একবার তাঁর প্রস্তাব সম্পর্কে গান্ধীজীর এবং জিন্নার স্বাক্ষরসহ একটি যৌথ বিবৃতি প্রকাশ করার ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। গান্ধীজী তাতে রাজি হননি। তিনি বলেছিলেন যে মুসলিম লীগের সভাপতিরূপে জিন্নার স্বাক্ষরের সঙ্গে কংগ্রেস সভাপতি কৃপালনীর স্বাক্ষর থাকা উচিত। মন্ত্রীমিশনের পক্ষ থেকেও একবার প্রস্তাব করা হয়েছিল যে দেশের খাদ্যশস্য বাঁচাতে, অধিক ফসল উৎপাদন করতে এবং অনুরূপ কয়েকটি সমস্যার মোকাবিলা করতে গান্ধীজী, জিন্না এবং ভাইসরয়ের স্বাক্ষরসহ একটি বিবৃতি প্রকাশ করা হোক। বস্তুত ভাইসরয়ের এবং মন্ত্রীমিশনের মতলব ছিল গান্ধীজীকে জিন্নার পাশাপাশি হিন্দু নেতারূপে তুলে ধরা। তাঁদের এই চালাকিতে গান্ধীজী ধরা দেননি। কিন্তু পরবর্তী সময়ে দাঙ্গা যখন প্রবল আকার ধারণ করেছিল তখন মাউন্টবেটেনের আগ্রহে দেশবাসীকে শান্ত হতে একটি বিবৃতি প্রচারিত হয়েছিল এবং তাতে গান্ধীজী ও জিন্না স্বাক্ষর করেছিলেন। বিবৃতিটিতে বলা হয়েছিল : "...রাজনৈতিক কার্যসিদ্ধির উদ্দেশ্যে বল প্রয়োগ করা আমরা সর্বকালের জন্য নিন্দা করি এবং ধর্ম বিশ্বাস যার যেমনই হোক না কেন, ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ের মানুষের কাছে আমাদের আবেদন যে তাঁরা কেবল হিংসাত্মক এবং শান্তিশৃঙ্খলাভঙ্গকারী কদর্য কাজ থেকে বিরত থাকবেন তা নয়, কথা এবং লেখাতেও তাঁরা যেন এমন শব্দ ব্যবহার না করেন যাতে লোকে উত্তেজিত হয়ে উঠতে পারে।" এই বিবৃতিতে কেন কংগ্রেসের কেউ স্বাক্ষর না করে তিনি জিন্নার সঙ্গে স্বাক্ষর করেছেন সেই প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন যে তিনি নিজেকে ছাড়া আর কারও প্রতিনিধিত্ব করেন না। তাই তাঁর মতো বাইরের লোককে বাদ দিয়ে যদি কংগ্রেস ও লীগের স্বাক্ষরসহ আবেদনটি প্রচারিত হোত তা হলে ভাল হত। কিন্তু এ কথা সত্য যে স্বাক্ষর করার ফলে স্বাক্ষরকারীদের উপর গুরু দায়িত্ব এসে গিয়েছে।

যাই হোক, এই স্বাক্ষর করার পিছনে কিছু কৌতুকপ্রদ ঘটনা আছে। কথা ছিল যে বিবৃতিটিতে গান্ধীজী, জিন্না এবং কৃপালনী সই করবেন। গান্ধীজীর কাছে প্রথমেই বিবৃতিটি নিয়ে আসা হলে তিনি তাতে সই করে দেন। কিন্তু জিন্না বলেন যে কৃপালনীর সই থাকলে তিনি সই করবেন না। গান্ধীজী তখন পাটনায় চলে গিয়েছিলেন। মাউন্টবেটেন টেলিগ্রাম করে গান্ধীজীকে ঘটনাটি জানান এবং অনুরোধ করেন যে গান্ধীজী যেন জিন্নার ইচ্ছা মেনে নেন। গান্ধীজী সঙ্গে সঙ্গে টেলিগ্রাম করে জানান যে তিনি মনে করেন, কংগ্রেস সভাপতির সই থাকা উচিত। তা হলেও তিনি বিষয়টি নেহরু এবং মাউন্টবেটেনের উপর ছেড়ে দিচ্ছেন। নেহরুও নিজে কোন দায়িত্ব না নিয়ে মাউন্টবেটেনের উপর সিদ্ধান্ত নেবার ভার ছেড়ে দিয়েছিলেন। মাউন্টবেটেনের ইচ্ছা (কাকতালীয়, না ষড়যন্ত্র ?) পূর্ণ হয়। তিনি গান্ধীজী এবং জিন্নার স্বাক্ষরসহ বিবৃতিটি প্রকাশ করেন।

যৌথ স্বাক্ষরসহ এই বিবৃতি দাঙ্গা দমনে সমর্থ না হলেও তার দ্বারা জিন্নার উদ্দেশ্য সাধিত হয়েছিল। মুসলিম লীগের মুখপত্র 'ডন' পত্রিকা লিখেছিল যে ভারতবর্ষের দুটি জাতির নেতারা এই নাটকীয় আবেদনটিতে সই করেছেন। এখানে দুটি জাতি আছে এ কথা যদি স্বীকার করা না হয় তা হলে দুজনকে দিয়ে সই করাবার দরকার কী ছিল ? পক্ষান্তরে গান্ধীজী বলেছিলেন যে এই আবেদন সত্ত্বেও মুসলমানরা যখন পাকিস্তানের ধুয়া তুলে হিংসা চালিয়ে যাচ্ছেন তখন তাঁদের হয়ে কথা বলার অধিকার তো লীগের থাকে না। ভাইসরয় কেন চুপ করে বসে আছেন ? কেন তিনি গান্ধীজী অথবা জিন্নাকে এই হিংসাকাণ্ডের জন্য দায়ী করছেন না ? হিন্দু-মুসলমানের মিলন ঘটাতে যদি তাঁরা অক্ষম

হন তা হলে দেশ ছেড়ে কেন তাঁরা চলে যাচ্ছেন না ?[১৪৭]

পরিস্থিতির দ্রুত পরিবর্তন হতে থাকে। পাকিস্তান সৃষ্টি হয়। কিন্তু গান্ধীজীর আর পাকিস্তানে যাওয়া হয় না। পাকিস্তান সৃষ্টি হবার আগে ১৯৪৬ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে তিনি কংগ্রেসকে কিছু নির্দেশ দিয়েছিলেন। তাতে তিনি বলেছিলেন : "কংগ্রেস তার ষাট বছরের অবিচ্ছেদ্য জীবনের মধ্যে হিন্দু মুসলমান এবং অন্যান্য সকল সম্প্রদায়ের অনিবার্যভাবে এবং প্রগতিশীলতার সঙ্গে প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে। কংগ্রেসের মধ্যে সব সময়েই কিছু না কিছু ভণ্ড লোক থেকেছে। আর তা হল এর অনেক গুণের মধ্যে যে দুটির কথা বলা হল তার গীতিকাব্য (That it has always had a number of hypocrites is but an ode to these two among its many virtues)। যাঁরা এই দুটি গুণের প্রতিনিধিত্ব করেন তাঁরা যদি নিজেদের নিতান্ত সংখ্যালঘু মনে করেন তা হলে তাঁদের উচিত প্রতিবাদ করা এবং কংগ্রেস থেকে বার হয়ে গিয়ে বাইরে থেকে জনমত সৃষ্টি করা। তবেই তাঁরা জাতির প্রকৃত সেবক হতে পারবেন। সুতরাং আমি মনে করি যে সঙ্কটকালে ওয়ার্কিং কমিটির উচিত কংগ্রেসকে যথোচিত এবং সুনির্দিষ্ট নেতৃত্ব দেওয়া। তার জন্য ওয়ার্কিং কমিটিকে নিম্নোক্ত প্রস্তাবগুলি কার্যকর করতে হবে—

"(১) যদিও আমি এখনও মনে করি যে কংগ্রেসের অবস্থানকে সুস্পষ্ট করার পক্ষে গণপরিষদের প্রস্তাবই শ্রেয় তা হলেও মনে হয় যে এখন আর তার জন্য দাবি করার সময় নেই।

"(২) শ্রেয়র দিক থেকে দ্বিতীয় হল নিজেদের এবং কায়েদ এ-আজম জিন্নার ব্যাখ্যাসহ মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাব সমর্থন করা।

"(৩) এটি অবশ্যই পরিষ্কার করে বুঝে নিতে হবে যে কংগ্রেসের যে কোন সদস্যের বা ইউনিটের কংগ্রেসের সিদ্ধান্ত থেকে সরে এসে তার গোষ্ঠী বা প্রদেশ স্তর থেকে বেরিয়ে আসার কথা ঘোষণা করবার স্বাধীনতা থাকবে। কংগ্রেসেরও স্বাধীনতা থাকবে তা মেনে নেওয়ার, যদিও বিচ্ছিন্ন অংশটিকে সে প্রকাশ্যে পরিচালিত করতে থাকবে। এটি হবে মন্ত্রীমিশনের সেই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী যেখানে তাঁরা বলেছেন যে কোন গোষ্ঠী বা প্রদেশকে তাঁরা বাধ্য করতে পারেন না।

"এর ফল এই হবে যে মন্ত্রীমিশনের বিবৃতি অনুসারে সেকশন 'এ'-র সদস্যরা পূর্ণ সংবিধান রচনা করবেন এবং সেকশন 'বি' ও 'সি' এখন যেরকম ভাবা হয়েছে সেইভাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবার পরেও তাঁরা তাদের সংবিধান রচনা করবেন। পূর্বে অসম, পশ্চিমে সীমান্তপ্রদেশ, পাঞ্জাবে শিখরা এবং সম্ভবত বেলুচিস্তান এতে থাকবে।

"এমন হতে পারে যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট এটি মেনে নেবে। অথবা আর একটি গণপরিষদ গঠন করবে। তা যদি তারা করে তবে তারা চিরদিনের জন্য নিজেদের ধিকৃত করবে। মন্ত্রীমিশনের শর্তানুসারে সংবিধান রচিত হলে তা তাঁরা মানতে বাধ্য। মন্ত্রীমিশনের শর্ত হল বাকিটুকু তাঁরা ভাগ্যের উপর ছেড়ে দেবেন, ব্রিটিশ প্রভুত্বের সব নিদর্শন মুছে যাবে এবং ব্রিটিশ সেনা ভারতবর্ষ ছেড়ে চিরদিনের জন্য চলে যাবে।

"কংগ্রেসের অবস্থান সম্পর্কে এ কথা মোটেই ভাবা যাবে না যে কংগ্রেস কায়েদ-এ-আজম জিন্নার হাতে নাচছে। তিনি যদি এইরকম কিছু ভেবে থাকেন তবে কায়েদ-এ-আজম জিন্নাকে পাকিস্তানের একটি সর্বজনগ্রাহ্য এবং অনাক্রমণাত্মক পাকিস্তান দেবার জন্য কংগ্রেস বিশ্বের কাছ থেকে ধন্যবাদ লাভ করবে। কংগ্রেস তার নীতির সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত। তাই কংগ্রেস কখনও ন্যায়কে ত্যাগ করতে পারে না।

"সংবিধান রচিত হবে সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য। একটি বিশেষ ধারা এর মধ্যে থাকবে যাতে যাঁরা বয়কট করছেন (মুসলিম লীগ তখন বয়কটের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল—ভ. প্র. চ.) তাঁরা এর সঙ্গে কীভাবে যুক্ত হবেন সেকথা বলা থাকবে।"[১৪৮]

এটি ছিল কংগ্রেস নেতাদের কাছে গান্ধীজীর সাবধানবাণী। তিনি তাঁদের সমগ্র ভারতবর্ষের জন্য সংবিধান রচনার মধ্যে পাকিস্তানের দাবিকে সন্নিহিত করতে বলেছিলেন, ভারতবর্ষের উপর থেকে ব্রিটিশদের প্রভাবকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিলেন এবং কংগ্রেস যদি এই নীতি থেকে সরে আসে তবে কংগ্রেসীদের বিদ্রোহ করতে বলেছিলেন। মনে হয় দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশকে বিভক্ত করা আটকাতে তিনি তখন মরিয়া হয়ে চারিদিকে পথ অনুসন্ধান করছিলেন, কোথায় শক্তি আছে তা খতিয়ে দেখছিলেন। কিন্তু ভরসা করবার মতন, যাকে অবলম্বন করে নতুন করে সংগ্রাম শুরু করা যায় তেমন কোন শক্তি তিনি খুঁজে পাননি। তাঁর ডাকে কেউ সাড়া দেবে এমন বোধও তাঁর মধ্যে জাগেনি। কংগ্রেসের নেতারা তাঁকে বিমুখ করেছিলেন। গান্ধীজীও শেষ পর্যন্ত বিদ্রোহের কথা না তুলে কংগ্রেস কর্মীরা যদি তাঁদের নেতাদের অস্বীকার করেন তা হলে কী বিপদ হতে পারে তার কথা বলে ওয়ার্কিং কমিটির দেশবিভাগের প্রস্তাব মেনে নিতে বলেছিলেন। ওয়ার্কিং কমিটির সভায় গান্ধীজী নেহরু এবং প্যাটেলের কাছে মৃদু অভিযোগ তুলে বলেছিলেন যে তাঁরা দেশবিভাগের পরিকল্পনা নিয়ে নিজেদের মধ্যে আলোচনা করার আগে তাঁকে কিছুই জানাননি। নেহরু জোর দিয়ে বলেন যে তিনি গান্ধীজীকে সব কিছুই জানিয়েছিলেন। গান্ধীজী আবার বলেন যে দেশবিভাগের পরিকল্পনা সম্পর্কে তাঁর জানা ছিল না। নেহরু এবার অন্য কথা বলেছিলেন। তিনি জানিয়েছিলেন যে নোয়াখালি অনেক দূরে। তাই তিনি গান্ধীজীকে দেশবিভাগ সম্পর্কে মোটামুটিভাবে কিছু লিখে থাকলেও বিশদভাবে বর্ণনা করেননি।[১৪৯] মনে হয় এরপর আর গান্ধীজীর কিছু বলার ছিল না। হয়তো কিছু করারও ছিল না। তাঁর পায়ের তলার মাটি সরে যেতে শুরু করেছিল। তবু মাউন্টবেটেন আসবার পরেও তিনি দেশবিভাগ রোধ করবার পথ খুঁজেছেন। অনুরোধ করেছেন, ভয় দেখিয়েছেন। তারপর হতাশ হয়ে কংগ্রেস নেতাদের ইচ্ছার কাছে আত্মসমর্পণ করে নতুন করে জীবনের আদর্শকে প্রতিষ্ঠিত করতে পথে নেমে এসেছিলেন। তাঁর অবস্থা তখন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের 'পরশ পাথর' কবিতার সন্ন্যাসী ঠাকুরের মতো—

সন্ন্যাসী আবার ধীরে পূর্ব পথে যায় ফিরে
খুঁজিতে নতুন করে হারানো রতন।
সে শকতি নাহি আর— নুয়ে পড়ে দেহ ভার,
অন্তর লুটায় ছিন্ন তরুর মতন।
পুরাতন দীর্ঘ পথ পড়ে আছে মৃতবৎ
হেথা হতে কত দূর, নাহি তার শেষ।
দিক হতে দিগন্তরে মরুবালি ধূধূ করে
আসন্ন রজনী ছায়ে ম্লান সর্বদেশ।
অর্ধেক জীবন খুঁজি কোন্ মনে চক্ষুবুজি
স্পর্শ লভেছিল যার এক পল ভর,.
বাকি অর্ধ ভগ্ন প্রাণ আবার করিছে দান
ফিরিয়া খুঁজিতে সেই পরশ পাথর।

গান্ধীজী তখন প্রকৃতই একা। কংগ্রেসের সঙ্গে তখন তাঁর বিচিত্র সম্পর্ক। কংগ্রেসের

প্রথম সারির নেতারা তাঁদের বিবেচনামতো সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছেন। কিন্তু তাঁদের ভয় ছিল সাধারণ কর্মীরা কি তাঁদের সিদ্ধান্ত মেনে নেবেন! গান্ধীজী তাঁদের সাহায্যে এগিয়ে গিয়েছিলেন। কীভাবে, সে সম্পর্কে উপরে আলোচনা করা হয়েছে। কিন্তু কেন তিনি কংগ্রেসের অধিবেশনে ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব নেবার পরামর্শ দিয়েছিলেন? বিদ্রোহ করবার অবস্থা যখন তাঁর ছিল না তখন নিজের অসহায় অবস্থা নিয়ে তিনি তো চুপ করে থাকলেই পারতেন। সেদিন এই প্রশ্ন অনেকের মনেই দেখা দিয়েছিল। পরবর্তী সময়েও বারবার এই প্রশ্ন উঠেছে। এ সম্পর্কে গান্ধীজী তাঁর নিজের বক্তব্য তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন। ১৯৪৭ সালের ২২শে জুন 'হরিজন' পত্রিকায় প্রকাশিত এক প্রবন্ধে বলা হয়েছিল: "একজন পত্রলেখক গান্ধীজীকে লিখেছেন যে তিনি (গান্ধীজী) ঘোষণা করেছিলেন যে ভারতবর্ষকে ভাগ করার অর্থ তাঁর দেহকে বিভক্ত করা। তিনি এখন দুর্বল হয়ে পড়েছেন। লেখক তাঁকে প্রস্তাবিত বিভাজনে বিরোধিতা করার জন্য নেতৃত্ব দিতে আহ্বান করেছেন। এই ব্যঙ্গ তিনি স্বীকার করতে পারেন না। যখন তিনি ঐ বিবৃতিটি দিয়েছিলেন তখন তিনি জনগণের অভিমত ব্যক্ত করেছিলেন। কিন্তু আজ যখন জনমত তাঁর বিরুদ্ধে তখন কি তিনি জোর খাটাতে পারেন? লেখক আরও যুক্তি দিয়েছেন যে তিনি (গান্ধীজী) প্রায়ই বলে থাকেন যে অসত্য এবং অন্যায়ের সঙ্গে আপোষ করা ঠিক নয়। অভিব্যক্তিটি (assertion) সঠিক। তিনি এ কথা জোর দিয়ে বলতে পারেন যে যদি কেবল অমুসলমান ভারতবর্ষও তাঁর সঙ্গে থাকত তা হলেও তিনি দেখিয়ে দিতে পারতেন যে প্রস্তাবিত দেশবিভাগকে কী করে আটকান যায়। কিন্তু তিনি খোলাখুলি মেনে নিচ্ছেন যে তিনি সেকেলে হয়ে গিয়েছেন অথবা তাঁকে সেইরকম মনে করা হচ্ছে।[১৫০]

গান্ধীজী বলেছিলেন যে তাঁকে সেকেলে বলে মনে করা হচ্ছে। কে মনে করছে? বস্তুত যাঁরা তাঁর অনুগামী বলে পরিচিত ছিলেন, স্বাধীনতার সংগ্রামে মাঝে মাঝে মতপার্থক্য দেখা দিলেও যাঁরা এতকাল তাঁর নেতৃত্ব মেনে এসেছেন তাঁদের কাছেই তখন তিনি সেকেলে হয়ে গিয়েছিলেন। অর্থাৎ উদ্ভূত পরিস্থিতিতে গান্ধীজী নতুন করে নেতৃত্ব দিতে অক্ষম বলেই তাঁরা ধরে নিয়েছিলেন। তাই এই কথার মধ্যে গান্ধীজীর আর্তি ফুটে উঠেছিল। মুসলিম লীগ তো চাইছিলই আর কংগ্রেস এবং হিন্দুদের উল্লেখযোগ্য সংগঠনগুলি তখন দেশবিভাগ মেনে নিতে উদগ্রীব হয়ে উঠেছিল। শেষ পর্যন্ত তাঁদের সুরেই তিনি সুর মিলিয়েছিলেন। তাই দেশবিভাগের দায়িত্ব গান্ধীজীর না হলেও, দেশবিভাগকে আটকাতে না পারার দায় কিছুটা তাঁকেও বহন করতে হয়েছে। যা পাওয়া গেল তা তিনি চাননি।

॥ পরিণতি-খ ॥

॥ মাউন্টবেটনের ভূমিকা : আলেয়ার আলো ॥

সূচনা

১৯৩০ সালে প্রথম গোলটেবিল বৈঠকে মৌলানা মহম্মদ আলি ইংরেজ প্রভুদের সম্বোধন করে বলেছিলেন, বর্তমানে যে নিয়ম প্রচলিত তা হল বিভেদ সৃষ্টি কর এবং শাসন কর। ভারতবর্ষে এর শ্রম বিভাজন ঘটেছে। সেখানে আমরা বিভেদ সৃষ্টি করি আর আপনারা শাসন করেন।

কথাটি বক্রোক্তি, কিন্তু তাৎপর্যপূর্ণ। ভারতবর্ষের ইতিহাসে এক দিকে যেমন মহামিলনের সুর ধ্বনিত হয়েছে তেমনি খাল কেটে কুমির আনার মতো স্বজন বিরোধের মোকাবিলায় বিদেশীকে দেশে ডেকে আনার ঘটনাও এখানে ঘটেছে। এই কাজ শুরু হয়েছিল জয়চাঁদ-পৃথ্বিরাজের আমল থেকেই। পলাশীর যুদ্ধেও সেই ঘটনারই পুনরাবৃত্তি হয়েছে। আর সেই বিরোধের তরঙ্গাভিঘাতে বিক্ষুব্ধ ভারতবর্ষে মাউন্টবেটন এসেছিলেন ক্ষমতা হস্তান্তর করতে। সেই কাজ তিনি ভালভাবেই সম্পন্ন করেছিলেন এবং সেই সঙ্গে ভারতবাসীর অন্তর্কলহ মিটিয়ে সম্প্রীতি প্রতিষ্ঠার কফিনে শেষ পেরেকটি পুঁতে দিয়েছিলেন। তাতে দেশবিভাগ হয়েছিল, কিন্তু অন্তর্কলহ মেটেনি। এক নতুন আয়তনে, এক নতুন মাত্রায় বিরোধ আর বিদ্বেষ সমগ্র দেশে, আসলে দুটি রাষ্ট্রে পরিব্যাপ্ত হয়ে গিয়েছিল। ক্ষমতার হস্তান্তর হয়েছিল লক্ষ লক্ষ মানুষকে দেশবিভাগের যূপকাষ্ঠে ফেলে দিয়ে। আর তাতে দেশের মাটিই কেবল আলাদা হয়ে যায়নি, আলাদা হয়ে গিয়েছিল মানুষের মন। দেশবিভাগ কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। এটি হল দীর্ঘ প্রয়াসের পরিণতি। সেই প্রয়াস যে সব সময় গোচরীভূত হয়েছে তা নয়, তার প্রয়াস কখন কখন ফল্গুধারার মতো দৃষ্টির বাইরে প্রবাহিত হয়েছে। বহু ঘাত-প্রতিঘাতের, বহু মান-অভিমানের, বহু ভুল-ত্রুটির অবশ্যম্ভাবী পরিণাম হল দেশবিভাগ। ভারতবর্ষের শেষ ভাইসরয় মাউন্টবেটন হলেন এই ঘটনার কারুকৃৎ। তিনি ব্যাধিটি ধরতে পেরেছিলেন। দক্ষ সার্জনের ভূমিকায় দাঁড়িয়ে তিনি অঙ্গচ্ছেদকে ব্যাধির নিদান বলে মেনে নিয়েছিলেন। সেই কাজে তিনি সফলও হয়েছিলেন। তাঁর 'অপারেশন' সার্থক, কিন্তু বিরোধের ব্যাধিগ্রস্ত হিন্দু-মুসলমান নিরাময় হয়নি। এ জন্য দেশবিভাগে মাউন্টবেটনের ভূমিকার মূল্যায়ন করতে হলে যে ভূমিকায় দাঁড়িয়ে তিনি তাঁর কাজ সিদ্ধ করেছিলেন তার দিকে সিংহাবলোকন করা দরকার।

শক-হুন-পাঠান-মোগল বহিরাগত হয়েও যেমন ভারতবর্ষে এক দেহে লীন হয়েছে তেমনি এ কথাও অবিসংবাদী সত্য যে ভারতবর্ষে বসবাসকারী সব মানুষের ধর্ম এক নয়। দীর্ঘ দিন ধরে তারা পাশাপাশি বাস করেছে মিলন ও বিরোধের মধ্য দিয়ে। মিলনকে

উপেক্ষা করে যখনই বিরোধকে বড় করে দেখা হয়েছে তখনই ভারতবর্ষে দুর্দিন দেখা দিয়েছে, সংঘাত হয়ে উঠেছে অনিবার্য। সব সময় সংঘাত যে শারীরিক সীমায় পৌঁছেছে তা নয়, তা অনেক সময় মানসিক স্তরকে কুটিল করে দিয়েছে।

বস্তুত সাম্প্রদায়িকতা প্রথম প্রথম এই বিশ্বাসের ভিত্তিতে উত্তেজিত হয় যে সম-ধর্মাবলম্বী মানুষদের মধ্যে কতকগুলি ধর্ম-নিরপেক্ষ সাধারণ স্বার্থও আছে। এই ধারণাই মানুষের মনে এমন বিশ্বাস সৃষ্টি করে দেয় যে একটি ধর্ম-সম্প্রদায়ের অসাম্প্রদায়িক স্বার্থগুলির সঙ্গে অন্য ধর্ম-সম্প্রদায়ের অসাম্প্রদায়িক স্বার্থগুলির বৈসাদৃশ্য আছে। এই বিশ্বাস ক্রমশ বিস্তারিত হয়ে বিভিন্ন ধর্ম-সম্প্রদায়ের মানুষের মধ্যে সংঘাতের মানসিকতা সৃষ্টি করে। এর ফলে মানুষ ভুলে যায় যে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক ক্ষেত্রগুলিতে ধর্ম-নিরপেক্ষভাবে সকল মানুষের মধ্যে একটি ঐক্য আছে। প্রথম পর্যায়ে সাম্প্রদায়িকতার মানসিকতা এইভাবে পুষ্টি লাভ করে। ভারতবর্ষ দীর্ঘ দিন ধরে বিভেদের মধ্যে, বৈচিত্র্যের মধ্যে ঐক্যের যে-সাধনা করেছিল তার পদবিক্ষেপ ছিল আত্মিক ক্ষেত্রে। আত্মগত মিলন সমাজবন্ধনকে দৃঢ় করেছিল। ব্রিটিশ শাসন প্রতিষ্ঠিত হবার সঙ্গে সঙ্গে সমাজ যখন ভেঙে যেতে থাকে তখন আত্মিক বন্ধনও শিথিল হয়ে যায়। আর এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে বিদেশী শাসক তার বিভেদ নীতি চালু করে। রাজনৈতিক চেতনা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে সেই বিভেদ রাজনৈতিক স্বার্থসিদ্ধির পঙ্কিল আবর্তে জড়িয়ে পড়ে। ইংরেজ শাসন তাকে প্রশ্রয় দিতে থাকে। অসাম্প্রদায়িক দাবিগুলির প্রতি কোন রকম সহানুভূতি না দেখালেও ইংরেজ সরকার সাম্প্রদায়িক দাবিগুলি সঙ্গে সঙ্গে মেনে নিতে থাকে। ১৮৮৫ সাল থেকে ১৯০৫ সাল পর্যন্ত কংগ্রেসের একটি দাবিও সরকারের অনুমোদন লাভ করতে পারেনি। কিন্তু মুসলিম লীগ গঠিত হবার পর থেকেই তাদের দাবিগুলি সহানুভূতির সঙ্গে বিবেচিত ও অনুমোদিত হতে থাকে।[১৫১]

সৈয়দ আহমেদ একজন অসাম্প্রদায়িক মানুষ বলে সমধিক পরিচিত। তিনি প্যান ইসলামিক আন্দোলনে বিশ্বাস করতেন না। মুসলমানদের শিক্ষা প্রসারে তাঁর বিরাট অবদানের কথা সকলেই শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করেন। কিন্তু কংগ্রেসের সাম্য এবং স্বাধীনতার দাবির সঙ্গে তিনি একমত হতে পারেননি। হিন্দুরা সংখ্যাগরিষ্ঠ। সুতরাং ব্রিটিশরা যদি চলে যায় এবং দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রচলন হয় তা হলে ভারতবর্ষে হিন্দু রাজত্ব প্রতিষ্ঠিত হবে। সে জন্য সৈয়দ এই ব্যবস্থা সমর্থন করতে পারেননি। তাঁর তো মনে হয়েছিল যে স্বাধীন গণতান্ত্রিক ভারতবর্ষ গঠিত হওয়ার চেয়ে ইংরেজ শাসনই বরণীয়। * আসল কথা হল, সামাজিক ন্যায় বলতে যা বোঝায়, সৈয়দ আহমেদ তা সমর্থন করতে পারেননি, যদিও আধুনিক শিক্ষাকে তাঁর নিজের সম্প্রদায়ের মধ্যে সম্প্রসারিত করতে তাঁর আন্তরিকতার বিন্দুমাত্র অভাব ছিল না। অন্য দিকে হিন্দু মহাসভার প্রথম অধিবেশনে সভাপতিত্ব করেছিলেন কাশিমবাজারের মহারাজা। ঘটনাটি আকস্মিক নয়। প্রকৃতপক্ষে স্বাধীনতার দাবি উত্থাপনের সঙ্গে সঙ্গে হিন্দু এবং মুসলমানদের কিছু বুদ্ধিজীবী এবং ধনিক সম্প্রদায়ের মানুষ তাঁদের গোষ্ঠী স্বার্থ রক্ষার উদ্দেশ্যে ধর্ম-সম্প্রদায়গুলিকে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার করে নিতে চেয়েছিলেন। যে-সাধারণ স্বার্থসূত্রগুলি সকল সম্প্রদায়ের কাছে সমান গুরুত্বপূর্ণ ছিল সেগুলি অবহেলিত হয়ে বিভেদভিত্তিক

* ভিকর উল মুলুক বলেছিলেন : "ঈশ্বর না করুন ভারতবর্ষ থেকে যদি ব্রিটিশ শাসনের অবসান হয় তা হলে হিন্দুরা প্রভুত্ব করবে আর আমরা আমাদের জীবন, সম্পদ ও সম্মানের জন্য সব সময়ে ভয়ে ভয়ে থাকব। এই বিপদ থেকে বাঁচবার একমাত্র উপায় হল ব্রিটিশ শাসনকে বজায় রাখতে সাহায্য করা।[১৫২]

স্বার্থগুলিই প্রাধান্য লাভ করতে থাকে।

আলিগড় ইউনিভার্সিটির অধ্যক্ষ বেক বুঝেছিলেন যে হিন্দু-মুসলমানের ঐক্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিকে দুর্বল করে দেবে। সেজন্য তিনি চেয়েছিলেন যে স্যার সৈয়দ যেন কংগ্রেসের বিরোধী একটি সংগঠন খাড়া করতে উদ্যোগী হন। তাঁর আগ্রহে ১৮৮৮ সালে ইউনাইটেড ইন্ডিয়ান প্যাট্রিয়টিক অ্যাসোসিয়েশন গঠিত হয়েছিল।[১৫৩] খালিকুজ্জমান তো বলেছিলেন যে ব্রিটিশদের আশ্রয়পুষ্ট যে সাম্প্রদায়িকতা সেইটিই হল অসম্মানজনক। বোধহয় তিনি এ কথাই বলতে চেয়েছিলেন যে সম্প্রদায়ের সঙ্গে সাম্প্রদায়িকতা এসেই যায়। তাকে স্বাভাবিক বলেই মেনে নিতে হবে। কিন্তু সেই সাম্প্রদায়িকতার বোধকে যখন কোন তৃতীয় পক্ষ আপন স্বার্থ সিদ্ধির জন্য উৎসাহিত করতে থাকে এবং সেই সাম্প্রদায়িক পক্ষ তৃতীয় পক্ষের আশ্রয়পুষ্ট হয় তখন তা সম্প্রদায়কেও হেয় করে দেয়। খালিকুজ্জমানের কথার মধ্যে অবশ্যই কিছু যুক্তি আছে। কেননা গোষ্ঠীপ্রীতি মানুষের স্বাভাবিক প্রবণতা। আর তা সব সময় দূষণীয় নাও হতে পারে। কিন্তু এই গোষ্ঠীপ্রীতি যখন আগ্রাসী হয়ে ওঠে, অন্য গোষ্ঠীর প্রতি আক্রমণাত্মক হয়ে ওঠে তার কার্যকলাপ, তখন তা সমাজে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। আগ্রাসী হয়ে ওঠার একটি কারণ হল এই যে ব্যষ্টি যখন সমষ্টির মধ্যে সাযুজ্য খুঁজে না পেয়ে নিজেকে বিচ্ছিন্ন মনে করে, মনে করে তার পায়ের তলার মাটি সরে যাচ্ছে তখন তার আন্তরিক রক্ষণ-প্রবৃত্তি (defence instinct) তাকে আক্রমণাত্মক করে তোলে। সেই আক্রমণ কখনও হয় নিজের প্রতি, যার পরিণাম আত্মহনন। আবার তা কখন উদ্দীষ্ট হয় অন্যের প্রতি। হতাশার জঠর থেকে উদ্গত এই আক্রমণাত্মক মানসিকতা অনুকূল পরিবেশে সাম্প্রদায়িকতাকে আশ্রয় করে এবং তখন তার দুষ্ট প্রকৃতি একটি আদর্শের আবরণে আচ্ছাদিত হয়ে অনেকের কাছে গ্রহণীয় হয়ে ওঠে। ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসন সাম্প্রদায়িকতাকে অনেকের কাছে গ্রহণীয় হতে অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি করে দিয়েছিল। তারা শাসন পরিচালনায় তিনটি পদ্ধতি অনুসরণ করেছিল। একটি হল, সমাজকে ভেঙে রাষ্ট্রিক কাঠামোকে শক্তিশালী করা। দ্বিতীয়টি হল, জনগণের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টি করা। আর তৃতীয়টি হল, শাসন কাজের জন্য প্রতিনিধি নির্বাচনের ক্ষেত্রে পৃথক নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করা। দ্বিতীয় এবং তৃতীয়টি প্রায় সম্পৃক্ত। তাদের এই কূটকৌশলে প্রভাবিত হয়েছিল হিন্দু-মুসলমান দুটি সম্প্রদায়—কেউ বেশি, কেউ কম। অষ্টাদশ শতাব্দীর নব্বুই-এর দশকে হিন্দুরা গোহত্যা বন্ধের আন্দোলন শুরু করে। এই আন্দোলন ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে অর্থাৎ মিলিটারী এবং ক্যান্টনমেন্ট এলাকায় করা হয়নি। তা পরিচালিত হয়েছিল মুসলমানদের বিরুদ্ধে এবং তাদের এলাকায়। ১৯০৯ সালে পাঞ্জাব হিন্দুসভা প্রতিষ্ঠিত হয়। তার এক নেতা এই অভিযোগ তুলেছিলেন যে কংগ্রেস মুসলমানদের তোষণ করছে। তিনি বলেছিলেন : "একজন হিন্দু কেবল বিশ্বাসই করবে না, উপরন্তু সে তার জীবনে এইটিই প্রতিষ্ঠিত করবে যে প্রথমে সে হিন্দু এবং পরে ভারতীয়।"[১৫৪]

ব্রিটিশ শাসনকে চিরস্থায়ী করার এই ত্রিমুখী প্রয়াসকে কখন কখন বাধা দেবারও চেষ্টা করা হয়েছে। ১৯১৬ সালে লক্ষ্ণৌ কংগ্রেসের সময় কংগ্রেস-লীগ চুক্তি সম্পন্ন হয়েছিল। এর জন্য উদ্যোগী হয়েছিলেন তিলক এবং অ্যানি বেসেন্ট। এই চুক্তির মূল কথা ছিল—বিকেন্দ্রীকরণ, প্রাদেশিক স্বায়ত্তশাসন, সাম্প্রদায়িক নির্বাচন এবং ভারতীয়করণ। চুক্তিটিতে এই কথাও বলা হয়েছিল যে প্রাদেশিক আইনসভাগুলিতে মুসলমানদের আসন সংরক্ষিত থাকবে এবং নির্বাচন হবে সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিতে। কেন্দ্রীয় আইনসভায়

নির্বাচিত সদস্যদের (মোট সদস্যসংখ্যার তিন-পঞ্চমাংশ নির্বাচিত, বাকিরা মনোনীত) এক-তৃতীয়াংশ আসন মুসলমানদের জন্য সংরক্ষিত থাকবে। এই প্রসঙ্গ আগেই আলোচিত হয়েছে। এই চুক্তির সার্থক রূপায়ণ না হলেও চুক্তিটি এই কথা স্পষ্ট করে দিয়েছিল যে ভারতবর্ষে যে দুটি বৃহৎ সম্প্রদায় বাস করে তাদের রাজনৈতিক স্বার্থ এক নয়। চুক্তিটির এই ন্যূনতা তিলক ব্রিটিশদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ সংগ্রামের স্বার্থে মেনে নিয়েছিলেন।[১৫৫] মুসলিম লীগের অসহযোগিতায় তিলকের আশা পূর্ণ হয়নি। ১৯২৭ সালে তাঁরা তাঁদের দাবির পরিধি আরও বাড়িয়ে দিয়েছিলেন। একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্তে আসার জন্য নেহরু কমিটি গঠিত হয়েছিল। জিন্না তাতেও সন্তুষ্ট হননি। তিনি পালটা প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন। ফলে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের আদত ইচ্ছা পূর্ণ হয়েছিল। স্বাধীনতার সংগ্রামে মুসলিম লীগ কংগ্রেসের পাশে এসে দাঁড়ায়নি। ভারতবর্ষে ইংরেজ শাসনের পাশাপাশি স্বাধীনতা সংগ্রামের ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায় যে কংগ্রেসের আন্দোলনের ফলে গভর্নমেন্ট যখনই শাসন সংস্কারের প্রস্তাব করেছে তখনই সাম্প্রদায়িকতার দাবিতে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়েছে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সময় থেকেই এবং বিশেষ করে যুদ্ধাবসানের পর ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট বুঝতে পেরেছিল যে ভারতবর্ষে আর কেবল শাসন সংস্কার করে ভারতবাসীর স্বাধীনতার দাবিকে ঠেকিয়ে রাখা যাবে না। তাদের এবার এই দেশ ছেড়ে চলে যেতেই হবে। তাই প্রধান মন্ত্রীত্বের আসনে বসার ছ মাস পরে এটলি অধ্যাপক রিচার্ডসনের নেতৃত্বে একটি সর্বদলীয় প্রতিনিধি ভারতবর্ষে পাঠিয়েছিলেন। তাঁরা এসেছিলেন যুদ্ধের পর ভারতবর্ষের অবস্থা কীরকম দাঁড়িয়েছে এবং ভারতবর্ষের বিভিন্ন রাজনৈতিক দলের মেজাজ কেমন তা সরেজমিনে খতিয়ে দেখতে। এই প্রতিনিধি দল জানিয়েছিলেন যে ভারতবর্ষ এবং ব্রিটেনের সম্পর্ক মোটেই সুখকর নয়। যেটুকু শুভেচ্ছা এখনও অবশিষ্ট আছে তা বজায় থাকতে থাকতেই ব্রিটিশদের ভারতবর্ষ ত্যাগ করা উচিত। দেরি করলে অথবা বলপ্রয়োগে আরও কয়েক বছর ভারতবর্ষকে পদানত রাখলে সেই শুভেচ্ছাটুকুও নষ্ট হয়ে যাবে।[১৫৬] এই রিপোর্ট পাবার পরই ব্রিটিশ সরকার মন্ত্রীমিশন পাঠাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন।* সঙ্গে সঙ্গে ভারতসচিব এই কথাও জানিয়ে দিয়েছিলেন যে তাঁরা ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে আসতে চান বটে কিন্তু তাই বলে সংখ্যালঘুদের ভাগ্য তাঁরা সংখ্যাগুরুদের উপরে ছেড়ে দেওয়া সম্ভবপর বলে মনে করেন না। অবশ্য কয়েক দিন পরেই এটলি সংখ্যালঘুদের ভেটো দেবার অধিকার দেওয়া হবে না, এই কথাও জানিয়ে দিয়েছিলেন।

ওয়াভেলও স্বীকার করেছিলেন যে আজাদ হিন্দ বাহিনীর বিচার নিয়ে ভারতীয় সেনাদের মধ্যে যে অসন্তোষ ধূমায়িত হচ্ছিল তাতে বিপদের সম্ভাবনা রয়েছে। তা ছাড়াও কংগ্রেস যদি আবার বিয়াল্লিশের আন্দোলনের মতো আর একটি আন্দোলনের ডাক দেয় আর তাকে দমন করা যদি সম্ভব হয় তা হলেও তার ফলে যে-পরিস্থিতির উদ্ভব হবে তাকে সামলাবার মতো পর্যাপ্ত দক্ষ অফিসার সরকারের নেই। বস্তুত এই রিপোর্ট এবং ধারণার পটভূমিতে ক্ষমতার হস্তান্তরের প্রশ্নটি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

এটি জানা কথা যে যুদ্ধের সময় থেকেই ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট কংগ্রেসের সঙ্গে মিটমাটের চেষ্টা করে আসছিল। তারা বুঝতে পেরেছিল যে মুসলিম লীগকে কাছে পেলেও তাদের

---

* একটি প্রচলিত ধারণা এবং রজনীপাম দত্তও লিখেছেন যে বোম্বাই-এর নৌ-বিদ্রোহ ১৮-২-৪৬ তারিখে শুরু হয়েছিল এবং তাতে ভয় পেয়ে এটলি ১৯-২-৪৬ তারিখে মন্ত্রীমিশন পাঠাবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছিলেন। কথাটি ঠিক নয়। ব্রিটিশ মন্ত্রীসভা ২২শে জানুয়ারি মন্ত্রীমিশন পাঠাবার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন।

কার্যসিদ্ধি হবে না। যুদ্ধে ভারতবাসীর সহযোগিতা পেতে হলে কংগ্রেসকেও কাছে পাওয়া দরকার। এই অনুভূতির বশবর্তী হয়েই তাঁরা ক্রিপসকে ভারতবর্ষে দৌত্য করতে পাঠিয়েছিলেন। কিন্তু তাঁদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হয়নি। কেন হয়নি তার কারণ উল্লেখ করে ক্রিপস নিজেই ১০-৪-৪২ তারিখে চার্চিলকে লিখেছিলেন : "এটিকে বাতিল করার প্রধান কারণ হল কংগ্রেসের মতে এখনই একটি জাতীয় সরকার গঠন করা উচিত এবং সাংবিধানিক পরিবর্তন ছাড়াই একটি প্রতিশ্রুতি দেওয়া দরকার যাতে বলা হবে যে নতুন সরকার স্বাধীন সরকারের মতো কাজকর্ম করবে আর এর সদস্যরাও তাঁদের কাজকর্ম করবেন সংবিধানসম্মতভাবে গঠিত সরকারের সদস্যদের মতো।"[১৫৭] এদিকে হারবার্ট লিনলিথগোকে জানিয়েছিলেন যে হিন্দু মহাসভা ভীষণভাবে জাপানীদের অনুকূলে। সুতরাং নেহরুকে যদি প্রতিরক্ষার ভার দেওয়া হয় তা হলে তারা কংগ্রেসের তীব্র বিরোধিতা করবে।[১৫৮] ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট হিন্দু মহাসভার প্রতিক্রিয়ায় প্রভাবিত হয়েছিলেন বলে মনে হয় না। নেহরুকে প্রতিরক্ষামন্ত্রী রূপে হিন্দু মহাসভার পছন্দ না করার যে কারণ সেইটিই সরকারের কাছে তাঁকে গ্রহণযোগ্য করার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। কিন্তু স্বাধীনতার গ্যারান্টি এবং তাৎকালিক আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার দিতে স্বীকৃত না হওয়ায় ক্রিপস জমাট বরফ গলাতে সক্ষম হননি। এর পরের ঘটনাবলী সকলের জানা। কংগ্রেসের 'ভারত ছাড়ো' আন্দোলনের প্রস্তাব, নেতাদের কারাবন্দী, তার দেশব্যাপী প্রতিক্রিয়া এবং গান্ধীজীকে হিংসাত্মক ঘটনার জন্য দায়ী করায় তার প্রতিবাদে তাঁর অনশন। * তার পরে জেল থেকে মুক্তি এবং মন্ত্রীমিশনের ভারতবর্ষে আগমন।

এর মধ্যেই অচল অবস্থা দূর করতে রাজাগোপালাচারী তাঁর পরিকল্পনা পেশ করেছিলেন। সেই পরিকল্পনাকে ভিত্তি করে গান্ধীজী জিন্নার সঙ্গে আলোচনা শুরু করেছিলেন। ক্রিপস প্রস্তাবে দেশকে ভাগ করবার কথা ছিল, রাজাজীর ফরমুলাতেও তা সমর্থিত হয়েছিল। আর গান্ধীজী তা নিয়ে কথা বলবার জন্য জিন্নার সঙ্গে দেখা করেছিলেন। তার ফলে মনে করা গিয়েছিল যে মিলনের একটি সূত্র পাওয়া গিয়েছে। এই দৃষ্টিকোণ থেকেই 'টাইমস অফ ইন্ডিয়া' মন্তব্য করেছিল : "ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট ক্রিপসের মাধ্যমে পাকিস্তান স্বীকার করেছিল, কংগ্রেস তা করেছে, গান্ধীর মাধ্যমে। এখন প্রশ্ন হল তার বিস্তারিত বিষয়গুলি স্থির করে নেওয়া।"[১৬০]

আপাতদৃষ্টিতে পত্রিকাটির এই অভিমতকে সঠিক বলে মনে হলেও তা যথার্থ নয়। ঠিক কথা যে ক্রিপস অনিচ্ছুক প্রদেশগুলির মূল ভূখণ্ডের বাইরে থাকার অধিকার অনুমোদন করেছিলেন এবং রাজাজীর প্রস্তাবে দেশবিভাগের কথা বলা হয়েছিল। কিন্তু

---

* প্রসঙ্গত : গান্ধীজী যখন জেলে অনশন করেছিলেন তখন লিনলিথগো ছিলেন ভাইসরয় এবং ওয়াভেল সেনাধ্যক্ষ। ওয়াভেল লিনলিথগোকে ২৪-২-৪৩ তারিখে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন : "আমি ক্রিস্টির (ভাইসরয়ের ডেপুটি প্রাইভেট সেক্রেটারী) কাছ থেকে একটি চিঠি পেয়েছি। তাতে তিনি লিখেছেন যে আপনি জানতে চেয়েছেন গান্ধীজীর অনশন সেনাবাহিনীর উপর কীরকম প্রভাব বিস্তার করেছে এবং তাঁর মৃত্যু হলে কী অবস্থা হবে সে সম্পর্কে আমার কী ধারণা। ... বলা যায় যে এ সম্পর্কে তাদের ধারণা সম্পূর্ণ নিরপেক্ষ অথবা তারা মনে করে যে সেনাবাহিনীর সঙ্গে এর কোন সম্পর্ক নেই। গান্ধীজীর যদি মৃত্যু হয় আমার তো মনে হয় না যে তাদের এই মনোভাবের কোন পরিবর্তন হবে। বস্তুত আমার তো মনে হয় না যে এই পৃথিবী থেকে গান্ধী বিদায় নিলে কেউ তাকে স্বাগত করবে না।"

এর ঠিক এক দিন পরে চার্চিল লিনলিথগোকে একটি 'জরুরী এবং অত্যন্ত গোপনীয়' চিঠিতে লিখেছিলেন : "গান্ধীর অনশনের বিশ্বাসযোগ্যতা সম্পর্কে ভীষণ সন্দিহান না হয়ে আমি পারছি না। ...এর মধ্যে কপটতা যদি কিছু থাকে তবে তা প্রকাশ করে দিলে খুব ভাল হয়। কংগ্রেসের হিন্দু ডাক্তাররা যাঁরা তাঁকে ঘিরে থাকেন তাঁদের পক্ষে গান্ধীর খাদ্যের মধ্যে গ্লুকোজ বা অন্য কোন রকম পুষ্টি ঢুকিয়ে দেওয়া সহজ।[১৫৯]

কংগ্রেস ক্রিপস প্রস্তাব মেনে নেয়নি আর গান্ধীজী রাজাগোপালাচারীর পরিকল্পনা নিয়ে কথা বললেও জিন্নার পাকিস্তানের দাবির পিছনে দ্বি-জাতি তত্ত্বের যে ধারণা ছিল তা সমর্থন করেননি। তার ফলে ক্রিপস যেমন সফল হননি তেমনি গান্ধী-জিন্না আলোচনাও ব্যর্থ হয়েছিল। তবে এ কথা স্বীকার করতে হয় যে ক্রিপস যে-প্রতিশ্রুতির পরিমণ্ডলে রেখে দিয়ে ভারতবর্ষের স্বাধীনতাকে তখনকার মতো আটকে রাখতে চেয়েছিলেন এবং রাজাজীর প্রস্তাবে যেভাবে মুসলিম লীগের ভারতবর্ষ থেকে বেরিয়ে গিয়ে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র গঠনের দাবিকে মেনে নেওয়া হয়েছিল মন্ত্রীমিশন সেই সূত্র ধরেই আলোচনায় অগ্রসর হয়েছিলেন। তাঁদের সুপারিশগুলিও প্রায় সেই সূত্র ধরেই রচিত হয়েছিল। আর তাঁরা যেখানে কাজ শেষ করেছিলেন মাউন্টবেটেন সেখান থেকেই তাঁর কাজ শুরু করেন। এইসবগুলির মধ্যেই একটি ধারাবাহিকতা প্রচ্ছন্ন আছে। কৃপালনী বলেছেন যে এটলির ২০-২-৪৬ তারিখের ঘোষণায় যেখানে বলা হয়েছিল যে তাঁরা ১৯৪৮ সালের মধ্যেই ভারতবর্ষ ত্যাগ করে চলে যাবেন সেখানেই পাকিস্তানের দাবি মোটামুটিভাবে মেনে নেওয়া হয়েছিল। কেননা এটলি বলেছিলেন যে সব কটি অঞ্চলের প্রতিনিধিদের নিয়ে গণপরিষদ যদি কাজ করতে না পারে তবে যেসব অঞ্চল একসঙ্গে থাকতে চাইবে তাদের নিয়েই কেন্দ্রীয় সরকার গঠিত হবে। আর বাকি অঞ্চলগুলিকে চালু প্রাদেশিক সরকারের কাছে ছেড়ে দেওয়া হবে।* এটলি জানতেন যে তিনি যখন এই বিবৃতি দিচ্ছিলেন তখন লীগ গণপরিষদ বয়কট করেছিল। এ থেকে পরিষ্কার বোঝা যায় যে মুসলিম লীগকে তুষ্ট করতে ইংলন্ডের শ্রমিক সরকারও কতটা আগ্রহী ছিলেন। আর মন্ত্রী পরিষদের সদস্যরূপে এসে পেথিক লরেন্স তো গান্ধীজীকে জানিয়ে দিয়েছিলেন যে গণপরিষদ 'কাজ শুরু করার পরেই স্বাধীনতা দেওয়া হবে'। তার আগে নয়।

মন্ত্রীমিশন নেতাদের সঙ্গে দীর্ঘ আলোচনা করেছিলেন। তাঁরা একাধিক সুপারিশও করেছিলেন। তাঁদের সঙ্গে ওয়াভেলও তাঁর নিজস্ব ভঙ্গীতে প্রয়াস চালিয়েছিলেন। মন্ত্রীমিশন ১৬-৫-৪৬ তারিখে যে সুপারিশ উপস্থাপিত করেছিলেন তাতে পাকিস্তানের দাবি নাকচ করে দেওয়া হলেও মুসলমান-প্রধান অঞ্চলগুলিকে সার্বভৌম ভারতবর্ষের অন্তর্ভুক্ত থেকে স্বাতন্ত্র্য দিতে চেয়েছিলেন। তাঁরা ভারতবর্ষের সংবিধান রচনার জন্য গণপরিষদ গঠনের কথা এবং যত দিন না ক্ষমতার হস্তান্তর হচ্ছে তত দিন শাসন কাজ চালাবার জন্য অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের কথা বলেছিলেন। এ সম্পর্কে আগে আলোচনা করা হয়েছে। জিন্না একে পোকায় কাটা পাকিস্তান মনে করেও তা মেনে নিয়েছিলেন। প্রসঙ্গত উল্লেখ

* এটলি ২০-২-৪৬ তারিখে বলেছিলেন : "হিজ ম্যাজিস্টিস গভর্নমেন্ট মন্ত্রীমিশনের পরিকল্পনা অনুসারে ভারতবর্ষে সব কটি দলের দ্বারা গৃহীত সংবিধান যে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠিত করবে তার কাছে ক্ষমতা হস্তান্তর করতে চায়। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত সেখানে এমন অবস্থা যে এইরকম একটি সংবিধান এবং কর্তৃত্ব গঠিত হবে বলে মনে হয় না। বর্তমানের অনিশ্চিত অবস্থা বিপজ্জনক এবং তাকে অনির্দিষ্ট কাল চলতে দেওয়া যায় না। হিজ ম্যাজিস্টিস গভর্নমেন্ট এই কথা স্পষ্ট করে জানিয়ে দিতে চায় যে তাঁদের নির্দিষ্ট মত হল ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যে তাঁরা দায়িত্বশীল ভারতীয়দের হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে দেবেন।...কিন্তু ৭ম প্যারাতে (উপরের) উল্লেখিত তারিখের মধ্যে যদি একটি সংবিধান কার্যকর না হয় তা হলে হিজ ম্যাজিস্টিস গভর্নমেন্ট চিন্তা করবেন যে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ার কেন্দ্রীয় সরকারের ক্ষমতা তাঁরা কার হাতে অর্পণ করবেন। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ায় কোন রকম কেন্দ্রীয় গভর্নমেন্টের কাছে, নাকি কতকগুলি অঞ্চলকে বর্তমান প্রাদেশিক সরকারগুলির কাছে অথবা ভারতীয় জনগণের সর্বোত্তম কল্যাণের দৃষ্টিতে যাকে যুক্তিযুক্ত মনে করা হবে তার কাছে।"[১৬১] এই ঘোষণায় কংগ্রেস সন্তোষপ্রকাশ করেছিল। কেননা এর মধ্যে ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন নির্দিষ্ট করা হয়েছিল এবং অনিচ্ছুক অঞ্চলকে (অর্থাৎ পাঞ্জাব এবং বাংলার শিখ ও হিন্দুপ্রধান অঞ্চলগুলিকে) জোর করে কোন রাষ্ট্রের মধ্যে ধরে না রাখার কথা দেওয়া হয়েছিল। হডসন বলেছিলেন—২০-২-৪৭ তারিখের ঘোষণা ভারতীয় রাজনীতির পটভূমিকায় কোন না কোনভাবে পাকিস্তানের স্বীকৃতি। 'টাইমস' লিখেছিলেন—হোয়াইট পেপারের ভাষা থেকে মুসলিম বিভেদকারীরা উৎসাহবোধ করবেন।[১৬২]

করা যায় যে পেথিক লরেন্স ৮-১১-৪৫ তারিখে একটি গোপন চিঠিতে ওয়াভেলকে জানিয়েছিলেন যে জিন্না কোন রকম খর্বিত পাকিস্তান গ্রহণে সম্মত হবেন কি না সে বিষয়ে সংশয় আছে।[১৬৩] জিন্নার এই মতের পরিবর্তন হয়েছিল। জিন্নার সঙ্গে দেখা করার পর ওয়াভেল তাঁর ১৯-১১-৪৬ তারিখের নোটে লিখেছিলেন যে জিন্না তাঁকে জানিয়েছেন যে কলকাতার জন্য জোর করলেও মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাবিত ক্ষুদ্র পাকিস্তান তিনি বাতিল করে দেননি।[১৬৪]

যাই হোক, পরবর্তী ঘটনাপ্রবাহ তাঁর মনঃপূত না হওয়ায় তিনি 'লড়কে লেঙ্গে পাকিস্তান'-এর জিগির তুলেছিলেন। যেদিন মুসলিম লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রাম শুরু হয় তার তিন দিন আগে (১৩-৮-৪৬) ওয়াভেল লন্ডনকে জানিয়েছিলেন : "আট তারিখে অনুষ্ঠিত আমার গভর্নরদের সভা কাজের হয়েছে। এটি খুবই স্পষ্ট যে ইচ্ছা করলে মুসলমানরা সত্যিই সাংঘাতিক গোলমাল শুরু করতে পারেন।"[১৬৫] গোলমাল শুরু করা হয়েছিল কলকাতায়। সেই নারকীয় কাণ্ডে ওয়াভেল যে ভূমিকা নিয়েছিলেন তার বিরুদ্ধে অভিযোগ তুলেছিলেন গান্ধীজী। তখন থেকেই ওয়াভেলের বিদায় আসন্ন হয়ে ওঠে।

এদিকে মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাব সমস্যা সমাধানে ব্যর্থ হচ্ছিল। ৬-১২-৪৬ তারিখে একটি বিবৃতিতে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট সেকথা স্বীকার করেন। কারণ হিসেবে তাঁরা বলেছিলেন যে মিশনের প্রস্তাবে গোষ্ঠী থেকে বেরিয়ে আসবার যে স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে সেইটিই অসুবিধা সৃষ্টি করেছে।[১৬৬] পরিস্থিতি ব্রিটিশ গভর্নমেন্টকে একটি কানাগলির মধ্যে ঠেলে দিয়েছিল। ভারতবর্ষকে স্বাধীনতা থেকে বঞ্চিত করার জন্য তাঁরা এত দিন যে বিষবৃক্ষে জল সিঞ্চন করে এসেছিলেন ক্ষমতা হস্তান্তর যখন অনিবার্য হয়ে উঠেছিল তখন তা ফলবান হয়ে ওঠে। যুদ্ধে সহযোগিতা করার বিষয় নিয়ে কংগ্রেসের সঙ্গে শাসকদের বিরোধ বাধলে তাঁরা তো জিন্না এবং মুসলিম লীগকে কাছে টেনে নিয়েছিলেন। লিনলিথগো জাতীয় সরকার গঠনের দাবি অগ্রাহ্য করে তাঁর এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলে কয়েকজন ভারতীয়কে মনোনীত করে তার পরিধি বাড়াতে চেয়েছিলেন। যুদ্ধের পর জনপ্রতিনিধিদের উপর সংবিধান রচনার ভার দেওয়া হবে এ কথা বলেও তিনি জানিয়ে দিয়েছিলেন যে ভারতবর্ষের জাতীয় জীবনের অঙ্গীভূত কোন বড় এবং শক্তিশালী অংশ যে-ব্যবস্থা সমর্থন করবে না তাকে তাঁর গভর্নমেন্ট মেনে নেবে না। বলা বাহুল্য এর দ্বারা পরোক্ষভাবে জিন্নাকেই সমর্থন করা হয়েছিল। এই কাজ তাঁরা বরাবর করে এসেছেন। জিন্না সেটি বুঝতেন। লিনলিথগোর কথাকে তিনি পরোক্ষে পাকিস্তানের প্রতি সমর্থন বলেই গণ্য করেছিলেন। সেরকম মনে করে জিন্না কিছু ভুল করেননি। লিনলিথগো আমেরিকে লিখেছিলেন : "মুসলিম লীগ যখন যুদ্ধ প্রয়াসে সহযোগিতা করছে তখন জিন্নাকে শত্রু করে না দেওয়া খুবই গুরুত্বপূর্ণ বিষয়।"[১৬৭] গান্ধী-জিন্না আলোচনা ব্যর্থ হবার পিছনেও ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের হাত ছিল বলে অনেকে মনে করেছেন। গান্ধীজী সরাসরি সেই অভিযোগ করেছিলেন। কেউ কেউ বলেছেন যে আলোচনার প্রাথমিক অবস্থায় জিন্না একটি মীমাংসায় আসতে আগ্রহী ছিলেন। কিন্তু ফিরোজ খাঁ নুনের মাধ্যমে আমেরির পাঠান একটি বার্তায় জিন্না জানতে পেরেছিলেন যে ভারত সচিব কেন্দ্রে হিন্দুদের ৪০ শতাংশ, মুসলমানদের ৪০ শতাংশ এবং অন্য সম্প্রদায়গুলির ২০ শতাংশ প্রতিনিধিত্বের কথা বিবেচনা করছেন।[১৬৮] এই বার্তা পেয়েই জিন্না আলোচনা অগ্রসর হতে দেননি। এইভাবে তাঁকে ধরে রাখবার যে-চেষ্টা ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট করে এসেছিল সেইটিই তাদের কাছে বুমেরাং হয়ে ফিরে আসে। জিন্নার মানসিকতা কোন্ খাতে প্রবাহিত হচ্ছে

সেকথা লিনলিথগোর অজানা ছিল না। তিনি ২৪-৫-৪৩ তারিখে একটি 'অত্যন্ত গোপনীয়' চিঠিতে আমেরিকে জানিয়েছিলেন : "আপনি জানেন যে জিন্নার প্রকাশ্য দাবিগুলির আন্তরিকতা আমি কোন দিন বিশ্বাস করিনি। ...আমরা কেবল জিন্নাকে এই কথা ভাবতেই চালিত করব যে আমরা তাঁকে এত গুরুত্বসহকারে গ্রহণ করেছি যে আমরা চাই, তিনি তাঁর প্রস্তাব আরও স্পষ্ট করে ব্যাখ্যা করুন। এর অতিরিক্ত কোন রকম উৎসাহ আমরা তাঁকে দেব না এ কথা আমি মানি। মহাসভা এবং হিন্দু মতকেও এবং বিশেষ করে পাঞ্জাবকে আরও বেশি নিরুৎসাহ করতে চাই না।"[১৬৯] জিন্নাকে দিয়ে তাঁরা এইভাবেই কার্য সিদ্ধি করতে চেয়েছিলেন। জিন্না সততার সঙ্গে সে কাজ করেছেন। প্রশ্রয় পাওয়ার সাধারণ নিয়ম হল যে তা কখন কখন মাত্রাকে অতিক্রম করে এবং প্রশ্রয়দাতার অস্বস্তির কারণ ঘটায়। জিন্নার ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম হয়নি। তাঁর ভূমিকাও কখন কখন গভর্নমেন্টকে বিব্রত এবং বিড়ম্বিত করেছিল। সিমলা সম্মেলন* ব্যর্থ হবার দায় তাঁরা জিন্নার উপর চাপিয়েছিলেন। তবে মনে হয় বন্ধুকৃত্য হিসেবে ওয়াভেল নিজেকেই এর ব্যর্থতার জন্য দায়ী করেছিলেন। এই বিষয়ে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সঙ্গে তাঁর মতের মিল হয়নি। আমেরি একটি চিঠিতে ভাইসরয়কে লিখেছিলেন : "জিন্নার গোঁয়ার্তুমির (intransigence) ফলে আমাদের এই মুহূর্তের পরিকল্পনা ভেস্তে গেল। ...ঘটনাটি যেভাবেই হোক এ কথা প্রমাণ করে দিয়েছে যে গোলমাল ভারতবর্ষ এবং হিজ ম্যাজিস্টিস গভর্নমেন্টকে নিয়ে নয়। তা রয়েছে ভারতবর্ষের ভিতরেই। ...এটিও খুব খারাপ হল না যে কংগ্রেসের নেতারা আপনার ব্যক্তিগত সম্পর্কে এসেছেন এবং তাঁদের এই অবস্থার সম্মুখীন করান হয়েছে যে আপনি অথবা আমি তাঁদের আশা পূরনে বাধা সৃষ্টি করছি না, যে করছে সে হল মুসলিম লীগ।"[১৭০]

বস্তুত অনুকূল বাতাবরণে মুসলিম লীগ তার দাবি ক্রমশই বাড়িয়ে দিচ্ছিল। ১৯৪০ সালে দেশবিভাগের যে দাবি তাদের ছিল ১৯৪৭ সালে তা অনেক বর্ধিত হয়েছিল। ১৯৪০ সালের দাবিতে বলা হয়েছিল যে যেসব এলাকায় মুসলমানরা সংখ্যায় বেশি সেইসব অঞ্চলকে নিয়ে নতুন রাষ্ট্র (বা পাকিস্তান) গঠিত হবে। ১৯৪৭ সালে বলা হয় যে সামগ্রিকভাবে পাঁচটি প্রদেশের সঙ্গে বেলুচিস্তানকে নিয়ে পাকিস্তান গঠিত হবে। এর অতিরিক্ত পশ্চিম পাকিস্তান এবং পূর্ব পাকিস্তানের মধ্যে যোগাযোগ সহজতর করার জন্য 'হিন্দুস্থানের' মধ্য দিয়ে হাজার মাইল লম্বা একটি পথ দিতে হবে। স্বভাবতই এই দাবি কংগ্রেস সমর্থন করতে পারেনি। এই রকম বিরক্তিকর এবং জটিল সমস্যার বোঝা মাথায় নিয়ে মাউন্টবেটেন ভারতবর্ষে এসেছিলেন। মাউন্টবেটেন এসেছিলেন বললে ভুল বলা হয়। আসল কথা হল অনিচ্ছুক মাউন্টবেটেনকে ভারতবর্ষে পাঠান হয়েছিল। ওয়াভেল জানতেন যে জিন্না ভীষণভাবে অসুস্থ। মাউন্টবেটেন হয়তো তা জানতেন না। কিন্তু তিনি বুঝে নিয়েছিলেন যে ক্ষমতা হস্তান্তরের চাবিকাঠি রয়েছে জিন্নার হাতে। গান্ধীজী নন, নেহরুও নন, জিন্না এবং প্যাটেলই হলেন আসল লোক।[১৭১] তিনি বুঝে নিয়েছিলেন যে জিন্নার কাছের লোকেরা তাঁর সম্পর্কে যে-কথাই লিখুন না কেন তিনি বড় কিছু পেয়েছেন এ কথা ইতিহাস কোন দিন স্বীকার করবে না। জিন্না বলেছিলেন : "আমরা চাই ভারতবর্ষ

* সিমলা অধিবেশন ১৯৪৬ সালের ৫ই থেকে ১২ই এপ্রিল অনুষ্ঠিত হয়। এর আলোচ্য বিষয়গুলি নিম্নরূপ ছিল : ১। প্রদেশগুলির গোষ্ঠী : (ক) সংগঠন, (খ) গোষ্ঠীর বিষয়গুলি নির্ধারণের পদ্ধতি, (গ) গোষ্ঠী সংগঠনের চরিত্র ; ২। ইউনিয়ন—(ক) ইউনিয়নের বিষয়সমূহ, (খ) ইউনিয়নের সংবিধানগত চরিত্র, (গ) অর্থ ; ৩। সংবিধান রচনার কলাকৌশল (machinary)—(ক) সংগঠন, (খ) কর্মধারা—(১) ইউনিয়নের, (২) গোষ্ঠীগুলির, (৩) প্রদেশগুলির।

বিভক্ত হোক। আর তা না হলে ভারতবর্ষ ধ্বংস হয়ে যাক।"[১৭২] মাউন্টবেটেন যখন ভারতবর্ষে এসে পৌঁছান তখন এইটিই ছিল ভারতবর্ষের রাজনৈতিক জীবনের পটভূমি এবং পশ্চাৎপট।

সমাপন

কলকাতার দাঙ্গা সরেজমিনে দেখে আসার পর ওয়াভেল গান্ধীজী এবং নেহরুর সঙ্গে আলোচনায় বসেছিলেন। তাঁরা আলোচনা করছিলেন মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাব নিয়ে। ওয়াভেল তাঁদের মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে কংগ্রেস মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাব মেনে নিয়েছে। উত্তরে গান্ধীজী বলেছিলেন যে এ কথা ঠিক যে তাঁরা মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাব মেনে নিয়েছেন। কিন্তু প্রস্তাবের অর্থ তাঁরা যেভাবে করেছেন সেইভাবেই তাঁরা সেটি মেনেছেন। গান্ধীজীও ওয়াভেলকে স্মরণ করিয়ে দিয়েছিলেন যে ওয়াভেল অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের সিদ্ধান্ত আগেই ঘোষণা করেছেন। এখন মুসলিম লীগের আপত্তিতে তা থেকে পিছিয়ে আসা উচিত নয়। নেহরু তো সরাসরি প্রশ্ন তুলেছিলেন যে ভাইসরয় কি এখন মুসিলম লীগের ভয় দেখিয়ে কার্যসিদ্ধির চেষ্টার কাছে (blackmail) নতি স্বীকার করছেন ? ভাইসরয় এই কথায় ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন। ক্ষুব্ধ হয়েছিলেন গান্ধীজী এবং নেহরু ওয়াভেলের প্রতিশ্রুতি ভঙ্গে। গান্ধীজী তাঁর বিরক্তি জানিয়ে ইংলন্ডে চিঠি পাঠিয়েছিলেন। এই ঘটনার বিস্তৃত উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। এর প্রায় ছ মাস পরে ২০শে ফেব্রুয়ারী ১৯৪৭ এটলি তাঁর বেতার ভাষণে নতুন ভাইসরয়রূপে মাউন্টবেটেনের নাম ঘোষণা করেন। তার আগের দিন প্রাতরাশ করার সময় ওয়াভেল ইংলন্ড থেকে একটি 'একান্ত ও গোপনীয়' টেলিগ্রাম পান। সেটি পড়ে তিনি মন্তব্য করেছিলেন : "ওরা আমাকে বিতাড়িত করেছে। হয়তো ঠিকই করেছে।"[১৭৩]

মাউন্টবেটেন যে ভারতবর্ষের ভাইসরয় পদের জন্য নির্বাচিত হবেন এটি তাঁর কাছেও অপ্রত্যাশিত ছিল। তিনি ছিলেন নৌবাহিনীর মানুষ। রীয়ার অ্যাডমিরাল পদে তিনি নিযুক্ত হবেন এমন কথা ঠিক হয়েছিল। কিন্তু এটলি ওয়াভেলের উত্তরাধিকাররূপে মাউন্টবেটেনকেই বেছে নিয়েছিলেন। এটলি বলেছিলেন যে ওয়াভেলের প্রয়াস ছিল ভারতবর্ষ থেকে সামরিক দখল ছেড়ে চলে আসার পরিকল্পনা প্রস্তুত করা। তিনি কোন গঠনমূলক পরিকল্পনা উপস্থাপিত করতে পারেননি। তাই অপ্রসন্ন মুসলিম লীগ এবং কংগ্রেসের বিরোধজনিত অচলাবস্থা থেকে মুক্ত হবার জন্য সঠিক নীতির সুষ্ঠু প্রয়োগের প্রয়োজন। মাউন্টবেটেন রাজপরিবারের মানুষ। এই কাজে তিনিই যোগ্যতম ব্যক্তি। মাউন্টবেটেনও একটি শর্তে এটলির কথায় ভাইসরয় হতে রাজি হয়েছিলেন। পরের দিনের ঘোষণায় তিনি জানিয়েছিলেন যে ১৯৪৮ সালের জুন মাসের মধ্যেই (অর্থাৎ জুলাইয়ের আগেই) ক্ষমতা হস্তান্তরের কাজ সম্পন্ন হবে।[১৭৪] মাউন্টবেটেন ভারতবর্ষে এসে পৌঁছিয়েছিলেন ১৯৪৭ সালের ২৩শে মার্চ।

ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয় নিয়ে ভারতবর্ষে যে ঘটনাপ্রবাহ চলেছিল মাউন্টবেটেন সে সম্পর্কে অবশ্যই সচেতন ছিলেন। ভারতবর্ষে আসবার আগেই তিনি ভি. পি. মেননের লেখা একটি নোট দেখেছিলেন। মেনন প্যাটেলের নির্দেশে এই নোটটি লিখেছিলেন। ক্ষমতা হস্তান্তরের খসড়া পরিকল্পনাটিও মেননের রচনা। তিনি ছিলেন সরকারের রিফর্ম কমিশনার। শাসকবর্গের আস্থা তিনি অর্জন করেছিলেন। প্যাটেলের সঙ্গে তাঁর সম্পর্কও

ভাল ছিল। প্যাটেল তাঁকে জানিয়েছিলেন যে ব্রিটিশ গভর্নমেন্ট যদি এখনই ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস দিয়ে দেয় তা হলে তিনি কংগ্রেসকে পাকিস্তান মেনে নিতে চেষ্টা করবেন।[১৭৫]

ভারতবর্ষে যাত্রা করবার আগে মাউন্টবেটেন ষষ্ঠ জর্জের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। ইংলন্ডেশ্বর ছিলেন তাঁর সম্পর্কে ভাই। তিনি তাঁর সাম্রাজ্যের অন্তর্গত ভারতবর্ষে কোন দিন পদার্পণ করেননি। যে-ভারতবর্ষ তাঁর অজানা তাকেই তিনি স্বাধীনতা দেবেন। এই বেদনা তাঁর মনে ছিল। তিনি চেয়েছিলেন যে ভারতবর্ষ স্বাধীন হতে চায় তো হোক, কিন্তু ব্রিটিশ কমনওয়েলথ থেকে যেন বেরিয়ে না যায়। তিনি মাউন্টবেটেনকে এই দিকে বিশেষ দৃষ্টি দিতে অনুরোধ করেছিলেন। অবশ্য এটলি সেরকম কোন অনুরোধ মাউন্টবেটেনকে করেননি।[১৭৬] মাউন্টবেটেন সম্রাটকে সেই অনুরোধ রক্ষা করার প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলেন এবং সেই প্রতিশ্রুতি রক্ষাও করেছিলেন। ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছিল, দেশবিভাগও হয়েছিল। তবে কমনওয়েলথ ছেড়ে যায়নি। সে আরও পরের কথা।

সময়সীমা সম্পর্কে মাউন্টবেটেন যেমন একটি শর্ত আরোপ করেছিলেন তেমনি তিনি চেয়েছিলেন যে তাঁকে যেন কর্মসূত্র ঠিক করে দেওয়া হয়। পরিবর্তিত পরিস্থিতিতে ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন অপ্রতুল হয়ে গিয়েছিল। ক্ষমতা হস্তান্তরের অনিবার্যতার কারণে নতুন একটি আইন প্রণয়নেরও প্রয়োজন অনুভূত হয়নি। সেজন্য মাউন্টবেটেনের কাজকে সহজ করে দেওয়ার উদ্দেশ্যে তাঁকে একটি কর্মসূত্র দেওয়া হয়েছিল। তাতে বলা হয়েছিল :

১। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের উদ্দেশ্য হল ব্রিটিশ ভারতের প্রদেশগুলি এবং দেশীয় রাজ্যগুলিকে নিয়ে একটি 'ইউনিটারী' (এককেন্দ্রিক) গভর্নমেন্ট গঠন করা।* মন্ত্রীমিশনের পরিকল্পনা অনুযায়ী একটি গণপরিষদ গঠিত হবে এবং সেই গণপরিষদই ঠিক করবে যে সরকার গঠনের পদ্ধতি কী হবে। এটিকে কার্যকর করতে মাউন্টবেটেন সকল দলের সঙ্গে কথা বলবেন। যদি সম্ভব হয় এই সরকারকে কমনওয়েলথে রাখার চেষ্টা করা হবে। (মাউন্টবেটেনের বিশেষ অনুরোধে কমনওয়েলথের বিষয়টি কর্মসূত্রের মধ্যে উল্লেখ করা হয়েছিল।)

২। মন্ত্রীমিশনের পরিকল্পনা কেবল ব্রিটিশ ভারতবর্ষের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য এবং এটি প্রযুক্ত হবে ভারতবর্ষের দুটি রাজনৈতিক দলের ক্ষেত্রে। তবে তাদের কাউকে কোন কিছু গ্রহণে বাধ্য করা যাবে না। যদি পয়লা অক্টোবরের মধ্যে মতৈক্য আনা না যায় তবে মাউন্টবেটেন বিকল্প ব্যবস্থার পরামর্শ দেবেন।

৩। মাউন্টবেটেন দেশীয় নৃপতিদের এ কথা বোঝাতে চেষ্টা করবেন যে তাঁদের রাজ্যগুলিতে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থার প্রচলন করা যুক্তিযুক্ত। মাউন্টবেটেন তাঁদের এ কথাও বোঝাতে চেষ্টা করবেন যে ভবিষ্যতের নতুন গভর্নমেন্টের সঙ্গে তাঁদের সম্পর্ক কী হবে সে বিষয়ে একটি সিদ্ধান্তে আসার জন্য তাঁরা যেন এখনই ব্রিটিশ ভারতের নেতাদের সঙ্গে আলোচনা শুরু করেন।

৪। মাউন্টবেটেনের চেষ্টা হবে ভারতীয়দের ঘনিষ্ঠতম সহযোগিতায় প্রশাসনিক কাজ সম্পন্ন করা।

৫। ভারতীয় সেনাবাহিনীর অখণ্ডতা বজায় রাখার বিষয়ে মাউন্টবেটেন নেতাদের

---

* ১৮-৩-৪৭ তারিখে এটলি মাউন্টবেটেনকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন : "হিজ ম্যাজিস্টিস গভর্নমেন্টের নির্দিষ্ট লক্ষ্য হল, যদি সম্ভব হয় তবে ব্রিটিশ কমনওয়েলথের মধ্যে, মন্ত্রীমিশনের পরিকল্পনা অনুসরণ করে গঠিত এবং পরিচালিত গণপরিষদের মাধ্যমে ব্রিটিশ ভারতবর্ষ এবং ভারতীয় রাজ্যগুলিকে নিয়ে একটি এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র গঠন করা।"[১৭৭]

সচেতন করবেন। ভারত মহাসাগরের রক্ষণ ব্যবস্থায় ভারতীয় সেনাবাহিনীর পক্ষে ব্রিটিশদের সহযোগিতার প্রয়োজনের কথা তিনি সকলকে বোঝাবেন।[১৭৬]

মাউন্টবেটেনকে দেওয়া এই কর্মসূত্রে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের ঘোষিত নীতির স্ববিরোধিতা লক্ষ্য করা যায়। আর সেটি যে ইচ্ছাকৃত সেকথা মনে করলেও বোধহয় ভুল হবে না। এটলি তো আগেই ঘোষণা করেছিলেন যে সংখ্যালঘুকে সংখ্যাগরিষ্ঠের প্রগতিতে 'ভেটো' দেবার অধিকার দেওয়া হবে না। কিন্তু মাউন্টবেটেনকে যে কর্মসূত্র দেওয়া হয়েছিল তাতে পাকিস্তানের দাবি সমর্থন না করে 'ইউনিটারী গভর্নমেন্টের' কথা বলা হলেও এই কথা বলা হয়েছিল যে কোন অনিচ্ছুক রাজনৈতিক দলকে কোন কিছু গ্রহণ করতে বাধ্য করা হবে না। অধিকন্তু, প্রধান রাজনৈতিক দল দুটির (অর্থাৎ কংগ্রেস এবং মুসলিম লীগ) ঐকমত্যেই 'ইউনিটারী গভর্নমেন্ট' হতে পারবে। মুসলিম লীগের ঘোষিত দাবি ছিল পাকিস্তান। সেই দাবি আদায়ের জন্য শেষ পন্থারূপে তারা ভ্রাতৃহত্যাকেই বেছে নিয়েছিল। এসব কথা কারও অজানা ছিল না। অতএব কংগ্রেস এবং লীগের ঐকমত্যের ভিত্তিতে এককেন্দ্রিক সরকার গঠনের কথা বলা আলেয়ার আলো দেখান ছাড়া আর কিছুই নয়। তা ছাড়া দেশীয় নৃপতিদের যে উপদেশ দেওয়া হয়েছিল আপাতদৃষ্টিতে তাকে ভাল মনে হলেও তার মধ্যেও বিপদের ঝুঁকিকে ডেকে আনা হয়েছিল। দেশীয় রাজগুলির সবকটিতে রাজা এবং প্রজারা একই ধর্মাবলম্বী ছিলেন না। কাশ্মীরের রাজা ছিলেন হিন্দু এবং প্রজারা মুসলমান। তবে সেখানে শেখ আবদুল্লার নেতৃত্বে অধিকাংশ মুসলমান কংগ্রেসের আদর্শে বিশ্বাসী ছিলেন। তেমনি হায়দ্রাবাদের নিজাম ছিলেন মুসলমান। কিন্তু সেখানকার জনসাধারণের অধিকাংশই হিন্দু এবং কংগ্রেসের অনুগত। রামানন্দ তীর্থ সেখানকার উল্লেখযোগ্য নেতা। ভূপালের নবাবও হিন্দুপ্রধান রাজ্যের প্রধান ছিলেন। তিনি ছিলেন রাজন্যবর্গের মুখপাত্র। সুতরাং দেশীয় রাজ্যগুলির নৃপতিরা ভবিষ্যৎ রাষ্ট্র (অথবা দুটি রাষ্ট্র)-এর সঙ্গে কী সম্পর্ক বজায় রাখতে চান তার জন্য তাঁদের ভারতবর্ষের বিবদমান রাজনৈতিক নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করা এবং তার পূর্ব প্রস্তুতিরূপে নিজেদের দেশে গণতান্ত্রিক ব্যবস্থা কায়েম করা ক্ষমতা হস্তান্তরের প্রয়াসকে জটিলতর করে দিতে পারত। এই রকম অনিশ্চিত বিপদের সম্ভাবনা থাকলেও মাউন্টবেটেনকে দেওয়া কর্মসূত্রে এই কথাও বলা হয়েছিল যে রাজনৈতিক দলগুলির মধ্যে মতৈক্য সৃষ্টি করতে না পারলে মাউন্টবেটেন বিকল্প ব্যবস্থা উত্থাপন করতে পারবেন। প্রত্যক্ষত মাউন্টবেটেন তাঁর প্রয়াসকে সচেতনভাবে সেই দিকেই ধাবিত করেছিলেন।

এর কারণও ছিল স্পষ্ট। মাউন্টবেটেন জানতেন যে ইংলন্ডে শ্রমিক দলের সরকার থাকলেও ক্ষমতা হস্তান্তরের বিল পার্লামেন্টে গ্রহণ করাতে রক্ষণশীল দলেরও সহযোগিতা দরকার। হাউস অফ কমনস-এ শ্রমিক দলের প্রতিনিধিরা সংখ্যায় বেশি ছিলেন। কিন্তু সেখানেও বিনা বাধায় প্রস্তাব গ্রহণ করাতে হলে রক্ষণশীল দলের সমর্থন দরকার।[১৭৯] আর হাউস অফ লর্ডস-এ তো চার্চিলের রক্ষণশীল দল বেশ ভারী ছিল।[১৮০] চার্চিল প্রথম থেকেই ক্ষমতা হস্তান্তরের বিরোধী ছিলেন। তিনি চাইতেন না যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অঙ্গচ্ছেদ ঘটুক। আর এটলি জানতেন যে ভারতবর্ষে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়টিতে চার্চিলকে রাজি করান তাঁর সাধ্য নয়। তাঁর দলেরও কেউ এই অসাধ্য সাধন করতে পারবেন না। একমাত্র মাউন্টবেটেনই এই কাজ করতে পারেন। এটলির কথামতো মাউন্টবেটেন চার্চিলের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। চার্চিল তাঁকে প্রশ্ন করেছিলেন—কংগ্রেস যে পাকিস্তানে রাজি হবে তার কোন লিখিত প্রমাণ আছে? মাউন্টবেটেন বলেছিলেন যে

একটি চিঠি থেকে তিনি জানতে পেরেছেন যে যদি এখনই ডোমিনিয়ন স্ট্যাটাস দিয়ে দেওয়া হয় তা হলে কংগ্রেসকে পাকিস্তান মেনে নিতে রাজি করান যাবে। চার্চিলের পরের প্রশ্ন ছিল—'কিন্তু গান্ধী' ? মাউন্টবেটেন স্বীকার করে নিয়েছিলেন যে গান্ধীজীকে আগে থেকে বোঝা যায় না (unpredictable)। তবে তাঁর আশা যে নেহরু এবং প্যাটেলের মাধ্যমে তিনি গান্ধীজীকে এক সঙ্কটের মধ্যে ফেলে দিতে পারবেন।[১৮১]

এটি অবশ্য কয়েক মাস পরের কথা। তবে ভারতবর্ষে আসবার কয়েক দিন পরেই (২৮-৩-৪৭) ভি. পি. মেনন মাউন্টবেটেনের সঙ্গে দেখা করেছিলেন। এই প্রথম সাক্ষাতেই মাউন্টবেটেনকে মেনন বলেছিলেন যে জিন্না খণ্ডিত পাকিস্তান নিতেও প্রস্তুত। মেনন লিখেছেন : "তাঁর আগমনের মাত্র চার দিন পরেই আমি বুঝতে পারি যে তিনি কীভাবে কাজ করবেন তা স্থির করে ফেলেছেন এবং মনে মনে তিনি একটি সমাধানও ভেবে রেখেছেন। আমি তাঁকে বলি, আমার ধারণায় জিন্না এবং মুসলিম লীগ একটি কেন্দ্রীয় সরকারে যাওয়ার চেয়ে একটি খণ্ডিত পাকিস্তান পেতেও ইচ্ছা করবেন। আমি তাঁকে মনে করিয়ে দিই যে তিনি ভারতবর্ষে পূর্ণ ক্ষমতা এবং অধিকার নিয়ে এসেছেন এবং দলগুলি যদি কাছাকাছি আসতে না পারে তবে হিজ এক্সেলেন্সিকেই সিদ্ধান্ত নিতে হবে। সেই সিদ্ধান্ত কোন দলেরই মনোমত না হতে পারে।"[১৮২]

কথা প্রসঙ্গে মেনন হয়তো এ কথা মাউন্টবেটেনকে বলে থাকতে পারেন। কিন্তু মাউন্টবেটেন যখন ভারতবর্ষের অবস্থা সম্পর্কে ওয়াকিবহাল ছিলেন এবং কী করবেন তার ছক মনে মনে ঠিক করে রেখেছিলেন তখন মেননের কথা তাঁর কাছে অতিকথন বলে মনে হয়ে থাকতে পারে। মাউন্টবেটেন বুঝতে পেরেছিলেন যে কোন রকম ঐকমত্যে আসার কোন সম্ভাবনা নেই। তাঁর ভারতবর্ষে আসবার ঠিক আগেই কয়েকটি জায়গায় দাঙ্গা হয়েছিল। তিনি পুলিশ প্রধানদের ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তাঁর প্রশ্নের উত্তরে পুলিশের কর্তাব্যক্তিরা জানিয়েছিলেন যে হিংসার ঘটনা বন্ধ করবার ক্ষমতা তাঁদের নেই। মাউন্টবেটেন ভারতবর্ষের সেনা প্রধান স্যার ক্লড অচিনলেককেও একই প্রশ্ন করেছিলেন। অচিনলেকও তাঁদের অক্ষমতার কথা জানিয়েছিলেন। মাউন্টবেটেন এটিও লক্ষ্য করেছিলেন যে যে-মন্ত্রীসভা (ওয়াভেল মন্ত্রীসভা না বলে ভাইসরয়ের এক্সিকিউটিভ কাউন্সিল বলতেন। অর্থাৎ তিনি এটিকে মন্ত্রীসভার মর্যাদা দিতে চাননি। কংগ্রেস এটিকে তাঁর দুরভিসন্ধি বলে মনে করত।) নিয়ে তিনি কাজ করেন তার সদস্যরা পরস্পর বন্ধুভাবাপন্ন নন। তাঁদের অনেকে নিজেদের মধ্যে কথা পর্যন্ত বলেন না। এই অবস্থা দেখে মাউন্টবেটেন স্থির করেছিলেন যে নেতাদের সম্মেলন ডেকে কোন সমাধান খুঁজে পাওয়া যাবে না। ব্যক্তিগত প্রয়াসেই সেই কাজ করতে হবে।[১৮৩] তিনি তাঁর কৌশল ঠিক করে নিয়েছিলেন। নিজের মনে সমাধানের বিকল্প সূত্রও তিনি স্থির করে নেন। ঐকমত্যের সম্ভাবনা যখন নেই তখন এককেন্দ্রিক (ইউনিটারী) গভর্নমেন্টের বিকল্প ব্যবস্থার কথাই তাঁকে ভাবতে হবে। আর সেটি হল দেশবিভাগ এবং পাকিস্তান। কিন্তু সমস্যা হল কংগ্রেসকে এবং বিশেষ করে গান্ধীজীকে তাতে রাজি করান যাবে কী করে ? সমস্যা নেহরুকে নিয়েও ছিল। তিনি বড়ই 'মুডি' বা ভাবপ্রবণ। তাঁকেও রাজি করাতে হবে। মাউন্টবেটেন লক্ষ্য করেছিলেন যে প্যাটেলের সঙ্গে মেননের একটি ব্যক্তিগত সৌহার্দপূর্ণ সম্পর্ক আছে। তিনি মেননকে কাজে লাগান। প্রথম প্রথম গোপনে মেনন দৌত্যের কাজ করতে থাকেন।[১৮৪] মাউন্টবেটেন এটিও উপলব্ধি করেছিলেন যে জিন্নার মূল লক্ষ্য হল ভারতবর্ষে ব্রিটিশদের স্থিত করে রাখা। সুতরাং তিনি যদি মাউন্টবেটেনের

পরিকল্পনা গ্রহণ না করেন তবে ক্ষমতা হস্তান্তরের বিষয়টি জটিল হয়ে যাবে।[১৮৫] এই পরিস্থিতি অতিক্রম করবার জন্য তিনি জিন্নাকে কথার প্যাঁচে জড়িয়ে ফেলতে চেয়েছিলেন। তিনি জিন্নার ক্ষেত্রে এমন অবস্থার সৃষ্টি করতে চেয়েছিলেন যা থেকে জিন্নার বেরিয়ে আসবার কোন উপায় থাকবে না। ১৫-৩-৪৭ তারিখে আলোচনা প্রসঙ্গে জিন্না মাউন্টবেটেনকে বলেছিলেন : "আপনি যদি আমাকে আপনার নির্মম যুক্তি দিয়ে তাড়া করেন তা হলে আমরা অসহায় হয়ে যাব।" এই আলোচনার পরই মাউন্টবেটেন তাঁর কার্যসিদ্ধির চাবিকাঠি পেয়ে গিয়েছিলেন। জিন্নার সম্পর্কে তিনি পরে যে মন্তব্য করেছিলেন তা থেকেই বোঝা যায় যে তিনি ঠিক কীভাবে এগোতে চেয়েছিলেন। তাঁর কর্মধারার একটি অস্পষ্ট ইঙ্গিত এতে আছে। তিনি বলেছিলেন : "(জিন্না) হলেন এক মানসিক বৈকল্যের শিকার। বস্তুত তাঁর সঙ্গে দেখা হবার আগে পর্যন্ত আমি ভাবতেই পারিনি যে প্রশাসনিক কাজ সম্পর্কে সম্পূর্ণ অজ্ঞ, দায়িত্বজ্ঞানহীন এই রকম মানুষের পক্ষে এত ক্ষমতাপূর্ণ পদ অর্জন করা অথবা দখল করে রাখা সম্ভব।"[১৮৬] জিন্নাও বুঝে নিয়েছিলেন যে ক্ষমতা হস্তান্তরের সঙ্গে সঙ্গে দেশবিভাগ হবেই। কিন্তু পাঞ্জাব এবং বাংলাকে ভাগ করা তিনি সমর্থন করতে পারছিলেন না। মাউন্টবেটেন তাঁকে বোঝাতে সমর্থ হয়েছিলেন যে প্রদেশ ভাগ না হলে দেশবিভাগও হবে না। সেই সঙ্গে মোক্ষম অস্ত্ররূপে জিন্নাকে লেখা চার্চিলের চিঠি তো ছিলই। নেহরুকে তিনি ব্যক্তিত্ব দিয়ে প্রভাবিত করেছিলেন। গান্ধীজীর হাতকে নিষ্ক্রিয় করে দিয়ে, তাঁর সহকর্মীদের মনে আশা এবং আশঙ্কাকে জাগিয়ে গান্ধীজী এবং তাঁদের মধ্যে একটি প্রাচীর তুলে দিয়ে মাউন্টবেটেন গান্ধীজীকে অন্ধকার অনিশ্চিতের মধ্যে ঠেলে দিয়েছিলেন। তার ফলে গান্ধীজী তাঁকে জানিয়েছিলেন যে কংগ্রেসের নেতারা তাঁর (গান্ধীজীর) প্রস্তাব* অনুমোদন করেননি। সুতরাং এই অবস্থায় মাউন্টবেটেন তাঁর সঙ্গে আর আলোচনা না করে কংগ্রেসের নেতাদের সঙ্গেই আলোচনা করেন।[১৮৭] এরপর গান্ধীজী পাটনায় চলে যান। প্রথম রাউন্ডে মাউন্টবেটেন জয়লাভ করেন। অবশ্য গান্ধীজীর সম্পর্কে সম্পূর্ণ ভয়মুক্ত হতে তাঁর আরও কিছু দিন সময় লেগেছিল।

প্রাথমিক আলোচনায় মাউন্টবেটেন তাঁর পরিকল্পনা প্রণয়নের কয়েকটি সূত্র নির্দিষ্ট করেছিলেন। সেগুলি হল : (১) দেশবিভাগ হবে প্রাদেশিক অথবা প্রদেশগুলির অংশের ভিত্তিতে। এটি স্থির হবে প্রাদেশিক আইনসভার মাধ্যমে জনগণের ইচ্ছার দ্বারা। (২) ভারতবর্ষের প্রতিরক্ষার জন্য সুপ্রিম ডিফেন্স কাউন্সিল অথবা অন্য কোন রকমের কেন্দ্রীয় কর্তৃত্বের ব্যবস্থা করা। (৩) যত দিন না সংবিধান রচিত হচ্ছে তত দিনের জন্য একটি অন্তর্বর্তী সরকার গঠন করা।

এই বিষয়গুলি নিয়ে নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করার উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠিত হয়েছিল। তার সদস্য ছিলেন মাউন্টবেটেন, ইসমে এবং আরও দুজন। ইতিমধ্যে গভর্নরদের মতামতও মাউন্টবেটেন মেনে নিয়েছিলেন। বাংলা এবং পাঞ্জাবের গভর্নররা দেশবিভাগ সমর্থন করেছিলেন। কিন্তু তাঁরা প্রদেশগুলিকে ভাগ করবার বিপক্ষে মত দিয়েছিলেন।** নেতাদের সঙ্গে আলোচনা করবার ভার কমিটির সদস্যদের দেওয়া হয়।

---

* জিন্নাকে শর্তসাপেক্ষে প্রধানমন্ত্রী হতে আহ্বান করা।

** বাংলার এক সময়ের গভর্নর আর জি কেসি ছিলেন অস্ট্রেলিয়ান। ১৯৪৭ সালের মার্চ মাসে লন্ডনে প্রকাশিত 'An Australian in India' বইতে তিনি লিখেছেন : "আমি বেশ ভালভাবেই বুঝি যে ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের সমস্যার সমাধান খুঁজে বার করতেই হবে। কিন্তু আমি এই বিষয়ে নিশ্চিত যে পাকিস্তান সেই সমাধান নয়।... আমি

মাউন্টবেটেন মনে মনে একটি ছক তৈরি করেছিলেন। তাঁর সহকর্মীরাও ক্ষমতা হস্তান্তরের একটি খসড়া প্রণয়ন করেছিলেন। এই খসড়াটিতে মুসলিম লীগের দাবি যতটা সমর্থিত হয়েছিল কংগ্রেসের দাবি ঠিক ততটাই উপেক্ষিত হয়েছিল। এর কারণ হল এই যে খসড়া প্রণয়ণের ভার যাঁদের উপর দেওয়া হয়েছিল তাঁদের সকলেরই মুসলিম লীগের প্রতি সহানুভূতি ছিল। ভি. পি. মেননের কথা অবশ্য আলাদা। তাঁকে এই পর্যায়ে খসড়া প্রস্তুত করার জন্য বলা হয়নি। মাউন্টবেটেনেরও নিজের ধারণার উপর অতি বিশ্বাস ছিল। তাই খসড়াটি অনুমোদনের জন্য তিনি ২-৫-৪৭ তারিখে লন্ডনে পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। সেটি কিছু সংশোধিত হয়ে ফিরে আসে। মাউন্টবেটেন যে খসড়াটি লন্ডনে পাঠিয়েছিলেন সেটির বিরুদ্ধে নেহরু, গান্ধীজী এবং জিন্না তিনজনেই আপত্তি তুলেছিলেন। কিন্তু যে-খসড়া সংশোধিত হয়ে এসেছিল তা কংগ্রেসের কাছে একেবারেই গ্রহণযোগ্য বলে মনে হয়নি। মাউন্টবেটেন তাঁর ভুল বুঝতে পারেন। এবার তিনি নতুন খসড়া রচনার জন্য মেননকে ডেকে আনেন। মেনন খসড়া তৈরি করে নেহরুকে দেখান। নেহরু সমর্থন করেন। নতুন পরিস্থিতিতে ইংলন্ডের কর্তৃপক্ষ ভাইসরয়ের সঙ্গে কথা বলা প্রয়োজন মনে করেন। নেহরু, প্যাটেল, জিন্না, লিয়াকত আলি এবং বলদেব সিং-এর সঙ্গে আলোচনা করে নিয়ে মাউন্টবেটেন লন্ডন যাত্রা করেন। এবার তাঁর সঙ্গী হন ভি. পি. মেনন।

মাউন্টবেটেন ইংলন্ড থেকে ফিরলেন ৩১শে মে ১৯৪৭। তিনি নেহরু, প্যাটেল, কৃপালনী, জিন্না, লিয়াকত আলি, আবদুর রব নিস্তাব এবং বলদেব সিংকে ২রা জুন এক সভায় মিলিত হতে আহ্বান করেন। প্রারম্ভিক ভাষণে তিনি দেশের অস্থির অবস্থার বর্ণনা করে বলেন যে তাঁরা সকলেই এক অদ্ভুত জরুরী অবস্থার সম্মুখীন হয়েছেন। দেরি করবার কোন সুযোগ নেই। ক্ষমতার হস্তান্তর এখনই করে ফেলতে হবে। তিনি তাঁর নতুন পরিকল্পনার একটি আভাস নেতাদের সামনে তুলে ধরেন। সঙ্গে সঙ্গে এই কথাও জানিয়ে দেন যে ক্ষমতা হস্তান্তরের জন্য পরের বছরের জুন পর্যন্ত অপেক্ষা করার দরকার নেই। দেরি করলে বর্তমান জটিল অবস্থার এক মানসিক প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হবে। এর দু দিন পরেই মাউন্টবেটেন এক সাংবাদিক সম্মেলনে সকলকে অবাক করে জানিয়েছিলেন যে ক্ষমতার হস্তান্তর ঐ বছরের ১৫ই আগস্ট তারিখে সম্পন্ন হবে। ১৫ই আগস্ট কেন ? এই তারিখটি মাউন্টবেটেনের একটি স্মরণীয় দিন। দু বছর আগের এই দিনটিতে তিনি দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে পূর্ব রণাঙ্গণের সুপ্রিম কমান্ডাররূপে বিজয়োৎসব পালন করেছিলেন।

যাই হোক, ২রা জুন মাউন্টবেটেন অবস্থার যে বিশ্লেষণ করেছিলেন এবং ক্ষমতা

একথা বিশ্বাস করি না যে দুটি সম্প্রদায়ের পার্থক্য এত বেশি—অথবা বলা উচিত যে তার স্থায়িত্ব এত বেশি যে সেই সমস্যার সমাধানের জন্য ভারতবর্ষকে ভাগ করতেই হবে।... ভারতবর্ষকে একবার যদি বিচ্ছিন্ন করা হয় তবে সেই ঘা শুকোতে বহু যুগ লেগে যাবে।" কেসি আরও লিখেছেন যে পাকিস্তান সৃষ্টি করার দ্বারা অন্তত কাগজে কলমে একটি সংখ্যালঘুর সমস্যার সমাধান হবে। কিন্তু তার দ্বারাই সৃষ্ট হবে অন্য সংখ্যালঘুদের সমস্যা। প্রায় আট কোটি অমুসলমানদের (অধিকাংশই হিন্দু) পাকিস্তানে মুসলমান শাসিত রাষ্ট্রে বাস করতে হবে। ভারতবর্ষের মুসলমানদের মতো তারাও পাকিস্তানে এমন অবস্থার মধ্যে বাস করবে যা তাদের ভাল লাগবে না। জিন্না মুসলমানদের একাংশের ভারতবর্ষ থেকে বিচ্ছিন্ন হবার দাবি করেছেন। কিন্তু যেসব মুসলমান ভারতবর্ষে থেকে যাবেন তিনি তাঁদের কথা ভাবেননি।[১৮৮] মনে হয় কেসির এই সাবধানবাণী মাউন্টবেটেনের কানে পৌঁছয়নি। খালিকুজ্জমান স্বীকার করেছেন যে পাঞ্জাব এবং বাংলা মুসলিম লীগকে শক্তিশালী হতে সাহায্য করেছিল। আবার পাকিস্তান আদায় করতে লড়াই করার হাতিয়ার দ্বি-জাতি তত্ত্ব সংখ্যালঘু প্রদেশগুলিতে মুসলমানদের বিরুদ্ধে শত্রুতা করেছে।[১৮৯] গান্ধীজী এই কথাই জিন্নাকে বোঝাতে চেয়েছিলেন। জিন্না বোঝেননি। ক্ষমতা হস্তান্তর করার আগ্রহে মাউন্টবেটেনও সেটি বুঝতে চাননি।

হস্তান্তরকে ত্বরান্বিত করতে আহ্বান করেছিলেন তা নেতাদের মনকে উদ্বেল করে দিয়েছিল। তাঁরা এর জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। তাঁদের সকলের মনেই এক শূন্যতা বিরাজ করছিল। মন্ত্রীমিশনের পরিকল্পনা কার্যকর করা যায়নি। মাউন্টবেটেনের প্রথম খসড়াটিও সকলের সমর্থন লাভ করতে পারেনি। আবার কোন একটি সর্বসম্মত সিদ্ধান্তেও নেতারা উপনীত হতে পারেননি। চতুর্দিকে এক হতাশার পরিবেশ। এর মধ্যে মাউন্টবেটেনই ছিলেন একমাত্র আশার আলো। তিনি তাঁর বিকল্প প্রস্তাব নিয়ে উপস্থিত। হতচকিত নেতাদের ভাববার কোন অবকাশ দিতে চাননি তিনি। তিনি জানতেন যে দ্রুততার সঙ্গে কাজ করতে হবে। সিদ্ধান্তে পৌঁছানর জন্য গতিকেও তিনি এক অস্ত্ররূপে প্রয়োগ করেছিলেন। যে-মশাল তিনি ধরে আছেন হয় তাকেই তৎক্ষণাৎ গ্রহণ করতে হবে আর তা না হলে দীর্ঘদিনের জন্য অনিশ্চিতের অন্ধকারে ডুবে যেতে হবে। মশালের আগুনে অন্ধকার দূর হবার সঙ্গে সঙ্গে গৃহদাহও হবে কিনা সেকথা ভাববার সময় তিনি নেতাদের দিতে চাননি।

মাউন্টবেটেনের উপস্থাপিত বিকল্প প্রস্তাবটির মূল সূত্রগুলি ছিল নিম্নরূপ :

(১) চালু গণপরিষদের কাজকর্মে কোন রকম বাধা সৃষ্টি করা হবে না। কিন্তু গণপরিষদ যে সংবিধান রচনা করবে সেটিকে ভারতবর্ষের যেসব অঞ্চল গ্রহণ করতে চাইবে না তাদের উপর চাপিয়ে দেওয়া হবে না।

(২) বিভিন্ন অংশগুলির ইচ্ছা অনুধাবন করার জন্য দুটি পদ্ধতির পরামর্শ দেওয়া হল—

(ক) বিসংবাদী অঞ্চলগুলির প্রতিনিধিদের সঙ্গে মিলিতভাবে বর্তমান গণপরিষদ তা করবে, অথবা

(খ) বিসংবাদী অঞ্চলগুলির প্রতিনিধিদের নিয়ে গঠিত স্বতন্ত্র গণপরিষদ তা করবে।

(৩) প্রদেশগুলির সম্পর্কে নিম্নলিখিত ব্যবস্থাগুলি অবলম্বিত হবে—

(ক) পাঞ্জাব এবং বাংলার আইনসভাগুলি দুটি ভাগে বিভক্ত হবে। একটিতে থাকবেন মুসলমান সংখ্যাগরিষ্ঠ জেলাগুলির প্রতিনিধিরা এবং অন্যটিতে থাকবেন অমুসলমান জেলাগুলির প্রতিনিধিরা। তাঁরা যদি প্রদেশ ভাগ করতে চান তবে প্রত্যেকটি ভাগ নিজের ইচ্ছামতো গণপরিষদে যোগ দিতে পারবে।

(খ) প্রাদেশিক আইনসভা ঠিক করবে যে সে কোন্ গণপরিষদে যোগ দেবে।

(গ) উত্তর-পশ্চিম সীমান্তপ্রদেশে আইনসভার যারা ভোটার তাঁদের ইচ্ছা গণভোটের মাধ্যমে স্থির করা হবে।

(ঘ) অসমের সিলেট জেলাও গণভোটের মাধ্যমে তার ইচ্ছা নির্ণয় করবে।

(ঙ) গভর্নর জেনারেল বেলুচিস্তানের জনগণের ইচ্ছা জানার পদ্ধতি স্থির করবেন।

(৪) প্রাক-চুক্তি আলোচনা (negotiation) হবে—

(ক) দেশবিভাগের ফলে প্রশাসনিক ক্ষেত্রে যেসব কেন্দ্রীয় বিষয় উত্থিত হবে সেগুলি নিয়ে উত্তরাধিকারী সরকারীগুলি (succesor Governments) আলোচনা করবে।

(খ) ক্ষমতা হস্তান্তরের ফলে যেসব বিষয় উত্থিত হবে সেগুলির বিষয়ে সন্ধি করার জন্য উত্তরাধিকারী সরকারগুলি হিজ ম্যাজিস্টিস গভর্নমেন্টের সঙ্গে আলোচনা করবে।

(গ) প্রাদেশিক বিষয়গুলির প্রশাসনের ক্ষেত্র নিয়ে প্রদেশগুলির অংশরা নিজেদের মধ্যে আলোচনা করবে।

(৫) দেশীয় রাজ্যগুলি সম্পর্কে মন্ত্রীমিশনের ১৪ই মে ১৯৪৬-এর স্মারকলিপিতে উত্থাপিত নীতি প্রযুক্ত হবে। এই নীতির সার কথা হল হিজ ম্যাজিস্টিস গভর্নমেন্ট দেশীয়

রাজ্যগুলি থেকে তার কর্তৃত্ব প্রয়োগের অধিকার উঠিয়ে নেবে এবং রাজ্যগুলি তাদের উপর কর্তৃত্ব করার যে-অধিকার দিয়েছিল তা তাদের কাছে ফেরত চলে যাবে। এটি হয়ে গেলে রাজ্যগুলি উত্তরাধিকারী রাষ্ট্রগুলির সম্পর্কে কীরকম রাজনৈতিক সম্পর্ক বজায় রাখতে চায় তা স্থির করবার স্বাধীনতা তাদের থাকবে।[১১০]

মাউন্টবেটেন তাঁর পরিকল্পনাটি নেতাদের কাছে উপস্থাপিত করার পর সকলকেই তাঁদের সম্মতি সেদিন মধ্যরাত্রির মধ্যে জানিয়ে দিতে বলেছিলেন। নেহরু বলেছিলেন যে দেশবিভাগের প্রস্তাব থাকায় তিনি পরিকল্পনাটি পুরোপুরি সমর্থন করতে পারছেন না। তা হলেও এটিকে কার্যান্বিত হতে বাধা দেবেন না। বস্তুত মধ্যরাত্রির আগেই কংগ্রেস সভাপতি কৃপালনী প্রস্তাবটির প্রতি কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির সমর্থন জানিয়ে চিঠি পাঠিয়ে দিয়েছিলেন। বলদেব সিং-ও শিখদের পক্ষ থেকে পরিকল্পনাটি উৎকৃষ্ট বলে সমর্থন করেছিলেন। জিন্না সরাসরি সমর্থন করতে চাইছিলেন না। তিনি ইতস্তত করছিলেন। যে-পাকিস্তান তিনি চেয়েছেন মাউন্টবেটেনের প্রস্তাব তা দিতে পারেনি। তাঁর সহকর্মীরা এটি মেনে নিতে রাজি হবেন তো? জিন্নার দ্বিধা কি ছিল কেবল এই কারণেই? পরিকল্পনাটি মেনে নিলে একটি নির্দিষ্ট তারিখে ক্ষমতার হস্তান্তর হবে। ব্রিটিশদের এ দেশ থেকে চলে যাবার তিনিও কি শেষ পর্যন্ত একজন নিমিত্ত হবেন? এই প্রশ্ন কি ছিল তাঁর দ্বিধার কারণ? যাই হোক, জিন্না জানিয়েছিলেন যে লীগ কাউন্সিলের সঙ্গে কথা না বলে তিনি কোন মতামত দিতে পারবেন না। মাউন্টবেটেন প্রমাদ গুনেছিলেন। তাঁর প্রয়াস কি ব্যর্থ হয়ে যাবে? ইংলন্ড তাকিয়ে আছে তাঁর দিকে। কংগ্রেসকে তিনি রাজি করিয়েছেন। গান্ধীজীকে এড়িয়ে আসতে পেরেছেন। শেষ পর্যন্ত কি তীরে এসে তরী ডুবে যাবে? মাউন্টবেটেনের মধ্যে সেনাপতির সত্ত্বা জেগে উঠেছিল। তিনি দৃঢ় হয়েছিলেন। জিন্নাকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে সময় সেই দিন মধ্যরাত্রি পর্যন্ত। জিন্না এসেছিলেন। মাউন্টবেটেন তাঁকে বলেছিলেন : "আপনি যদি মনে করে থাকেন যে আপনি আপনার অনুগতদের দিল্লীতে ডাকবেন বলে আমি এটিকে সাত দিন ধরে রাখব তা হলে বুঝব যে আপনার মস্তিস্ক বিকৃতি ঘটেছে। আপনি জানেন যে আমরা যখন ফুটন্ত অবস্থায় তখনই এটি রচিত হয়েছে। আপনি আপনার পাকিস্তান পাচ্ছেন—যেটিকে এক সময় পৃথিবীর কোন লোকই সম্ভব বলে মনে করেনি। আমি জানি আপনি বলবেন এটি কীটদষ্ট, তা হলেও এটি পাকিস্তান।"

মাউন্টবেটেন জিন্নাকে আরও জানিয়েছিলেন যে কংগ্রেস এই শর্তে সমর্থন করেছে যে জিন্নাও এটি মেনে নেবেন। এখন জিন্না যদি অন্যথা করেন তবে কংগ্রেস বেঁকে বসবে এবং সব কিছু বানচাল হয়ে যাবে। জিন্না বলেছিলেন যে তিনি তো আর একা মুসলিম লীগ নন। মাউন্টবেটেন জিন্নার এই কথাও মানতে রাজি হননি। তিনি পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছিলেন যে জিন্নার অবস্থান কোথায় তা তাঁর জানা আছে। সুতরাং এত সহজে তিনি ব্যর্থতা মেনে নেবেন না। জিন্না যদি লিখিতভাবে তাঁর সম্মতি জানাতে না পারেন তা হলে কী করতে হবে সেই পরামর্শও তিনি জিন্নাকে দিয়েছিলেন। মাউন্টবেটেন বলেছিলেন যে পরের দিন যখন সব দলের নেতারা মিলিত হবেন তখন তিনি বলবেন যে জিন্না এটি মেনে নিয়েছেন। এই কথা বলে তিনি জিন্নার দিকে তাকাবেন। জিন্না সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়বেন। তা হলেই কাজ হয়ে যাবে।* মাউন্টবেটেনের চাতুরি কাজ করেছিল। আর

* জিন্নার প্রতি এই ধরনের পক্ষপাতদুষ্ট আচরণ শাসকদের পক্ষে আগেও করা হয়েছে এবং তা করা হয়েছে কংগ্রেসের কাছে গোপন রেখে। ১১-৯-৪৬ তারিখে পেথিক লরেন্স একটি অত্যন্ত জরুরী এবং গোপনীয় টেলিগ্রামে ওয়াভেলকে

চার্চিলের চিঠি তো ছিলই। নেতাদের সভায় মাউন্টবেটেনের কথা সমর্থন করে জিন্না ঘাড় নেড়েছিলেন। আর ঐতিহাসিক এই ঘাড় নাড়াতেই ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ নির্দিষ্ট হয়ে গিয়েছিল। সেই দিনই অর্থাৎ ৩রা জুন ১৯৪৭ তিন সম্প্রদায়ের, তিনটি দলের তিনজন নেতা মাউন্টবেটেন পরিকল্পনা সমর্থন করে বেতারে ভাষণ দিয়েছিলেন।

২রা জুন সম্মেলন শেষ হয়ে যাবার পর মাউন্টবেটেনের সঙ্গে দেখা করতে গান্ধীজী এসেছিলেন। সম্ভবত গান্ধীজী এসেছিলেন বর্তমান চুক্তি বাতিল করার জন্য তিনি যে চেষ্টা করবেন বলে ঘোষণা করেছেন তাকেই কার্যান্বিত করতে। গান্ধীজী এসেছিলেন মাউন্টবেটেনের আহ্বান পেয়ে। গান্ধীজী এই দিন মৌন ছিলেন। তাতেই মাউন্টবেটেন স্বস্তি বোধ করেছিলেন। ভারতসচিব লিস্টওয়েলকে একটি টেলিগ্রামে তিনি লিখেছিলেন যে ঈশ্বর নিশ্চয় আমাদের দিকে আছেন। কেননা এই দিনটিতে গান্ধীজী মৌন ছিলেন। তবে তিনি একটি ব্যক্তিগত শ্রদ্ধা জানিয়ে বন্ধুত্বপূর্ণ নোট লিখেছেন।[১৮২] প্রকৃতপক্ষে গান্ধীজী যেভাবে দেশবিভাগের বিরুদ্ধে কথাবার্তা বলছিলেন তাতে কেবল মাউন্টবেটেন নন অন্য নেতারাও ভয়ভীত ছিলেন। ৩রা জুনের সভার বিবরণীতে মাউন্টবেটেন লিখেছিলেন : "মিঃ জিন্না এই অভিমত প্রকাশ করেন যে মিঃ গান্ধী যদি এইভাবেই চলতে থাকেন তবে জনগণের মধ্যে এই ধারণার সৃষ্টি হবে যে আজকের সম্মেলনে যা ঠিক হল তা মেনে নেওয়ার দরকার নেই। তিনি নিজে অবশ্য মনে করেন না যে মিঃ গান্ধীর উদ্দেশ্য মন্দ। কিন্তু সম্প্রতি তিনি যে ভাষা ব্যবহার করছেন তাতে এমন ইঙ্গিত রয়েছে যে মুসলিম লীগ জোর করে পাকিস্তান আদায় করছে।"[১৮৩]

গান্ধীজীকে নিয়ে ভয় থাকলেও ২রা জুনের পর নেতাদের সম্পর্কে মাউন্টবেটেনের আর ভয় ছিল না। নেহরু চেয়েছিলেন যে খসড়া বিল যেন নেতাদের দেখান হয়। ভারতসচিব নেতাদের সঙ্গে বিলের শর্তগুলি আলোচনা করতে চাননি। তাঁর মনে হয়েছিল যে যদি বিলের বিরূপ সমালোচনা হয় তা হলে পার্লামেন্টের চালু অধিবেশনে বিলটি গৃহীত নাও হতে পারে। কিন্তু মাউন্টবেটেন মনে করেছিলেন যে নেতাদের প্রবল ইচ্ছাকে মেনে নেওয়া উচিত। নেহরু চেয়েছিলেন যে খসড়া বিলটি যেন গান্ধীজীকে দেখান হয়। কেননা খসড়া পাকা হয়ে যাবার পর যদি তাঁকে দেখান হয় এবং তিনি তাঁর কিছু খুঁত বার করেন তা হলে অসুবিধার সৃষ্টি হবে। প্যাটেলও এইরকম ইচ্ছা প্রকাশ করেছিলেন। এর ফলে মাউন্টবেটেন ৩০-৬-৪৭ তারিখে একটি চিঠিতে গান্ধীজীকে খসড়াটি দেখবার জন্য আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন। তিনি লিখেছিলেন : "ইন্ডিয়ান ইনডিপেনডেন্স বিল আপনি অবশ্যই দেখুন এ জিনিস পণ্ডিত নেহরু, বল্লভভাই প্যাটেল এবং আমি চাই।"[১৮৪]

ইতিমধ্যে আরও কয়েকটি ঘটনা ঘটে গিয়েছিল। জয় করেও ভয় যাচ্ছিল না মাউন্টবেটেনের। আর সেই ভয় তো গান্ধীজীকে নিয়ে। তিনি কখন যে কী করে বসেন, জনগণকে উত্তেজিত করে দাবার ছক উল্টে দেন সে বিষয়ে মাউন্টবেটেন নিশ্চিন্ত হতে পারছিলেন না। ১২-৬-৪৭ তারিখে তিনি তাঁর ব্যক্তিগত রিপোর্টে লিখেছিলেন : "গত সপ্তাহের শেষ দিকে আমি খবর পেয়েছিলাম যে গান্ধী খুবই বিষণ্ণ এবং আবেগের মধ্যে

জানিয়েছিলেন : "১৬ই মে-র সভার বিবরণ থেকে মুসলিম লীগ যে নোট তৈরি করেছে তাতে আপনার উল্লেখিত তিনটি বিষয়ের প্রতিশ্রুতির উপর জিন্না যদি সিদ্ধান্তকে নির্ণয় করতে চান তা হলে আপনি নেহরুকে বলবেন যে আলোচনার সময় মন্ত্রীমিশন লীগকে জানিয়েছিল যে এইটিই হল তাঁদের অভিপ্রায়। লীগ যে সভার বিবরণী দেখেছে সেকথা দয়া করে নেহরুকে জানাবেন না। কেননা এইভাবে দেখার অনুমতি এই একবারই মাত্র দেওয়া হয়েছে।[১৮১]

রয়েছেন। কয়েকজন কংগ্রেস নেতা ভয় পাচ্ছেন যে তিনি হয়তো পরবর্তী কোন প্রার্থনাসভায় পরিকল্পনাটির নিন্দা করবেন এবং সেটিকে গ্রহণ করতে অস্বীকার করবেন।* আমি সেজন্য তাঁকে প্রার্থনাসভায় যাবার আগেই আমার সঙ্গে দেখা করতে অনুরোধ করি। প্রকৃতপক্ষে তাঁর মেজাজ খুব বিগড়ে ছিল। তাঁর সমগ্র জীবনের কাজ আমি নষ্ট করে দিয়েছি বলে তিনি যে কতটা বেদনার্ত সেই কথাই তিনি আমাকে বলেছিলেন।" মাউন্টবেটেন তাঁর ঐ রিপোর্টে আরও লিখেছিলেন : "আমি ভি. পি.-কে বলি—তাঁকেও গান্ধীজীর সঙ্গে যোগাযোগ রাখতে বলা হয়েছিল**—ঐভাবেই কাজ করে যেতে। তিনি আমাকে জানিয়েছিলেন যে আমার কথায় কাজ হয়েছে। কেননা এখন গান্ধীজী বুঝতে পেরেছেন যে আমি তাঁর উপদেশ সততার সঙ্গে মানতে চেষ্টা করেছি। আর পরিকল্পনাটি যেভাবে কার্যকর হবে বলে প্রথমে ভাবা হয়েছিল এখন তার চেয়েও বেশি জোর দিয়ে গান্ধীজী ভারতবর্ষের ভবিষ্যৎ রচনার দিকে মন দিয়েছেন।"[১১৬]

মনে হয় এরপর মাউন্টবেটেনের ভয় কেটে গিয়েছিল। গান্ধীজী বুঝতে পেরেছিলেন যে দেশবিভাগ হবেই। হবে ক্ষমতা হস্তান্তরও। এবং স্বাধীন দুটি রাষ্ট্রের সঙ্গে ব্রিটিশ গভর্নমেন্টের সংযোগ ছিন্ন হবে না। কী হবে সেই সংযোগের সূত্র, এত দিন যে বিভেদের নীতি অনুসৃত হয়েছে স্বাধীনতার পরেও তা নতুন আকারে অনুসরণ করে দুটি রাষ্ট্রের মধ্যে বিরোধ জাগিয়ে রাখা হবে কি না তা নিয়ে গান্ধীজী উদগ্রীব ছিলেন। এমন বিভেদ যে করা হবে না তার প্রতিশ্রুতি গভর্নমেন্ট দিক, এই অনুরোধ গান্ধীজী করেছিলেন। কিন্তু তেমন প্রতিশ্রুতি দেওয়া গভর্নমেন্টের পক্ষে সম্ভব হয়নি। ২৬-৬-৪৭ তারিখে এটলির সভাপতিত্বে 'ইন্দো-বর্মা কমিটি'-র সভায় এই বিষয়ে আলোচনা হয়েছিল। তার বিবরণীতে লেখা হয়েছিল :

"কার্যবৃত্ত—৩

"ভারত ও পাকিস্তানের সঙ্গে হিজ ম্যাজিস্টিস গভর্নমেন্টের সম্পর্ক।

"ক্ষমতা হস্তান্তর হয়ে যাবার পর ভারতবর্ষ এবং পাকিস্তানের সঙ্গে যে-চুক্তি সম্পন্ন হবে তাতে হিজ ম্যাজিস্টিস গভর্নমেন্ট কোন রকম পার্থক্য করবে না এই মর্মে প্রতিশ্রুতি চেয়ে মিঃ গান্ধীর অনুরোধ সম্পর্কিত ভারতসচিবের স্মারকলিপি কমিটি আলোচনা করেছে।

"কমিটির সাধারণ মত হল যে এই অনুরোধ মেনে নেওয়া যায় না ; এটি অবশ্যই এমন প্রস্তাব নয় যে চুক্তি-আলোচনার আগেই সে সম্পর্কে গুরুত্ব দিতে হবে। প্রতিরক্ষা মন্ত্রণালয় জানিয়েছে যে মিঃ গান্ধীর প্রস্তাব মেনে নিলে দুটি ভারতীয় রাষ্ট্রের কাছ থেকে আমরা প্রতিরক্ষার যেসব সুযোগ-সুবিধা পাব বলে আশা করি তা সাংঘাতিকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হবে।"[১১৭]

বিদেশী রাজনীতির চক্রে পড়ে গিয়ে দুটি দেশ এক অস্থির অবস্থায় পড়ে যেতে পারে। দেশবিভাগের মধ্যে সেই ভয় আছে এ কথা গান্ধীজী অনুমান করতে পেরেছিলেন। ব্রিটিশ গভর্নমেন্টও তা জানত। সেজন্য হয়তো অন্তিম মুহূর্তে এক কেন্দ্রিক গভর্নমেন্টের কথাও তাদের মনে উঁকি দিয়েছিল। কিন্তু গান্ধীজীকে এবং কংগ্রেসকে তারা বিশ্বাস করতে পারেনি। জিন্না সেদিক থেকে তাদের কাছে অনেক বেশি গ্রহণযোগ্য ছিলেন।

---

* মাউন্টবেটেন ৩১-৫-৪৭ তারিখে তাঁর স্টাফ মিটিং-এর বিবরণে লিখেছিলেন : "রায়বাহাদুর ভি. পি. মেনন বললেন যে সরদার প্যাটেলের অভিমত হল, ঐক্যবদ্ধ ভারতবর্ষ সম্পর্কে মিঃ গান্ধী সম্প্রতি যেসব কথা বলছেন তাতে বিশেষ গুরুত্ব দেবার দরকার নেই।"[১১৫] প্যাটেলের এই কথা শুনেও মাউন্টবেটেন একেবারে নিশ্চিন্ত হতে পারছিলেন না।

** মাউন্টবেটেন কৃষ্ণ মেননকেও এই কাজে লাগিয়েছিলেন।

২৭-৬-৪৭ তারিখে লিস্টওয়েল একটি চিঠিতে মাউন্টবেটেনকে লিখেছিলেন : "কংগ্রেসের দৃষ্টিতে দেশবিভাগের বিরোধিতার স্পষ্টতই একটি প্রধান কারণ হল এই ভীতি যে পাকিস্তান আমাদের কাছ থেকে, আমেরিকার অথবা অন্যদের কাছ থেকে সাহায্য গ্রহণ করে নিজেকে শক্তিশালী করে তুলবে। ... গান্ধীজীর এটি স্পষ্ট ধারণা যে চুক্তির আলোচনা শুরু করার আগে আমরা যেন কথা দিই যে পাকিস্তানের সঙ্গে আমরা এমন কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করব না যা আমরা হিন্দুস্থানের সঙ্গে করব না।"

গান্ধীজী ব্যাধিটিকে ঠিক জায়গায় ধরেছিলেন। কিন্তু তার নিদানের জন্য কিছু করা তখন তাঁর সাধ্যাতীত। কয়েক দিন পরেই ২৭/২৮শে জুন ১৯৪৭ একটি দীর্ঘ চিঠি তিনি মাউন্টবেটেনকে লিখেছিলেন। তাতে কয়েকটি অভিযোগের কথাও ছিল যা মাউন্টবেটেন গান্ধীজীর চিঠি পাবার সঙ্গে সঙ্গেই অস্বীকার করেছিলেন। গান্ধীজী লিখেছিলেন :

"...মন্ত্রীমিশনের সৃষ্ট পার্লামেন্টরী ডেলিগেশনকে এবং মন্ত্রীমিশনকেও আমি বলেছিলাম যে তাঁদের দুটি পক্ষের অথবা এমনকি তিনটি পক্ষের মধ্যে একটিকে বেছে নিতে হবে। তাঁরা যদি সবাইকেই ন্যায্য মনে করে সকলকেই খুশি করতে চান তবে তাঁরা অবশ্যই ব্যর্থ হবেন। আমি আশা করেছিলাম যে আপনি সাহস ও সততার সঙ্গে অসম্ভব অবস্থা থেকে নিজেকে বার করে আনবার চেষ্টা করবেন। কিন্তু আমার চোখ খুলে গেল যখন আমি শুনলাম—অবশ্যই যদি আমি আপনাকে ঠিকমতো বুঝে থাকি, যে আপনি বলেছেন, কায়েদ-এ-আজম জিন্না এবং লীগের সদস্যরা কংগ্রেসের সদস্যদের মতো সমান সঠিক আর সম্ভবত কায়েদ-এ-আজম অধিকতর সঠিক। আমার কথা হল এটি কোন মানুষের পক্ষে সম্ভব নয়। একজন তুলনামূলক অর্থে অবশ্যই সম্পূর্ণ সঠিক হবেন। এই দেশের বর্তমান সঙ্কটময় সময়ে আপনার পক্ষে একজনকে বেছে নিতেই হবে। ...

"আপনি এ কথা বলেও আমাকে বিস্মিত করেছেন যে ব্রিটিশ আধিপত্যের মধ্যেই যদি দেশবিভাগ না হয় তবে যেহেতু হিন্দুরা হল মুখ্য পক্ষ তারা কখনই দেশবিভাগ হতে দেবে না এবং জোর করে মুসলমানদের দাবিয়ে রাখবে। আমি আপনাকে বলেছিলাম যে এটি খুবই ভুল।

"আমি নিচে আপনার বিবেচনার জন্য কয়েকটি বিষয় উল্লেখ করছি—

"(ক) কংগ্রেস পবিত্রতার সঙ্গে ঘোষণা করেছে যে সে কোন প্রদেশকে জোর করে ইউনিয়নের মধ্যে ধরে রাখবে না।

(খ) জাতিভেদে ক্লিষ্ট হিন্দুদের পক্ষে কয়েক কোটি কম কিন্তু সুসংবদ্ধ মুসলমানদের জোর করে দাবিয়ে রাখা কার্যত অসম্ভব।

(গ) এটি ভুললে চলবে না যে পরবর্তীকালে ইংরেজ বিজয়ীরা যেভাবে ভারতবর্ষকে দাবিয়ে রেখেছে ঠিক সেইভাবেই মুসলিম রাজবংশ ক্রমবর্ধমান আকারে ভারতবর্ষকে দাবিয়ে রেখেছিল।

(ঘ) তথাকথিত তপশিলী শ্রেণী এবং তথাকথিত আদিবাসী জাতিগুলির মানুষদের নিজেদের কাছে টানবার জন্য মুসলমানদের পক্ষ থেকে ইতিমধ্যে আন্দোলন শুরু হয়ে গিয়েছে।

(ঙ) এটি ভালভাবেই দেখান যায় যে বর্ণহিন্দুরা যারা নাকি জুজু তারা নিশ্চিতরূপে ভীষণ সংখ্যালঘু। এদের মধ্যে শস্ত্রধারী রাজপুতরা শ্রেণীগতভাবে জাতীয়তাবাদী নয়। ব্রাহ্মণ এবং বেনিয়ারা এখনও অস্ত্র চালাতে অনভিজ্ঞ। যেখানে তাদের প্রাধান্য সেটি হল নৈতিক ক্ষেত্রে। আমার বলতে দুঃখ হচ্ছে যে শূদ্ররা তপশিলী শ্রেণীর অতিরিক্ত কিছুই

নয়। এই রকম হিন্দু সমাজ যারা কেবল সংখ্যায় প্রধান তারা কোটি কোটি মুসলমানদের ধ্বংস করবে এ কথা ভাবা এক বিস্ময়কর কল্পনা।"[১১৮]

গান্ধীজী মাউন্টবেটেনকে জানিয়েছিলেন যে এই চিঠি তিনি কাউকে দেখাননি। মাউন্টবেটেন তাতে সন্তোষ প্রকাশ করেছিলেন। কিন্তু ঐ পর্যন্তই। তার বেশি কিছু নয়। একটি দেশের জীবননাট্যের সংলাপ প্রস্তুত, মহড়া সমাপ্ত, কুশীলবরা সুসজ্জিত। অপেক্ষা কেবল যবনিকা উত্তোলনের। ৯ই জুন মুসলিম লীগ কাউন্সিলের অধিবেশন অনুষ্ঠিত হয়। সেখানে মাউন্টবেটেনের পরিকল্পনা সমর্থিত হয়। লীগ কাউন্সিলের প্রস্তাবে বলা হয়েছিল : "অতএব এই কাউন্সিল অল ইন্ডিয়া মুসলিম লীগের সভাপতি কায়েদ-এ-আজম জিন্নাকে একটি আপোস রফারূপে পরিকল্পনার মৌলিক নীতিগুলি গ্রহণ করার অধিকার দিচ্ছে। প্রতিরক্ষা, অর্থ এবং যোগাযোগসহ হিজ ম্যাজিস্টিস গভর্নরের পরিকল্পনায় উল্লেখিত মৌলিক নীতিগুলির ভিত্তিতে ভারতবর্ষের বিভাজন যাতে ন্যায্য এবং যথাযথ হয় তার উদ্দেশ্যে বিশদ ব্যবস্থা অবলম্বনের জন্য তাঁকে পূর্ণ অধিকার এবং ক্ষমতা প্রদান করছে।"[১১৯]

জিন্না যখন তাঁর দায় এড়াতে মাউন্টবেটেনকে বলেছিলেন যে লীগ কাউন্সিলের সভায় আলোচনার আগে তিনি মতামত দিতে পারেন না তখন মাউন্টবেটেন তাঁকে মনে করিয়ে দিয়েছিলেন যে কাউন্সিলে জিন্নার অবস্থান কোথায় তা তাঁর জানা আছে। কথাটি অসঙ্গত ছিল না। কাউন্সিলের প্রস্তাবে জিন্নাকে সম্পূর্ণ দায়িত্ব দেওয়ায় সেকথা সমর্থিত হয়েছে। কংগ্রেসের পক্ষে এইভাবে প্রস্তাব গ্রহণ করা সম্ভবপর ছিল না। তার কয়েকটি কারণের মধ্যে একটি এই হতে পারে যে মুসলিম লীগ যা আশা করেনি তা পাচ্ছিল। আর কংগ্রেস যা হারাতে চায়নি তাই হারাচ্ছিল। তাই কংগ্রেসের নেতাদের দরকার হয়েছিল গান্ধীজীর সমর্থন আদায় করার। নেহরু, আজাদ, প্যাটেল কেউই নিজের শক্তির উপর যথেষ্ট ভরসা করতে পারেননি। তাই কংগ্রেসের অধিবেশনে গান্ধীজী এসেছিলেন। ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব সমর্থন না করার ঝুঁকি কতটা সেকথা বলেই তিনি সভা ছেড়ে চলে গিয়েছিলেন। তবুও কংগ্রেসের দেশবিভাগ মেনে নেওয়ার প্রস্তাব সর্বসম্মত হয়নি।

মাউন্টবেটেন যে-কাজের জন্য এসেছিলেন সেই কাজ শেষ হল। পৃথিবীর ইতিহাসে এক নতুন মাত্রা যুক্ত হল। ভারতবর্ষকে যারা প্রায় দুশ বছর ধরে শাসন করেছে, শোষণ করেছে তাদের সঙ্গে বন্ধুত্ব এবং সদ্ভাব বজায় রেখেই ক্ষমতার হস্তান্তর হয়ে গেল। আর সেই সঙ্গে যুগ যুগ ধরে যারা একই সঙ্গে বসবাস করেছে, যাদের ধমনীতে একই রক্ত প্রবাহিত, যাদের জীবনচর্চা প্রায় একই রকম তারা পৃথগন্ন হয়ে গেল। কেবল দুটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্রই গঠিত হল না, তারই সঙ্গে দুই রাষ্ট্রের মানুষের মনের মধ্যে দুরতিগম্য এক ব্যবধান রচিত হয়ে গেল। পশ্চিম ভারতবর্ষে শুরু হয়ে গেল অসংগঠিত লোক বিনিময়, অপরিসীম অত্যাচারে জর্জরিত হলেন অসংখ্য মানুষ। ভ্রাতৃহত্যায়, নারী নির্যাতনে কলঙ্কিত হল ভারতবর্ষের সভ্যতা, সংস্কৃতি, ধর্মবোধ। জিন্না কি এ জিনিস চেয়েছিলেন ?* আজাদ বলেছিলেন যে দেশবিভাগ হল জলের উপর দাগ কেটে নদীকে দু ভাগ করার

---

* করাচি থেকে প্রেরিত জিন্নার একটি বিবৃতি ২৬-১১-৪৬ তারিখে স্টেটসম্যানে প্রকাশিত হয়েছিল। একটি সাংবাদিক সম্মেলনে জিন্নাকে দেশে বিশৃঙ্খলা বন্ধ এবং শান্তি স্থাপনা কী করে করা যায় সে বিষয়ে পরামর্শ দিতে বললে জিন্না বলেছিলেন, "এই ভয়ানক হত্যাকাণ্ডের পটভূমিতে আমার মনে হয় যে কেন্দ্রীয় এবং প্রাদেশিক সরকারের কর্তৃপক্ষদের এখনই এইসব পাশবিক ঘটনায় পুনরাবৃত্তি বন্ধ করতে—যেখানে অতিকায় সংখ্যাগরিষ্ঠরা সামান্য সংখ্যালঘুদের হত্যা করে চলেছে তা বন্ধ করতে—লোক বিনিময়ের বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করা উচিত।[২০০]

মতো ব্যাপার। দুটি দেশ আবার জোড়া লাগবে। আজাদ যা ভেবেছিলেন তা হয়নি। হবেও না। দেশবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে মনের ভাগও হয়ে গিয়েছিল। ক্ষয়িষ্ণু নীতিবোধের মধ্যেই কি গান্ধীজী তাঁর মৃত্যুর পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছিলেন ? ইতিহাসের কাহিনীই ইতিহাস রচনা করে দেয়। কেটে গেল কয়েকটা দিন। যবনিকা উত্তোলিত হল। ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পাকিস্তানের জন্ম হল। সেই দিনের অবসানে ১৫ই আগস্ট মধ্যরাত্রিতে খণ্ডিত ভারতবর্ষ স্বাধীনতা লাভ করল। নতুন রাষ্ট্রের নাম হল ইন্ডিয়া অর্থাৎ ভারত। দেশবিভাগের নেপথ্য কাহিনীর অবসান হল।

উপসংহার : 'শেষ নাহি যে শেষ কথা কে বলবে ?'

ক্ষমতার হস্তান্তর এবং দেশবিভাগ একইসঙ্গে ঘটে গেল। এটি ঠিক কাকতালীয় ঘটনা নয়। বলা যায় যে ক্ষমতা হস্তান্তরের পূর্ব শর্ত হল দেশবিভাগ। এটি কোন আকস্মিক ঘটনা নয়। দেশবিভাগের পরিণতি হল স্বাধীনতা। দেশবিভাগের সঙ্গে সঙ্গে এক দীর্ঘ ইতিবৃত্তের অবসান হল। কিন্তু তাতে যে বিষ উদ্গীরণ হল তা নিঃশেষ হল না। রবীন্দ্রনাথ লিখেছিলেন : "ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন না একদিন ইংরেজকে এই ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে ? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে ? একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে ?" (সভ্যতার সঙ্কট) রবীন্দ্রনাথ সঙ্গত প্রশ্নই তুলেছিলেন। সাম্রাজ্যবাদীর শাসনধারা শুষ্ক হবার সঙ্গে সঙ্গে ভারত সাম্রাজ্য ত্যাগ করে তাদের চলে যেতে হল। যাবার সময় তারা রেখে গেল দাঙ্গাক্লিষ্ট দুটি রাষ্ট্র এবং নীতিবোধহীন বিচ্ছেদ-বিদ্বেষে দীর্ণ মানসিক-বিভ্রান্ত কোটি কোটি মানুষকে, ভারতে এবং পাকিস্তানে।

বেদনাবিধুর এবং ক্রোধ উদ্রেককারী এই দেশবিভাগ অনেক দিনের অনেক ঘটনার অন্তিম পরিণাম। এই ঘটনা মেনে নেবার পর অনেকের মনের জিজ্ঞাসা হল দেশবিভাগ সত্যই কি অনিবার্য ছিল ? একে কি কোনভাবেই এড়ান যেত না ? এই প্রশ্নের উত্তর অন্বেষণের সঙ্গে সঙ্গে আর একটি যে প্রশ্ন স্বাভাবিকভাবেই উদিত হয় তা হল, দেশবিভাগকে যদি আটকান যেতই তবে তার জন্য কী মূল্য দিতে হত লক্ষ লক্ষ হিন্দু-মুসলমান অখণ্ড ভারতবর্ষের মানুষকে !

প্রশ্ন যত সহজ, উত্তর ততই কঠিন। হয়তো এর উত্তর নেই। এর উত্তর দেওয়া হয়নি। উত্তর দেওয়া যায় না, দেওয়া যাবে না। সব প্রশ্নেরই কি উত্তর সব সময় থাকে ? শেষের পরেও তো অশেষ থেকে যায়। তবু ঘটনার পারম্পর্য বিশ্লেষণ করা যায় এবং তারই মধ্য দিয়ে উত্তরের অনুসন্ধান করা যেতে পারে।

ভারতবর্ষে হিন্দু-মুসলমানের অনৈক্য ইংরেজরা সৃষ্টি করেছিল এমন আত্মশ্লাঘা ভুল। সত্য যা তা হল আগে থেকেই সৃষ্ট অনৈক্যকে ইংরেজ শাসকগোষ্ঠী তাদের রাজনৈতিক উদ্দেশ্য সাধনের হাতিয়ার করে নিয়েছিল। ইংরেজ, ফরাসী, জার্মানী যে অর্থে জাতি ভারতবর্ষে বসবাসকারী মানুষরা সেই অর্থে কোন দিন জাতি ছিল না। ইংরেজরা আসবার আগে ভারতবর্ষের বিপুল অঞ্চলে কোন এককেন্দ্রিক বা ইউনিটারী গভর্নমেন্ট ছিল না। ভারতবর্ষ ছিল খণ্ড, ছিন্ন, বিক্ষিপ্ত। ভারতবর্ষে রাষ্ট্র শাসনের চেয়ে সমাজের অনুশাসনই

ছিল প্রবল। ইংরেজরা ভারতবর্ষের বিপুল অংশকে একটি শাসনের অধীনে নিয়ে আসে। ইচ্ছা করেই কতকগুলি অঞ্চলকে তারা তাদের প্রত্যক্ষ শাসনে না এনে তাদের কর্তৃত্বাধীনে স্বাধীন রাজ্যরূপে বিরাজ করতে দেয়। শাসনব্যবস্থাকেই অর্থাৎ রাষ্ট্রকেই তারা সকল ক্ষমতার, সকল কর্মযজ্ঞের কেন্দ্র করে তোলে। তাদের নিজেদের দেশে এবং পৃথিবীর আরও কয়েকটি দেশে সাংবিধানিক গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হয়। ভারতবর্ষে জনগণের শাসন প্রচলিত না করলেও শাসন সংস্কারের নামে জনপ্রতিনিধিদের কাছে সীমিত এবং বলা বাহুল্য অতি নিয়ন্ত্রিত শাসনের উচ্ছিষ্ট তারা দিতে থাকে। এর ফলে এক দিকে যেমন সমাজ দুর্বল ও পঙ্গু হয়ে পড়ায় মানুষের মধ্যকার আত্মিক একাত্মবোধের ধারটি শুকিয়ে যেতে থাকে তেমনি অন্য দিকে ক্ষমতার উৎসকে জনপ্রতিনিধিদের করায়ত্ত করার মনোবাঞ্ছা ধীরে ধীরে জেগে উঠতে থাকে। হিন্দুরা সংখ্যায় বেশি, গণতন্ত্র তাদের হাতেই ক্ষমতা এনে দেবে এই ভীতি মুসলমান সমাজের মধ্যে জাগিয়ে দেওয়া হয়। বিভেদ রাজনৈতিক ক্ষমতার দ্বন্দ্বে বিচ্ছিন্নতার মানসিকতাকে প্রশ্রয় দিতে থাকে।

কীভাবে, তারও কার্যকরণ আছে। ইংরেজ শাসকরা বুঝতে পেরেছিল যে ভারতবর্ষের মতো বিরাট দেশে শাসন পরিচালনার জন্য যে লোকবল দরকার তার জন্য বিদেশ থেকে পর্যাপ্ত লোক আনা যাবে না। ভারতবর্ষের মধ্য থেকেই লোক সংগ্রহ করতে হবে, তাদের এই কাজে উপযুক্ত করে তুলতে হবে। এই ভাবনা থেকেই তারা এ দেশে শিক্ষার প্রসার ঘটাতে থাকে। শিক্ষাপদ্ধতিও তারই অনুকূলে রচিত হয়। এই শিক্ষার ধারা অনুসরণ করে ভারতবর্ষে এক শিক্ষিত সম্প্রদায় গড়ে ওঠে। এর অধিকাংশ লোকই হয়ে ওঠেন সরকারের বশংবদ। অবশ্য এ কথাও স্বীকার করতে হবে যে এই শিক্ষার মাধ্যমেই আধুনিক জগতের দুয়ার উন্মুক্ত হয় শিক্ষিতজনের কাছে। জ্ঞানে-বিজ্ঞানে আলোকপ্রাপ্ত অনেক মানুষ স্বাধীনতার চেতনাকে জাগ্রত করতে এগিয়ে আসেন। হিন্দুরাই প্রথমে এই শিক্ষার সুযোগ গ্রহণ করেছিলেন। তার ফলে শাসনের কাজে তো বটেই, জীবনচর্চার অন্যদিকেও হিন্দুরা সাধারণভাবে মুসলমানদের চেয়ে এগিয়ে যান।

ইংরেজদের ছত্রছায়ায় ভারতবর্ষে এককেন্দ্রিক রাষ্ট্র গঠিত হওয়ার ফলে ইউরোপের ধাঁচে এ দেশেও জাতীয়তার উন্মেষ হতে থাকে। ভারতবর্ষে বসবাসকারী সকল মানুষ একই জাতিগোষ্ঠীর মানুষ এমন একটি চিন্তা মানুষের মনে প্রতীত হতে থাকে। বস্তুত রাষ্ট্রকে কেন্দ্র করে প্রত্যয়িত জাতীয়তা রাষ্ট্র-সঞ্চালনের অধিকারের সঙ্গে সমীকৃত হয়ে যায়। অর্থাৎ এত দিন সমাজকে অবলম্বন করে যে একত্ববোধ জাগরুক ছিল তা রাষ্ট্রিক জীবনের ঐক্যে রূপ পরিগ্রহ করে। জাতির অস্তিত্ব রাষ্ট্র-কাঠামোকে আশ্রয় করেই টিকে থাকে এবং ভবিষ্যতেও টিকে থাকবে এমন বিশ্বাস মানুষের মনকে আচ্ছন্ন করে ফেলে। ভেঙে পড়া সমাজ উৎক্ষিপ্ত এবং উপেক্ষিতই থেকে যায়। তাই স্বাধীনতা আন্দোলনের উষালগ্নে এই নিয়ে বিতর্ক উঠেছিল যে সমাজ সংস্কারের কাজ আগে, না রাজনৈতিক স্বাধীনতা আগে। প্রশ্ন উঠেছিল, নৈতিক জাগরণ, নাকি রাষ্ট্র সঞ্চালনের অধিকারের দাবি কোন্‌টিকে অগ্রাধিকার দেওয়া হবে! এই বিতর্কে সমাজ সংস্কার এবং নৈতিক জাগরণের কাজের চেয়ে বেশি প্রাধান্য পায় রাজনৈতিক স্বাধীনতার আন্দোলন। গান্ধীজী স্বাধীনতার জন্য প্রত্যক্ষ আন্দোলন এবং সমাজ সংস্কারের জন্য গঠনকর্ম দুটিকে পাশাপাশি চালাতে চেয়েছিলেন, একটিকে আর একটির পরিপূরকরূপে। কিন্তু স্বাধীনতার আন্দোলনকে গণমুখী করতে তিনি যতটা সফল হয়েছিলেন গঠনকর্মে জনগণকে সেইভাবে উদ্বুদ্ধ করতে পারেননি। নেতাদের মধ্যেও গঠনমূলক কাজের প্রতি অনেকেরই ছিল অনীহা। তার

ফলে সামাজিক দুর্বলতাগুলি সুসংস্কৃত না হয়ে রাজনৈতিক বোধে উদ্বুদ্ধ জাতীয়তা প্রবল হতে থাকে। এ যেন বালির উপর বাঁধ বাঁধা। শাসকদের কাছে এটি শাপে বর হয়ে উঠেছিল।

স্বাধীনতা আন্দোলনের প্রতি অতি আগ্রহবশত অনেকেই ভুলে গিয়েছিলেন যে স্বাধীনতা এবং জাতীয়তা এক জিনিস নয়। বস্তুত দেশপ্রেম এবং জাত্যাভিমান দুটি স্বতন্ত্র বিষয়, দুটির মধ্যে গুণগত পার্থক্য আছে। স্বদেশপ্রেমে যেমন আত্মনিবেদনের, দেশের জন্য ত্যাগ করবার মানসিকতা আকাঙ্ক্ষিত, তেমনি জাত্যাভিমানে একটি আগ্রাসী মানসিকতা প্রশ্রিত। পরাধীনতার অবমাননায় ভারতবাসীর মনে স্বদেশপ্রেমের অঙ্কুরোদ্গম ঘটেছিল এবং স্বশাসনের আকাঙ্ক্ষা সেই স্বদেশপ্রেমকে জাতীয়তার প্রেক্ষাপটে প্রস্থাপিত করেছিল। তার ফলে দেশপ্রেম, জাতীয়তা সব কিছুই বিদেশী শাসনকে হটিয়ে দেশে স্বদেশী এবং স্বজাতীয় সরকার গঠনের মধ্যে আপন পরাকাষ্ঠা খুঁজে নিতে চেষ্টা করেছিল। স্বশাসন মানে জনগণের শাসন। ভারতবর্ষে তার ব্যবহারিক রূপ হিন্দুদের শাসন। স্বাধীনতার দাবি উদগ্র হবার পথেই মুসলমানদের অনেকের কাছে এটি অভিশাপ বলে মনে হয়েছিল। আবার হিন্দুদেরও অনেকের মনে এটিকেই একান্ত বাঞ্ছিত বলে মনে হয়েছিল।

সাধারণভাবে মুসলমানদের মনে একটি অভিমান ছিল। ইংরেজরা মুসলমান সম্রাটকে পরাজিত করে দিল্লী অধিকার করেছিল। সিপাহী বিদ্রোহ সফল হয়নি। এটি তাঁদের অনেকের কাছে বেদনার কারণ হয়েছিল। তার জন্য তাঁরা অনেক দিন ইংরেজদের আমদানী করা প্রগতির পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে রেখেছিলেন। তাঁদের যখন ভুল ভাঙে তখন হিন্দুরা অনেকটা পথ এগিয়ে গিয়েছিলেন। তাই যখনই হিন্দুরা স্বাধীনতার দাবি নিয়ে সোচ্চার হচ্ছিলেন তখনই তাঁদের কারও কারও মনে এই প্রশ্ন দেখা দিয়েছিল যে ইংরেজদের ভারতবর্ষ থেকে চলে যাওয়া কি মুসলমানদের ক্ষেত্রে পরশাসনমুক্তি বলে সূচিত হবে! ভারতবর্ষের স্বাধীনতা কি মুসলমানদের হিন্দুদের অধীনতা মেনে নিতে বাধ্য করবে না? অম্বেদকরের মনেও এই একই প্রশ্ন ছিল।

রাষ্ট্রীয় চেতনা জাগিয়ে মুসলমানদের অনেকের মনের এই শঙ্কা দূর করা সম্ভব ছিল না। কেননা এর উদ্গমই তো হয়েছিল রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতার দাবি থেকে। সমাজ সংস্কারের দ্বারা, মানুষের জীবনচর্চার পরিবর্তন সাধন করে হয়তো বিভেদকে প্রশমিত করা যেত। কিন্তু ব্যাপক আকারে সে কাজ করার দিকে মন দেওয়া হয়নি। তাই ব্যক্তিগত এবং সামাজিক আচার-আচরণে যে অনৈক্য বিরাজমান ছিল সেটি রাষ্ট্রিক বা রাজনৈতিক পরিমণ্ডলের মধ্যে নতুনভাবে বিকশিত এবং প্রকাশিত হতে থাকে। বিশেষ করে হিন্দুদের মধ্যে যাঁরা সাম্প্রদায়িক মনোভাবাপন্ন বলে পরিচিত ছিলেন তাঁরা যখন অখণ্ড ভারতবর্ষের দাবি তুলছিলেন তখন মুসলমানদের একাংশ তাকে ভাল চোখে দেখেনি। এইসব হিন্দু নেতাকে এই প্রশ্ন কেউ করেনি যে ভারতবর্ষে মুসলমানরা যদি সংখ্যাগরিষ্ঠ হতেন তা হলে তাঁরা অখণ্ড ভারতবর্ষের কথা বলতেন কি না।

ইংরেজরা যখনই বুঝতে পেরেছিল যে ভারতবর্ষের স্বাধীনতার দাবিতে হিন্দুরা বড় ভূমিকা নিয়েছে এবং সেই দাবিকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করা যাবে না, কিছু একটা দিতেই হবে তখনই তারা শাসন সংস্কারের ধুয়া তুলে সাম্প্রদায়িকতার আগুনে নতুন নতুন ইন্ধন দিতে থাকে। পৃথক নির্বাচন, আসন সংরক্ষণ, 'প্যারিটি', সংখ্যালঘুদের আপত্তি থাকলে কোন সিদ্ধান্ত গ্রহণ না করা এবং শেষ পর্যন্ত দেশবিভাজন—এইসব কিছুই ছিল সাম্প্রদায়িকতাকে

বাড়িয়ে তোলার প্রয়াস। ইংরেজরা সুচতুরভাবে সেই কাজ করেছিল এবং ভারতবর্ষের হিন্দু-মুসলমানের অনেকেই রাষ্ট্রোন্মাদনায় তাকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন। জিন্নার দ্বি-জাতি তত্ত্ব, মুসলিম লীগের দেশ বিভাজনের প্রস্তাব, প্রত্যক্ষ সংগ্রামের বিভীষিকা এবং দেশব্যাপী সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা—এই ঘটনাগুলি যদি দেশবিভাগকে অনিবার্য করে থাকে তবে 'ইহ বাহ্য আগে কহ আর'-এর ধারা অনুসরণ করে শেষ যে কার্যকারণটি পাওয়া যাবে তা হল রাষ্ট্রকে অধিকার করবে কে ? রাষ্ট্র সঞ্চালনের ক্ষেত্রে কার অথবা কাদের কথা প্রাধান্য পাবে ? সংহতি যখন দানা বাঁধেনি, সামাজিক সম্মিলন যখন বাস্তব হয়ে ওঠেনি, ধর্মসম্প্রদায়গুলির মধ্যেকার ফাটল যখন জোড়া লাগেনি তখন রাষ্ট্রশক্তি প্রয়োগে কে প্রধান হবে এই প্রশ্নকে উপেক্ষা করা সহজ ছিল না। রাজনৈতিক নেতাদের কাছে 'জনগণের হাতে ক্ষমতার' আদর্শ বিশেষ অর্থ বহন করত না। কেননা 'জনগণ' কারা এবং তাঁদের কাছে ক্ষমতা কীভাবে দেওয়া হবে তার কোন পরিষ্কার ধারণা তাঁদের অনেকের কাছেই ছিল না। জনগণের হাতে ক্ষমতা এবং বয়স্ক ভোটাধিকারে প্রতিনিধি নির্বাচন এই দুটি অনেকের কাছে সমার্থবোধক বিষয় হয়ে গিয়েছিল। উপরন্তু 'জনগণ' তো সম্প্রদায়ের দ্বারাই চিহ্নিত হয়ে গিয়েছিল। দ্বি-জাতি তত্ত্বের জিগির তোলার দায় তো একা জিন্নার নয়। হিন্দু মহাসভার প্লাটফরম থেকেও তো ভারতবর্ষে হিন্দুরাই কেবল একটি জাতি এমন কথা উচ্চারিত হয়েছিল।

হিন্দু মহাসভা হিন্দুদের স্বার্থরক্ষার হকদার এ কথা ঘোষণা করলেও হিন্দুদের মধ্যে তা উল্লেখযোগ্য স্থান করে নিতে পারেনি। কংগ্রেস কোন বিশেষ সম্প্রদায়ের নয়—এই ঘোষিত নীতি সত্ত্বেও হিন্দুদের অধিকাংশই কংগ্রেসকে স্বীকার করে নিয়েছিল। অন্যদিকে শত সঙ্কীর্ণতা সত্ত্বেও মুসলিম লীগ অধিকাংশ মুসলমানের প্রতিনিধিত্ব করার অধিকার অর্জন করেছিল। আর কংগ্রেস আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকারকে আদর্শরূপে স্বীকার করে নিয়ে সেই আদর্শকে ভাষার ভিত্তিতে গঠিত প্রদেশগুলির মধ্যে রূপায়িত করতে চেয়েছিল। যে যুক্তিতে কংগ্রেস এই প্রস্তাব গ্রহণ করেছিল তা হল শাসন ক্ষমতাকে কেন্দ্রের কুক্ষিগত না রেখে বিকেন্দ্রীকৃত করে দেওয়া। অবশ্য কংগ্রেস ভাষাভিত্তিক প্রদেশগুলিকে বিকেন্দ্রীকৃত ফেডারেল রাষ্ট্রব্যবস্থার ক্ষুদ্র ইউনিটরূপে গণ্য করতে চেয়েছিল। কংগ্রেসের এই সিদ্ধান্তের নজির দেখিয়ে কেউ প্রশ্ন করতে পারেন যে ভাষাকে যদি ইউনিট গঠন করার নির্ণায়করূপে গণ্য করা যায় তা হলে ধর্মকেই বা তা করা যাবে না কেন ? ধর্ম যদি সম্প্রদায় সৃষ্টি করে বিরোধের কারণ হতে পারে তবে ভাষাও যে হবে না তার নিশ্চয়তা কোথায় ? বস্তুত ভাষা নিয়েও তো বিরোধ হয়েছে। তত্ত্বগত দিক থেকে এই প্রশ্নকে অসঙ্গত বলা যায় না। তবে ভারতবর্ষের ক্ষেত্রে ধর্মকে ভাষার সমান ভূমিকায় দাঁড় করান যায় না। এখানে বিভিন্ন ভাষার লোক মোটামুটিভাবে কয়েকটি নির্দিষ্ট এলাকায় এবং লাগোয়া অঞ্চলে বাস করে। হিন্দীভাষী লোক এক বিস্তীর্ণ অঞ্চলে বাস করে বটে। তবে সেই অঞ্চলকেও প্রশাসনিক দিক থেকে ভাগ করা যায়। কিন্তু হিন্দু এবং মুসলমান সমগ্র ভারতবর্ষেই ছড়িয়ে ছিটিয়ে বাস করেন। সেজন্য ইংরেজরা প্রশাসনিক সুবিধার্থে যেভাবে প্রদেশ গঠন করেছিল তারই মধ্যে ধর্মভিত্তিক প্রদেশ বেঁছে নেওয়া ছাড়া কোন উপায় ছিল না। জিন্না তাই চেয়েছিলেন। তাতে বিপুল সংখ্যক মুসলমান যে আত্মনিয়ন্ত্রণের অধিকার থেকে বঞ্চিত হয়ে হিন্দুপ্রধান প্রদেশগুলিতে থেকে যেতে বাধ্য হবেন সেকথা তিনি ভাবেননি। সেজন্য তাঁর স্বাতন্ত্র্যের দাবির মধ্যে যুক্তির চেয়ে আবেগই প্রবল ছিল। তাঁর ঘোষিত দ্বি-জাতি তত্ত্বও যে অলীক তা তিনি নিজেও জানতেন। আর জানতেন বলেই পাকিস্তান গঠিত

হবার পর তিনি অন্য সুরে কথা বলেছিলেন।

যাই হোক, মুসলমানদের অধিকাংশের প্রতিনিধিত্ব করে মুসলিম লীগ যে দাবি উত্থাপন করেছিল সেটিকে যতই অন্যায় এবং অযৌক্তিক বলা হোক না কেন তাকে বাতিল করতে হিন্দুদের কাছে গরিষ্ঠতার জোর প্রয়োগ করা ছাড়া অন্য কোন শক্তি ছিল না। আর তা করলে হিন্দুরা প্রচলিত গণতান্ত্রিক রীতি অনুসরণ করা হয়েছে বলে নিজেদের সন্তোষ বিধান করলেও মুসলিম লীগ যে অজুহাত দেখিয়ে স্বতন্ত্র রাষ্ট্রের দাবি তুলেছিল সেইটিই সত্য বলে প্রমাণিত হত। এর উত্তরে অবশ্যই এ কথা বলা যায় যে কিছু লোক—তাঁরা যদি একটি বিশেষ সম্প্রদায়ের লোকই হন—যদি কোন অন্যায় দাবি করেন তা হলে কি সাম্প্রদায়িকতার অভিযোগের ভয়ে ভীত হয়ে ভিন্ন সম্প্রদায়ের গরিষ্ঠ মানুষরা তাকে আটকাতে পারবেন না? প্রশ্নটি খুবই সঙ্গত। কিন্তু এই প্রশ্নের প্রতি প্রশ্ন হল, সংখ্যাগরিষ্ঠরা যা বলবেন সেইটিই যে ন্যায় তার প্রমাণ কী? বস্তুত এইখানেই হল গণতন্ত্রের সীমাবদ্ধতা। এর কোন সহজ এবং সর্বজনগ্রাহ্য সমাধান নেই। অন্তত ভারতবর্ষে তখন সাম্প্রদায়িকতার যে-গরল উদ্গীরণ হয়েছিল তাতে মুসলিম লীগের সম্মতি ছাড়া দেশবিভাগকে আটকান সহজ কাজ ছিল না। হয়তো সম্ভবও ছিল না। মনে হয় শেষের দিকে গান্ধীজী এই কারণেই দ্বি-জাতি তত্ত্বকে অস্বীকার করেও দেশবিভাগ মেনে নেওয়া যায় কিনা তার পরীক্ষা করতে চেয়েছিলেন। জিন্না রাজি হননি। কেননা জিন্না বুঝতে পেরেছিলেন যে স্বজন বিরোধকে জাগিয়ে রাখতে না পারলে দেশবিভাগ বা পাকিস্তানের সৃষ্টি সার্থক হবে না। সেদিক থেকে তিনি সফল হয়েছেন। ভারতবর্ষ স্বাধীন হয়েছে, দেশ বিভক্ত হয়েছে। পাকিস্তান গঠিত হয়েছে। কিন্তু জিন্নার সার্থকতা দেশবিভাগের নেপথ্যে যে বিদ্বেষ এবং অবিশ্বাসের ধারা প্রবাহিত ছিল তাকে স্তব্ধ করতে পারেনি। দেশবিভাগের ট্রাজেডি সেই খানেই।

দেশবিভাগকে অনেকেই মেনে নিতে পারেননি। অনেকের কাছেই তা ছিল এক বেদনাদায়ক ঘটনা। দাঙ্গায় যাঁরা ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিলেন, নিজেদের বাসভূমি থেকে যাঁরা উৎক্ষিপ্ত হয়েছিলেন, যাঁদের স্বজন বিয়োগ হয়েছিল এবং যাঁদের রুজি-রোজগার বন্ধ হয়ে গিয়েছিল তাঁদের কাছে দেশবিভাগ ছিল এক অভিশাপ। হিন্দু-মুসলমান-শিখ সকলের ক্ষেত্রেই এ কথা সমান সত্য। এ ছাড়াও দেশবিভাগ অনেককে অন্য কারণেও বেদনার্ত করেছিল। তাঁদের মধ্যে এমন মানুষ বিরল নন যাঁরা দেশবিভাগের পূর্বাপর ঘটনায় আদর্শের অপঘাত মৃত্যু লক্ষ্য করেছেন। যাঁরা মানুষকে মানুষ হিসেবেই ভালবাসতে চেয়েছেন, মানুষকে তার ধর্মের পরিচয় দিয়ে চিহ্নিত করতে চাননি তাঁরা দেশবিভাগের পরিণতি দেখে ব্যথিত হয়েছেন। এঁদের মধ্যেও হিন্দু, মুসলমান, শিখ এবং অন্য ধর্মের মানুষরা আছেন। আবার এমন মানুষও আছেন যাঁরা একটি অথবা একাধিক ঘটনাকে দেশবিভাগের কারণরূপে নির্দিষ্ট করতে চেয়েছেন এবং দোষ দিয়েছেন সেইসব ঘটনার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন যেসব মানুষ তাঁদের। তাঁদের মনে হয়েছে যে কয়েকজন মানুষের ভুল-ত্রুটি, পক্ষপাতিত্ব এবং অবিবেচনাই দেশবিভাগকে অবশ্যম্ভাবী করে দিয়েছিল। এঁদের কথায় যুক্তি যত আছে, ভাবপ্রবণতা আছে তার চেয়েও বেশি। এঁদের কারও কারও মনে যে হিন্দু মানসিকতা প্রবল নয় সেকথা বলা যায় না। এই সব মানুষের যুক্তি এবং আবেগকে বিশ্লেষণ করলে যে সত্য বেরিয়ে আসে তা হল অখণ্ড ভারতবর্ষে হিন্দুপ্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত না হওয়ার জন্য ক্রোধ। হতে পারে যে এই ক্রোধ তাঁদের জেগেছে প্রত্যক্ষ সংগ্রামের বর্বরতার বেদনা থেকে। সেকথা মেনে নিলেও এ কথা অস্বীকার করা

যাবে না যে তাঁদের অবচেতন মনে এর অঙ্কুর লুকোন ছিল। অনুকূল পরিবেশে তা পল্লবিত হয়েছে। কারণ যাই থাক ঘটনাটি তাই। বস্তুত এই ভেদভাবের বোধই রাজনীতির পটভূমিতে দেশবিভাগকে অনিবার্য করে তুলেছিল। জিন্না তারই নিমিত্ত হয়েছিলেন। জিন্না না হলে হয়তো আর কেউ তাঁর ভূমিকায় দাঁড়িয়ে একই কাজ করতে চেষ্টা করতেন।

ক্ষমতা হস্তান্তরকে কেন্দ্র করে যে পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়েছিল তাতে দেশবিভাগকে আটকাবার সম্ভাব্য উপায় ছিল তিনটি। এক, অখিল ভারত কংগ্রেস কমিটি যদি ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব নাকচ করে দিত। দুই, গান্ধীজী যদি অনশন করে কংগ্রেস নেতাদের দেশবিভাগ মেনে নেবার প্রস্তাব প্রত্যাহার করতে বাধ্য করতেন। তিন, কংগ্রেসকে বাদ দিয়ে যদি অখণ্ড ভারতের জন্য আর একটি আন্দোলন শুরু করা যেত। শেষ থেকে শুরু করা যাক। সমগ্র ভারতবর্ষে আন্দোলন শুরু করার ক্ষমতা একমাত্র গান্ধীজীরই ছিল। তিনি কংগ্রেসের কাছে এই রকম একটি প্রস্তাব দিয়েছিলেন। কংগ্রেস রাজি হয়নি। দেশে তখন এমন কোন প্রকৃত অর্থে সংগঠিত দল ছিল না যাকে অবলম্বন করে আন্দোলন করা যেত। আন্দোলনের ডাক দিলে তাতে অধিকাংশ মুসলমান যোগ দিতেন না। হিন্দুদের লড়তে হত গভর্নমেন্টের সঙ্গে এবং মুসলিম লীগের উন্মত্ত জনতার সঙ্গে। জিন্না তাদের খেপিয়ে দিতেন এই বলে যে যেটুকু পাকিস্তানও পাওয়া যাচ্ছিল তাও হিন্দুদের আন্দোলনের ফলে পাওয়া যাচ্ছে না। এই সম্ভাবনাকে সামনে রেখে গান্ধীজী দাঙ্গায় বিভ্রান্ত জনগণকে ভরসা করে আন্দোলন ডাকার সাহস পাননি। তিনি যে রক্তস্নানের কথা বলেছিলেন তাতে সংগঠিত সমর্থন তিনি পাননি। হতাশার বাতাবরণে সংগ্রাম অসম্ভব ছিল।

গান্ধীজী যদি অনশন করতেন তবে তার প্রভাব জিন্না এবং মুসলিম লীগের উপর পড়ত না। কংগ্রেস নেতারা যদি চাপে পড়ে প্রস্তাব প্রত্যাহার করে নিতেন তা হলে সাময়িকভাবে দেশবিভাগ আটকান সম্ভব হলেও পারস্পরিক অবিশ্বাস, বিদ্বেষ আর হিংসা বেড়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল। দাঙ্গা আরও ব্যাপক আকার ধারণ করত। দাঙ্গা দমনে ব্রিটিশ সেনাদের উপর ভরসা করতে হত। কেননা ভারতীয় সেনাদেরও হিন্দু-মুসলমান বিদ্বেষের দ্বারা আক্রান্ত হয়ে যাবার সম্ভাবনা ছিল। তার ফলে স্বাধীনতা অনেক দিনের জন্য পিছিয়ে যেত। হতে পারে যে দেশবিভাগের ফলে যে প্রাণনাশ এবং ক্ষয়-ক্ষতি হয়েছে তার পরিমাণ অনেক বেশি। গান্ধীজী কংগ্রেস নেতাদের সেকথা বলেছিলেন। রক্তস্নানের কথাও বলেছিলেন। কিন্তু সেই অবস্থায় অন্তত একটি পক্ষকে তিনি সঙ্গে পেতেন। অনশনের দ্বারা চাপ সৃষ্টি করলে অবস্থার বিপর্যয় হয়ে যেত।

কংগ্রেস কর্মীরা যদি ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাব বাতিল করে দিতেন তা হলে রাজনৈতিক সংগঠনরূপে কংগ্রেসের অস্তিত্ব লোপ পেত। মুসলিম লীগের সঙ্গে মোকাবিলা করার উপযুক্ত রাজনৈতিক দল থাকত না। ক্ষমতার হস্তান্তর দীর্ঘ দিনের জন্য আটকে যেত। জিন্না তাতে খুশি হতেন। ইংরেজ সরকারের মনোবাঞ্ছা তাতে পূর্ণ হত। এ জিনিস সেদিন কেউ চাননি। মুসলমানদের অধিকাংশই চাইছিলেন স্বতন্ত্র রাষ্ট্র। হিন্দুরা ভাবছিলেন যাদের নিয়ে শান্তিতে থাকা যাবে না তাদের ছেঁটে ফেলাই ভাল। অতএব দেশবিভাগ হোক। এর বিকল্প দৃশ্যগোচর ছিল না।

হয়তো জিন্নাই পারতেন দেশবিভাগ আটকাতে। তাঁর সেই যোগ্যতা এবং ক্ষমতা ছিল। দেশবিভাগের অনুকূল অবস্থা এবং তার অনিবার্যতা এক দিনে সৃষ্টি হয়নি। তার

পিছনে ছিল এক দীর্ঘ দিনের ইতিহাস। অনেক দিন ধরেই তার প্রস্তুতি চলেছিল, বহু ঘটনার ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে দেশবিভাগের দাবি রূপ পরিগ্রহ করছিল। সেই ঘটনাপ্রবাহের মাথায় ছিলেন জিন্না। তিনি না থাকলে হয়তো আর কেউ সেখানে আসত। কিন্তু ভারতবর্ষে যে অসাম্প্রদায়িক আন্দোলনের ধারা প্রবাহিত ছিল, রাজনৈতিক পটভূমিতে যার পুরোভাগে ছিলেন গান্ধীজী, নেহরু, আজাদ, বাদশা খান, সুভাষচন্দ্র প্রমুখরা জিন্না যদি তাঁদের সঙ্গে হাতে হাত মেলাতেন, সমান পদক্ষেপে এগিয়ে যেতেন তা হলে ব্রিটিশ-শাসননীতির শেষ পরিণাম দেশবিভাগকে হয়তো এড়ান যেত। তা করা যায়নি। কেননা জিন্না পরিস্থিতিকে অতিক্রম করতে পারেননি, বরং তাকে জটিল করে দিয়েছিলেন। আর গান্ধীজী পরিস্থিতির কাছে পরাভূত হয়েছিলেন। দেশবিভাগের এইটিল হল পশ্চাৎ কাহিনী।

পূর্বাভাস

১। Gandhi and the Partition of India—Sandhya Choudhury, p. 204
২। Gandhi Vs. Jinnah—The Debate Over the Partition of India—Allen Hayes Merrian, p. 13
৩। The Discovery of India—Jawaharlal Nehru, p. 347
৪। Ibid, p. 348
৫। Facts are Facts—The Untold Story of India's Partition—Wali Khan, p. 3-4
৬। Quoted in Search for a New Equilibrium in Indian Society—Krishna Kant, Main Stream, Annual Number 1990, p. 16-7
৭। Was India's Partition Unavoidable? —Hiren Mukherjee, p. 52
৮। Ibid, p. 53
৯। Pakistan or Partition of India—B.R. Ambedkar, p. 121-2
১০। The Last Days of British Raj—Leonard Mosley, p. 59
১১। Pakistan or Partition of India, p. 240-1

প্রসঙ্গত : ১৮৮৯ সালে কংগ্রেসের পঞ্চম অধিবেশনে আইনসভার প্রসার এবং সংস্কার সম্পর্কিত একটি প্রস্তাবে সংখ্যালঘুদের প্রতিনিধিত্বের কথা উল্লেখিত হয়েছিল। সেই প্রস্তাবের আলোচনায় কংগ্রেসের প্রতিষ্ঠাতা হিউম যেমন সংখ্যালঘু কথাটি তুলে দেবার পক্ষে মত দিয়েছিলেন তেমনি অযোধ্যার মুন্সী হিদায়েত রসুল চেয়েছিলেন যে জনসংখ্যার অনুপাত উপেক্ষা করে হিন্দু-মুসলমান সদস্য-সংখ্যা সমান হোক। লক্ষ্ণৌ-এর ব্যারিস্টার হামিদালী খাঁ হিন্দু-মুসলমানের উল্লেখ সমর্থন করেননি। তাতে রেগে গিয়ে সৈয়দ ওয়ায়েদ আলি বিওয়াজী বলেছিলেন যে কাউন্সিলে মুসলমান সদস্য-সংখ্যা হিন্দু সদস্য-সংখ্যার তিন গুণ হওয়া উচিত। এর প্রতিবাদ করে সৈয়দ মিরুদ্দিন আহমেদ বালখি বলেছিলেন "আমরা এখানে একটি উদ্দেশ্যেই সমবেত হয়েছি। এখানে মুসলমানরা নিজেদের মুসলমান হিসেবে ভাববে না, হিন্দুরাও নিজেদের হিন্দু হিসেবে ভাববে না। আমরা সবাই জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে ভারতীয় হিসেবে ঘোষণা করব।"

—ভারতের জাতীয় কংগ্রেস—১ম ভাগ, ডঃ হেমেন্দ্রনাথ দাশগুপ্ত, পৃ ১৩৩-৩৪

১২। ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব—অমলেশ ত্রিপাঠী, পৃ ৬২-৩
১৩। Pathway to Pakistan—Choudhury Khaliquzzaman, p. 237
১৪। Ibid, p. 17
১৫। The Transfer of Power in India—V.P. Menon, p. 9-10
১৬। India Divided—Rajendra Prasad, p. 115
১৭। Pathway to Pakistan, p. 18
১৮। শ্যামাপ্রসাদের ভাইরী ও মৃত্যুপ্রসঙ্গ—সম. উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, পৃ. ৫৪
১৯। তদেব, পৃ. ২১৯
২০। The Transfer of Power—1942-7, Vol. IV, published by Her Majestiy's Stationary

Office, p. 112-3

২১। Pathway to Pakistan, p. 28-9

২২। Facts are Facts, p. 5

২৩। The Transfer of Power in India, p. 42

২৪। History of the Freedom Movement in India, Vol. 4, Tarachand, p. 4-5

২৫। Facts are Facts, p. 6

২৬। History of the Freedom Movement in India, Vol. 4, p. 317

২৭। Verdict on India—Beverly Nicholos, p. 184-5 [১৯৪৪ সালে প্রকাশিত এই বইটির উদ্দেশ্য ছিল ভারতবর্ষের, তার ধর্ম, সভ্যতা এবং নেতাদের কুৎসা রচনা করা।]

২৮। The Transfer of Power 1942-7, Vol. I, p. 811

২৯। History of the Freedom Movement in India, Vol. 4, p. 17

৩০। The Transfer of Power 1942-7, Vol. II, p. 811

৩১। Verdict on India, p. 192

৩২। History of the Freedom Movement in India, Vol. 4, p. 11-2

৩৩। Ibid, p. 75-6

৩৪। Mahatma Gandhi, The Last Phase, Vol. I, Book 1—Pyarelal, p. 75

৩৫। Pathway to Pakistan, p. 34

৩৬। Ibid, p. 37

৩৭। Gandhi and the Partition of India, p. 23

৩৮। Facts are Facts, p. 9

৩৯। Ibid, p. 37

৪০। Pilgrimage to Freedom, Part I—K.M. Munshi, p. 71

৪১। প্রসঙ্গত : "অধ্যাপক ক্লার্ক বলেছেন যে চরমপন্থীদের কর্মপন্থার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতার যে প্রবণতা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছিল তার অন্যতম উৎস বঙ্কিমচন্দ্রের চিন্তাধারা। বলা বাহুল্য এ জাতীয় মন্তব্য খণ্ডিত মূল্যায়নের ফল। বঙ্কিমচন্দ্রের লেখনী কখনই সৎ মুসলমানদের বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করেনি। তাঁর রচনায় নিন্দিত হয়েছিলেন কেবলমাত্র অত্যাচারী বা অপদার্থ মুসলমানবর্গ।"—অমলেশ ত্রিপাঠী, 'ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব', পৃ ২৯।

৪২। Pathway to Pakistan, p. 76

৪৩। The Transfer of Power in India, p. 31

৪৪। Pathway to Pakistan, p. 99

৪৫। Ibid, p. 135-6

৪৬। Was India's Partition Unavoidable? p. 32

৪৭। Khilafat to Pakistan—Molin Shakir, p. 177

৪৮। Was India's Partition Unavoidable? p. 32-3

৪৯। Pilgrimage to Freedom. p. 25

৫০। জিন্না-পাকিস্তান—নতুন ভাবনা, শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়, পৃ. ১৮

৫১। Pilgrimage to Freedom, p. 3, 8

৫২। Mahatma, Vol. 1—D.G. Tendulkar, p. 191

৫৩। Ibid, p. 191-2

৫৪। Search For a New Equilibrium etc. p. 139

৫৫। যুক্ত বাংলার শেষ অধ্যায়—কালিপদ বিশ্বাস, পৃ. ১৯২

৫৬। ভারত স্বাধীন হলো—আবুল কালাম আজাদ, পৃ. ৩৭

৫৭। যুক্ত বাংলার শেষ অধ্যায়, পৃ. ১৪, ৩১, ৩৫

৫৮। Pathway to Pakistan, p. 70-1

৫৯। Mahatma, Vol. II, p. 58

৬০। Ibid, p. 148

৬১। Ibid, p. 234-5
৬২। Pilgrimage to Freedom, p. 25
৬৩। Discovery of India, p. 388
৬৪। Gandhi Vs. Jinnah, p. 14
৬৫। The Discovery of India, p. 369
৬৬। History of the Freedom Movement in India, Vol. 4, p. 204-5
৬৭। Mahatma, Vol. 4, p. 14
৬৮। The Discovery of India, p. 352
৬৯। Pakistan or Partition of India, p. 25
৭০। The Transfer of Power in India, p. 57
৭১। The Discovery of India, p. 373
৭২। History of the Freedom Movement in India, Vol. 4, p. 225
৭৩। Ibid, p. 226 এবং Pilgrimage to Freedom, p. 346
৭৪। Ibid, p. 230-31 এবং Pathway to Pakistan, p. 161-3
৭৫। ভারত স্বাধীন হলো, পৃ. ২৩১-২
৭৬। Guilty Men of India's Partition—Ram Monohor Lohia, p. 59
৭৭। Gandhi and Partition of India, p. 30
৭৮। আজাদ ছিলেন একাধারে যুক্তিবাদী ও জাতীয়তাবাদী—অন্নদাশঙ্কর রায়, আজকাল, ২-৭-৮৯
৭৯। Pathway to Pakistan, p. 183
৮০। Ibid, p. 191
৮১। Ibid, p. 192

পরিকল্পনা

১। India's Struggle For Independence 1857-1947—Bipan Chandra and others, p. 441
২। Gandhi Vs. Jinnah, p. 56-7
৩। The Origins of Partition of India—Anita Inder Singh, p. 36, 38
৪। The Discovery of India, p. 393
৫। Facts are Facts, p. 21
৬। The Origins of Partition of India, p. 32
৭। History of The Freedom Movement of India, Vol. 4, p. 262
৮। Ibid, p. 318
৯। Pathway to Pakistan, p. 237-9
১০। The Origins of The Partition of India, p. 107
১১। Pakistan or Partition of India, p. 103
১২। Pathway to Pakistan, p. 200-01
১৩। Ibid, p. 38
১৪। Pilgrimage to Freedom, p. 47
১৫। Pakistan or Partition of India, p. 109
১৬। Pathway to Pakistan, p. 108 এবং Gandhi Vs. Jinnah, p. 17
১৭। Search for a New Equilbrium in Indian Society, p. 16
১৮। India Divided, p. 204-05
১৯। History of the Freedom Movement in India, Vol. 4, p. 239
২০। Search For a New Equilibrium in Indian Society, p. 16
২১। Gandhi Vs. Jinnah, p. 16
২২। India Divided, p. 176-7

২৩। The Transfer of Power in India, p. 382-3
২৪। Facts are Facts, p. 40-1
২৫। Gandhi and the Partition of India, p. 46-7
২৬। Pathway to Pakistan, p. 235-7
২৭। যুক্ত বাংলার শেষ অধ্যায়, পৃ. ১৯৯-২০০
২৮। Pathway to Pakistan, p. 207-8
২৯। Pakistan or Partition of India, p. 3-4
৩০। যুক্ত বাংলার শেষ অধ্যায়, পৃ ২২১-২
৩১। The Transfer of Power in India, p. 106
৩২। The Origins of The Partition of India, p. 74-5
৩৩। Facts are Facts, p. 29
৩৪। Pakistan Resolution to Pakistan, p. 78-9
৩৫। Ibid, p. 22-3
প্রসঙ্গত : ওয়াভেল ১৯৪৬ সালের আগস্ট মাসে পেথিক লরেন্সকে একটি 'জরুরী এবং গোপন' টেলিগ্রামে ফজলুল হক সম্পর্কে তাঁর মত জানিয়ে লিখেছিলেন : "You know Fazlul Huq's record. He is corrupt even for a Bengali. I do not feel I can stomach his inclusion in the Ministry and no name could possibly be more provocative to the League. I shall tell Nehru that I refuse to accept him." (The Transfer of Power 42-7, Vol. VIII p. 272) ফজলুল হককে এই সময় লীগ সহ্য করতে পারত না ওয়াভেলের কাছে এইটিই কি তাঁকে মন্ত্রীসভায় না নেবার বড় কারণ ছিল ?
৩৬। Khilaphat to Pakistan, p. 151
৩৭। Mahatma, Vol. 5, p. 272
৩৮। Was India's Partition Unavoidable? p. 60 এবং Transfer of Power in India, p. 83
৩৯। The Transfer of Power, 42-47, Vol. II, p. 86
৪০। Was India's Partition Unavoidable? p. 59
৪১। Pakistan Resolution to Pakistan, p. 41
৪২। The Origins of The Partition of India, p. 89
৪৩। The Transfer of Power, 42-47, Vol. II, p. 266
৪৪। The Transfer of Power in India, p. 153
৪৫। Facts are Facts, p. 47
৪৬। Verdict on India, p. 192
৪৭। Was India's Partition Unavoidable? p. 82
৪৮। The Last Days of British Raj, p. 6
৪৯। Ibid, p. 9
৫০। The Transfer of Power in India, p. 87
৫১। Mountbatten and the Partition of India—Lorry Collins & Dominique Lappiere, p. 27
৫২। Pathway to Pakistan, p. 392
৫৩। The Transfer of Power in India, p. 59-60
৫৪। Pilgrimage to Freedom, p. 73
৫৫। The Transfer of Power in India, p. 84-5
৫৬। The Origins of The Partition of India, p. 122
৫৭। Ibid, p. 143
৫৮। Ibid, p. 144-5
৫৯। The Transfer of Power 1942-7, Vol. IV, p. 585
৬০। Ibid, p. 960
৬১। Ibid, p. 1070

৬২। Ibid, p. 966
৬৩। The Transfer of Power 1942-7,Vol. I, p. 14
৬৪। Ibid, p. 97
৬৫। The Origins of Partition of India, p. 45
৬৬। The Transfer of Power 1942-7, Vol. I, p. 153
৬৭। Ibid, p. 190
৬৮। Survey of British Commonwelth Affairs: Problems of Wartime Cooperation and Postwar Change—1939-52—Nicholes Mansengh, p. 209-11, quoted in Pakistan Resolution to Pakistan, 1940-47, p. 94-5
৬৯। স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস (১৮৮৫-১৯৪৭)—অমলেশ ত্রিপাঠী, পৃ. ২৯৪
৭০। The Transfer of Power 1942-47, Vol. I, p. 837
৭১। ভারত স্বাধীন হলো, পৃ. ৭০
৭২। তদেব, পৃ. ৯৭
৭৩। History of The Freedom Movement in India, Vol. 4, p. 342
৭৪। ভারত স্বাধীন হলো, পৃ. ৮২
৭৫। Mahatma, Vol. 6, p. 74
৭৬। The Orlgins of the Partition of India, p. 76
৭৭। Facts are Facts, p. 38-9
৭৮। The Transfer of Power 42-47, Vol. !, p. 413-4
৭৯। Ibid, p. 865
৮০। The Transfer of Power in India, Vol. IV, p. 93
৮১। The Origins of Partition of India, p. 59
৮২। Mahatma, Vol. 6, p. 87
৮৩। History of The Freedom Movement in India, Vol. IV, p. 369

প্রস্তুতি

১। Mahatma, Vol. 5, p. 280
২। Mahatma Gandhi—Sourse Material for a history of the Freedom Movement in India, Vol. III, part II p. 492
৩। Harijan, 23-3.40, p. 49
৪। Ibid, 6-4.40, p. 76
৫। Mahatma, Vol. 5, p. 270
৬। The Origins of Partition of India, p. 108-9
৭। History of The Freedom Movement of India, Vol. 4, p. 428; The Last Phase, Vol. I, BK-1, p. 65-6, এবং The Pilgrimage to Freedom, p. 434
৮। History of The Freedom Movement, Vol. 4, p. 429
৯। Ibid, p. 429
১০। The Last Phase, Vol. I, BK-1, p. 86-7
১১। Mahatma, Vol. 6, p. 271
১২। Pakistan Resolution to Pakistan—1940-47, p. 76-8

গান্ধীজী চিঠি লিখেছিলেন ১৫-৯-৪৪ তারিখে। তাতে ছিল With this background I shall present you with my difficulty in accepting your resolution:

(1) Pakistan was not in the resolution. Does it bear the original meaning—the Punjab, Afganistan, Kashmir, Sind and Beluchistan out of which the name was mnemocially formed? If not, what is it?

(2) Is the goal of Pakistan pan-Islamic?

(3) What is it that distinguishes an Indian Muslim from every other Indian, if not his religion? Is he different from a Turk or an Arab?

(4) What is the connotation of the word 'Muslim' in the resolution under discussion? Does it mean the Muslims of the India of geography or the Pakistan to be?

(5) Is the resolution addressed to Muslims by way of education or to the inhabitants of the whole of India by way of appeal, or to the foreign rulers as an ultimattum?

(6) Are the constituents in the two zones to constitute 'independent States', as undefined number in each zone?

(10) Please satisfy me that these independent states will not become a collection of poor States, a menace to themselves and to the rest of India.

(11) Pray show me the facts and figures or otherwise how far independence and welfare of India as a whole can be brought about by the acceptance of the resolution.

(13) What is defination of 'minorities'?

জিন্না ১৭-৯-৪৪ তারিখে চিঠির উত্তর দিয়েছিলেন। তিনি গান্ধীজীর অধিকাংশ প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে গিয়েছিলেন। কেবল দুটি প্রশ্নের তিনি সরাসরি উত্তর দিয়েছিলেন। যেমন—

(1) Yes the word 'Pakistan' is not mentioned in the resalution, and it does not bear the original meaning. The word has become synonymous with the Lahore resolution.

(6) No. They will form units of Pakistan.

জিন্না চিঠির প্রারম্ভে এ কথাও বলে দিয়েছিলেন : We maintain and hold that Muslims and Hindus are too major nations by defination, or test of a nation.

১৩। The Transfer of Power 42-7, Vol. IV, p. 1182

১৪। যুক্ত বাংলার শেষ অধ্যায়, পৃ. ২৩০

১৫। The Transfer of Power 42-7, Vol. V, P. 74 এবং History of The Freedom Movement in India, Vol. 4, p. 434-5

১৬। The Last Phase, Vol. 1, BK-1, p. 117-20

প্রসঙ্গত : সংরক্ষণবাদী লর্ড এলেনবারো হাউস অফ লর্ডস-এ একবার বলেছিলেন : "Our every existence depended upon the exclusion of the native from the military and political power. We have won the empire by the sword and we preserve it by the same means." শাসনকার্যে ভারতবাসীদের যুক্ত করার প্রসঙ্গে তিনি এই কথাগুলি বলেছিলেন। কিন্তু উদারপন্থীরা তাঁর এই মানসিকতা সব সময় সমর্থন করতেন না। ব্রাডল ছিলেন সেই রকম একজন উদারনীতিক ইংরেজ। তিনি ৩১-১২-১৮৮৩ তারিখে পার্লামেন্টে বলেছিলেন : "I am of opinion that we have obtained our authority in India in a great part by means, of which we ought to be heartily ashamed. And I think if we continue to govern India there is the weightiest duty upon every Englishman and English woman to take care that the despatic authority of England should be used, as much as it can be, to redeem our past and to make our Indian fellow citizens desirous of being governed by us."

—Hindu Patriot, 9.1.1884

এখানেও সাম্রাজ্যবাদীর মানসিকতা প্রকট হয়েছিল। তবে তা অনেকটা পরিশীলিত। বস্তুত ইংরেজদের মনে এই ধারণা দীর্ঘ দিন প্রবল ছিল যে ভারতবর্ষকে শাসন করা তাদের পবিত্র কর্তব্য।

১৭। The Last Phase, Vol 1, BK-1, p. 26-7

১৮। স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, পৃ. ৩৮৪-৫
১৯। The Transfer of Power in India, p. 196
২০। The Transfer of Power 42-7, Vol. V, p. 1204
২১। Ibid, p. 1206
২২। The Transfer of Power in India, p. 211, 214
২৩। Mahatma, Vol 7, p. 10-1
২৪। গান্ধীজীর দূত—সুধীর ঘোষ, পৃ. ৫৭
২৫। ভারতে মাউন্টবেটেন-এ্যালেন ক্যাম্বেল জনসন, পৃ. ১
২৬। India From Curzon to Nehru and After—Durga Das, p. 229
২৭। ভারত স্বাধীন হলো, পৃ. ২৫৪
২৮। তদেব, পৃ. ২৫৪
২৯। Was India's Partition Unavoidable? p. 51
৩০। The Last Phase, Vol. 1, BK-1, p. 132
৩১। Facts are Facts, p. 50-3
৩২। The Origins of Partition of India, p. 101

প্রয়োগ

১। The Last Phase, Vol. 1, BK-1, p. 198
গান্ধীজী ১৮-৬-৪৫ তারিখে তাঁর এই আপত্তির কথা একটি টেলিগ্রামে ওয়াভেলকে জানিয়েছিলেন। গান্ধীজী লিখেছিলেন : My objection to inavilibility of parity between Muslims and caste Hindus stands. If that view incapable of being altered by British Government my advise Congress will be not to participate in formation executive council. (The Transfer of Power 42-7, Vol. V, p. 1143)
২। The Origins of Partition of India, p. 146
৩। India's Struggle for Independence, p. 423
৪। স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, পৃ. ৪০৭
৫। History of the Freedom Movement of India, Vol. 4, p. 460-1
৬। Ibid, p. 463
৭। Gandhi Vs. Jinnah, p. 18
৮। গান্ধীজীর দূত, পৃ. ১২৯-৩১ এবং ; The Last Phase, Vol. 1, BK-1, p. 198
৯। গান্ধীজীর দূত, পৃ. ১৩৬
১০। The Man who Saved India from Disaster—Satis Kakoti, The Telegraph, dt. 9.8.89 p. 7
গোপীনাথ বরদৌলি অসমের সমস্যাটি বড় করে তুলে ধরেছিলেন। মন্ত্রীমিশনের প্রস্তাব বাতিল হয়ে যাবার যে কয়েকটি কারণ ছিল তার মধ্যে প্রদেশগুলির গ্রুপে যাওয়ার সমস্যাটি ছিল প্রবল। সিমলা কনফারেন্সের সময়েই মন্ত্রীমিশন কংগ্রেস ও লীগের মধ্যে চুক্তি যাতে সম্পাদিত হয় তার জন্য কয়েকটি পরামর্শ দিয়েছিলেন। তার মধ্যে অন্তর্বর্তী সরকার গঠনের কথা ছিল। কংগ্রেস চেয়েছিল যে অন্তর্বর্তী সরকার এখনই গঠিত হোক এবং পরে যদি কোন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দেয় তবে তার সমাধান করার জন্য বিতর্কিত বিষয়গুলি একটি নিরপেক্ষ সালিশীর কাছে উত্থাপন করা হবে এই মর্মে একটি সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হোক। কংগ্রেসের এই প্রস্তাব কার্যকর করা যাবে বলে অনেকে মনে করেননি : (The Transfer of Power in India, Vol. IV, p. 257-8)। কংগ্রেসের এই প্রস্তাব সমর্থিত না হওয়ায় মন্ত্রীমিশন উভয় পক্ষকে তাঁদের পরামর্শ দিতে বলেছিলেন। মুসলিম লীগ তাঁদের স্মারক পত্রে দাবি করেছিলেন— (১) মুসলমান-প্রধান প্রদেশগুলিকে একটি গ্রুপে সংঘবদ্ধ করা হোক। প্রদেশগুলি পররাষ্ট্র, দেশরক্ষা, যোগাযোগ ছাড়া বাকি বিষয়গুলি দেখাশোনা করবে। (২) দুটি মুসলমান প্রদেশের জন্য একটি

পৃথক গণপরিষদ গঠন করতে হবে। (৩) পাকিস্তান ফেডারেল গভর্নমেন্ট গঠিত হবার পর প্রদেশগুলির যে কোন রাষ্ট্রে যোগদান করার স্বাধীনতা থাকবে। অন্য দিকে কংগ্রেসের দাবি ছিল—(১) ফেডারেল গভর্নমেন্টের জন্য একটিই সংবিধান রচিত হবে। এবং (২) সেটি হয়ে যাবার পর প্রদেশগুলি গ্রুপে সংঘবদ্ধ হবে। (Ibid, p. 263)

১১। The Last Days of British Raj, p. 15-6, এবং ভারত স্বাধীন হলো, পৃ. ২০২-৪
১২। ভারত স্বাধীন হলো, পৃ. ২১৫
১৩। তদেব, পৃ. ২১৬-৭
১৪। The Last Days of British Raj, p. 21
১৫। Pakistan Resolution to Pakistan, p. 136-9
১৬। The Transfer of Power in India, p. 246-7
১৭। ভারত স্বাধীন হলো, পৃ. ২১৫
১৮। The Last Phase, Vol. 1, BK-1, p. 255-6
১৯। The Last Days of British Raj, p. 21
২০। Gandhi Vs. Jinnah, p. 117
২১। History of The Freedom Movement in India, Vol. 4, p. 283
২২। The Transfer of Power in India, p. 284
২৩। The Origins of Partition of India, p. 181-3
২৪। The Last Days of British Raj, p. 26-7
২৫। The Last Phase, Vol. 1, BK-1, p. 257-8
২৬। উদ্ধৃতি : আনন্দবাজার পত্রিকা, ২৫-৯-৮০
২৭। The Origins of Partition of India, p. 154
২৮। স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, পৃ. ৪৪৫
২৯। ভারতে মাউন্টবেটেন, পৃ. ২৫
৩০। History of The Freedom Movement of India, Vol. 4, p. 484-5
৩১। The Last Phase, Vol. 1, BK-1, p. 219
৩২। Ibid, p. 222
৩৩। গান্ধীজীর দূত, পৃ. ১৫৬

জিন্নার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের পর ৭-৬-৪৬ তারিখে ওয়াভেল তাঁর বিবরণে লিখেছিলেন যে অন্তর্বর্তী সরকারে জিন্না প্রতিরক্ষামন্ত্রীর পদ বেশি পছন্দ করেছিলেন এবং চেয়েছিলেন যে সেই সঙ্গে তিনি মুসলিম লীগেরও সভাপতি থাকবেন।

—The Transfer of Power 42-7, Vol. VII, p. 839

৩৪। The Last Phase, Vol. 1, BK-1, p. 222-3
৩৫। Ibid, p. 267-8
৩৬। Gandhi and Partition of India, p. 180
৩৭। Pathway to Pakistan, p. 370
৩৮। The Transfer of Power in India, p. 312-8
৩৯। The Last Days of British Raj, p. 91
৪০। ভারত স্বাধীন হলো, পৃ. ২৫২
৪১। যুক্ত বাংলার শেষ অধ্যায়, পৃ. ২৪৩-৫
৪২। The Transfer of Power in India, p. 324-5
৪৩। History of The Freedom Movement in India, Vol. 4, p. 492-3

পরিণতি

১। Was India's Partition Unavoidable? p. 6
২। The Last Days of British Raj, p. 14-5, এবং ভারত স্বাধীন হলো, পৃ. ২০৫-৬

৩। ভারত স্বাধীন হলো, পৃ. ২০৮-৯
৪। History of the Freedom Movement in India, Vol. 4, p. 453
৫। The Transfer of Power 42-7, Vol. IX, p. 926
৬। ভারত স্বাধীন হলো, পৃ. ২৫৭
৭। তদেব, পৃ. ২১১
৮। Sardar's Letters Mostly Unknown, Vol. 1, p. 171
৯। ভারত স্বাধীন হলো, পৃ. ১৩৬
১০। তদেব, পৃ. ২৬১
১১। গান্ধীজীর দূত, পৃ. ২০১-৪
১২। My Life And Struggle—Badsha Khan, p. 211-2
১৩। Ibid, p. 178
১৪। Ibid, p. 205
১৫। ভারত স্বাধীন হলো, পৃ. ২৬৪
১৬। Pakistan Resolution to Pakistan 1940-47, p. 220
১৭। My Life And Struggle, p. 204
১৮। Guilty Men of India's Partition, p. 20
১৯। Pilgrimage to Freedom, Vol. 1, p. 466
২০। The Last Days of British Raj, p. 101
২১। Ibid, p. 118
২২। ভারতে মাউন্টবেটেন, পৃ. ৬৩
২৩। তদেব, পৃ. ৭৩
২৪। The Last Days of British Raj, p. 142
২৫। ভারতে মাউন্টবেটেন, পৃ. ৫৭
২৬। The Last Days of British Raj, p. 117-8
২৭। Ibid, p. 131-2
২৮। The Transfer of Power in India, p. 354-5
২৯। ভারতে মাউন্টবেটেন, পৃ. ৪৭
৩০। Mountbatten and The Partition of India, p. 148
৩১। Sardar's letters mostly unknown, Vol. 1, p. 206
৩২। ভারতে মাউন্টবেটেন, পৃ. ৩৭
৩৩। The Last Days of British Raj, p. 106
৩৪। India From Curzon to Nehru & After, p. 254-5; এবং ভারত স্বাধীন হলো, পৃ. ২৬২
৩৫। Mahatma Gandhi—The Last Phase, Part-II, p. 163
৩৬। ভারত স্বাধীন হলো, পৃ. ২৭১
৩৭। The Last Days of The British Raj, p. 107
৩৮। Ibid, p. 109
৩৯। গান্ধী রচনা সম্ভার, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৩৯৩
৪০। Pilgrimage to Freedom, p. 126
৪১। Pakistan Resolution to Pakistan, p. 275
৪২। Mahatma Gandhi—The Last Phase, Vol. 1, BK-1, p. 94-5
৪৩। Mahatma Gandhi—Source Material, Vol. III, Part-II, p. 493
৪৪। History of The Freedom Movement in India, Vol-4, p. 479
৪৫। The Origins of The Partition of India, p. 60
৪৬। ভারতে মাউন্টবেটেন, পৃ. ২০
৪৭। তদেব, পৃ. ২১
৪৮। শ্যামাপ্রসাদের ডাইরি ও মৃত্যুপ্রসঙ্গ, পৃ. ২১৯

৪৯। Pilgrimage to Freedom, Vol. 1, p. 84-5
৫০। যুক্ত বাংলার শেষ অধ্যায়, পৃ. ২১২
৫১। শ্যামাপ্রসাদের ডাইরি ও মৃত্যু প্রসঙ্গ, পৃ. ৫৫
৫২। গান্ধীজীর দূত, পৃ. ১০০
৫৩। Pilgrimage to Freedom, Vol. 1, p. 81
৫৪। India From Curzon to Nehru & After, p. 205
৫৫। The Last Days of British Raj, p. 285
৫৬। Mahatma Gandhi—The Last Phase, Vol. 1, BK-1, p. 273
৫৭। Mahatma, Vol. 7, p, 189
৫৮। History of The Freedom Movement of India, Vol. 4, p. 509
৫৯। Pilgrimage to Freedom, Vol. 1, p. 121
৬০। স্বাধীনতা সংগ্রামে ভারতের জাতীয় কংগ্রেস, পৃ. ৪৯৭-৮
৬১। The Life of Mahatma Gandhi—Louis Fischer, p. 506
৬২। জিন্না, পাকিস্তান—নতুন ভাবনা, পৃ. ১২৯
৬৩। Gandhi Vs. Jinnah, p. 39
৬৪। History of The Freedom Movement in India, Vol. 4, p. 118-21
৬৫। Facts are Facts, p. 9-10.
৬৬। Was India's Partition Unavoidable? p. 38
৬৭। Gandhi Vs. Jinnah, p. 62-4
৬৮। Ibid, p. 62
৬৯। History of The Freedom Movement in India, Vol. 4, p. 428
৭০। Gandhi Vs. Jinnah, p. 115
৭১। History of The Freedom Movement in India, Vol. 4, p. 10
৭২। The Origins of The Partition of India, p. 7, 25
৭৩। Facts are Facts, p. 52-3
৭৪। Pilgrimage to Freedom, Part-I, p. 439

গান্ধীজীর এই মন্তব্যটি কে. এম. মুন্সির ছেলেকে লেখা একটি নোটে আছে। তারিখ নেই। তবে মনে হয় নোটটি গান্ধী-জিন্না আলোচনার সময় লেখা হয়েছিল। গান্ধীজী যে সভার কথা উল্লেখ করেছেন সম্ভবত সেটি ছিল ১৯১৬ সালে দক্ষিণ আফ্রিকা থেকে ফেরার পর তাঁর সংবর্ধনা সভার।

৭৫। Gandhi Vs. Jinnah, p. 58-9
৭৬। Was India's Partition Unavoidable? p. 40
৭৭। ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের ইতিহাস, পৃ. ৪৩০

জিন্না সম্পর্কে দুটি প্রাসঙ্গিক মন্তব্য এখানে উল্লেখ করা যায়।

(১) ৬-৮-৪৫ তারিখে ওয়াভেল পেথিক লরেন্সকে একটি অত্যন্ত গোপনীয় টেলিগ্রামে জানিয়েছিলেন : "একটি দৃঢ় ধারণার সৃষ্টি হয়েছে যে জিন্নার আচরণ হল বাধাজনক। রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক দু দিক থেকেই যে তা অসুবিধাজনক তা প্রকাশ করে দেওয়া উচিত।" (The Transfer of Power 42-7, Vol. VI, p. 38)

(২) ১৩-৮-৪৬ তারিখে একটি ব্যক্তিগত এবং গোপনীয় চিঠিতে ওয়াভেল পেথিক-লরেন্সকে জানিয়েছিলেন : "নেহরুর প্রেরিত সংবাদ যা আপনাকে পাঠিয়েছি তা মোটামুটি ভাল বলেই মনে হয়। কেননা তিনি কোয়ালিশন গভর্নমেন্টের জন্য চেষ্টা করতে রাজি আছেন। কিন্তু শর্তগুলি যুক্তিপূর্ণ হলেও জিন্না তাঁর অহংকার গলাধঃকরণ করতে পারবেন এবং অন্তর্বর্তী সরকারে যোগ দেবেন এই বিষয়ে আমার যথেষ্ট সন্দেহ আছে। একটি সিদ্ধান্ত নেওয়া খুবই কঠিন ব্যাপার।" (Ibid, Vol. VIII, p. 227)

৭৮। The Origins of The Partition of India, p. 125
৭৯। ভারত স্বাধীন হলো, পৃ. ১৬৭

৮০। Pathway to Pakistan, p. 43
৮১। Was India's Partition Unavoidable? p. 30-1
৮২। Ibid, p. 6
৮৩। Pathway to Pakistan, p. 250
৮৪। Pakistan Resolution to Pakistan 1940-47, p. 73
৮৫। History of The Freedom Movement in India, Vol. 4, p. 434
৮৬। Pakistan or Partition of India, p. 253-9
৮৭। Gandhi Vs. Jinnah, p. 41-2
৮৮। Was India's Partition Unavoidable? p. 52
৮৯। The Origins of Partition of India, p. 128
৯০। India Divided, p. 373
৯১। Search For A New Equilibrium in Indian Society, p. 141
৯২। Ibid, p. 136

প্রসঙ্গত : ১৮৬১-র ইন্ডিয়ান কাউন্সিল বিল-এর উপর বিতর্কের সময় স্যার চার্লস উড (ভারত সচিব) খুব জোর দিয়েই বলেছিলেন যে "আইন প্রণয়নের সময় আমাদের একটা নয়, বিভিন্ন ধর্ম, ভাষা, রীতিনীতি এবং আচার-আচরণে বিভক্ত কয়েকটা জাতির কথা মনে রাখতে হবে।" এর প্রায় ২৭ বছর পরে স্যার সৈয়দ আহমদ দ্বি-জাতি তত্ত্বের কথা প্রথম উচ্চারণ করেন।

৯৩। Mountbatten and the Partition of India, p. 63
৯৪। Gandhi Vs. Jinnah, p. 60-1
৯৫। Pilgrimage to Freedom, p. 442-4
৯৬। History of The Freedom Movement in India, Vol. 4, p. 517
৯৭। ভারতে মাউন্টবেটন, পৃ. ৫৬
৯৮। Mountbatten and The Partition of India, p. 37
৯৯। Freedom at Midnight, p. 109-11
১০০। Mountbatten and The Partition of India, p. 58-62
১০১। Pathway to Pakistan, p. 321

উত্তরপ্রদেশের গভর্নর স্যার এফ উইলি ২-১-৪৬ তারিখে ওয়াভেলকে লিখেছিলেন : "আমার তাঁকে (খালিকুজ্জমান) খুবই পছন্দ হয়েছে। কিন্তু তাঁর কথা বলার সময় আমার দৃঢ় ধারণা জন্মেছে যে তিনি আমার মতনই পাকিস্তান বিশ্বাস করেন না।" (he did not believe in Pakistan in any more than I do.)—The Transfer of Power 42-7, Vol. VI, p. 727.

১০২। Gandhi: Prisoner of Hope, p. 367
১০৩। Ibid, p. 368
১০৪। The Indian Struggle—Subhas Chandra Bose, p. 227-8
১০৫। Mahatma Gandhi—The Last Phase, BK-I, Vol. 1, p. 29-30
১০৬। India From Curzon to Nehru & After, p. 194
১০৭। Pilgrimage to Freedom, Vol. 1, p. 440
১০৮। Harijan, 13.4.40
১০৯। Freedom at Midnight, p. 118-9
১১০। The Last Phase, BK-I, Vol. II, p. 161
১১১। Harijan, 18-5-47.
১১২। Was India's Partition Unavoidable? p. 61-2
১১৩। Protagonist of Pakistan —M.K. Gandhi, p. 132-3, এবং The Transfer of Power in India, p. 164-5
১১৪। Gandhi: His Life and Through—J.B. Kriplani, p. 277
১১৫। History of The Freedom Movement in India, Vol. 4, p. 471
১১৬। গান্ধীজীর দূত, পৃ. ১৪১-৫৩

১১৭। ভারতের মুক্তি সংগ্রামে চরমপন্থী পর্ব, পৃ. ১৬৪
১১৮। Gandhi: His Life and Thought, p. 224
১১৯। The Last Days of British Raj, p. 141-2
১২০। Mahatma, Vol. 7, p. 145-6
১২১। Gandhi: Prisoner of Hope, p. 371, এবং C.W.M.G., Vol. 88, p. 13, 34

১৯৪৬ সালে লিখিত একটি নোটে গান্ধীজী বিড়লাকে লিখেছিলেন : "আমার হৃদয় ক্ষতবিক্ষত। কিন্তু যেসব ঘটনা ঘটে চলেছে তার জন্য নয়। আমার স্থান কোথায় তা আমাকে দেখে নিতে হবে। ওয়ার্কিং কমিটিতে আমার কথার কোন মূল্য নেই। আমি যদি স্থানত্যাগ করি তবে এই ক্ষত দূর হতে পারে। যেভাবে সব ঘটনা ঘটছে তা আমার মনঃপূত নয়, কিন্তু তা আমি প্রকাশ করতে পারছি না। আমি যদি নিজেকে সরিয়ে নিই তা হলে কিছু সৃষ্টির কাজ করতে পারি। এখন আমার নিজেকে ত্রিশঙ্কু বলে মনে হচ্ছে। সত্যিই কি এখন আমার হিমালয়ে চলে যাবার সময় এসেছে ? অনেকে তো তেমন পরামর্শ দিতে শুরু করেছেন।"

১২২। Collected Works of Mahatma Gandhi, Vol. 86, p. 295
১২৩। Gandhi: Prisoner of Hope, p. 369
১২৪। Gandhi: His Life and Mission, p. 224
১২৫। Pakistan Resolution to Pakistan, 1940-47, p. 213, 218
১২৬। Freedom at Midnight, p. 119
১২৭। ভারতে মাউন্টবেটেন, পৃ. ৯২
১২৮। তদেব, পৃ. ১২৫
১২৯। Mahatma, Vol. 8, p. 6
১৩০। The Last Days of British Raj, p. 126
১৩১। Mountbatten and The Partition of India, p. 99
১৩২। Pilgrimage to Freedom, Vol. 1, p. 439
১৩৩। Mountbatten and The Partition of India, p. 95-6
১৩৪। Ibid, p. 151
১৩৫। Mahatma, Vol. 8, p. 4
১৩৬। Mountbatten and The Partition of India, p. 157
১৩৭। Mahatma Gandhi—The Last Phase, BK-1, Vol. 1, p. 29
১৩৮। My Days With Gandhi—N.K. Bose, p. 230-6
১৩৯। Freedom at Midnight, p. 161-3
১৪০। My Days With Gandhi, p. 128-30
১৪১। Gandhi Vs. Jinnah, p. 81
১৪২। Mahatma, Vol. 7, p. 3
১৪৩। A bunch of old letters written mostly to Jawaharlal Nehru, p. 515
১৪৪। Mahatma Gandhi—The Last Phase, Vol. 1, BK-II, p. 210
১৪৫। গান্ধী রচনা সম্ভার, ৬ষ্ঠ খণ্ড, পৃ. ৪২৭
১৪৬। The Transfer of Power 42-7, Vol. XII, p. 594, 601
১৪৭। Mahatma Gandhi—The Last Phase, BK-II, Part-II, p. 87, 157; এবং Mountbatten and The Partition of India, p. 186-7
১৪৮। My Days With Gandhi, p. 128-30
১৪৯। Guilty Men of India's Partition, p, 22
১৫০। Harijan, 22-6-47, p. 205
১৫১। India's Struggle for Independence, p. 409
১৫২। Ibid, p. 417
১৫৩। Khilafat to Partition, p. 21
১৫৪। India's Struggle for Independence, p. 417-8

১৫৫ । Ibid, p. 166
১৫৬ । গান্ধীজীর দূত, পৃ. ৭-৯
১৫৭ । The Transfer of Power 42-7, Vol. I, p. 731
১৫৮ । The Transfer of Power 42-7, Vol. I, p. 697
১৫৯ । Ibid, Vol. III, p. 726, 730
১৬০ । Gandhi and The Partition of India, p. 115
১৬১ । History of the Freedom Movement of India, Vol. 4, p. 496
১৬২ । Ibid, p. 499

প্রদেশ কথাটি বলতে সঠিক কী বোঝান হচ্ছে তা নিয়েও অনেকের মনে সংশয় দেখা দিয়েছিল। মাস্টার তারা সিং ২৩-১০-৪৫ তারিখে এটলিকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন : I most earnestly request on behalf of the Sikhs, that, His Majesty's Government should clarify that Cripp's offer by anouncing that the term Province as used therein does not mean as Province delimited today (The Transfer of Power 42-7, Vol. VI, p. 424) এই প্রশ্ন করার অর্থ হল শিখপ্রধান অঞ্চলগুলিকে মুসলমানপ্রধান পাঞ্জাব প্রদেশ থেকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার করা।

১৬৩ । The Transfer of Power 42-7, Vol. VI, p. 3
১৬৪ । Ibid, Vol. IX, p. 109

ওয়াভেল লিখেছেন : His (Jinnah) whole theme was that a settlement between the communities was quite impossible and we should never succeed in getting it. If we are going, we had better go at once. ...We went over all the ground again, Pakistan and all. Jinnah asserted at one moment that he had never rejected the smaller Pakistan suggested by the Mission, through he had insisted Calcutta.

১৬৫ । Was India's Partition Unavoidable? p. 79

প্রসঙ্গত : (১) স্যার ডরমান স্মিথ হুডসনকে ১৯৪৬ সালের অক্টোবরে জানিয়েছিলেন যে মাসখানেকের মধ্যেই হাঙ্গামা বেধে যাবে। (The Transfer of Power 42-7, Vol. VII, p. 339)

(২) ওয়াভেল ১/২ আগস্ট ১৯৪৬ তারিখে তাঁর নোটে লিখেছিলেন : Colien Reid of Daily Telegraph asked Jinnah what he ment by direct action, to which Jinnah replied that there would be a mass illegal movement. In the text of the interview which Ried called to the Daily Telegraph, and showed Jinnah first, Jinnah altered "illegal" to "unconstitutional". He was not prepared to specify any greated detail what this involved and Reid said that he got the impression that they had not really worked out what they were going to do. (The Transfer of Power 42-7, Vol. VIII, p. 174)

১৬৬ । The Transfer of Power in India, p. 329, 473
১৬৭ । Gandhi and the Partition of India, p. 99
১৬৮ । Ibid, p. 130
১৬৯ । The Transfer of Power 42-7, Vol. III, p. 940-1
১৭০ । Gandhi and the Partition of India, p. 146
১৭১ । Mountbatten and the Partition of India, p. 62
১৭২ । Freedom at Midnight, p. 29
১৭৩ । The Last Days of British Raj, p. 41, 51
১৭৪ । ভারতে মাউন্টবেটেন, পৃ. ১

মাউন্টবেটেন ৭-১-৪৭ তারিখে এটলিকে একটি চিঠিতে লিখেছিলেন : I imagine you are considering an honour for Wavell, when he gives up office. I hope you will not mind my mentioning this, but I am sure you will understand how much happier I should feel in succeding a man I admire so much, if his services were to receive high recognition. অর্থাৎ মাউন্টবেটেন ওয়াভেলের গুণমুগ্ধ ছিলেন এবং চাইছিলেন যে গভর্নমেন্ট তাঁর

কাজের স্বীকৃতি দিক। এই চিঠিতে মাউন্টবেটেন ক্ষমতা হস্তান্তরের নির্দিষ্ট তারিখও চেয়েছিলেন। দু দিন পরে এটলি একটি চিঠিতে মাউন্টবেটেনকে জানিয়েছিলেন যে সঠিক তারিখ নির্দিষ্ট করা যায় না। তবে ওয়াভেল সম্পর্কে মাউন্টবেটেনের পরামর্শ তাঁর মনে আছে। ১১-২-৪৭ তারিখে ক্ষমতা হস্তান্তরের দিন নিয়ে মাউন্টবেটেন এটলিকে আর একটি চিঠিতে লিখেছিলেন : At Buckingham Palace on 24th January I told you how worried I was to hear from Sir Stafford Cripps that the date proposed was the middle of 1948, since I felt that this left too wide a margin covering, as it did, a period of almost 100 days. Although I asked for a specific date, you said you felt that no date closer than a month should be given, I agreed that the naming of a month, without specifying the particular day would be acceptable; and I said I would aim at the first of that month, so that as to have 30 days in hand.

(The Transfer of Power 42-7, Vol. IX, p. 483, 491, 667)

১৭৫। The Transfer of Power in India, p. 359
১৭৬। Freedom at Midnight, p. 32
১৭৭। The Transfer of Power 42-7, Vol. IX, p. 972
১৭৮। ভারতে মাউন্টবেটেন, পৃ. ৮-৯
১৭৯। ভারত স্বাধীন হলো, পৃ. ২৭৬
১৮০। Freedom at Midnight, p. 52
১৮১। Ibid, p. 149-50
১৮২। The Last Days of British Raj, p. 104
১৮৩। Freedom at Midnight, p. 81-3
১৮৪। Mountbatten and the Partition of India, p. 45
১৮৫। Ibid, p. 141-2
১৮৬। The Origins of The Partition of India, p. 227
১৮৭। Mahatma Gandhi—The Last Phase, Vol. II, p. 84-5; এবং ভারতে মাউন্টবেটেন, পৃ. ৩৪
১৮৮। Ibid, p. 149-50
১৮৯। Pathway to Pakistan, p. 171, 390
১৯০। History of the Freedom Movement in India, Vol. 4, p. 516
১৯১। The Transfer of Power 42-7, Vol. VIII, p. 491
১৯২। Ibid, Vol. XI, p. 53
১৯৩। Ibid, Vol. XI, p. 75
১৯৪। Ibid, Vol. XI, p. 377, 747, 749, 773
১৯৫। Ibid, Vol. XI, p. 3-4
১৯৬। Mountbatten and the Partition of India, p. 157
১৯৭। The Transfer of Power 42-7, Vol. XI, p. 663-4
১৯৮। Ibid, Vol. XI, p. 713-4
১৯৯। History of the Freedom Movement of India, Vol. 4, p. 517-8
২০০। The Transfer of Power 42-7, Vol. IX, p. 178

কৈফিয়ত

স্বাধীনতার আগে বর্তমানের উত্তরপ্রদেশকে যুক্তপ্রদেশ, এবং প্রদেশের/রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রীদের প্রধানমন্ত্রী বলা হত। বইটিতে বর্তমান নাম ব্যবহার করা হয়েছে। 'হলো' না লিখে সর্বত্রই 'হল' লেখা হয়েছে। 'আসাম' না বলে 'অসম' বলা হয়েছে। গান্ধীজীকে ইংরেজরা কখন 'মিঃ গান্ধী' বা শুধু 'গান্ধী' বলে উল্লেখ করতেন। উদ্ধরণ চিহ্নের মধ্যে থাকলেও গান্ধী-কে গান্ধী এবং গান্ধীজী দু'ভাবে উল্লেখ করেছি। মিঃ গান্ধীকে অপরিবর্তিত রেখেছি। —লেখক।

কয়েকটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা, কালানুক্রমিক

১৭৫৭ — ১৩ জুন, পলাশীর যুদ্ধ, পরাধীনতার সূচনা।
১৭৭৩ — ব্রিটিশ পার্লামেন্টে রেগুলেটিং এ্যাক্ট গৃহীত, ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির উপর নিয়ন্ত্রণ।
১৭৯৩ — Bengal Regulation for the Internal Government of British territory গৃহীত।
১৮২১ — শাসকদের পক্ষ থেকে 'ডিভাইড এ্যান্ড রুল' নীতি প্রবর্তনের প্রস্তাব।
১৮৫৭ — ১০ মে মীরাটে সিপাহী বিদ্রোহের সূত্রপাত। ২৭ জুলাই ডিসরেলির ঘোষণা, সিপাহী বিদ্রোহ নয়, জাতীয় বিদ্রোহ।
১৮৫৮ — রানী ভিক্টোরিয়ার ঘোষণাপত্রে ভারত শাসনের কর্তৃত্ব অধিগ্রহণ।
১৮৮২ — রিপন স্বায়ত্ত শাসনের প্রস্তাব পেশ করেন।
১৮৮৫ — ভারতের জাতীয় কংগ্রেসের জন্ম।
১৮৮৬ — আলিগড় ইনস্টিটিউট গেজেটের সম্পাদক সৈয়দ আহমদ খাঁ অধ্যক্ষ থিয়োডোর ব্যাকের পৃষ্ঠপোষকতায় মুসলিম এডুকেশন কনফারেন্স আহ্বান করেন। কংগ্রেসের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করা হয়।
১৮৮৮ — লর্ড ডাফরিন মুসলমানদের স্বতন্ত্র প্রতিনিধিত্বের প্রস্তাব করেন।
১৮৯২ — ইন্ডিয়ান কাউন্সিল এ্যাক্ট গৃহীত।
১৯০৫ — বঙ্গভঙ্গের প্রস্তাব।
১৯০৬ — মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা। হিন্দু মহাসভার জন্ম।
১৯০৯ — মিন্টো-মর্লি শাসন সংস্কার।
১৯১৬ — কংগ্রেস ও লীগের উদ্যোগে লক্ষ্ণৌ চুক্তি।
১৯১৭ — ২০ আগস্ট মন্টেগুর শাসন সংস্কারের ঘোষণা। ১৯১৯ সালে চেমসফোর্ডের সহযোগিতায় আইন পাস।
১৯১৮ — কংগ্রেসের আত্মনিয়ন্ত্রণ সম্পর্কিত প্রস্তাব গ্রহণ।
১৯২২ — ২১ সেপ্টেম্বর লর্ড রিডিং একটি চিঠিতে হিন্দু-মুসলমান বিভেদ রচনার কাজ শেষ করায় সন্তোষ প্রকাশ করেন।
১৯২৩ — জিন্নার কংগ্রেস ত্যাগ করে পুরোপুরি লীগে যোগদান।
১৯২৪ — লাজপত রায় কয়েকটি প্রদেশ ভাগ করে মুসলিম রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব করেন।
১৯২৫ — ১১ এপ্রিল হিন্দু মহাসভা লক্ষ্ণৌ প্যাক্টের নিন্দা করে।
১৯২৮ — সর্বদলীয় সম্মেলন ব্যর্থ।
১৯২৯ — জিন্নার ১৪ দফা পরিকল্পনা উপস্থাপন।
১৯৩০ — ইকবালের প্রদেশ ভাগ ও দেশবিভাগের প্রস্তাব।
১৯৩১-৩২ — গান্ধী আরউইন চুক্তি, দ্বিতীয় গোলটেবিল বৈঠক, ম্যাকডোনাল্যান্ডের সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা।
১৯৩২ — হিন্দু-মুসলমান ঐক্য স্থাপনের উদ্দেশ্যে ঐক্য সম্মেলন।
১৯৩৪-৩৫ — ইউনিটি বৈঠক।

১৯৩৫ — ভারত শাসন সংস্কারের প্রস্তাব। ফেডারেল রাষ্ট্র গঠনের সুপারিশ।
১৯৩৭ — কংগ্রেসের প্রাদেশিক মন্ত্রীসভা গঠন। সভারকরের ঘোষণা, হিন্দু-মুসলমান ভিন্ন জাতি।
১৯৩৯ — মন্ত্রীসভা থেকে কংগ্রেস মন্ত্রীদের পদত্যাগ। লীগের মুক্তি দিবস উদ্‌যাপন।
১৯৪০ — মার্চ মাসে লাহোরে অনুষ্ঠিত অধিবেশনে মুসলিম লীগের দ্বি-জাতি তত্ত্বের ভিত্তিতে দেশবিভাগের প্রস্তাব গ্রহণ।
৪ এপ্রিল শাসকদের জিন্নাকে আশ্বাস যে মুসলমানদের বিনা অনুমতিতে সংবিধান চাপান হবে না।
১৯৪২ — ২৩ মার্চ ক্রিপস দৌত্যের কাজে ভারতবর্ষে আসেন।
২৩ এপ্রিল মাদ্রাজ বিধানসভার একটি প্রস্তাবে কংগ্রেসকে লীগের দাবি মেনে নেবার অনুরোধ।
মে মাসে কংগ্রেস ক্রিপস প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করে।
১৭ জুলাই গান্ধী-জিন্না আলোচনা শুরু এবং পরে ব্যর্থ ঘোষণা।
১০ মে হিন্দু মহাসভার পাকিস্তান বিরোধী দিবস উদ্‌যাপন।
৮ আগস্ট কংগ্রেসের অধিবেশনে ভারত ছাড়ো প্রস্তাব গৃহীত।
৯ আগস্ট গান্ধীজী এবং কংগ্রেসের নেতৃবৃন্দের কারাবরণ।
১৯৪৪ — ২৫ জুন ওয়াভেল আহূত সিমলা সম্মেলন। ২৭ জুন ব্যর্থ ঘোষণা।
১৯৪৫ — ৭ মে জার্মানির যুদ্ধে পরাজয়।
১৯৪৬ — ১৯ জানুয়ারি পার্লামেন্টে মন্ত্রীমিশন পাঠাবার কথা ঘোষণা।
২৩ মার্চ মন্ত্রীমিশনের ভারত আগমন।
৯ মে মন্ত্রীমিশন আহূত সিমলা সম্মেলন। ১২ মে ব্যর্থ ঘোষণা।
১৬ মে মন্ত্রীমিশনের সুপারিশ।
২৯ জুলাই লীগ সমর্থন প্রত্যাহার করে নেয়।
১৬ আগস্ট লীগের প্রত্যক্ষ সংগ্রামের কর্মসূচি।
২৯ সেপ্টেম্বর কংগ্রেস কর্তৃক অন্তর্বর্তীকালীন সরকার গঠন।
১৫ অক্টোবর অন্তর্বর্তী সরকারে লীগের যোগদান।
১৯৪৭ — ২০ ফেব্রুয়ারি এটলির ঘোষণা ১৯৪৮-এর জুলাইয়ের মধ্য ক্ষমতার হস্তান্তর।
২৩ মার্চ মাউন্টবেটেনের ভারত আগমন।
২ জুন মাউন্টবেটেনের প্রস্তাব উত্থাপন।
মুসলিম লীগ কাউন্সিল প্রস্তাব মেনে নেয়।
১৫ জুন কংগ্রেসের অধিবেশনে মাউন্টবেটেন প্রস্তাব সমর্থন।
১৪ আগস্ট পাকিস্তানের জন্ম।
১৫ আগস্ট ভারতবর্ষের স্বাধীনতা লাভ।

গভর্নর জেনারেল এবং ভাইসরয়*

কোম্পানি আমল (১৭৭৪-১৭৫৮)

১৭৭৪-৮৫	ওয়ারেন হেস্টিংস	১৮২৮	উইলিয়াম বেইলি
১৭৮৬-৯৩	লর্ড কর্নওয়ালিস	১৮২৮-৩৫	লর্ড বেন্টিঙ্ক
১৭৯৩-৯৮	স্যার জন মোর	১৮৩৬-৪২	লর্ড অকল্যান্ড
১৭৯৮-১৮০৫	লর্ড ওয়েলেসলি	১৮৪২-৪৪	লর্ড এলেনবরা
১৮০৫	লর্ড কর্নওয়ালিস	১৮৪৪-৪৮	লর্ড হার্ডিং
১৮০৭-১৩	প্রথম লর্ড মিন্টো	১৮৪৮-৫৬	লর্ড ডালহৌসি
১৮১৩-২৩	লর্ড হেস্টিংস	১৮৫৬-৫৮	লর্ড ক্যানিং
১৮২৩-২৮	লর্ড আমহার্স্ট		

১৮৫৮-৬২	লর্ড ক্যানিং	১৮৯৯-১৯০৫	লর্ড কার্জন
১৮৬২-৬৩	প্রথম লর্ড এলগিন	১৮০৫-১০	দ্বিতীয় লর্ড মিন্টো
১৮৬৫-৬৯	স্যার জন লরেন্স	১৮১০-১৬	দ্বিতীয় লর্ড হার্ডিঞ্জ
১৮৬৯-৭২	লর্ড মেয়ো	১৮১৬-২৬	লর্ড চেমসফোর্ড
১৮৭২-৭৬	লর্ড নর্থব্রুক	১৮২১-২৫	লর্ড রিডিং
১৮৭৬-৮০	লর্ড লিনটন	১৮২৬-৩১	লর্ড আরউইন
১৮৮০-৮৪	লর্ড রিপন	১৮৩১-৩৬	লর্ড ওয়েলিংটন
১৮৮৪-৮৮	লর্ড ডাফরিন	১৮৩৬-৪৩	লর্ড লিনলিথগো
১৮৮৮-৯৪	লর্ড ল্যান্সডাউন	১৮৪৩-৪৭ মার্চ	লর্ড ওয়াভেল
১৮৯৪-৯৯	দ্বিতীয় লর্ড এলগিন	৪৭ মার্চ—১৪/৮/৪৭	লর্ড মাউন্টবেটন

★ অস্থায়ীদের নাম তালিকায় নেই।

Facts are Facts—The Untold Story of India's Partition—Wali Khan
Freedom at Midnight—Lorry Collins, Dominique Lapirre
Gandhi and Partition of India—Sandhya Choudhury
Gandhi—His Life and Thought—J.B. Kriplani
Gandhi—Prisoner of Hope—Judith M. Brown
Gandhi Vs. Jinnah—The Debate over The Partition of India—Allen Hayes Merrium
Guilty Men of India's Partition—Rammonohor Lohia
History of The Freedom Movement of India—Tarachand
India From Curjon to Nehru and After-Durga Das
India's Struggle for Independence 1857-1947—Bipan Chandra & others
India Divided—Rajendra Prasad
Khilafat to Partition—Moin Shakir
Mahatma, Vol. 1 to 8—D.G. Tendulkar
Mahatma Gandhi—The Last Phase—Pyarelal
Mahatma Gandhi Vol. I to III—Source Material—Maharstra State Government
Mountbatten and The Partition of India—Lorry Collins, Dominique Lapirre
My Days With Gandhi—N.K. Bose
My Life and Struggle—Autobiography of Badsha Khan
Pakistan or Partition of India—B.R. Ambedkar
Pakistan Resolution to Pakistan 1940-47, Ed. Latif Ahmed Sherwani
Pathway to Pakistan—Choudhury Khaliquzzaman
Pilgrimage to Freedom—K.M. Munshi
Sardar's Letters Mostly Unknow
The Discovery of India—Jawaharlal Nehru
The Last Days of British Raj—Leonard Mosley
The Origins of The Partition of India 1936-47—Amita Inder Singh
The Transfer of Power in India—V.P. Menon
The Transfer of Power 1942-7, Vol. I to XII—Editor in Chief, Nicholas Manserg, Editor—Pendel Moon, published by Her Majesty's Stationary Office
Was India's Partition Unavoidable?—Hiren Mukherjee

গান্ধীজীর দূত—সুধীর ঘোষ
জিন্না-পাকিস্তান, নতুন ভাবনা—শৈলেশকুমার বন্দ্যোপাধ্যায়
ভারত স্বাধীন হলো—মৌলানা আবুল কালাম আজাদ
ভারতে মাউন্টবেটেন—এ্যালেন ক্যাম্বেল জনসন
যুক্ত বাংলার শেষ অধ্যায়—কালিপদ বিশ্বাস
শ্যামাপ্রসাদের ডাইরী ও মৃত্যুপ্রসঙ্গ—সম. উমাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়

অখণ্ড হিন্দুস্থান, ২০
অচিনলেক, স্যার ক্লড, ১৬৮
অন্তর্বর্তী সরকার, ৩৩, ৬১, ৬৬, ৭৯, ৮২, ৮৪, ৮৫, ৮৭, ৮৮-৯৫, ৯৯, ১০৭, ১১০, ১১৭, ১১৮, ১২০, ১৩৮, ১৪২, ১৫০, ১৫১, ১৬৫, ১৬৮
অমলেশ ত্রিপাঠী, ৮৯
অমৃতকুমারী, রাজকুমারী, ৯০
অল ইন্ডিয়া মুসলিম কনফারেন্স, ১৭
অসহযোগ আন্দোলন, ৬০, ৯৫

আই. আই. চণ্ডীগড়, ৯২, ৯৯
'আগস্ট দান', ৪৯
আগা খাঁ, ১৭, ৩০, ৩৭, ৪০, ১২৯
আজাদ মুসলিম বোর্ড, ৪৫
আজাদ, মৌলানা আবুল কালাম, ২৭, ৩১-৩৩, ৪৫, ৫৩, ৫৪-৫৬, ৬৭-৭১, ৭৮, ৮১, ৮৩, ৯০, ৯১, ৯৩, ৯৭-১১৩, ১১৬, ১২০, ১২৬-১২৯, ১৪৩, ১৪৪, ১৫২, ১৭৬, ১৭৭, ১৮৫
আজাদ হিন্দ বাহিনী, ৭৪, ৯০, ১৬০
আত্মনিয়ন্ত্রণ, ২৫, ২৬, ৩৪, ৪০, ৪৫, ৪৬, ৫৫, ৫৮-৬৪, ১১৩, ১১৬, ১১৭, ১৩১-১৩৩, ১৩৭-১৩৯, ১৬১, ১৬২, ১৮২
আনসারি, ডাঃ ২৭
আবদুর রব নিস্তার, ৭৮, ৯২, ৯৩, ১৭০
আবদুর রহমান সিদ্দিকি, ৪৫
আবদুল গফুর খাঁ (বাদশা খাঁ দেখুন)
আবদুল জব্বর, ৪০
আবদুল লতিফ, ডঃ, ৪০
আবদুল সত্তার, ৪০
আবদুল হামিদ, ৯৭
আবদুল হালিম শাকার, ৪১
আমরস ডভাস, ৪৮
আমেরি, ১৯, ৪১, ৪৭, ৪৯-৫৩, ৫৬, ৫৭, ৬৪, ৬৫, ৭৩, ১১৩, ১৬৪
আম্বেদকর, ১৫, ২২, ৩১, ৪২, ৪৩, ৭৫, ১৮১
আরউই ২১, ২৮, ১৩৬
আর. জি. কেসি, ১৬৯
আলি জাহির, ৮৯, ৯২
আল্লা বক্স, ৩১, ৪৫, ৫৫
আসফ আলি, ৬৮, ৮৯
আহরার, ৪৫
আয়েঙ্গার, ১১৫
অ্যানি বেসেন্ট, ১৫৯
অ্যাংলো ওরিয়েন্টাল কলেজ, ১৩

ইউনাইটেড ইন্ডিয়ান প্যাট্রিয়টিক অ্যাসোসিয়েশন, ১৫৯
ইকবাল, ৩৫, ৩৮, ৪০
ইন্ডিপেন্ডেন্ট পার্টি, ৩০
ইন্ডিয়ান ইনডিপেন্ডেন্স বিল, ১৭৩
ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অ্যাকট, ২৫
ইন্দো বর্মা কমিটি, ১৭৪
ইবন বতুতা, ১২
ইসকিন্দার মির্জা, ১৩৫
ইসমাইল খাঁ, ৩২, ৩৩, ৬৮, ৭৮
ইসমে, ১৬৯
ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানী, ১৩

উলফ্রেড সুইন ব্লান্ট, ৪০
উলমুলুক (নবাব), ১৭
উসমানী, ১৭

এইচ. টোয়ামেন, ৪৬, ৫০, ৬৩
এইচ. সেনর, ৫৩

এটলি, ২১, ৫০-৫৪, ৬৯, ৭৬, ৭৭, ৮৪, ৯৯, ১০৭, ১০৯, ১৬০, ১৬২, ১৬৫-১৬৭, ১৭৪
এন. পি. ইঞ্জিনিয়র, ৯০
এনায়েত উল্লা খাঁ মশরিকি (খাকসার আন্দোলন), ৪৫, ৬২
এ. ভি. আলেকজান্ডার, ৭৬
এম. এন. রায়, ৪১
এলফিনস্টোন, ১৩, ২০
এ. হোপ, ৫৭
এ্যালেন ক্যম্বেল জনসন, ১০৫-১০৭, ১০৯, ১১৩, ১১৪, ১৩৪, ১৪৫

ঐক্য সম্মেলন, ২১

ওলিভার, ২০, ২১
ওয়াভেল, ৫০, ৫১, ৫৪, ৫৭, ৬৪-৭৩, ৮৩-৮৫, ৮৭-৯০, ৯২-৯৫, ৯৮, ১০০, ১০২, ১০৭, ১২২, ১২৬, ১৩৪, ১৩৮, ১৫৩, ১৬০-১৬৫, ১৬৮, ১৭২
ওয়ার ক্যাবিনেট, ৫৪
ওয়ালি খাঁ, ৩৬, ৪৩, ১২৫
ওয়েলিংডন, ১২১, ১২৩

কবীর, ১৩
কম্যুনিস্ট পার্টি (কমিউনিস্ট), ৪১, ১১৫, ১৩০, ১৪৮
কংগ্রেস, ১৪-১৯, ২১-২৪, ৩২-৩৬, ৪১, ৪২, ৪৬, ৪৯-৬১, ৬৪-৬৯, ৭৬-৯৫, ৯৮, ৯৯, ১০২-১২৩, ১২৬-১৩৪, ১৩৭-১৫৭, ১৬০-১৬৯, ১৭২-১৭৬, ১৮২-১৮৪
কংগ্রেস ন্যাশানালিস্ট পার্টি, ৩০
কংগ্রেস সোসালিস্ট পার্টি, ১৪২
কার্জন, ১৬, ২০, ২৫
কাসিম রাজভি, ২২, ২৩
কৃপালনী, আচার্য, ১২০, ১২১, ১৪৯, ১৫৩, ১৬২, ১৭০, ১৭২
কৃষ্ণ মেনন, ১০৩, ১৭৪
কে. এম. মুন্সী, ২০, ১২৭, ১৩৭
ক্রামবান, লর্ড, ৫৩
ক্লাউ, ৫০

খাকসার (এনায়েত উল্লা খাঁ দেখুন)
খাঁ ইফতিকার হুসেন খাঁ, ১৫২
খাঁ (খান) সাহেব, ডাঃ, ৩৬, ৩৭, ১০৩
খালিকুজ্জমান (চৌধুরী), ২৭, ৩১-৩৪, ৩৭, ৩৮, ৪১-৪৫, ৪৯, ৭৩, ৭৪, ১২৮, ১২৯, ১৩৫, ১৫৯, ১৭০
খিলাফত (খলিফা), ১৮, ১৯, ২৭, ৯৫, ১২৭

গঙ্গাধর অধিকারী, ১৩০, ১৩১
গজনফর আলি খাঁ, ৯২
গণপরিষদ, ১২, ৭৮, ৮১, ৮৩, ৮৮, ৯৪, ১৪২, ১৬২, ১৬৬, ১৭১
গান্ধীজী (মহাত্মা), ১৬, ১৮, ১৯, ২২, ২৬-২৮, ৩৩, ৩৫, ৪৪-৪৯, ৫২-৫৬, ৫৯-৭১, ৭৪, ৭৭-৮১, ৮৫-৯৩, ৯৯-১১৫, ১১৮, ১২০-১২৭, ১৩০-১৫৬, ১৬১, ১৬৪, ১৬৮-১৭৭, ১৮০-১৮৫
'গান্ধারীর আবেদন', ১৪৫
গেলডার, ৬৬
গোবিন্দ বল্লভ পন্থ, ৩২, ১১৯
গোলটেবিল বৈঠক, ২২, ২৭, ২৮, ৩০, ৩৭, ১২১, ১২৩, ১৩৬, ১৫৭

ঘনস্যামদাস বিড়লা, ১৪৩

চার্চিল, ৩৭, ৪৯, ৫১, ৫২, ৫৬, ৫৭, ৬৬, ৭০-৭৩, ১০৭, ১৩৪, ১৩৫, ১৬১, ১৬৭, ১৬৮, ১৭৩
চিত্তরঞ্জন দাস, ১৫, ২৩, ২৭, ১৩০
চিমনলাল শীতলবাদ, ৪৬, ১২৫
চিয়াং কাইশেক, ৫১-৫৩
চেমসফোর্ড, ২১, ২৫, ২৬, ১২৪
চোদ্দ দফা প্রস্তাব, ২৪, ১২৯
চৌধুরী মহম্মদ আলি, ৯৩

জওহরলাল নেহরু, ১২, ২৯, ৩১-৩৪, ৩৬, ৫৩, ৫৬, ৭০, ৭৮-৮৫, ৮৮-১১২, ১১৫, ১১৭, ১১৮, ১২০, ১৩০, ১৩৫, ১৪৩, ১৪৮, ১৫০-১৫৫, ১৬১, ১৬৪-১৭৩, ১৭৬, ১৮৫
জগজীবন রাম, ৮৯
জন ব্রাইট, ২০, ৪১
জন মাথা ৮৯
জন অ্যালেন ক্যাম্বেল, ৮৯
জমায়েত উল উলেমা, ৪৫
জয়প্রকাশ নারায়ণ, ১০৪, ১৪২
জয়াকর, ৫৫
জাকির হোসেন, ৯০
জাফরুল্লা, ৪৪
জি. এম. রসম্যান, ১০৯

জিন্না (কায়েদ-এ-আজম), ২৩-২৬, ৩০, ৩২, ৩৪, ৩৬, ৩৭, ৪০, ৪২-৫০, ৫৬, ৫৭, ৬২-৭১, ৭৫-৯৭, ১০০, ১০২-১০৭, ১১০-১১৭, ১২১-১৩৫, ১৩৭, ১৩৯-১৪১, ১৪৪, ১৪৬-১৫৪, ১৬০-১৬৫, ১৬৮-১৭৬, ১৮২-১৮৫
জে. আর. প্যাটেল, ১৩৪
জেটল্যান্ড, ৩৭

টমাস, ১৩০
'টাইমস', ২০, ১৬২
'টাইমস অফ ইন্ডিয়া', ১৬১
ট্রটস্কি, ১৪৮

ডন, ৮৬, ৯৯, ১৫৩
ডাফরিন, ১৬, ২০
ডি. ভেলেরা, ৮৯
'ডেলি মেল', ৪৮
ডোমিনিয়ন স্টেটাস, ২৫, ২৯, ৪১, ৫০, ৫৩, ৫৪, ৫৯, ১০৭, ১০৮, ১১১, ১১৮, ১২৯, ১৪৭, ১৬৪, ১৬৮
ডোমিয়ান লেপিয়ার, ১৩৮

তাঁরাচাঁদ, ডঃ, ৫৮, ৬৩, ৯৪, ১১৩, ১২৯, ১৩১, ১৩৪
তারা সিং, মাস্টার, ৬৮, ১১৩, ১১৪
তিলক, ২৫, ২৬, ১৫৯, ১৬০
তেজবাহাদুর সপ্রু, ৫৫

দাদাভাই নৌরজী, ১২২
দাদু, ১৩
দুর্গাদাস, ১১০
দেশাই, ভুলাভাই (দেশাই-লিয়াকত চুক্তি), ৬৪, ৬৭
দ্বি-জাতি তত্ত্ব, ১৯, ২০, ৬৪, ৮৫-৮৮, ১২৭, ১৩২, ১৩৭, ১৩৯, ১৫০, ১৫১, ১৫৫, ১৬২, ১৭০, ১৮২, ১৮৩

নবাব মহম্মদ, ৬৮
নিউ ক্রনিকাল, ৬৬
নিজাম, ১২২, ১৬৭
নিজামুদ্দিন (নাজিমুদ্দিন), ৪৩, ৪৬, ৮৪, ৮৫
নেহরু (জওহরলাল দেখুন)
নেহরু কমিটি (মতিলাল নেহরু দেখুন)
নোয়াখালি, ১৫০, ১৫১
নৌ-বিদ্রোহ, ৭৪

'পরশ পাথর', ১৫৫
পানিক্কর, ১১৪
পি. সি. যোশী, ১৩১
পুরুষোত্তম দাস ট্যান্ডন, ৩৩
পৃথক নির্বাচন (সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা), ১৬, ২০-২২, ২৪-২৮, ৩১, ৪৬, ১১৫, ১২২, ১২৩, ১২৯, ১৩০, ১৫৯, ১৮১
পেথিক লরেন্স, ৭৩, ৭৬, ৭৭, ৭৯, ৯৯, ১০২, ১১৬, ১৪০, ১৬২, ১৬৩, ১৭৩
প্যাটেল (বল্লভভাই দেখুন)
প্যান ইসলাম, ৪৪, ৬৩, ৯৭, ১৫৮
প্যারেলাল, ১০২
প্রত্যক্ষ সংগ্রাম (ডাইরেক্ট অ্যাকশন), ৮৮-৮৯, ১০০, ১২৫, ১২৬, ১২৮, ১৪৪, ১৬৩, ১৮২, ১৮৩
প্রাউডান, ৩৭

ফজলুল হক, ২৭-৩১, ৪২, ৪৪, ৪৫
ফিরোজ খাঁ নুন, মালিক, ১৫১, ১৬৩
ফেডারেল কোর্ট, ১০৫
ফেডারেশন (ফেডারেল রাষ্ট্র/স্টেট), ২৪, ২৬, ২৮, ২৯, ৩০, ৩৭, ৪০, ৪১, ৪২, ৫৬, ৬০, ৭৮, ৮১, ১১৩, ১২৭, ১২৯, ১৩৩
ফ্রান্সিস টকার, স্যার, ৪৮
ফ্রান্সিস সায়ার, ৭০

বঙ্কিমচন্দ্র (আনন্দমঠ/ বন্দেমাতরম), ২৩, ১২৫, ১২৯, ১৩৯
বঙ্গভঙ্গ, ১৬, ১৭-২০
'বন্দেমাতরম' (বঙ্কিমচন্দ্র দেখুন)
বরোজ, ১১২
বলদেব সিং, ৮৯, ৯৪, ৯৫, ১০৬, ১৭০, ১৭২
বল্লভভাই প্যাটেল, ৭৮, ৮১, ৮৯, ৯৩-১১২, ১১৮, ১২০, ১২২, ১৩৫, ১৪৩, ১৪৪, ১৫২, ১৫৫, ১৬৫, ১৬৬, ১৬৮, ১৭০, ১৭৩, ১৭৪
বাদশা খাঁ (খুদা-ই খিদমদগার), ৪৩, ৭৬, ১০৩, ১০৪, ১৫২, ১৬৫, ১৭৬, ১৮৫
বেক, ১৫৯
বেভারিল নিকলস, ৪৭
বেভিন, ৭৩
'বোম্বে ক্রনিকেল', ৩৭

'ভারত ছাড়ো' (আগস্ট আন্দোলন), ১৭-৪৬, ৪৭; ৫০, ৫১, ৬১, ৬৬, ৬৯, ৯৫, ১০০, ১১৩, ১২৮, ১৩০, ১৩২, ১৩৩, ১৪৪, ১৫১,

১৬০, ১৬১
ভিকর উল মুলুক, ১৫৮
ভি. পি. মেনন, ৬৯, ১০৭, ১০৮, ১১১, ১১৮, ১৩১, ১৪৯, ১৬৫, ১৬৭, ১৬৮, ১৭০, ১৭৪
ভূলাভাই (দেশাই ভূলাভাই দেখুন)

মতিলাল নেহরু (নেহরু পরিকল্পনা/ নেহরু কমিটি), ২৩, ২৪, ২৮, ৩০, ৩৬, ৩৭, ১২২, ১২৯, ১৬০
মদনমোহন মালব্য, ২৮, ১১৭
মন্টেগু, ২১, ২৫, ২৬, ১২৪
মন্ত্রীমিশন, ৭৩-৮৫, ৯৮, ৯৯, ১০১-১০৫, ১১০, ১১৩, ১১৬, ১১৮-১২০, ১৩৫, ১৩৮, ১৪০-১৪৪, ১৫৩, ১৫৪, ১৬০-১৬৫, ১৭১, ১৭৩, ১৭৫
'মর্নিং নিউজ', ৮৬
মর্লে, ২১
মহম্মদ আলি, মৌলানা, ১৯, ২৪, ২৭, ৪১, ১২২, ১৫৭
মহম্মদ গুল খান, ৪১
মাউন্টবেটেন, ৪৯, ৫৫, ৮৯, ১০২, ১০৩, ১০৫-১১১, ১১৫, ১১৮-১২০, ১৩২-১৩৫, ১৩৮, ১৫২, ১৫৩, ১৫৫, ১৫৭-১৭৭
মালিক খিজির হায়েত খাঁ, ৬৮, ৬৯
মিন্টো, ১৬, ২০, ২১
'মুক্তি দিবস', ৪২, ১২৫
মুঞ্জে, বি. এস, ১৮, ২৪
মুসলিম গেজেট, ১৭
মুসলিম লীগ, ১৭, ১৯-২২, ২৫, ২৬, ৩০-৩২, ৩৪, ৩৫, ৩৬, ৩৮, ৪১-১০২, ১০৬, ১০৮, ১০৯, ১১১-১১৭, ১২০, ১২২, ১২৩, ১২৫-১৩৪, ১৩৭-১৫০, ১৫৩-১৫৭, ১৬০-১৬৯, ১৭২-১৭৬, ১৮২-১৮৫
মোপালা রায়ট, ২৭
ম্যাকডোনাল্ড, ২৮
'মঞ্চেস্টার গার্ডেন', ৪৮

যোগেন্দ্রনাথ মণ্ডল, ৯২, ১২৬
যৌথ নির্বাচন, ২৩, ২৪, ৫৫, ১২২, ১২৩, ১২৭

'রঙ্গীলা রসূল', ২৮
রজনীপাম দত্ত, ১৬০
রব্বব, ১৩
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, ১২, ৫২, ১৪৫, ১৫৫, ১৭৯
রহমত আলি (চৌধুরী), ৩৭, ৩৮, ৪০, ১২৭
রয়াল কমিশন, ৩৬
রাজাগোপালাচারী (রাজাজী), ২০, ৫২, ৫৬, ৫৭, ৫৯, ৬০-৬৪, ৬৭-৬৯, ৯৩, ১০১, ১০৪, ১১২, ১১৩, ১১৫, ১৩১, ১৩৯, ১৬২
রাজেন্দ্রপ্রসাদ, ৩১, ৩৬, ৮৯, ১০৮, ১১০, ১১৯
রামমনোহর লোহিয়া, ৩৩, ১০৪
রামানন্দ তীর্থ, ১৬৭
রিচার্ডসন, ১৬০
রিডিং, লর্ড, ১৯
রুজভেল্ট, ৫৬
রেনাইন, ১৩০
র‍্যাডক্লাফ, ১০২

লক্ষ্ণৌ প্যাক্ট, ২৫, ১২২, ১২৬
লয়েড্ জর্জ, ৩৭
লালা লাজপত রায়, ১৫, ২৬, ২৮, ৩৭, ৪১, ১৩০, ১
লিওনার্ড মসলে, ৮৭, ১০৫, ১০৬
লিনলিথগো, ১৮, ১৯, ৪২-৪৪, ৪৯, ৫২, ৫৩, ৫৬, ৫৭, ৬৮, ১১৩, ১২৮, ১৬১, ১৬৩, ১৬৪
লিস্ট ওয়েল, ১৭৩, ১৭৫
লিয়াকত আলি, ৬৫, ৬৮, ৬৯, ৭৮, ৯২-৯৫, ১১০, ১২৩
লুই ফিশার, ১২০, ১৭০
লেডি মাউন্টবেটেন, ১০৩, ১০৫
ল্যারি কলিনস, ১৩৮

শরৎচন্দ্র বসু, ৯০, ৯২, ১১৫, ১৫০
শহীদ সুরাবর্দী, ৮৬, ৮৭, ১১৫, ১৫০
শাফত আহমেদ খাঁ, ৮৯, ৯২
শুদ্ধি আন্দোলন, ২৭
শেখ আবদুল্লা, ১৬৭
শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, ১৭, ১৮, ৬৩, ৬৮, ১১৩, ১১৫, ১৫০
শ্রদ্ধানন্দ, স্বামী, ২৭, ২৮
শ্রীঅরবিন্দ, ৫৭

সভারকর, ১৫, ১৭, ১৯, ৫৬, ৯৭, ১২৭
সাইমন (সাইমন কমিশন), ২১, ১২২
সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা (পৃথক নির্বাচন দেখুন)
সার্বভৌম বাংলা, ১১৫, ১৩০, ১৫০
সালিমুল্লা, ১৭
সি. এইচ. ভাবা, ৮৯
সিপাহী বিদ্রোহ, ১৩, ১৪১

সিকান্দর হায়াত খাঁ (ইউনিয়নিস্ট পার্টি), ৩১, ৪০, ১১৫
সিমলা সম্মেলন, ৫০, ৬৭, ৬৮, ৭৮, ৭৯, ৯৯, ১০০, ১২৪, ১২৬, ১৩৬, ১৬৪
সুধীর ঘোষ, ১০২, ১০৩
সুভাষচন্দ্র বসু, ৩৪, ৫৯, ১৩৬, ১৪৩, ১৮৫
সৈয়দ আফগানী, ৪১
সৈয়দ আহমেদ, স্যার, ১৩-১৫, ১৭, ৯৭, ১৫৮, ১৫৯
স্টাফোর্ড ক্রিপস (ক্রিপস প্রস্তাব), ৪৮, ৫১-৫৮, ৭৪, ৭৬-৯৯, ৯৯-১০২, ১১৫, ১২৮, ১৩৫, ১৩৬, ১৬১, ১৬২
স্তালিন, ৪১
'স্টেটসম্যান', ১৭৬
স্যামুয়েল হোর, ২১, ১২১-১২৩
স্বরাজ্য দল, ২৩
স্বায়ত্তশাসন, ১১২-১২১

হডসন, ১৬২
'হরিজন', ১২১, ১৩৭, ১৫৬
হারবার্ট, ১৬১
হিউম, ১৪১
হিন্দু মহাসভা, ১৫, ১৭-২০, ৩০, ৩৬, ৪৫, ৫৫-৭৫, ৭৬, ৯৭, ১১৪, ১১৫, ১২৩, ১৫৮, ১৬১, ১৬৪, ১৮২
হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, ১৩০